সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী

সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস (২য় খণ্ড)

মূল ঃ সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী

অনুবাদ ঃ আবূ সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী ও হাফেজ আবু তাহের মেছবাহ

প্রকাশক ঃ

মুহাম্মদ আবদুর রউফ

মুহাম্মদ ব্রাদার্স

৩৮, বাংলাবাজার

ঢাকা-১১০০

ফোন ঃ ৭১২৫৪৮১

প্রকাশকাল ঃ

প্রথম প্রকাশ ঃ শ্রাবণ ১৩৯৭ ; মুহররম ১৪১১ ; আগস্ট ১৯৯০ ইং

দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ আগস্ট ২০০৩ ইং

অক্ষর বিন্যাস ঃ

জবা কম্পিউটার

বুকস্ এণ্ড কম্পিউটার মার্কেট (৪র্থ তলা)

৪৫, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণে ঃ

মেসার্স তাওয়াক্কাল প্রেস

৮৭/১, নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

প্রচ্ছদ ঃ

বশির মেছবাহ

সালসাবিল

মোবাইল : ০১৭১-২৬৬৮৪৫

ISBN : 984-622-002-2

মূল্য ঃ ১৬০.০০ টাকা মাত্র

Shangrami Shadhakder Itihash : (History of the Soviours of Islamic Spirit) written by Syed Abul Hasan Ali Nadvi in Urdu, translated by A. S. M. Omar Ali and Hafez Abu Taher Mesbah into Bengali and Published by Muhammad Abdur Rouf. Muhammad Brothers, 38, Bangla Bazar. Dhaka—1100. Phone—7125481 August, 2003. Price : Tk. 160.00 Only.

উৎসর্গ

ইসলামের প্রচার ও প্রসারে যাঁরা চরম আত্মত্যাগের সম্মুখীন হয়েও বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি, এ পথের সকল প্রতিকূলতাকে যাঁরা হাসিমুখে মুকাবিলা করেছেন,

অত্যাচারী জালিমের খড়্গ-কৃপাণ ও বদ্ধ কারাপ্রাচীর যাঁদের বিশ্বাসের ভিত্‌কে এক বিন্দুও টলাতে পারেনি,

বিলাসী ও আয়েশী জীবন যাপনের শত সুযোগ থাকা সত্ত্বেও যাঁরা নির্লোভ ও নির্মোহ্ জীবন যাপন করে মানুষের সামনে অনুপম আদর্শ স্থাপন করেছেন,

পর্ণ কুটিরে বাস করে অনাড়ম্বর পরিবেশ থেকেও যাঁরা রাজা-বাদশাহ্‌র ঔদ্ধত্য ও দাম্ভিকতার সামনে নিজেদের শির্‌ সমুন্নত রেখেছেন, দুঃখী ও মজলুম মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে যাঁরা তাদের হতাশ অন্তরে আশা-ভরসার প্রদীপ জ্বালিয়েছেন,

তাদেরকে কাছে টেনেছেন,
আপন করেছেন,

রূহানিয়াতের প্রোজ্জ্বল আলোকধারায় যাঁরা পাপক্লিষ্ট ও পথভ্রষ্ট মানুষকে হিদায়াতের প্রশস্ত রাজপথে এনে দাঁড় করিয়েছেন, সেই সব জানা-অজানা মর্দে মু'মিন ও মর্দে মুজাহিদের পবিত্র রূহের উদ্দেশে।

আমাদের কথা

খুলাফায়ে রাশেদীনের পর মুসলিম ইতিহাসের আদর্শবাদী ধারা যথেষ্ট দুর্বল হয়ে পড়লেও পরবর্তী প্রতিটি যুগে এমন কিছু কিছু বিরল ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটেছে যাঁরা পুনরায় ফিরে যেতে চেয়েছেন ইসলামের মূল আদর্শের দিকে এবং আজীবন সংগ্রাম ও সাধনা করেছেন ইসলামী আদর্শের পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। তাঁরা কেউ কেউ, যেমন ওমর ইবন 'আবদুল 'আযীয (র.), গাযী সালাহ্উদ্দীন রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এই সাধনা ও সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছেন, কেউ কেউ এই সাধনার কারণে তৎকালীন রাষ্ট্রশক্তির কোপদৃষ্টিতে পতিত হয়েছেন, আবার অনেকেই রাষ্ট্রীয় অঙ্গন থেকে দূরে অবস্থান করে ইসলামের আধ্যাত্মিক, নৈতিক, দার্শনিক ও সামাজিক আদর্শকে সমুন্নত রাখার কঠোর সাধনায় নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। ইসলামের প্রকৃত ইতিহাস যতটা মুসলিম রাজা-বাদশাহ ও শাসকদের ইতিহাস, তার চাইতেও অধিক এই সব সাধক ও সংগ্রামী পুরুষের ইতিহাস। আজকের বিশ্বব্যাপী ইসলামী নব জাগরণের পেছনে এসব অমর সাধকের শত-সহস্র বছরের নিঃস্বার্থ সাধনার অবদানকে অস্বীকার করা আর বাস্তবতাকে অস্বীকার করা একই কথা।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, ইসলামের ইতিহাসের এই স্বর্ণোজ্জ্বল ধারা আজও আমাদের কাছে প্রায় অজানাই রয়ে গেছে। ইসলামী আদর্শের পুনঃপ্রতিষ্ঠাকামী এই বিপ্লবী তাৎপর্যমণ্ডিত প্রবাহের চাপাপড়া ইতিহাস পুনরুদ্ধারকল্পে আত্মনিয়োগ করে উপমহাদেশের প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষক সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (র.) মুসলিম উম্মাহকে চিরকৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছেন। উর্দু ভাষায় রচিত তাঁর এ সম্পর্কিত যুগান্তকারী গ্রন্থ 'তারীখ-ই দাওয়াত ও 'আযীমত' ছয় খণ্ডে সমাপ্ত এবং হযরত ওমর ইবন 'আবদুল আযীয (র.) থেকে শুরু করে বিপ্লবী অগ্নিপুরুষ সাইয়েদ আহমদ শহীদ বেরেলভী (র.) পর্যন্ত সাধক সংগ্রামীদের আলেখ্য এতে স্থান লাভ করেছে। এই গ্রন্থমালা বাংলায় প্রকাশ করার কর্মসূচী মুহাম্মদ ব্রাদার্স ইতিপূর্বেই গ্রহণ করেছে এবং ইতোমধ্যেই এ সিরিজের ১ম খণ্ডটি সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস নামে মুহাম্মদ ব্রাদার্স থেকে প্রকাশিতও হয়েছে। বর্তমান গ্রন্থ উক্ত 'তারীখ-ই-দাওয়াত ও আযীমত' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের অনুবাদ।

বর্তমান খণ্ডে ইসলামী রেনেসাঁর বিপ্লবী (একই সঙ্গে বিতর্কিতও) পুরুষ শায়খুল ইসলাম হাফিজ তকীয়্যুদ্দীন ইবনে তায়মিয়া (র.)-র সুবিস্তৃত ঘটনা ও কর্মবহুল জীবনালেখ্য স্থান পেয়েছে। উল্লেখ্য, ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র ওপর কয়েকটি বই

ইতিপূর্বেই বিভিন্ন প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত হয়েছে। তবে বর্তমান গ্রন্থে ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র.) সম্পর্কে পাঠক ভিন্নতর স্বাদ পাবেন, তদুপরি এই বিতর্কিত (একই সঙ্গে মজলুমও বটেন) চরিত্রটি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পাবেন এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।

আমরা গ্রন্থটির বহুল প্রচার আশা করছি। পরিশেষে আমাদের মুনাজাত, আল্লাহ্ পাক আমাদের সামান্য খিদমতটুকু কবুল করুন। আমীন!

আগস্ট, ২০০৩ ইং
ঢাকা-১১০০

—প্রকাশক

অনুবাদকদ্বয়ের আরয

আল্লাহ্ রাব্বু'ল-'আলামীনের অপার অনুগ্রহে মুসলিম বিশ্বের প্রখ্যাত 'আলিম, লেখক, দার্শনিক ও রূহানী মার্গের অন্যতম জ্যোতিষ্ক 'আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান 'আলী নদভীর রচিত 'তারীখ দাওয়াত ও 'আযীমত' সিরিজের দ্বিতীয় খণ্ডের বাংলা তরজমা **"সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস"** (দ্বিতীয় খণ্ড) প্রকাশিত হ'ল। যাঁর অসীম রহমতে এটি বাংলাভাষী পাঠকের হাতে পৌঁছতে পারল সর্বপ্রথম সেই মহান আল্লাহ্র দরবারে জানাই লাখো-কোটি হাম্দ এবং অসংখ্য শোক্র ও সুজূদ।

উর্দূভাষী পাঠকের নিকট 'আরীখ-ই দাওয়াত ও 'আযীমত'-এর নতুন পরিচয়ের অবকাশ নেই। সর্বপ্রথম ভারতে প্রকাশিত হলেও ইতিমধ্যেই তা আরবী ও ইংরেজী ভাষায় অনূদিত হয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পাঠকমহলে সাড়া জাগিয়েছে এবং এর কোন কোন খণ্ডের একাধিক সংস্করণও প্রকাশিত হয়েছে। অবশেষে বাংলাভাষী পাঠক সর্বপ্রথম ১৯৮৩ সালের প্রথম দিকে এ সিরিজের ৩য় খণ্ডটির সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পান যা 'ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রপথিক' নামে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। অতঃপর এর ১ম খণ্ডটি অনেক বিলম্বে হলেও যথানিয়মেই প্রকাশিত হয়। অত্যন্ত আনন্দের বিষয়, দু'টি খণ্ডই পাঠক মহলে বিপুল জনপ্রিয়তা পায় ও অল্প দিনের মধ্যেই ৩য় খণ্ডটির দু'টি সংস্করণ এবং ১ম খণ্ডটির ১ম সংস্করণ নিঃশেষ হয়ে যায়। এই সঙ্গে সহৃদয় পাঠকমহলকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল, সিরিজের অপরাপর খণ্ডগুলোও যথাসম্ভব সত্বর পাঠকের হাতে তুলে দেওয়া হবে। অত্যন্ত আনন্দ ও সৌভাগ্যের বিষয়, আল্লাহ্ পাক আমাদের সে আশ্বাস পূরণের ক্ষেত্রে আরও এক ধাপ এগিয়ে যাবার তৌফিক দিলেন। সেই সাথে আগ্রহী পাঠকের কাছে বিনীত দু'আপ্রার্থী, রাহ্মানু'র-রাহীম আল্লাহ্ পাক তাঁর অসীম মেহেরবানীতে সিরিজের অপর দু'টিও খণ্ডও (৪র্থ ও ৫ম) যেন আমাদের পাঠকবৃন্দের হাতে সত্বর তুলে দেবার তৌফিক দেন। আর তাঁর তৌফিকই হোক আমাদের একমাত্র ভরসা।

বর্তমান খণ্ডটি শায়খুল ইসলাম হাফিজ ইবনে তায়মিয়া (র.)-র বিস্তৃত ঘটনা ও কর্মবহুল জীবনালেখ্য। ইবনে তায়মিয়া (র.) কেবল এদেশেই নয়–সারা মুসলিম বিশ্বেই বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব হিসাবে সমধিক খ্যাত ও পরিচিত। তাঁকে নিয়ে এই বিতর্ক তাঁর জীবিতকালেই শুরু হয়েছিল এবং এজন্য তাঁকে কম ভোগান্তির সম্মুখীন হতে হয়নি। জেল, জুলুম, প্রলোভন–এমন কোন অস্ত্র নেই যা তাঁর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হয় নি। কিন্তু কোন কিছুই তাঁকে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী থেকে একচুলও হটাতে সক্ষম হয়নি। বিশ্বত্রাস তাতারীদের অস্ত্র যেমন তাঁর সামনে ভোঁতা প্রমাণিত হয়েছে, তেমনি মুসলিম স্বেচ্ছাচারী শাসকদের ভয়-ভীতি ও হুমকী প্রদর্শন, সর্বশেষ বন্ধ কারা-প্রাচীরও অকার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। তিনি একমাত্র তাঁর মহান স্রষ্টা ছাড়া আর কোন শক্তির সামনেই তাঁর উন্নত মস্তক অবনত করেন নি, কিংবা কোন জাগতিক প্রেরণা বা স্বার্থই তাঁর পবিত্র চরিত্র কলুষিত করতে পারে নি।

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র.)-কে নিয়ে এই বিতর্কের কারণ কি? এ প্রশ্ন অন্যদের নয়–আমাদেরও। স্বীকার করতে কোন দ্বিধা নেই বর্তমান গ্রন্থটি পাঠ করবার পূর্বে আমাদের সে প্রশ্ন থাকলেও এক্ষণে তা আর নেই। এই মহান ব্যক্তিত্বের স্বপক্ষ ও বিপক্ষ সকল মহলের কাছেই তাই আমাদের বিনীত আবেদন, আসুন–আমরা এই বিতর্কিত চরিত্রটি সম্পর্কে খোলা মন নিয়ে জানতে চেষ্টা করি, এরপর তাঁর সম্পর্কে কোন রায় কায়েম করি। কারণ তিনি শুধু বিতর্কিতই নন– একজন সর্বাধিক মজলুমও। একজন মজলুম মানুষ হিসাবে তিনি অবশ্যই আমাদের কাছে এতটুকু ইনসাফ আশা করতে পারেন, তাঁর সম্পর্কে কোন রায় কায়েমের পূর্বে তাঁকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ আমরা দেব এবং তাঁর সকল বক্তব্য আমরা ধৈর্যের সাথে শুনব। বর্তমান গ্রন্থ আমাদেরকে সেই সুযোগ এনে দিয়েছে যেজন্য এ গ্রন্থের মূল লেখক আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান নদভীর নিকট আমরা কৃতজ্ঞ।

বাংলা ভাষায় এই মহান ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে ইতিপূর্বে তেমন কোন আলোচনা হয়নি। ফলে তিনি পূর্বোপর আমাদের কাছে অজানাই রয়ে গেছেন। মাত্র বছর খানেক আগে ড. সিরাজুল হক (প্রফেসর এমিরিটাস, ঢা. বি.)-কৃত ও ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত থিসিসটির বাংলা তরজমাটি প্রকাশিত হওয়ায় এ পথে এক ধাপ অগ্রসর হওয়া গেছে। তরজমা করেছেন ডঃ মুজিবর রহমান (অধ্যাপক, আরবী ও ইসলামিক স্ট্রাডিজ বিভাগ, রা. বি.)। পূর্বোক্ত গ্রন্থের সাথে বর্তমান গ্রন্থটি মিলিয়ে পড়লে আশা করা যায়, এই আপোসহীন মর্দে মু'মিন ও মর্দে মুজাহিদের বিপ্লবী চরিত্রটি উপলব্ধি করতে পাঠকের পক্ষে সহজ হবে। আল্লাহ্ পাক আমাদের সঠিক ও যথার্থ সিদ্ধান্ত গ্রহণে হিদায়াত দিন!

বলা দরকার, বর্তমান গ্রন্থের ১ম পৃষ্ঠা থেকে ২২১ পৃষ্ঠা পর্যন্ত তরজমা করেছেন জনাব আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী এবং ২২২ পৃষ্ঠা থেকে ৩৬৭ পৃষ্ঠা পর্যন্ত অনুবাদ করেছেন জনাব হাফেজ আবু তাহের মেছবাহ। এ ব্যাপারে আমরা কতটুকু সফল হয়েছি সে বিচারের ভার পাঠকের ওপরই ছেড়ে দিচ্ছি। তবে তরজমা মূলানুগ রেখে যথাসম্ভব প্রাঞ্জল, সাবলীল ও সুখপাঠ্য করতে সাধ্যানুযায়ী চেষ্টার কোন কসুর করিনি, এটুকু বোধ হয় বলা যায়। অতঃপর বাকীটুকু করেছেন এর সম্পাদক অগ্রজপ্রতিম কবি আফজাল চৌধুরী। এরপরও কোনরূপ ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য আগামী সংস্করণ পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া আর কী করতে পারি। নির্ঘণ্ট তৈরি করে দিয়ে মরিয়ম জামিলা ও জামিলা কুলছুম আমাদের মুবারকবাদ পাবার হকদার হয়েছেন। দু'আ করি, আল্লাহ পাক তাঁদেরকে উভয় জাহানে কামিয়াব করুন।

গ্রন্থের প্রকাশ ও মুদ্রণের বিভিন্ন পর্যায়ে যাঁরা অনস্বীকার্য ভূমিকা পালন করেছেন তাঁদের সকলকেই জানাই আন্তরিক মুবারকবাদ। প্রকাশের ভার নেবার জন্য মুহাম্মদ ব্রাদার্স কর্তৃপক্ষকে জানাই শুক্‌রিয়া। দীনের নগণ্য খাদেম হিসেবে আল্লাহ্ পাক আমাদের সকলের শ্রম কবুল করুন এবং একে নাজাতের ওসীলা বানান–এই মুনাজাত করি।

আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী
হাফেজ আবু তাহের মেছবাহ

ভূমিকা

আল্লাহ্ পাকের যাবতীয় প্রশংসা ও তাঁর মনোনীত বান্দাদের ওপর সালাম। আলহামদু লিল্লাহ্। পাঠকের সামনে 'তারীখে দাওয়াত ও 'আযীমত'-এর ২য় খণ্ড পেশ করার সৌভাগ্য ও আনন্দ লাভ করছি। গ্রন্থের ১ম খণ্ডে হিজরী ১ম শতাব্দী থেকে নিয়ে ৯ম শতাব্দী পর্যন্ত দাওয়াত ও ইসলাহর রোয়েদাদ পেশ করা হয়েছিল। ব্যক্তিত্বের দিক থেকে সাইয়েদুনা ওমর ইবনে 'আবদুল আযীয (র.) থেকে নিয়ে মওলানা জালালুদ্দীন রূমী (র.) পর্যন্ত সাধকদের পরিচিতি, তাঁদের সংস্কার, সংশোধনমূলক কাজ ও তাঁদের অদম্য ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের বিস্তৃত বিবরণ এতে এসে গেছে।

বর্তমান খণ্ডে ওয়াদা মাফিক্ শায়খুল ইসলাম হাফিজ ইবনে তায়মিয়া (র.)-র জীবনী, তাঁর ছাত্র ও চিন্তা-চেতনানুসারী মনীষীবৃন্দের আলোচনা স্থান পেয়েছে। প্রাথমিক খসড়া মুতাবিক বর্তমান খণ্ডটি উল্লিখিত যুগ ও উপরিউক্ত চিন্তাধারার জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল এবং সেদিকে লক্ষ্য রেখেই লেখা শুরু করেছিলাম। অবশেষে কেবল শায়খুল ইসলাম (র)-র ওপর আলোচনার মুসাবিদাই দু'শ' পৃষ্ঠা হয়ে যায়। তখনও তাঁর সংস্কার, পুনর্জাগরণমূলক কর্মকাণ্ড ও এর প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা বাকী ছিল। ইতোমধ্যে ১ম খণ্ডের ওপর যাঁরা আলোচনা-পর্যালোচনা পেশ করেছিলেন, তাঁদের কেউ কেউ আমাকে ঐকান্তিক পরামর্শ দেন, যেহেতু বর্তমান যুগে মানুষের অবকাশ কম, তারা সংক্ষিপ্ততা পসন্দ করেন বিধায় আলোচ্য গ্রন্থের কলেবর সংক্ষিপ্ত হলেই ভাল হবে। তাদের দাবী ছিল, শায়খুল ইসলামের ওপর আলোচনার পরিসর সংক্ষিপ্ত ও নির্বাচিত হলেই ভাল হবে যাতে এই খণ্ডেই সংগ্রামী সাধকদের অপরাপর ব্যক্তিবর্গের স্থান হয়ে যায়। গ্রন্থকার (যিনি এ যুগের মানসিক প্রবণতা সম্পর্কে অনবহিত নন)-ও এমনটি ইচ্ছা করেছিলেন, কিন্তু যখন আলোচনার ওপর আবার দৃষ্টি বুলালাম, অনুভব করলাম, অনেক প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান উপকরণ সংগৃহীত হয়ে গেছে যা আপন স্থানে উপকারী ও অপরিহার্য বিবেচিত হবে। কেউ কেউ যেমন সংক্ষিপ্তের পরামর্শ দিয়েছেন, ঠিক তেমনি কোন কোন অন্তরঙ্গ শুভাকাঙ্ক্ষী বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘ ও বিস্তারিত আলোচনার দাবী জানান এবং পুনঃপুনঃ আবেদন জানিয়ে বলেন, আমি যেন কিছুতেই আলোচনা সংক্ষিপ্ত না করি। শেষাবধি আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম, এই খণ্ডটি যেমন আছে তেমনি থাকুক এবং যা কিছু লিখেছি তা আর কাঁটছাট করব না। কারণ এ রকম জ্ঞানগর্ভ কাজ চাইলেই রোজ রোজ করা যায় না। তাছাড়া মনের আনন্দ-নিরানন্দ, অবকাশ মুহূর্ত ও কলমের বহমানতার ওপরও ভরসা নেই। গ্রন্থ রচনা সমাপ্তির পর মানুষ যে যার প্রয়োজনীয় স্বাদ ও রুচি মুতাবিক নিজেই বাছাই করে নিতে পারবে, সংক্ষেপ করতে চাইলেও পারবে।

মওলানা সাইয়েদ মানাযির আসান গীলানী ও মওলানা শাহ্ হালীম 'আতা আর ইহজগতে নেই যাঁরা এই সিলসিলার সর্বাধিক গুণগ্রাহী ছিলেন। ১ম খণ্ড প্রকাশের পর মওলানা গীলানী (র.)-ই সবচে' বেশি আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন। বইয়ের প্রতিটি শব্দ গভীর আগ্রহে পড়েছিলেন এবং অত্যন্ত উৎসাহ ও প্রভাবমণ্ডিত ভাষায় চিঠি লিখেছিলেন। আমাদের জানা মতে ভারত উপমহাদেশে মরহুমই ছিলেন শায়খ-ই আকবর-এর সমঝদার পাঠক ও বাহক। তদ্সত্ত্বেও তিনি ছিলেন শায়খুল ইসলাম (র.)-র ইমামত ও 'আজমত-এর সমর্থক, তাঁর গুণগ্রাহী ও তাঁর রচনার আগ্রহী পাঠক। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, আজ যদি তিনি বেঁচে থাকতেন তবে বর্তমান খণ্ড প্রকাশে খুবই আনন্দ পেতেন।

মওলানা শাহ্ হালীম 'আতা গোটা জীবনটাই নীরব নিভৃতে কাটিয়েছেন। জ্ঞানী মহলেও তাঁর পরিচিতি বড় একটা নেই। তাঁর সম্পর্কে তাঁরা কমই জানতে পেয়েছেন। কিন্তু আসলে এই উপমহাদেশে শায়খুল ইসলাম ও তাঁর ছাত্রদের জ্ঞান-ভাণ্ডার সম্পর্কে তাঁর চেয়ে বেশী কেউ জানতেন না। তাঁদের রচনা ও গবেষণাকর্ম সম্পর্কে তিনি ছিলেন জীবন্ত বিশ্বকোষ। যদিও ১ম খণ্ড তাঁর সাহায্য ও দিক-নির্দেশনা থেকে বঞ্চিত হয় নি, কিন্তু ২য় খণ্ডেও তাঁর বিস্তৃত জ্ঞান, প্রখর স্মৃতিশক্তি ও তাঁর মূল্যবান পাঠাগার লেখককে পরামর্শ ও সাহচর্য যুগিয়েছে এবং বর্তমান গ্রন্থের বিন্যাস ও সংকলনে তাঁর এতটা হিস্যা রয়েছে, কৃতজ্ঞতা ও স্বীকৃতির উন্নত থেকে উন্নততর শব্দ চয়নও তার জন্য যথেষ্ট হবে না। এই শেষ যুগেও এ দু'জন বুযুর্গ প্রথম যুগের 'উলামায়ে কিরামের 'ইল্ম, নিবিষ্টচিত্ততা, জ্ঞান নিমগ্নতা, বিস্তৃত দৃষ্টি ও গভীর অধ্যয়নের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। আল্লাহ্ পাক তাঁদের উভয়কে ক্ষমা করুন ও তাঁদের দর্জা বুলন্দ করে দিন!

প্রাচীন উৎস ছাড়াও বর্তমান গ্রন্থ রচনায় মিসরীয় মনীষী শায়খ মুহাম্মদ আবু যুহরাকৃত 'ইবনে তায়মিয়া' নামক গ্রন্থ থেকে প্রভূত সাহায্য পেয়েছি। বিনয়ের সঙ্গে আমি এর স্বীকৃতি দিচ্ছি এবং এজন্য শুকরিয়া আদায় করা কর্তব্য মনে করছি।

আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে প্রত্যাশা, ১ম খণ্ডের ন্যায় বর্তমান খণ্ডটিও ভারতবর্ষের শিক্ষিত ও ধর্মীয় মহলে জনপ্রিয় হবে এবং গভীর আগ্রহে পড়া হবে।

১৭ই মহররম, '৭৬ হিজরী

আবুল হাসান আলী
দাইরা-ই শাহ 'আলামুল্লাহ্ (র.)
রায়বেরেলী

সূচী

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

বাতিল ধর্ম ফেরকাগুলোর 'আকীদা-বিশ্বাসের মুকাবিলা খ্রিস্টধর্ম খণ্ডন ২৫৯-৩০৬ পৃষ্ঠা

নবম অধ্যায়

শরীয়তী 'ইলমসমূহের পুনরুজ্জীবন ৩০৮–৩১২

দশম অধ্যায়

ইসলামী চিন্তাধারার পুনরুজ্জীবন, আকাইদের উৎস কুরআন ও সুন্নাহ ৩১৪–৩২৬

একাদশ অধ্যায়

তাকলীদ-পূর্ব যুগে কুরআন, সুন্নাহ্ ও ফিক্‌হ শাস্ত্র ৩২৮–৩৩৬

দ্বাদশ অধ্যায়

ইবনে তায়মিয়ার সুযোগ্য ছাত্র ও উত্তরসূরী ৩৩৭–৩৬৬

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র.)

শায়খুল ইসলাম হাফিজ ইবন তায়মিয়া (র)

শরীয়তের মুখপাত্র ও সর্বতোমুখী প্রতিভার অধিকারী একজন সংস্কারকের প্রয়োজনীয়তা

ঐশী দর্শন ও 'আকাইদের ক্ষেত্রে গ্রীক দর্শন ও মুতাকাল্লিম (কালাম-শাস্ত্রবিদ)-দের বুদ্ধিবৃত্তিক বাহ্যিকতার একটি অনিবার্য প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিকভাবেই দেখা দেয়। আর এর পতাকাবাহী ছিলেন মওলানা জালালুদ্দীন রূমী। ত্রুটিপূর্ণ ও ভাসা ভাসা বুদ্ধিবৃত্তির মুকাবিলায় উন্নততর বুদ্ধিবৃত্তি, সুদৃঢ় চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গির এ ছিল এক স্বাভাবিক বহিঃপ্রকাশ, ছিল নতুন এক 'ইলমে কালামের শুভ উদ্বোধন যার বুনিয়াদ রাখা হয়েছিল আত্মা ও দৃষ্টির সমুন্নতি, শুচি-শুভ্র পবিত্রতা ও মুতাকাল্লিমের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ওপর। মওলানা রূমী (র) ছিলেন তাঁর যুগের একজন গভীর পাণ্ডিত্যসম্পন্ন 'আলিম ও একজন অভিজ্ঞ মুতাকাল্লিম যাঁকে আল্লাহ্ পাক 'আরিফের কলব (অন্তঃকরণ, আত্মা) ও 'আশিক প্রকৃতি দান করেছিলেন। দার্শনিকের বাক-রীতি ও মুতাকাল্লিমের খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখার প্রতি তাঁর প্রকৃতি ছিল শীতল, নিস্পৃহ ও অসন্তুষ্ট। একজন গভীর প্রত্যয়ী ও 'ইশকের অধিকারী মানুষের সাহচর্য, তাঁর রিয়াযত ও মুজাহাদা তাঁকে এই মকামে পৌঁছে দেয় যেখান থেকে তাঁর ইল্‌মে কালামের ঐ সব যুদ্ধে হাকীকত (সত্য, মূলতত্ত্ব ও যথার্থতা) কম এবং মেধা ও বাগ্মিতা অধিক দৃষ্টিগোচর হত। এই মকামে পৌঁছে তিনি ধর্মীয় মূল তত্ত্বগুলোকে নিজের ভাষায় বর্ণনা করেন এবং সে সবের প্রমাণ করবার জন্য সে সব রাস্তা এখতিয়ার করেন যা হাকীকতের অধিকতর নিকটবর্তী এবং জ্ঞাতব্য শক্তি ও অভিজ্ঞতার ওপর ছিল যার ভিত্তি।

কিন্তু দর্শনের এই বিদ্রোহ ও 'ইল্‌মে কালামের এই ভারসাম্যহীনতার বিরুদ্ধে আরও একটি প্রতিক্রিয়া দেখা দেবার দরকার ছিল যা পূর্বোল্লিখিত প্রতিক্রিয়ার মুকাবিলায় সত্যের কিছুমাত্র কম অনুকূল ছিল না। দর্শন (ঐশী ও ধর্ম সংক্রান্ত) ও 'ইলমে কালামের আলোচ্য বিষয়বস্তু ছিল আল্লাহ্‌র যাত (সত্তা) ও সিফাত (গুণাবলী)-এর সমস্যা। ইসলামী শরীয়ত 'আকাইদের ব্যাপারে মানুষকে অন্ধকারে ছেড়ে দেয়নি, বরং যেহেতু এই শাখাটি মানুষের গোটা জীবন

ও যিন্দেগী, 'আমল ও আখলাক এবং বিশুদ্ধ তমদ্দুন ও সুস্থ সঠিক সমাজের বুনিয়াদ, সেজন্য সে (ইসলামী শরীয়ত) আগেকার সমস্ত ধর্ম ও মযহাব থেকে আল্লাহ্‌র সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে অনেক বেশী স্পষ্ট, সাধারণের বোধগম্য ও চূড়ান্ত শিক্ষা দান করে যারপর এক্ষেত্রে আর কোন পরিশ্রম, মাথা ব্যথা ও কোন রকম কষ্ট-কল্পনার প্রয়োজন ছিল না। এই 'ইল্‌ম ও য়াকীনের উৎসমূল একমাত্র আম্বিয়া 'আলায়হিমু'স-সালামের পেশকৃত শিক্ষা। তাঁরা (আম্বিয়া-ই-কিরাম) যা কিছু বলে দিয়েছেন এবং যতটা বলে দিয়েছেন সেটাই চূড়ান্ত ও শেষ কথা। কেননা একমাত্র তাঁরাই সেই মহান সত্তা, তাঁর কল্পনাতীত ও উপমাবিহীন গুণাবলীর পরিচিতি সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন। এ বিষয়ে আলোচনা করবার এবং একটি পক্ষ হবার কোন অধিকার দর্শনের ছিল না। তার এ জ্ঞানের প্রাথমিক ধারণাটুকুও ছিল না, আর না এতটুকুই জানা ছিল যতটুকু সুবিন্যস্ত করে সে অজ্ঞাত তত্ত্ব পর্যন্ত পৌঁছে থাকে, আর না এখানে কোন প্রকার অভিজ্ঞতা, পর্যালোচনা কিংবা পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ ছিল, আর না দার্শনিকদের মধ্যে এর যোগ্যতাই আছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও দর্শন তার নিজ সীমারেখা অতিক্রম করে এবং এ বিষয়ে কেবল সে অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপই করেনি, বরং এর সমস্যা ও খুঁটিনাটি বিষয়াদিতে এতখানি আস্থা ও দৃঢ়তা সহকারে এবং এতটা বিস্তারিত ও সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করে এবং এর পর্যালোচনা থেকে কাজ নিতে শুরু করে যা কেবল একটি রাসায়নিক পরীক্ষাগারেই আঞ্জাম দেওয়া যেতে পারে।

দর্শনের মুকাবিলা ও ধর্মের সাহায্য ও সমর্থনের জন্য 'ইলমে কালাম জন্মলাভ করে এবং এমনটি হবার প্রয়োজনও ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা গেল, ক্রমান্বয়ে খোদ দর্শনের প্রাণসত্তাই এতে অনুপ্রবেশ করেছে এবং তা একটি ধর্মীয় দর্শনে রূপ লাভ করেছে। সেই একই তার আলোচ্য বস্তু, সেই একই আলোচনা-সমালোচনা পদ্ধতি ও যুক্তি-প্রমাণ পন্থা এবং সেই একই মৌলিক ভ্রান্তি যে, আল্লাহ্‌র সত্তা ও গুণাবলী (যাত ও সিফাত) ও ইন্দ্রিয়াতীত ও বুদ্ধির অগম্য সমস্যাগুলোকে জ্ঞান ও বুদ্ধির সাহায্যেই প্রমাণ করা যায়। সেই একই রূপ আম্বিয়া 'আলায়হিমু'স-সালামের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ওপর অনাস্থা ও অতৃপ্তি, সেই সীমাবদ্ধ, ত্রুটিযুক্ত ও ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টিকারী গ্রীক পরিভাষার ব্যবহার। এর ফল হল, সমস্যার নিষ্পত্তি ও কথা সংক্ষিপ্ত হবার পরিবর্তে তা আরো বেশী জটিল ও দীর্ঘসূত্রিতা লাভ করল এবং আল্লাহ্‌র সত্তা ও গুণাবলীর মত নেহাৎ সাদাসিধে, কার্যকর ও মর্মস্পর্শী বর্ণনার সমান্তরাল, যার ভেতর অন্তর-রাজ্যে ঈমান ও সুদৃঢ় আস্থা সৃষ্টি করবার, সেই সাথে প্রতিটি যুগের মেধা, মস্তিষ্কের সন্তোষ বিধান ও সান্ত্বনা প্রদানের পরিপূর্ণ যোগ্যতা ছিল এবং যা ছিল আল্লাহ্‌র কিতাব ও রসূলের সুন্নাহ্‌র স্বতঃপ্রকাশিত অর্থের ওপর স্থাপিত একটি দীর্ঘ

পেঁচালো ঐশী দর্শন ও একটি মোটা 'আকাইদের শরাহ (ব্যাখ্যা, ভাষ্য) তৈরি হয়ে যায় যার ওপর গ্রীক দর্শনের প্রতিদ্বন্দ্বী ও প্রতিপক্ষ হওয়া সত্ত্বেও এর চিন্তাধারার বেশ ভাল রকম প্রভাব এতে পড়েছিল। এ অবস্থার বিরুদ্ধে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র রূহ (প্রাণ, আত্মা) সর্বদাই বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ জানাতে থাকে। মুসলিম উম্মাহর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ঐসব বিস্তারিত দার্শনিক বর্ণনা ও মুতাকাল্লিমসুলভ জটিল ব্যাখ্যার বিরোধী হিসেবে বিরোধিতা অব্যাহত রাখেন। কিন্তু কুরআন-সুন্নাহ্‌র যথার্থ ও কার্যকর মুখপাত্র হিসেবে ভূমিকা পালনের জন্য এমন একজন শক্তিশালী ঈমান, সুবিস্তৃত জ্ঞান ও সূক্ষ্ম দৃষ্টিসম্পন্ন 'আলিমের প্রয়োজন ছিল যিনি এ বিষয়ে সুদৃঢ় ঈমান রাখেন, কুরআন ও সুন্নাহ্‌র স্বতঃপ্রকাশিত অর্থসমূহ, আল্লাহ্‌র সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে তাঁর বর্ণনা ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণই যথেষ্ট, যিনি তাঁর মেধা, প্রতিভা ও গভীর অধ্যয়নের মাধ্যমে দর্শনের প্রতিটি নাড়ী-নক্ষত্র সম্পর্কে অবহিত, যিনি গ্রীক পণ্ডিতদের বাণী ও উক্তি, ধ্যান-ধারণা ও ধর্মীয় চিন্তাধারার জ্ঞানগর্ভ সমালোচনা করতে পারেন, সে সবের মৌলিক দুর্বলতা সম্পর্কে যিনি ওয়াকিফহাল এবং যিনি তাঁর গভীর চিন্তা ও গবেষণার সাহায্যে 'ইলমে কালামের তলদেশ পর্যন্ত পৌঁছে গেছেন, বিভিন্ন মযহাব ও মুসলিম ফেরকার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মতভেদগুলো সম্পর্কে যিনি অবগত, 'ইলমে কালামের গোটা ইতিহাস ও এর চূড়ার ওপর যাঁর দৃষ্টি রয়েছে, তাঁর পরিপূর্ণ অধ্যয়ন ও অভিজ্ঞতা দ্বারা তার ভেতর কুরআন ও সুন্নাহর স্বতঃপ্রকাশিত অর্থসমূহ ও সাহাবায়ে কিরাম ও প্রথম যুগের 'উলামায়ে মুজতাহিদীনের ওপর গভীর আস্থা ও সুদৃঢ় বিশ্বাস ও তার সমর্থন তথা প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে প্রবল আবেগ ও অদম্য ইচ্ছা সৃষ্টি হয়েছে, যিনি বুদ্ধিবৃত্তির দিক দিয়েও এর অগ্রাধিকার ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য অস্থির হবেন। অতঃপর এই নাযুক ও বিরাট কর্ম সম্পাদনের জন্য তাঁর নিকট সে সব উপকরণ ও যোগ্যতা থাকবে যা এত বড় বিরাট কর্ম সম্পাদনের জন্য দরকার, যিনি স্বীয় মেধা, যুক্তি-প্রমাণ ও বাকশক্তি, প্রশস্ত দৃষ্টিভঙ্গি ও ব্যাপক অধ্যয়নের ক্ষেত্রেও বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী, সেই সঙ্গে যিনি তাঁর যুগের স্বাভাবিক মানের ঊর্ধ্বে হবেন এবং যে কোন বিচারে যিনি হবেন এই খেদমত আনজাম দেবার সম্পূর্ণ যোগ্য।

অপর দিকে ইসলাম অভ্যন্তরীণ ও বহিঃশক্তির হামলার শিকারে পরিণত হয়েছিল। খ্রিস্টানদের ভেতর নিজেদের ধর্মের সত্যতা ও অভ্রান্ততা প্রমাণ করবার এবং ইসলামের ওপর আপত্তি তুলবার নতুন আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছিল। ক্রুসেডারদের উপর্যুপরি হামলা এবং শাম (আজকের সিরিয়া, লেবানন ও জর্দান), ফিলিস্তীন ও সাইপ্রাসে পাশ্চাত্য বংশোদ্ভূত খ্রিস্টানদের এক বিরাট সংখ্যক উপস্থিতি তাদের ভেতর এমনই এক উৎসাহ-উদ্দীপনার জোয়ার সৃষ্টি করে

দিয়েছিল যে, তারা মুসলমানদেরকে তত্ত্বগতভাবে মুকাবিলা করবে, নবুওতে মুহাম্মদী (সা)-এর ওপর আপত্তি তুলবে এবং খ্রিস্ট ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে পুস্তক রচনা শুরু করবে। এর যোগ্য প্রত্যুত্তর দেবার জন্য এমন একজন 'আলিম ও মুতাকাল্লিমের প্রয়োজন ছিল যিনি খ্রিস্টবাদ ও অপরাপর ধর্ম সম্পর্কে বিস্তৃত ও গভীর অধ্যয়ন করেছেন, আসমানী কিতাব ও সে সবের পরিবর্তন তথা বিকৃতি সম্পর্কে যিনি পুরোপুরি অবহিত, বিভিন্ন ধর্মের পারস্পরিক তুলনা ও বিচারের কাজ যিনি অত্যন্ত সুন্দর ও সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে পারেন, যিনি ইসলামের সত্যতা ও শ্রেষ্ঠত্বকে শক্তিশালী ও কার্যকরভাবে পাণ্ডিত্যপূর্ণ উপায়ে তুলে ধরতে পারেন এবং বুদ্ধিদীপ্ত ও যৌক্তিক উপায়ে বা আস্থার সঙ্গে যিনি অপরাপর ধর্মের লোকদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতে সক্ষম।

ঐ সব খ্রিস্টান তার্কিক, সমালোচক ও লেখকদের হামলার চেয়েও অধিকতর বিপজ্জনক হামলা ছিল একটি নামমাত্র মুসলিম ফের্কার –যার নাম বাতেনিয়া ফেরকা—যাদের ধর্মবিশ্বাস ও শিক্ষা ছিল অগ্নিপূজকদের 'আকীদা-বিশ্বাস, প্লেটোনিক চিন্তাধারা ও বিপজ্জনক রাজনৈতিক লক্ষ্যের এক অদ্ভুত ও অত্যাশ্চর্য জগা-খিচুড়ি। এরা ও এদের বিভিন্ন শাখা (ইসমাঈলী, হাশীশী, দুরূযী, নুসায়রী) মুসলমানদের বিরুদ্ধে অমুসলিম শক্তির ও বাইরের হামলাকারীদের সব সময় সাহায্য করতে থাকে এবং অধিকাংশ সময় এদেরই আন্দোলন ও ষড়যন্ত্রের কারণে মুসলিম দেশগুলোর ওপর বাইরের হামলা হয়েছে। শাম ও ফিলিস্তীনের ওপর ক্রুসেড আক্রমণের সময় তারা ক্রুসেডারদের সহযোগিতা প্রদান করে। এর ফল দাঁড়াল এই যে, ক্রুসেডাররা যখন শামের ওপর অধিকার জমিয়ে বসে তখন বাতেনী ফের্কার লোকদেরকেই তারা তাদের আস্থাভাজন ও নৈকট্যপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিল এবং এভাবেই তারা তাদের সাহায্যের প্রতিদান দিয়েছিল। যঙ্গী ও আয়্যূবী শাসনামলে এরা সর্বদাই ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহে লিপ্ত থাকে। অষ্টম শতাব্দীতে তাতারীরা যখন শামের ওপর হামলা চালায় তখন তারা প্রকাশ্যভাবে ও খোলামেলা তাতারীদের সহযোগিতা দেয় এবং মুসলমানদের ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এছাড়া তারা মুসলমানদের মধ্যে সব সময় মানসিক বৈকল্য ও অস্থিরতা, ধর্মের প্রতি অনাস্থা ও বিদ্রোহ বিস্তার, ধর্মহীনতা ও ধর্মদ্রোহিতা প্রচারে নিরন্তর ব্যাপৃত থাকত এবং মুসলমানদের ধর্মীয় দুর্গে পঞ্চম বাহিনীর সদস্য হিসাবে কাজ করত। এসবের স্বাভাবিক দাবী ছিল, এসব ফের্কার ওপর জ্ঞানগত ও কার্যকর আঘাত হানতে হবে, তাদের 'আকীদা-বিশ্বাস ও উদ্দেশ্যের পর্দা খুলে দিতে হবে, মুসলমানদেরকে এদের সম্পর্কে সতর্ক ও সাবধান করে দিতে হবে এবং ইসলামের প্রতি শত্রুতামূলক কার্যকলাপের জন্য তাদের উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে। এ কাজও একমাত্র তিনিই আনজাম দিতে

পারতেন যিনি এ সব ফের্কার অন্তরালে নিহিত হাকীকত (মূলতত্ত্ব) ও গোপনীয় রহস্য, এদের অতীত ও বর্তমান, এদের সমস্ত শাখা-প্রশাখা ও এর সমস্ত উপ-ফের্কার 'আকাইদ ও ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হবেন, হবেন সে সবের তত্ত্বগত সমালোচনা ও প্রত্যাখ্যানের ব্যাপারে পূর্ণ ক্ষমতাবান, যাঁর বুকে ইসলামী গায়রতের আবেগ ও ঐ সব ইসলাম দুশমনের বিরুদ্ধে জিহাদী জোশ ও জযবা ক্রিয়াশীল থাকবে।

এসব ছাড়াও অমুসলিমদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ও মেলামেশা, অনারবীয় প্রভাব, 'আলিম-'উলামার অলসতা ও গাফিলতির কারণে জনসাধারণের ভেতর শেরেকী 'আমল-আকীদা ছড়িয়ে ছিল। তওহীদ ও নির্ভেজাল ধর্মের ওপর পর্দা পড়েই চলছিল। আল্লাহ্‌র ওলী ও সালেহ্ বান্দাদের সম্পর্কে য়াহূদী নাসারাদের ন্যায় অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়িমূলক ধারণা সৃষ্টি হয়ে চলেছিল। আল্লাহ্‌র ওলীদের নৈকট্যের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের ধারণা বদ্ধমূল হতে চলেছিল এবং ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى (আমরা দেবদেবীর পূজা এজন্যই করি, এরাই আমাদেরকে আল্লাহ্‌র নিকট সান্নিধ্যে পৌঁছে দেবে) -এর ন্যায় জাহিলী ধ্যান-ধারণা মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছিল। গায়রুল্লাহ্‌র দোহাই দেওয়া ও আল্লাহ ভিন্ন অপর কারুর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করার মত বিষয়ও অনেক আলিম-'উলামার নিকট খারাপ ও আপত্তিকর ছিল না। আম্বিয়া-ই-কিরাম ও আল্লাহ্‌র সালেহ্ বান্দাদের কবরের নিকট এমন সব কাজ-কর্ম হতে থাকে যে সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (স) পূর্বেই আশংকা ব্যক্ত করে গিয়েছেন এবং মুসলমানদেরকে যে সম্পর্কে তিনি কঠোরভাবে নিষেধ করেছিলেন; অমুসলিম ও যিম্মী (ইসলামী রাষ্ট্রের আশ্রিত অমুসলিম প্রজা)- দের রীতিনীতি, চালচলন ও তাদের সম্প্রদায়গত বৈশিষ্ট্যসমূহ অনুসরণ করা, তাদের ধর্মীয় পালা-পর্ব ও মেলায় যোগদান এবং তাদের প্রথা ও আচার-অভ্যাস গ্রহণ করতে মুসলমানেরা কোনরূপ দ্বিধা করত না। এসব শির্কমূলক জাহিলিয়াতের বিরুদ্ধে জিহাদ করা এবং খালেস ও নির্ভেজাল তওহীদের দিকে সমগ্র শক্তিসহযোগে ও খোলাখুলিভাবে দাওয়াত দেবার জন্য এমন একজন মুজাহিদ 'আলিমের প্রয়োজন ছিল যাঁর প্রতিভা ও বুদ্ধিমত্তা শিরক-এর পার্থক্য খুব ভাল রকম বুঝতে সক্ষম, যিনি জাহিলিয়াতকে তার যাবতীয় আবরণ ও বাহ্যিক বেশভূষায় আচ্ছাদিত অবস্থায়ও চিনতে পারেন, যিনি তওহীদের মূলতত্ত্ব (হাকীকত) শেষ যুগের কিতাবাদি, অজ্ঞ ও জাহিল মুসলমানদের পারস্পরিক ক্রিয়াকলাপ এবং যুগের রসম-রেওয়াজের পরিবর্তে সরাসরি কুরআন, সুন্নাহ্ ও সাহাবায়ে কিরামের আমল থেকে শিখেছেন, বুঝেছেন, যিনি বিশুদ্ধ 'আকীদার ঘোষণা দিতে ও প্রকাশ করতে সরকারের বিরোধিতা, স্বীয় যমানার লোকদের শত্রুতা, 'উলামায়ে কিরামের

মতভেদ ও কোন নিন্দুকের নিন্দা বাক্যের পরওয়া করেন না, যিনি কুরআন সুন্নাহর ও ইসলামের নির্ভরযোগ্য বিশুদ্ধ ও প্রাথমিক উৎস ও প্রাথমিক যুগের অবস্থার ওপর নিরপেক্ষ দৃষ্টি ও পরিপূর্ণ অধিকার রাখেন, যিনি য়াহূদী ও খ্রিস্টানদের সত্য থেকে বিচ্যুতি, তাদের ধর্মীয় গ্রন্থের পরিবর্তন ও বিকৃতির ইতিহাস এবং জাহিল কওমগুলোর মন-মানসিকতা ও বাসনাসমূহ সম্পর্কে পূর্ণরূপে ওয়াকিফহাল এবং যিনি মুসলমানদেরকে কুরআনুল করীমের শিক্ষা ও প্রথম শতাব্দীর 'আমল-আকীদায়' ফিরিয়ে আনতে এবং তাদেরকে সাহাবা-ই কিরাম ও তাঁদের স্থলবর্তীদের চাল-চলন, আচার-আচরণ ও পথ-মতের ওপর দেখতে প্রবল আগ্রহী।

তাসাওউফপন্থীদের ভেতর (নানা ঐতিহাসিক ও তত্ত্বগত কারণে) গ্রীক ও ভারতীয় দর্শন ও জ্যোতির্বিদ্যার প্রভাব অনুপ্রবিষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং সে সব ইসলামী 'আকীদা ও ধ্যান-ধারণার সঙ্গে এমনভাবে মিশে গিয়েছিল, যে, তার হদিস পাওয়াও ছিল দুষ্কর। নিউ-প্লেটোনিক মতবাদের জ্যোতির্বিদ্যা কিংবা ভারতবর্ষের যোগ, অবতারবাদ ও সংঘের 'আকীদা-বিশ্বাস, ওয়াহ্দাতু'ল-ওজুদের পথ ও মত, জাহির ও বাতেনের সীমারেখা নির্ধারণ, গুপ্ত ভেদ ও রহস্যসমূহ ও "বক্ষ জ্ঞানের ফেতনা", কামিল ও আল্লাহ্র পাগলদের জন্য শরীয়তের বিধান মওকুফ ইত্যাকার 'আকীদা ও ধ্যান-ধারণা তাসাওউফপন্থীদের একটি বিরাট অংশের মধ্যে জনপ্রিয় ও স্বীকৃত বিষয়ে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। যদিও প্রতিটি যুগের মুহাক্কিক ও গভীর তত্ত্বজ্ঞানী 'আলিমগণ এসব বিভ্রান্ত 'আকীদা প্রত্যাখ্যান ও ইনকার করতে থাকেন, কিন্তু তাসাওউফপন্থীদের একটি বিরাট অংশ এরপরও বিষয়টি আঁকড়ে ধরে থাকে। তাসাওউফের কতক শাখা-প্রশাখা ও সিলসিলা প্রতারণামূলক কলাকৌশল ও নজরবন্দীর নিম্নতম পর্যায়ে অবতরণ করেছিল। সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে রিফাঈ তরীকা এ ব্যাপারে ছিল অগ্রগামী। সাধারণ লোকে তো বটেই, অনেক বিশিষ্ট লোকও এসব বিভ্রান্তির শিকার ছিলেন। এ বিপদ রুখতে ও শরীয়তের হেফাজতের জন্যও এমন এক জন দৃঢ় বিশ্বাসী ও সাহসী সংস্কারকের প্রয়োজন ছিল যিনি এদের শান-শওকত ও প্রভাব-প্রতিপত্তি দৃষ্টে এদের ভক্ত-অনুরক্তদের সংখ্যা-শক্তিতে ভীত না হয়ে বেপরোয়া, স্বাধীন ও সাহসিকতার সঙ্গে তাদেরকে সমালোচনা করতে পারেন এবং করতে পারেন তাদের ভুল-ত্রুটি ও বিভ্রান্তির পর্দা উন্মোচন।

জ্ঞানী ও পণ্ডিত মহলে কয়েক শতাব্দী থেকে এমন এক বন্ধ্যাত্ব বিরাজ করছিল, নিজেদের দলীয় ফিকহী ও মযহাবী বৃত্তের বাইরে কদম রাখাকে গোনাহ্র কাজ বলে মনে করা হত,এমন কি কুরআন-হাদীসকেও ঐ সব ফিকহী দৃষ্টিকোণ ও দলীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখবার সাধারণ রেওয়াজ

চলছিল। ফিকহী ইখতিলাফের ক্ষেত্রে কুরআন-হাদীসকে ফয়সালাকারী বানাবার পরিবর্তে কুরআন-হাদীসকেই সকল অবস্থায় ফিকহী মসলায় ঢেলে সাজাবার চেষ্টা করা হত। ফিকহী তরজীহ্ (অগ্রাধিকার) ও ইখতিয়ারের দরজা কার্যত বন্ধ ছিল। যুগ ও অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অনেক নিত্য-নতুন সমস্যার উদ্ভব ঘটছিল যেসবের সমাধানে ফতওয়া প্রদানের জন্য ইসলামের সমগ্র ফিকহী ভাণ্ডারের ওপর বিস্তৃত দৃষ্টি, কুরআন ও সুন্নাহর ওপর পূর্ণ দখল, ইসলামের প্রাথমিক যুগগুলোর পারস্পরিক 'আমল সম্পর্কে অবহিতি এবং ফিকহ্-এর উসূল (মূলনীতি) সম্পর্কে গভীরতর জ্ঞানের অধিকার দরকার ছিল। কিন্তু দীর্ঘকাল যাবত মানুষের ভেতর থেকে জ্ঞান, দৃষ্টি ও অধ্যয়নের প্রতি প্রবল আগ্রহ স্তিমিত হয়ে যাচ্ছিল। মানুষের চিন্তাশক্তি ক্রমেই নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছিল এবং কোন 'আলিমই নতুন মাসায়েল খুঁজে বের করবার সাহস করছিলেন না। ইসলামী কানূন ও ফিক্‌হ স্বীয় খ্যাতি ও উত্থানের যোগ্যতা খুইয়ে বসেছিল এবং ফিক্‌হ -এর প্রাচীন ভাণ্ডারের সম্পদ বৃদ্ধি অসম্ভব মনে.করা হচ্ছিল। এমত অবস্থার সংস্কার ও সংশোধনের জন্যও এমন একজন মুহাদ্দিস, ফকীহ ও উসূলীর (নীতিশাস্ত্রবিদের) আবশ্যক ছিল যিনি সমগ্র ইসলামী গ্রন্থাগার ও তার জ্ঞানভাণ্ডার পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যালোচনা করে দেখেছেন, কুরআন ও হাদীসে যাঁর গভীর পাণ্ডিত্য দেখে লোকে বিস্মিত হবে, হাদীসের শ্রেণী-বিভাগ, বিন্যাস ও তার সংকলনগুলোর ওপর যাঁর এমন প্রখর দৃষ্টি থাকতে হবে যেন লোকে বলে, এ ব্যক্তি যে হাদীস জানেন না সেটা হাদীসই নয়। ফকীহদের ইখতিলাফ (মতপার্থক্য) এবং সে সবের উৎস ও প্রমাণ-পঞ্জী সর্বদা যাঁর নখদপর্ণে থাকবে, আপন মযহাব ছাড়াও অপরাপর মযহাব ও সে সবের খুঁটিনাটি সম্পর্কেও যিনি স্বয়ং সেই মযহাবের শিক্ষক ও মুফতীর চেয়ে বেশী খবর রাখেন, মাসায়েল বের করবার শক্তি ও ব্যক্তিগতভাবে তাহকীক করবার সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন যুগের বুযুর্গদের সীমারেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং মুজতাহিদ ইমামগণের মরতবা সম্পর্কে জ্ঞাত হবেন, অভিধানের ক্ষেত্রে মুহাক্কিক (উদাহরণ দ্বারা প্রমাণকারী দার্শনিক) এবং ভাষার ব্যাপারে একজন সমালোচক ও বিশেষজ্ঞ হবেন, ব্যাকরণের ক্ষেত্রে এতটা পাণ্ডিত্যের অধিকারী হবেন যাতে একজন বৈয়াকরণের ত্রুটিও তিনি অতি সহজেই বের করতে পারেন, যাঁর স্মৃতিশক্তি ইসলামের প্রথম যুগের মুহাদ্দিসগণের স্মরণকেই জাগিয়ে তোলে, যাঁর মেধা হবে আল্লাহর অসীম কুদরতের এক অপার নিদর্শন, তাঁর জ্ঞান চিরন্তন দাতার বদান্যতার একটি দলীল হবে, তাঁর সত্তা মুসলিম উম্মাহর মানুষ তৈরির ক্ষমতা, ইসলামবৃক্ষের সজীবতা, ইসলামী জ্ঞানের জীবন ও তারুণ্যের প্রমাণ দেবে এবং সেই হাদীসের সত্যতার পক্ষেও হবে জ্বলন্ত প্রমাণ ঃ

مثل امتى مثل المطر لايدرى اوله خير ام اخره -

আমার উম্মতের উপমা বৃষ্টিসদৃশ; একথা বলা যাবে না, এর প্রথমাংশই উত্তম ও বরকতযুক্ত অথবা এর শেষাংশ।[১]

এরই সঙ্গে তিনি জীবনের বাস্তব ক্ষেত্রে ও কর্মের জগতেও একজন মর্দে মুজাহিদ হবেন, শক্তিশালী লেখক ও যুদ্ধক্ষেত্রের একজন বীর যোদ্ধা হবেন। সুলতান কিংবা সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী শাসকের সামনে কথা বলতে যিনি এতটুকু ভয় পান না, তাতারীদের ন্যায় রক্তপিপাসু শত্রুর বিরুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর নেতৃত্ব দিতে যাঁর এতটুকু ভয় থাকবে না, থাকবে না সংকোচ; দরস মাহফিলে, গ্রন্থাগারের কোণে, মসজিদের নির্জনতায়, বিতর্কের মাহফিল থেকে শুরু করে জেলখানার অন্ধকার কুঠরি ও যুদ্ধের ময়দান অবধি যাঁর গতি অবাধ, বিচরণ উন্মুক্ত, অশ্বপৃষ্ঠে বিজয়ী বেশে যিনি টগবগিয়ে ছোটেন, সর্বত্রই যিনি শ্রদ্ধেয় ও নেতৃত্ব যাঁর স্বীকৃত ।

অষ্টম শতাব্দীতে এমনই একজন মর্দে কামিলের প্রয়োজন ছিল যিনি জীবনের সকল ক্ষেত্রে হবেন মর্দে মুজাহিদ, যাঁর সংগ্রাম, সাধনা ও যাঁর সংস্কার কোন একটিমাত্র শাখাতেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। শায়খুল ইসলাম হাফিজ ইবনে তায়মিয়া (র) ছিলেন তেমনই এক ব্যক্তিত্ব, যিনি মুসলিম জাহানে জ্ঞান ও কর্মের এমন এক গতি-প্রবাহ ও প্রাণ-চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেন যার প্রভাব কয়েক শতাব্দী গুজরে যাবার পর আজও অব্যাহত রয়েছে।

ইব্নে তায়মিয়া (র)-র যুগ

ইবনে তায়মিয়া (র)-র যুগটা ছিল অত্যন্ত ঘটনাবহুল ও দুর্যোগপূর্ণ। রাজনৈতিক, সামাজিক, নৈতিক ও চারিত্রিক, তত্ত্বগত ও ধর্মীয় অবস্থার দিক দিয়ে এই আমলটা ছিল বিশেষ গুরুত্বের দাবীদার। ইবনে তায়মিয়া (র)-র সংস্কারমূলক চেষ্টা-সাধনা ও তাঁর তত্ত্বগত ও সংস্কারধর্মী মেযাজ অনুধাবন করবার জন্য সেই পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতার পর্যালোচনা করা দরকার, যেই পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতার মাঝে তিনি লালিত-পালিত ও বর্ধিত হয়েছিলেন এবং যার ভেতর তিনি তাঁর রেনেসাঁ তথা নবজাগরণ ও সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছিলেন।

ইবনে তায়মিয়া (র) বাগদাদ ধ্বংসের পাঁচ বছর পর এবং হলব (আলেপ্পো) ও দামিশকে তাতারীদের প্রবেশের তিন বছর পর জন্মগ্রহণ করেন। এজন্য একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়, তিনি যখন কিছুটা বড় হয়েছেন সে সময় সে সব মুসলিম

১. তিরমিযী, আনাস ইব্নে মালিক থেকে বর্ণিত।

শহরের ধ্বংস, মুসলমানদের ব্যাপক গণহত্যার কাহিনী ও তাতারীদের লোমহর্ষক ও বর্বর জুলুম-নির্যাতনের ঘটনা লোকের মুখে মুখে ফিরত এবং সে সময় এমন লোকও বেঁচেছিলেন যারা এসব স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি যখন সাত বছরের তখন তাঁর বাসভূমি হারান-এর ওপর [তাতারীদের অধিকৃত এলাকার (ইরাকের) উত্তর এবং দজলা ও ফোরাত নদীর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত] তাতারীদের হামলা হয় এবং বহু পরিবার ও খান্দানের মত তাঁর খান্দানও তাতারীদের জুলুম-নির্যাতন ও নিষ্ঠুর নিপীড়নের হাত থেকে বাঁচবার জন্য দামিশ্‌ক অভিমুখে রওয়ানা হয়। গমন পথের প্রতিটি স্থানেই তাতারীদের ধ্বংসলীলা ও নিষ্ঠুর বর্বরতার চিহ্ন ইতস্তত ছড়িয়েছিল। এই ভয়াবহতা, পেরেশানী, অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার স্মৃতি তাঁর অসাধারণ স্মৃতিশক্তি থেকে হারিয়ে না যাওয়াই স্বাভাবিক। বড় হয়ে এই ধ্বংসের তাণ্ডবলীলার রেখে যাওয়া স্বাক্ষর তিনি স্বচক্ষে দেখে থাকবেন এবং নিজেও সে সমস্ত লোকের মুখে এসব ধ্বংসলীলার বেদনাদায়ক বিবরণ বিস্তারিত শুনে থাকবেন যাঁরা সে সব দৃশ্য স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এজন্য স্বাভাবিকভাবেই তাঁর সংবেদনশীল ও অনুভূতিপ্রবণ প্রকৃতি মুসলমানদের এই অসহায় অবস্থা ও লজ্জাকর পরিণাম ফলে প্রভাবিত হয়েছিল এবং ধ্বংসের এই তাণ্ডবলীলার বিরুদ্ধে তাঁর মন-মানসে তীব্র ঘৃণার সঞ্চার হয়েছিল।

এরই সাথে আয়ন-ই-জালূত নামক স্থানে মুসলমানদের শানদার বিজয়ের ঘটনা তাঁর জন্মের মাত্র তিন বছর পূর্বে সংঘটিত হয়। অধিকন্তু আল-মালিকু'জ-জাহির বায়বার্সের বিজয়ও তাঁর শৈশবকালীন ঘটনা। তৎকালীন অনুষ্ঠিত মজলিস ও বৈঠকাদি এসবের উত্তপ্ত আলোচনায় ভরপুর থাকত। এসব থেকে তাঁর আত্মা তৃপ্তি ও শক্তি লাভ করে এবং এসব ঘটনা থেকে তাঁর উৎসাহ-উদ্দীপনাও বৃদ্ধি পায়।

মিসরের মামলূক সুলতানগণ

ইবনে তায়মিয়া (র)-র জন্মের ১৩ বছর পূর্ব থেকে মিসর ও শামে মামলুক (দাস) বংশের শাসন চলছিল। এরা সুলতান সালাহুদ্দীন আয়্যূবীর বংশের শেষ সুলতান আল-মালিকু'স সালিহ নাজমুদ্দীন আয়্যূব (মৃ, ৬৪৭ হি.)-এর তুর্কী গোলাম ছিলেন। তাদের বিশ্বস্ততা, আনুগত্য ও বীরত্ব পরীক্ষা-অন্তে সুলতান তাদেরকে মিসরে আবাদ করেছিলেন এবং তারা বাহরিয়া[১] উপাধিতে খ্যাত হন এদের একজন 'ইয্‌যুদ্দীন আয়বক আত-তুর্কীমানী ৬৪৭ হিজরীতে

১. এদের বসতবাটি ছিল নীলনদের ধারে। ফলে তারা বাহরিয়া (নদী/সমুদ্রের অধিবাসী) নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। আজও নীলনদ 'বাহর-ই-নীল' নামে কথিত।

আল-মালিকু'স-সালিহ্-র স্থলাভিষিক্ত তুরান শাহকে হত্যা করে সিংহাসন দখল করেন এবং আল-মালিকু'ল-মুইয্য উপাধি ধারণ করেন। ৬৫৫ হিজরীতে তিনিও নিহত হলে তার পুত্র নূরুদ্দীন আলী তার স্থলবর্তী হন। ৬৫৭ হিজরীতে 'ইয্‌যুদ্দীন আয়বকের গোলাম সায়ফুদ্দীন কুতুয সিংহাসন দখল করেন। ঐ সময় তিনি সাম্রাজ্যের নাজিম-ই-আ'লা ছিলেন। এই সুলতানই তাতারীদের সর্বপ্রথম পরাজিত করেন। এর পরের বছর (৬৫৮ হি.) আল-মালিকু'স-সালিহ্ নাজমুদ্দীন আয়্যুবের অপর ক্রীতদাস রুকনুদ্দীন বায়বার্স সায়ফুদ্দীন কুতুযকে হত্যা করে ক্ষমতার বাগডোর স্বহস্তে গ্রহণ করেন এবং আল-মালিকু'জ জাহির উপাধি ধারণ করেন। ১৮ বছর তিনি অত্যন্ত দোর্দণ্ড প্রতাপ ও শান-শওকতের সঙ্গে রাজ্য শাসন করেন এবং তাতার ও ক্রুসেডারদের উপর্যুপরি পরাজিত করে গৌরবদীপ্ত বিজয় লাভ করেন।

ইবনে তায়মিয়া যখন জন্ম গ্রহণ করেন, সে সময় মিসর ও শামে (আজকের সিরিয়া, লেবানন, জর্দান ছিল সেদিনের শামের অন্তর্গত। এখন থেকে আমরা শামকে সিরিয়া, নামেই উল্লেখ করব-অনুবাদক) রুকনুদ্দীন জাহির বায়বার্সের শাসনকাল চলছিল। তাঁর শাসনামলেই ইবনে তায়মিয়ার শৈশবকাল অতিবাহিত হয়। সুলতানের যখন ইনতিকাল হয় তখন তাঁর (ইবনে তায়মিয়ার) বয়স ১৫ বছর এবং তিনি ছিলেন তখন তরুণ। সুলতান সালাহুদ্দীন-এর পর আল-মালিকু'জ-জাহির বায়বার্সই ছিলেন প্রথম শক্তিশালী মুসলিম শাসক যিনি জিহাদের প্রতি পূর্ণ মনোনিবেশ প্রদান করেন এবং ইসলামের শত্রুদের উপর্যুপরি পরাজিত করেন। ঐতিহাসিক ইবনে কাছীর সুলতান সম্পর্কে অভিমত পেশ করতে গিয়ে বলেন ঃ বায়বার্স ছিলেন সজাগ মস্তিষ্ক, উন্নত মনোবল ও বীরত্বের অধিকারী বাদশাহ্। শত্রু সম্পর্কে কখনোই তিনি অলস ও অসতর্ক থাকতেন না। তাদের বিরুদ্ধে তিনি সর্বদাই প্রস্তুত থাকতেন। ইসলামের বিক্ষিপ্ত ও বিস্রস্ত অবস্থা তিনি দূর করেন এবং মুসলমানদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন।

প্রকৃত ঘটনা এই, আল্লাহ্ পাক তাঁকে এই শেষ যুগে ইসলাম ও মুসলমানদেরকে সাহায্য করবার ও শক্তি যোগাবার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন। ফিরিঙ্গী, তাতারী ও পৌত্তলিক মুশরিকদের দৃষ্টিতে তিনি কাঁটার মত খচখচ করে বিঁধতেন। রাজ্যে মদ পান তিনি নিষিদ্ধ করেন। বদকার ও অপরাধী চরিত্রের লোকদেরকে দেশ থেকে নির্বাসিত করেন। অনাসৃষ্টি ও খারাপ কাজ দেখামাত্রই তিনি তা দূর করবার জন্য অস্থির হয়ে উঠতেন এবং যতক্ষণ না তা দূর করতে পারতেন তিনি শান্তি পেতেন না।[১]

১. আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২৭৬;

জাহির বায়বার্সের সাম্রাজ্য ছিল অত্যন্ত বিস্তৃত ও সুশৃঙ্খল, ছিল সুসংহত। প্রাচ্যে ফোরাত নদী ও দক্ষিণে সুদানের শেষাংশ অবধি তাঁর রাজ্য-সীমা পৌঁছে গিয়েছিল। মিসর ছিল এই সাম্রাজ্যের কেন্দ্রভূমি এবং কায়রো ছিল এর রাজধানী। সুলতান ও আব্বাসী খলীফা[১]-র অবস্থানের কারণে কায়রো তখন তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের রাজনৈতিক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। বায়বার্স বহু মাদরাসা কায়েম করেন। দূর-দূরান্তর থেকে 'আলিম-'উলামা ও জ্ঞানী-গুণীর সমাবেশ ঘটে কায়রোয়।

বায়বার্স তাঁর ব্যক্তিগত যোগ্যতা, ইসলামী প্রেরণা ও জিহাদী জোশের সঙ্গে সঙ্গে একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী একজন স্বৈরশাসকও ছিলেন। এজন্য স্বৈরশাসকদের ভেতর সাধারণত যে সব দুর্বলতা দেখা যায় তা তাঁর ভেতরও দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর ইতিহাস যেখানে মুজাহিদসুলভ কর্মকাণ্ড ও ইসলামের সেবায় আলোকোজ্জ্বল, সেখানে ব্যক্তিতান্ত্রিক শাসনের বৈশিষ্ট্যসমূহ, যেমন জুলুম-নিপীড়ন, জিদ, হঠকারিতা ও পীড়াপীড়ির ন্যায় ঘটনাবলী দ্বারাও তা কলঙ্কিত। ইমাম নববী (র)-র সঙ্গে সংঘটিত দুঃখজনক ঘটনা এর একটি জ্বলন্ত নজীর।[২]

বায়বার্সের আঠার বছরের সুদৃঢ়, সুশৃংখল ও সুসংহত শাসনের পর মিসর ও সিরিয়ার শাসন ক্ষমতায় খুব দ্রুত বেশ কয়েকজন সুলতানের আগমন ও নিষ্ক্রমণ ঘটে। এ থেকেও এর পরিমাপ করা যাবে, ৬৭৬ হিজরী থেকে (যে বছর বায়বার্স ইনতিকাল করেন) ৭০৯ হিজরী পর্যন্ত তেত্রিশ বছরে মোট ন'জন সুলতান মিসরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই তেত্রিশ বছরের শাসনামলে মিসর, সিরিয়া ও হেজাযের মুসলিম হুকুমত কেবল একজন শক্তিশালী পরিচালক ও মুজাহিদ সুলতান লাভ করে। এই সুলতানের নাম ছিল আল-মালিকু'ল-মনসুর সায়ফুদ্দীন কালাউন। তিনি ৬৭৮ হিজরীতে তাতারীদের ওপর আক্রমণ পরিচালনা করেন এবং তাদেরকে ভীষণভাবে পর্যুদস্ত করেন। যে ত্রিপোলী ১৮৫ বছর যাবত ক্রুসেডারদের দখলে ছিল, তিনি তা জয় করেন। ৬৭৮ হিজরী থেকে শুরু করে ৬৮৯ হিজরী পর্যন্ত ১২ বছর দোর্দণ্ড প্রতাপে সাম্রাজ্য শাসন করেন।

---

১. খলীফা মুস্তা'সিমের শাহাদতের পর মুসলিম জাহান তিন বছর পর্যন্ত কোন খলীফা ছাড়াই অতিবাহিত করে। ঐতিহাসিকগণ নতুন বছরের আলোচনা করতে গিয়ে লেখেনঃ دخلت سنه والمسلمون بلا خليفه অবশেষে সুলতান জাহির বায়বার্স ৬৫৯ হিজরীতে আব্বাসী বংশের এক ব্যক্তি আল-মুস্তানসির বিল্লাহ আবুল কাসিম আহমদ ইবন আমীরি'ল-মু'মিনীন আজ-জাহির-এর হাতে বায়'আত হন এবং মিসর খেলাফতের কেন্দ্র হিসাবে মর্যাদা লাভ করে। কিন্তু এ খেলাফত নামে মাত্র ছিল এবং কেবল বরকত লাভই ছিল এ খেলাফতের উদ্দেশ্য। প্রকৃত শাসক ও দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ছিলেন স্বয়ং সুলতান।

২. দ্র. তাবাকাতু'শ-শাফি'ঈয়্যাতু'ল-কুবরা।

মনসূর কালাউনের পর মিসরের সিংহাসন পুনরায় সুলতান ও হবু সুলতানদের ক্রীড়াক্ষেত্রে পরিণত হয়। শেষাবধি ৭০৯ হিজরীতে মনসুর কালাউনের পুত্র আল-মালিকু'ন-নাসির মুহাম্মদ ইব্‌ন কালাউন তৃতীয়বারের মত শাসন ক্ষমতা হাতে নেন এবং ৩২ বছর পর্যন্ত সাম্রাজ্যের সংহতি বজায় থাকে। আল-মালিকু'ন -নাসিরই ছিলেন ইমাম ইবনে তায়মিয়ার সমসাময়িক যার সঙ্গে তাঁর সংস্কার ও পুনর্জাগরণমূলক ইতিহাসের সম্পর্ক রয়েছে। এই সুলতান ছিলেন অনেকটা সুলতান জাহির বায়বার্স-এর স্থলাভিষিক্ত, অনেক গুণের ক্ষেত্রে তাঁর সাক্ষাত নমুনা এবং পিতা মনসুর কালাউনের জীবন্ত স্মৃতি। তাঁর শাসনামলে মুসলিম সাম্রাজ্যে ঐক্য ও শক্তির সঞ্চার হয়। তিনি তাঁর খ্যাতিমান পূর্বসূরীদের ন্যায় তাতারীদের বিরুদ্ধে শানদার ও গৌরবোজ্জ্বল বিজয় লাভ করেন এবং মুসলিম রাষ্ট্রের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করেন।

এই গোটা সময়ে ইরাক, ইরান, ও খুরাসান বা-দস্তর তাতারীদের নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকে এবং বাগদাদ তখন পর্যন্ত মুসলমানরা ফিরে পায়নি যতদিন না এর শাসক তাতারীরা নিজেরাই মুসলমান হয়ে গেছে। মিসরের আব্বাসী খলীফা নিজে সৈন্য পরিচালনা করেছেন এবং সুলতান জাহির বায়বার্স অনেকবারই বাগদাদ পুনর্দখলের চেষ্টা চালিয়েছেন। কিন্তু তিনি সাফল্য লাভে সক্ষম হন নি। মামলুক সুলতানদের নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনায় কেবল মিসর, সুদান, সিরিয়া ও হেজাযই ছিল অন্তর্ভুক্ত।

সাম্রাজ্যের রীতিনীতি

ইসলামই ছিল মামলুক সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় ধর্ম। সুলতান, সরকারী কর্মকর্তা ও রাষ্ট্রের সদস্যবৃন্দ ইসলামকে ভালবাসতেন। ধর্মের প্রতি তাঁরা ছিলেন সহানুভূতিশীল। কাযী, ইমাম, শায়খুল ইসলাম ও ধর্মীয় পদাধিকারী ব্যক্তিদেরকে যথানিয়মে নিযুক্ত করা হত। ন্যায়পাল বিভাগ (محكمه) প্রতিষ্ঠিত ছিল। কাযীর ফয়সালাই ছিল চূড়ান্ত এবং তা মান্য করা ছিল বাধ্যতামূলক। মাদরাসাগুলোতে স্বাধীনভাবে ধর্মীয় শিক্ষা চলত। কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও সাম্রাজের গোটা ব্যবস্থাপনার মূল চালিকা শক্তি ছিলেন সুলতান নিজে ও তাঁর আস্থাভাজন উযীর ও সাম্রাজ্যের সদস্যবৃন্দ ও তাদের নিয়োজিত কর্মকর্তা ও তাদের ইচ্ছা-অভিরুচি ও সিদ্ধান্তই ছিল সাম্রাজ্যের আইন ও কানুন। ইসলামী আইনের প্রচলন ও ঘোষণার পরিধি তাদের বিস্তৃত সাম্রাজ্যের মোটের ওপর সীমাবদ্ধ ছিল। রাষ্ট্রীয় রীতিনীতি ও ব্যবস্থাপনা আধা-ফৌজী তথা আধা-সামরিক ছিল, যার বিধিবদ্ধ ও বিন্যস্ত কোন সংবিধান ছিল না, ছিল না কোন নির্ধারিত ও সুনির্দিষ্ট রীতিনীতি কিংবা ছিল না কোন পরামর্শ সভা (মজলিসে শূরা)।

অবশ্য জাহির বায়বার্স ও তাঁর স্থলাভিষিক্ত সুলতানগণ এ ব্যাপারে চেষ্টা করতেন যাতে সাম্রাজ্যের আইন-কানুন, বিধি-বিধান ও তাঁদের কার্যাবলী তৎকালীন 'উলামায়ে কিরামের দ্বারা সত্যায়িত ও সমর্থিত হয়। তাঁরা 'উলামায়ে কিরামের তুষ্টি ও পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ করতে যথাসাধ্য চেষ্টা পেতেন। এমনও হয়েছে, 'উলামায়ে কিরাম সুলতানের নতুন কোন পদক্ষেপ কিংবা আইনের কঠোরভাবে বিরোধিতা করেছেন, তক্ষুনি সুলতান তা মুলতবী করে দিয়েছেন। একবার জাহির বায়বার্স মিসর ও সিরিয়ার সমস্ত জমিদারী ও জায়গীর রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বাধীনে নিয়ে আসতে চাইলেন। ইমাম নববী (র) এর প্রবল বিরোধিতা করেন। এতে বায়বার্স তাঁর অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং এজন্য ইমাম নববী (র)-কে দামিশ্‌ক ছেড়ে চলে যেতে হয়। তথাপিও এর এতটুকু প্রভাব পড়েছিল, ভূমি ব্যবস্থার সাবেক পদ্ধতিই বহাল থাকে এবং বায়বার্স কোনরূপ সংস্কার সাধনে ব্যর্থ হন।

সাম্রাজ্যের এই ব্যবস্থাপনা উত্তরাধিকার (মৌরসী) নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু কার্যত হচ্ছিল ঠিক তার উল্টো। যা হচ্ছিল তাও কোন ইসলামী ভিত্তির ওপর নয় এবং এ নীতির ভিত্তি এও নয় যে, ইসলামের রূহ তার নির্ভরযোগ্য ও বিশুদ্ধ রীতির দাবী যে, আমীর (নেতা) ব্যক্তিগত যোগ্যতা দ্বারা অভিষিক্ত হবেন এবং তিনি মুসলিম উম্মাহর আস্থা অর্জন করবেন, বরং এজন্য যে, মামলুক (দাস) বংশের ভিত্তিই স্থাপিত হয়েছিল ব্যক্তিগত চেষ্টা ও সংগ্রাম-সাধনা, উৎসাহ-উদ্দীপনা ও ব্যক্তিগত কর্মদক্ষতার ওপর এবং এ সাম্রাজ্যের এটাই মেযাজে পরিণত হয়ে গিয়েছিল, যিনি সর্বাধিক শক্তিশালী ও সাহসী বীরপুরুষ হবেন তিনিই ক্ষমতার বাগডোর স্বহস্তে গ্রহণ করবেন। আয়্যুবী সাম্রাজ্যের ক্রীতদাসগণ নিজেদের ব্যক্তিগত প্রয়াস ও সাহস বলে স্বীয় প্রভুদের সাম্রাজ্য দখল করেছিলেন। এ ধারা শেষাবধি অব্যাহত ছিল। এদের সকলেই নিজ নিজ সন্তানদেরকে সাম্রাজ্যের পরবর্তী উত্তরাধিকার নিযুক্ত করে যাবার চেষ্টা করতেন। কিন্তু তাদের ক্রীতদাসদের ভেতর যিনি সবচেয়ে বেশী সাহসী ও উদ্যমী হতেন, তিনি তাকে সরিয়ে দিয়ে নিজেই সিংহাসনে উপবেশন করতেন। সিংহাসন ও শাহী মুকুট লাভের এ সব সম্ভাবনা উৎসাহী ও উদ্যমী পুরুষদেরকে ভাগ্য পরীক্ষায় উৎসাহী করে তুলেছিল এবং সিংহাসন লাভের জন্য তাদের ভেতর অধিকাংশ সময় সংঘর্ষ ও শক্তি পরীক্ষা হতে থাকত। এ সময় তাতারী কিংবা ফিরিঙ্গীদের আক্রমণ দেখা দিতেই তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এক হয়ে যেতেন।

দেশের সামাজিক, নৈতিক ও চারিত্রিক অবস্থা

এই তুর্কী বংশোদ্ভূত শাসকশ্রেণী নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের অনুভূতির ক্ষেত্রে পুরো সজাগ ছিলেন এবং প্রতিটি বিষয়ে সাধারণ নাগরিকদের চেয়ে একটা বিশিষ্ট স্থান দখল করে থাকতে চাইতেন। তাদের ভাষা ছিল তুর্কী। কেবল 'ইবাদত-বন্দেগীর মুহূর্তে কিংবা 'উলামায়ে কিরামকে সম্বোধন করতে গেলে অথবা সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথাবার্তা বলার সময় (যার সরাসরি সুযোগ খুব কমই আসত) তারা আরবী ভাষা ব্যবহার করতেন। তাদের ভেতর কেউ কেউ আরবী ভাষায় এতটা অভিজ্ঞ ছিলেন যে, তা আরবী ভাষাভাষীদের মনেও ঈর্ষার উদ্রেক করত। এরই সঙ্গে তারা 'আলিম-'উলামার প্রতিও শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, ছিলেন তারা নেককার বুযর্গদের ভক্ত ও অনুরক্ত। মাদরাসা কায়েম ও মসজিদ নির্মাণেও তারা অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। রাষ্ট্রীয় পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে বিশেষ কোন গোত্র, বংশ, শ্রেণী কিংবা গোষ্ঠীর তারতম্য কিংবা পক্ষপাতিত্ব করা হত না। এরপরও বড় বড় ব্যবস্থাপনা ও সামরিক পদে নিযুক্তির বেলায় স্বাভাবিকভাবেই তুর্কী বংশোদ্ভূত সর্দারদের প্রাধান্য থাকত। কর্মকর্তা ও বড় বড় জায়গীরদার হতেন তুর্ক ও তাতারীরাই, যারা কৃষক ও শ্রমিকের শ্রম থেকে লাভবান হতেন। ৬৯৭ হিজরীতে হুসসামুদ্দীন লাজিন তাঁর শাসনামলে ভূমি সংস্কার করতে চেষ্টা পান, যাতে কৃষকগোষ্ঠী উপকৃত হয়, তাদের অবস্থার পরবর্তন ঘটে এবং তাদের জীবনে স্বচ্ছলতা ফিরে আসে, অধিকন্তু এর ফলে কৃষি উৎপাদনের যেন উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। কিন্তু সরকারী কর্মকর্তারা তাঁর এই আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গি পসন্দ করেন নি। ফলে তারা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। শহরের অধিবাসীদের একটা উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল তাতারী। সায়ফুদ্দীন কুতুয, জাহির বায়বার্স ও নাসিরউদ্দীন কালাউনের তাতারীদের সঙ্গে যেসব যুদ্ধ সংঘটিত হয় তাতে অগণিত তাতারী বন্দী হয়। বন্দী অবস্থায় তারা মিসর ও সিরিয়ায় নীত হয় এবং সেখানেই বসবাস করতে শুরু করে। ঐতিহাসিক মাকরিযীর বর্ণনা মুতাবিক জাহির বায়বার্সের শাসন আমলে মিসর ও সিরিয়া এসব তাতারী যুদ্ধবন্দী দ্বারা ভর্তি হয়ে যায় এবং তাদের আচার-আচরণ ও রসম-রেওয়াজ সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। এরা যদিও ইসলাম কবুল করে নিয়েছিল, তথাপি তারা অনেকেই তাদের প্রাচীন প্রথা ও অভ্যাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং তাঁদের বহু জাতীয় বৈশিষ্ট্য তারা অক্ষুণ্ন রেখেছিল। নও-মুসলিমদের সামগ্রিকভাবে ইসলামের দিকে চলে আসা, নিজেদের সাবেক 'আকীদা, ধ্যান-ধারণা, সভ্যতাগত বৈশিষ্ট্য ও মানসিক প্রভাব-প্রতিক্রিয়া থেকে একেবারেই মুক্ত ও একই লক্ষ্যাভিসারী হয়ে যাবার উদাহরণ ইতিহাসে খুব কমই মিলে। এটা একমাত্র সাহাবা-ই-কিরামের বৈশিষ্ট্য ও নবী করীম (সা)-এর মু'জিযা ছিল যে, তাঁদের জীবনে ইসলাম ও

জাহিলিয়াতের দ্বন্দ্ব একেবারে খতম হয়ে গিয়েছিল এবং তাঁরা যেন ইসলামে পুনর্জন্ম লাভ করেছিলেন। এমন একটি যুগ ও সমাজে যেখানে ইসলামী তা'লীম ও তরবিয়তের পরিপূর্ণ ব্যবস্থাপনা কায়েম নেই, যেখানে ইসলামী সমাজে নবাগতদের আকর্ষণ করে নেবার ও মিশিয়ে ফেলবার এবং একেবারে গোড়া থেকে ঢেলে সাজাবার যোগ্যতা থাকে না, সেখানে তাতারী ও তুর্কী বংশোদ্ভূত অনারবদের থেকে ইসলামী 'আকাইদ ও 'ইবাদত-বন্দেগীর ছাঁচে ঢালাই হবার এবং নিজেদের প্রাচীন অভ্যাস ও চরিত্র থেকে একেবারে মুক্ত ও স্বাধীন হয়ে যাবার আশা করা ঠিক নয়। অতএব, সঙ্গত কারণেই ঐসব তাতারী নও-মুসলিমদের জীবন ছিল ইসলামী ও জাহিলী প্রভাবের জগাখিচুড়ি মাত্র। মিসরের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক মাকরিযী লেখেন ঃ

> ঐ সব তাতারীর প্রশিক্ষণ মুসলিম দেশেই হয়েছিল। কুরআনের শিক্ষা তারা বেশ ভালভাবেই লাভ করেছিল এবং ইসলামের হুকুম-আহকাম ও আইন-কানূনগুলো তারা শিখেছিল। কিন্তু তাদের জীবন ছিল হক ও বাতিলের সংমিশ্রণ। তাদের ভেতর ভাল জিনিস যেমন ছিল, তেমনি ছিল মন্দও। তারা তাদের ধর্মীয় ব্যাপারগুলো– সালাত, সিয়াম, হজ্জ, যাকাত, ওয়াক্ফ, য়াতীমদের সমস্যা, স্বামী-স্ত্রীর বিবাদ-বিসম্বাদ, ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতার পারস্পরিক দ্বন্দ্ব প্রভৃতি কাযীউ'ল-কুযাতকে সোপর্দ করে রেখেছিল। নিজেদের ব্যাপারগুলোতে চেঙ্গীযীসুলভ অভ্যাস ও রীতি-নীতির অনুসারী ও 'আস-সিয়াসা' (তাতারী আইন)-এর দৃঢ়তার সঙ্গে কার্যকর করবার পক্ষপাতী ছিল। তারা নিজেদের জন্য 'হাজিব' নামে একজন হাকিম নিযুক্ত করে রেখেছিল যিনি তাদের দৈনন্দিন জীবনের সংঘটিত ঘটনাবলীর ক্ষেত্রে ফয়সালা করবেন, শক্তিশালীকে শাসন-শৃঙ্খলার অধীনে রাখবেন এবং 'আস-সিয়াসা' মুতাবিক দুর্বল ও কমযোরকে তার হক (অধিকার) ফিরিয়ে দেবেন। এভাবেই বড় বড় তাতারীর পারস্পরিক লেনদেন ইত্যাদি ব্যাপারগুলোর ফয়সালাও 'আস-সিয়াসা মুতাবিক হত এবং জমিদারী জায়গীরদারীসহ জমিজমা সংক্রান্ত বিবাদ-বিসম্বাদ নিষ্পত্তি তাদের জাতীয় আইন মুতাবিক করা হত।[১]

এই তুর্কী বংশোদ্ভূত অনারব ও তাতারী নও-মুসলিমদের অভ্যাস ও চরিত্র, প্রথা-পদ্ধতি, সভ্যতা ও সামাজিকতা,এমন কি তাদের ধর্মবিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণার প্রভাব প্রাচীন আরব ও মুসলিম জনবসতির ওপর পড়া অনিবার্য ছিল। ক্রুসেড যুদ্ধগুলোতে য়ূরোপ ও এশিয়ার যেভাবে সম্মিলন ঘটেছিল ঠিক সেভাবেই তাতারী আক্রমণ ও তাদের বিজেতা ও বিজিত হবার অবস্থায়ও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন

---

১. খুতাত-ই-মিসর।

ঘটেছিল। এই মিলন ও মিশ্রণ যুদ্ধক্ষেত্রের সংঘাত থেকে শুরু হয়েছিল, কিন্তু এর সমাপ্তি ঘটেছিল সভ্যতা, চিন্তাগত ও চারিত্রিক সংমিশ্রণের ভেতর দিয়ে। প্রত্যেকেই একে অপরকে প্রভাবিত করেছে এবং প্রত্যেকেই একে অপরের প্রভাব কবুল করেছে।

এই সম্মিলন ও সংমিশ্রণ বহুবিধ নতুন সমস্যার জন্ম দেয় এবং একটি নতুন সভ্যতা ও একটি নতুন সামাজিকতা অস্তিত্ব লাভ করে, যার সম্পর্কে একথা বলা কঠিন ছিল, সেটা ইসলামী সভ্যতা নাকি আরবীয় সামাজিকতা। এমত অবস্থায় এমন একজন সংস্কারক ও শিক্ষকের যিম্মাদারী অনেক বেশী বেড়ে যায় যিনি মুসলমানদের জীবনে অনৈসলামী প্রভাব ও জাহিলী যুগের আচার-অভ্যাস দেখাকে সইতে পারেন না এবং যিনি তাকে আপাদমস্তক কুরআন-সুন্নাহ্‌র অনুসারী প্রথম ও সর্বোত্তম শতাব্দীর (خير القرون) পদচিহ্নের ওপর এবং ادخلوا في السلم كافة (তোমরা সর্বতোভাবে ও পুরোপুরি ইসলামে প্রবেশ কর)-এর তফসীর দেখতে চান।

শিক্ষা ও জ্ঞানগত অবস্থা

এ শতাব্দীর মধ্যবর্তীতে 'আল্লামা তকীয়্যুদ্দীন আবূ 'আম্‌র ইবনু'স-সালাহ (৫৭৭-৬৪৩ হি.), শায়খুল ইসলাম 'ইয্‌যুদ্দীন ইবনে 'আবদুস সালাম (৫৭৮-৬৬০ হি.) ও ইমাম মুহ্‌য়ি উদ্দীন আন-নববী (৬৩১-৬৭৬ হি.)-এর মত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত যেমন বর্তমান ছিলেন, শতাব্দীর শেষভাগে শায়খুল ইসলাম তকীয়্যুদ্দীন ইব্‌ন দাকীকু'ল–'ঈদ (৬২৫-৭০২)-এর মত মুহাদ্দিছ ও 'আল্লামা 'আলাউদ্দীন আল-বাজী (৬৩১-৭১৪ হি.)-এর মত নীতিশাস্ত্রবিদ ও মুতাকাল্লিমও দৃষ্টিগোচর হন তেমনি। ইবনে তায়মিয়া (র)-র সমসাময়িকদের মধ্যে 'আল্লামা জামালুদ্দীন আবুল হুজ্জাজ আল-মিয্‌যী (৬৫৪-৭৪৬ হি.), আল-হাফিজ আলামুদ্দীন আল-বারযালী (৬৬৫-৭৩৯ হি.) ও 'আল্লামা শামসুদ্দীন আয-যাহবী (৬৭৩-৭৪৮ হি.)-এর মত মুহাদ্দিছ ও ঐতিহাসিকও বর্তমান ছিলেন যাঁরা তাঁদের যুগে হাদীস ও বর্ণনাশাস্ত্রের চতুর্স্তম্ভ হিসেবে পরিগণিত হন এবং যাঁদের প্রণীত গ্রন্থের ওপর শেষ যুগের 'আলিম-'উলামা' ছিলেন নির্ভরশীল।

এঁরা ছাড়াও কাযীউ'ল -কুযাত কামালুদ্দীন ইবনু'য-যামালকানী (৬৬৭-৭২৭ হি.), কাযীউ'ল-কুযাত জালালুদ্দীন আল-কাযভীনি (মৃ. ৭৩৯ হি.), কাযীউ'ল-কুযাত তকীয়্যুদ্দীন আস-সুবকী (৬৮৩-৭৫৬ হি.) ও 'আল্লামা আবূ হায়্যান আন-নাহ্‌ভী (৬৫৪-৭৪৮ হি.)-এর মত পরিপূর্ণ শাস্ত্রবিদ পণ্ডিত, শিক্ষক

ও শক্তিশালী যোগ্য 'আলিমও বর্তমান ছিলেন যাঁদের নিকট শিক্ষা লাভের জন্য ছাত্ররা পতঙ্গের মত ছুটে আসত এবং যাঁদের পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানের গভীরতার খ্যাতি দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে গিয়েছিল।

জ্ঞানের প্রচার ছিল বিকাশমুখী। মিসর ও সিরিয়ায় আয়্যুবী ও মামলূক সুলতানদের প্রতিষ্ঠিত বড় বড় মাদরাসা ছিল, ছিল দারু'ল-হাদীসও। এসব প্রতিষ্ঠানে চতুর্দিক থেকে আগত ছাত্রেরা ধর্মীয় ও বুদ্ধিবৃত্তিক শিক্ষা লাভ করত। মাদরাসার সঙ্গে স্থায়ীভাবে বড় বড় কুতুবখানা (গ্রন্থাগার) ছিল। এসব গ্রন্থাগারে জ্ঞানের প্রতিটি শাখার দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য কিতাবাদি সুরক্ষিত ছিল যেখান থেকে প্রত্যেক ছাত্র উপকৃত হতে পারত। কেবল মাদরাসা কামিলিয়াতে (৬২১ সনে আল-কামিল মুহাম্মদ আয়্যুবী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত) যে লাইব্রেরী ছিল তাতে এক লক্ষ কিতাব ছিল। এ শতাব্দীতে বেশ কতক মূল্যবান কিতাব রচিত হয়। এগুলো পরবর্তী যুগের লোকদের জন্য রেফারেন্স পুস্তক হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'আল্লামা তকীয়্যুদ্দীন ইবনু'স-সালাহ্-র 'মুকাদ্দিমা', শায়খ 'ইযযুদ্দীন ইবনে 'আবদুস সালামের 'আল-কাওয়াইদু'ল-কুবরা', ইমাম নববী-র সংকলন 'শরাহ আল-মুহাযযাব' ও 'শরাহ মুসলিম', ইব্‌ন দাকীকু'ল-'ঈদ-এর কিতাব 'আল-ইমাম' ও 'আহকামু'ল-আহকাম শরাহ 'উমদাতু'ল -আহকাম', আবুল হুজ্জাজ আল-মিযযীর 'তাহযীবু'ল-কামাল' ও 'আল্লামা যাহবীর 'মীযানু'ল-ই'তিদাল' ও 'তা'রীখুল ইসলাম'-এর নাম উল্লেখ করা যায়।

কিন্তু কতিপয় ব্যক্তিত্ব ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে কিছু উল্লেখযোগ্য অবদানের কথা বাদ দিলে এই শতাব্দীর জ্ঞান চর্চা ও গ্রন্থ রচনার বিস্তৃতি ছিল অনেক বেশী, গভীরতা ছিল কম। চিন্তা-ভাবনা ও তার গভীরতার পরিবর্তে অনুলিপিকরণ ও উদ্ধৃতি প্রদানের প্রতি আগ্রহ ছিল বেশী। ফিকহী মযহাবের লৌহ-প্রাকার তখন নির্মিত হয়ে গেছে যার ভেতর নমনীয়তা ছিল না। এমনিতে তো বলার সময় সবাই বলত, সত্য চার মযহাবের মধ্যে বৃত্তাবদ্ধ, কিন্তু কার্যত দেখা যেত, প্রতিটি মযহাবের অনুসারীই 'সত্য কেবল তার অনুসৃত মযহাবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ' বলে মনে করছে অর্থাৎ প্রত্যেকেই যার যার মযহাবকেই কেবল সত্য জানত। নমনীয়তার ক্ষেত্রে বড় জোর এতটুকু বলত–

رأی امامنا صواب يحتمل الخطأ ورأی غيرنا خطأ يحتمل الصواب .

আমাদের ইমামের ইজতিহাদ সবই সঠিক, যদিও তার ভেতর ভুলের আশংকাও রয়েছে এবং অন্যান্য মযহাবের ইমামদের ইজতিহাদ ভুলে ভরা যদিও সেগুলোর সঠিক হবার সম্ভাবনাও রয়েছে

এমনি করে সকল মযহাবের অনুসারীরাই নিজেদের ফিকহী মতবাদ সমস্ত ফিকহী মযহাব থেকে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম এবং তা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সমর্থিত ও গৃহীত বলে মনে করত। তাদের সমস্ত মেধা, রচনা ও বর্ণনা শক্তির সবটুকুই কেবল নিজেদের ইমামের ইজতিহাদকে অগ্রাধিকার প্রদান ও তার ফযীলত প্রমাণ করতে ব্যয়িত হত। মযহাব-অনুসারীরা নিজেদের মযহাবকে কোন্ দৃষ্টিতে দেখত এবং কোন্ ধরনের মন-মানসিকতা মযহাবপন্থীদের ভেতর কাজ করত নিম্নোক্ত ঘটনা থেকে তা কিছুটা আঁচ করা যাবে ঃ

> সুলতান আল-মালিকু'জ জাহির বায়বার্স বিগত দিনের সাংবিধানিক নীতির বিরুদ্ধে যখন শাফি'ঈ মযহাবের কাযীউ'ল-কুযাত ছাড়াও বাকী তিন মযহাবেরও আলাদা আলাদা কাযীউ'ল-কুযাত নিযুক্ত করেন তখন শাফি'ঈ মযহাবের ফকীহগণ একে অত্যন্ত অসন্তোষের দৃষ্টিতে দেখেন। কেননা তারা মিসরকে শাফি'ঈ মযহাবের কাযীউ'ল-কুযাতের অধীনে দেখতে চাচ্ছিলেন এবং মনে করছিলেন, প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা নিয়ম-রীতি ও ইমাম শাফি'ঈ (র)-এর দাফনগাহ হিসাবে মিসরের ওপর একমাত্র শাফি'ঈ মযহাবের অধিকারই স্বীকৃত। বায়বার্সের শাসনাবসানে মিসরের শাসন ক্ষমতা যখন তার খান্দান থেকে অন্য হাতে হস্তান্তরিত হয় তখন কোন কোন শাফি'ঈপন্থী একে তার অপকর্মের শাস্তি ও প্রকৃতির তথা আল্লাহ্‌র বিচার বলে মনে করেন।[১]

এই ফিকহী ফের্কাবন্দীর সঙ্গে 'ইলমে কালামের অনুসারিগণের গোঁড়ামি চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করেছিল। মযহাব চতুষ্টয়ের অনুসারিগণ একে অপরকে মান্য করত এবং ছাত্র ও শিক্ষক হিসেবে একে অপরকে শিক্ষা দান ও একে অপরের থেকে শিক্ষা গ্রহণও করতেন। কিন্তু আশ'আরীপন্থী ও হাম্বলী মতাবলম্বীদের মধ্যে একতা ও মিলন ছিল প্রায় অসম্ভব। মযহাবী দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে প্রশ্ন ছিল কোন্ মযহাব শ্রেষ্ঠ ও অগ্রগণ্য আর এখানে বিতর্ক ছিল ইসলাম ও কুফরের এবং এর ভিত্তিতে একজন আরেকজনকে গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট বলতেন এবং এ বক্তব্যে তারা অনড় থাকতেন। 'আকাইদ সংক্রান্ত বিতর্ক ও 'ইলমে কালামের খুঁটিনাটি বিষয়গুলো সমস্ত বিতর্ক ছাপিয়ে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। আর এতেই মানুষ মজা পেত বেশী। রাজন্যবর্গও এতে আকর্ষণ বোধ করতেন এবং সাধারণ ও বিশিষ্ট সকলেই এই নেশায় ছিলেন মত্ত।

---

১. তাবাকাতু'শ-শাফিঈয়্যাতু'ল কুবরা।

অপরদিকে তাসাওউফও উন্নতির চরম শীর্ষে আরোহণ করেছিল। এর ভেতর বহু অনৈসলামী উপাদান ও ভাবধারা ঢুকে পড়েছিল এবং অনেক পেশাদার মূর্খ জাহিল ও বিদ'আতী এ দলে শামিল হয়ে সাধারণ মানুষ ও বিশিষ্ট লোকদেরকে গোমরাহ ও শির্‌ক-বিদ'আতের বাজার গরম করে তুলেছিল।

দার্শনিকদের একটি দল ধর্ম ও আম্বিয়া 'আলায়হিমু'স-সালামের পেশকৃত শিক্ষা থেকে স্বাধীন হয়ে প্রচার প্রসারে প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে লিপ্ত ছিল। অপর দল দর্শনকেই সত্যের মূল ও মাপকাঠি অভিহিত করে ধর্মকে এর সঙ্গে জুড়ে দিতে চাইত এবং ঐশী বাণীকে তারা বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়াস চালাত। এই উভয় দল এ্যারিস্টোটল ও প্লেটোর অন্ধ অনুকারী, তাদের চিন্তাধারা ও ধ্যান-ধারণার পবিত্রতা, তাদের জ্ঞানের বিশুদ্ধতা, শ্রেষ্ঠত্ব ও অতি মানব হিসাবে তাঁদের মর্যাদার ব্যাপারে পুরোপুরি একমত ছিল। কোন কিছুতেই তাঁদের চিন্তার ফলাফল ও গবেষণা থেকে হটতে এবং তাঁদেরও যে ভুল হতে পারে, একথা স্বীকার করতে তারা আদৌ প্রস্তুত ছিল না।

এরূপ রাজনৈতিক, সামাজিক, নৈতিক, চারিত্রিক, মানসিক ও জ্ঞানগত পরিবেশে ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র আবির্ভাব ঘটে এবং এরূপ পরিবেশেই তিনি সংস্কার ও পুনর্জাগরণের পতাকা উড্ডীন করেন।

ইবনে তায়মিয়া (র)-র পিতৃভূমি

দজলা ও ফোরাত নদীর মধ্যবর্তী ভূভাগ দু অংশে বিভক্ত ঃ (১) দক্ষিণ ভাগকে ইরাক-ই-আরব বলা হয়। বাগদাদ, বসরা প্রভৃতি এ অংশে অবস্থিত। (২) উত্তর ভূভাগ, প্রাচীন আরবী সাহিত্যে একে দিয়ার-ই-বকর, দিয়ার ই-রবী'আ ও দিয়ার ই-মুদার নামে স্মরণ করা হয়েছে। আরব ভৌগোলিকেরা সাধারণভাবে একে আল-জযীরা নামে স্মরণ করেন। এর উত্তরে আর্মেনিয়া, দক্ষিণে ইরাক-ই-আরব, পূর্বে কুর্দিস্তান ও পশ্চিমে এশিয়া মাইনর ও বাদিয়াতু'শ -শাম (সিরিয়া প্রান্তর) অবস্থিত। এ এলাকায় মাওসিল, আর-রুক্কা (আল-বায়দা), নাসীবায়ন ও আর-রিহা (এডেসা)[1] অবস্থিত। আর-রিহার দক্ষিণে আনুমানিক ৮ ঘণ্টার দূরত্বে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শহর হাররান। ইবনে হাওকাল-এর বর্ণনা মুতাবিক এ শহর প্রাচীন কাল থেকেই সাবিঈন[2]দের ধর্মীয় ও

১. বর্তমানে একে আউরফা বলে। আধুনিক তুরস্কের অন্তর্গত।

২. 'সাবী' শব্দের বহুবচন; অর্থ ঃ যে নিজের দীন পরিত্যাগ করে অন্য দীন গ্রহণ করে (কুরতুবী)। তৎকালে প্রচলিত সকল দীন থেকে তাদের পছন্দমত কিছু কিছু বিষয় তারা গ্রহণ করে নিয়েছিল। তারা নক্ষত্র ও ফেরেশতা পূজা করত। হযরত ওমর (রা) তাদেরকে কিতাবী মনে করতেন (কুরআনুল করীম থেকে গৃহীত =অনুবাদক)।

শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। দর্শন ও প্রাচীন গ্রীক শাস্ত্রে এর একটি বিশিষ্ট স্থান, খ্যাতি ও প্রসিদ্ধি ছিল। এই হাররানই ইবনে তায়মিয়া (র)-র পিতৃভূমি এবং এখানেই তাঁর খান্দান শতাব্দীকাল থেকে বসবাস করে আসছিল।

ইবনে তায়মিয়া (র)-র খান্দান

ইবনে তায়মিয়া (র)-র খান্দান পূর্ব থেকেই আসির্রাত-ই-ইবনে তায়মিয়া[১] (খান্দান-ই-ইবনে তায়মিয়া) নামে খ্যাত ছিল। এঁরাই ছিলেন হাররানের শিক্ষিত ও বিখ্যাত ধর্মীয় খান্দান। মযহাব ও 'আকীদার দিক দিয়ে এই খান্দান (যতদূর এঁদের ইতিহাস জানা গেছে) হাম্বলী মযহাবের অনুসারী ছিল। স্বীয় অঞ্চলে এঁরা হাম্বলী মযহাবের নেতৃপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং এঁদের শিক্ষিত সদস্যরা সর্বদাই শিক্ষা দান, ফতওয়া প্রদান ও পুস্তকাদি রচনায় মশগুল থেকেছেন।

শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র পিতামহ আবুল বারাকাত মাজদুদ্দীন ইবনে তায়মিয়া (র) হাম্বলী মযহাবের অন্যতম ইমাম ও বুযুর্গ ছিলেন। কতক পণ্ডিত তাঁকে একজন মুজতাহিদ হিসেবে স্মরণ করেছেন।[২] রিজালশাস্ত্রের ইমাম হাফিজ যাহবী তাঁর 'আন-নুবালা' নামক গ্রন্থে বলেন ঃ

> মাজদুদ্দীন ইবনে তায়মিয়া (র) ৫৯০ হিজরীর কাছাকাছি সময় জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে তিনি তাঁর চাচা বিখ্যাত খতীব ও ওয়াইজ ফখরুদ্দীন ইবনে তায়মিয়ার নিকট 'ইলম হাসিল করেন। অতঃপর হাররান ও বাগদাদের 'উলমায়ে কিরাম ও মুহাদ্দিছদের নিকট 'ইল্‌ম হাসিল করেন এবং এক্ষেত্রে পরিপূর্ণতা লাভ করেন। ফিক্‌হশাস্ত্রেও তিনি ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। যাহ্‌বীর ভাষায় ঃ وانتهت اليه الامامة فى الفقه অর্থাৎ ফিকহশাস্ত্রে তিনি ইমাম হিসাবে বরিত হন।

৬৫১ হিজরীতে হজ্জ পালন উপলক্ষে বাগদাদে উপনীত হলে সেখানকার 'উলামায়ে কিরাম জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর মেধা ও প্রতিভা দেখে বিস্মিত হন। যাহবী বলেন ঃ শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়া (র) স্বয়ং আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, যে, শায়খ ইবনে মালিক বলতেন ঃ আল্লাহ্‌ পাক 'ইলমে ফিক্‌হকে মাজদুদ্দীন ইবনে তায়মিয়ার জন্য এমন কোমল ও দ্রবীভূত করে দিয়েছেন যেমন মোমের মত নরম ও দ্রবীভূত করে দিয়েছিলেন হযরত দাউদ (আ)-এর জন্য

---

১. ইমাম তায়মিয়া (র)-র চার পুরুষ আগের পূর্বপুরুষ মুহাম্মদ ইবন আল-খিযর-এর সময় থেকে ইবনে তায়মিয়া নিসবত শুরু হয়েছিল। এরূপ নামকরণের ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। একটি মত হল, মুহাম্মদ ইবন আল-খিযর-এর মাতার নাম ছিল তায়মিয়া। ইনি একজন ওয়াইজ ছিলেন। তাঁর নামে এই বংশের নামকরণ হয়।

২. তরজমা সাহিব -ই-মুনতাকীউ'ল-আখবার, নায়লুল আওতার প্রণেতা 'আল্লামা মুহাম্মদ ইবন আলী শাওকানী।

লোহাকে। তিনি এও বলতেন, আমাদের পিতামহ (মাজ্দুদ্দীন)-এর স্বভাব ও প্রকৃতিতে কিছুটা তেজী ভাব ও আবেগ ছিল। একবার এক 'আলিম তাঁকে শিক্ষা বিষয়ে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন ঃ এর উত্তর ষাটটি উপায়ে দেওয়া যায়। এরপর এক এক করে তাকে সব জওয়াবই হাতে গুণে দেন। শেষে বলেনঃ তোমাদের জন্য এই উত্তরগুলো নিয়ে দেওয়াই যথেষ্ট। তারা তাঁর এই মেধা ও প্রতিভা দেখে বিস্মিত হন এবং নিশ্চুপ হয়ে যান। শায়খুল ইসলাম বলেনঃ বিভিন্ন 'মতন'-এর নকল ও মযহাব স্মৃতিতে গেঁথে রাখতে তিনি ছিলেন এক বিরল প্রতিভা। এজন্য তাঁকে তেমন কোন বেগ পেতে হয়নি কিংবা এর জন্য বিশেষ কোন ব্যবস্থাও অবলম্বন করতে হত না।[১] ৬৫২ হিজরীতে তাঁর ওফাত হয়। তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত রচনা ও তাঁর জ্ঞানবত্তার শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন হল 'মুনতাকীউ'ল -আখবার' নামক গ্রন্থটি। 'উলামায়ে কিরাম প্রতিটি যুগেই এর থেকে উপকৃত হয়েছেন এবং এর প্রতি মনোযোগ দিয়েছেন। যেসব হাদীস মযহাব অনুসারীদের দলীল ও উৎস গ্রন্থকার এই গ্রন্থে ফিক্হী অধ্যায়ওয়ারী সে সব হাদীস একত্র করে দিয়েছেন। মুজতাহিদ 'আলিম ও খ্যাতনামা মুহাদ্দিছ 'আল্লামা মুহাম্মদ ইবন আলী আশ-শাওকানী (মৃ. ১২৫৫ হি.) 'নায়লু'ল-আওতার' নামে আট খণ্ডে এর শরাহ (ভাষ্য) লিখেন। উত্তর বিন্যস্ত ও সংক্ষিপ্তকরণ, চূড়ান্ত আলোচনা-পর্যালোচনা ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত দৃষ্টি ও উদার হৃদয়ের কারণে এটি শিক্ষক, ছাত্র ও জ্ঞানী মহলে বিশেষ মর্যাদার দাবিদার।

শায়খুল ইসলামের পিতা শিহাবুদ্দীন 'আবদুল হালীম ইবনে তায়মিয়া ছিলেন একজন 'আলিম, মুহাদ্দিছ, হাম্বলী মযহাবের ফকীহ, শিক্ষক ও মুফতী। হাররান থেকে দামিশক স্থানান্তরিত হবার পর তিনি সেখানকার উমায়্যা মসজিদে দরস প্রদান করতে শুরু করেন। এ মসজিদটি ছিল তৎকালীন শ্রেষ্ঠ 'আলিম ও মুদাররিসদের কেন্দ্র এবং সেখানে সব 'আলিম ও মুদাররিসের পক্ষে দরস প্রদান সহজ কাজ ছিল না। তাঁর দরস প্রদানের বৈশিষ্ট্য ছিল, তিনি মুখে মুখে ও তাৎক্ষণিকভাবে অর্থাৎ কোনরূপ পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই দর্স প্রদান করতেন এবং দরস প্রদানের কালে কোন কিতাবের সাহায্য গ্রহণ করতেন না, গোটাটাই মুখস্থ ও স্মৃতিনির্ভর হত। জামে উমায়্যাতে দর্স ও ওয়াজের সঙ্গে তিনি দামিশকের দারু'ল-হাদীস আস-সুকরিয়ার শায়খুল হাদীসও ছিলেন এবং সেখানেই তাঁর বাসস্থান ছিল। ৬৮২ হিজরীতে তিনি ইনতিকাল করেন এবং আস-সুফিয়া নামক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।[২]

---

১. এ সব বৈশিষ্ট্যই তাঁর পৌত্রের ভেতর গিয়ে আসন নেয়।

২. ইবনে কাছীরকৃত আল-বিদায়া ওয়া'ন-নিহায়া, ১৩শ খণ্ড, ৩০৩ পৃ.

জন্ম ও আবাসভূমি পরিবর্তন

এরূপ নামকরা, একনিষ্ঠ, শিক্ষিত ও ধর্মীয় খান্দানে ৬৬১ হিজরীর ১০ই রবী'উ'ল-আওয়াল সোমবার তকীয়্যুদ্দীন ইবনে তায়মিয়ার জন্ম হয়। পিতা তাঁর নাম রাখেন আহমদ তকীয়্যুদ্দীন। বড় হয়ে তিনি আবুল 'আব্বাস ডাক নাম রাখেন। কিন্তু খান্দানী উপাধি 'ইবনে তায়মিয়া' সব কিছু ছাড়িয়ে যায় এবং এ নামেই তিনি মশহুর হন।

এ যুগটা ছিল তাতারী চক্রের,একথা আগে বলা হয়েছে। গোটা মুসলিম জাহান তাদের ভয়ে থরথর করে কাঁপছিল, বিশেষ করে ইরাক ও জযীরা ভূখণ্ড ছিল তাদের ক্রীড়াক্ষেত্র। ইবনে তায়মিয়ার সাত বছর বয়ঃক্রমকালে তাঁর জন্মভূমি তাতারী হামলার শিকার হয়। তাতারী হামলার পর 'ইল্‌ম ও মর্যাদা, 'ইয্‌যত আব্রু ও জান-মালের নিরাপত্তার কোন ব্যবস্থা ছিল না। শেষে নিতান্ত বাধ্য হয়ে তাঁর পরিবারও শত শত 'আলিম-'উলামা ও শরীফ খান্দানের মতই কোন মুসলিম রাষ্ট্রে আশ্রয় সন্ধানে বেরিয়ে পড়েন। ইরাকে যাবার কোন প্রশ্নই ওঠে নি। কাছাকাছি দেশগুলোর ভেতর একমাত্র সিরিয়াই তাতারী আক্রমণের হাত থেকে তখনো পর্যন্ত নিরাপদ ছিল। মিসরের শক্তিশালী মামলুক সুলতানগণ এখানে রাজত্ব করছিলেন। শেষাবধি এই খান্দান পশ্চিম অভিমুখে তার গতিপথ পরিবর্তন করে এবং দামিশকের দিকে রওয়ানা হয়।

এরূপ বিব্রতকর ও নিঃস্ব অবস্থাতেও এই বিদ্যোৎসাহী ও জ্ঞানের নিশানবরদার পরিবারটি তাঁদের মূল্যবান গ্রন্থাগারটিকে, যেটি কয়েক পুরুষের সঞ্চিত ও সংযোজিত একটি বিরাট জ্ঞানাগার ছিল, পেছনে ছেড়ে যাওয়াকে মেনে নিতে পারেনি। অনন্তর তাঁরা সমস্ত মালমাত্তা রেখে একটি গাড়ীতে কেবল কিতাব বোঝাই করে রওয়ানা হন। তাতারী আক্রমণের আশংকা ছিল সর্বত্র। সবখানেই ভীতিকর অবস্থা বিরাজ করছিল। সাথে ছিল নারী ও শিশু। সবচেয়ে বেশী অসুবিধা ছিল, গাড়ী টানবার পশু সহজপ্রাপ্য না হওয়ায় কিতাব ভর্তি গাড়ী নিজেদেরই টানতে হচ্ছিল। কাফেলা অত্যন্ত কষ্টের সঙ্গে পথ চলছিল। এক জায়গায় তাতারীদের আক্রমণের মুখোমুখি গিয়ে পড়ে। আসলে ব্যাপারটা হয়েছিল এরকম, কিতাবের গাড়ী চলতে চলতে থেমে গিয়েছিল। এ অবস্থার হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্য পরিবারের লোকেরা আল্লাহ্‌র দরবারে দু'আপ্রার্থী হয় এবং কান্নাকাটি করতে থাকে। ফলে আল্লাহ্‌র সাহায্য নেমে আসে। গাড়ীর চাকা আবার সচল হয়ে ওঠে এবং কাফেলা সম্মুখ পানে অগ্রসর হয়।[১]

---

১. কাওয়াকিবুদ্দুররিয়্যা

দামিশক

দামিশকে পৌঁছুতেই শিক্ষিত ও জ্ঞানের ধারক এই পরিবারটির আগমন সংবাদ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। শিক্ষিত মহল পূর্ব থেকেই আবুল বারাকাত মাজদুদ্দীন ইবনে তায়মিয়ার সুনাম ও অবদান সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিলেন। 'আবদুল হালীম ইবনে তায়মিয়ার 'ইল্‌ম ও ফযীলত ছিল খ্যাতির শীর্ষে। কয়েকদিনের মধ্যেই জামে উমায়্যা ও দারু'ল-হাদীস আস-সুকরিয়ায় তাঁর দরস প্রদান শুরু হয়ে যায়। ছাত্র ও হাম্বলী মযহাবের উলামায়ে কিরাম তাঁর নিকট ভিড় জমাতে থাকে। ফলে এ পরিবারকে নতুন একটি শহরে নবাগত হিসেবে একাকীত্ব ও অপরিচিতির কোন সমস্যারই সম্মুখীন হতে হয়নি।

অল্পবয়স্ক বালক আহমদ ইবনে তায়মিয়া সত্বর কুরআন মজীদ হেফজ শেষ করেন এবং হাদীস, ফিক্‌হ ও আরবী সাহিত্যে পারদর্শিতা লাভের সাধনায় মশগুল হয়ে পড়েন। অল্প বয়স্ক হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁর পিতার দরস মজলিসে ও ওয়াজ মাহফিলে যোগদান করতেন এবং 'উলামায়ে কিরামের বৈঠকে ও তাঁদের জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় শরীক হতেন। এর ফলে তাঁর অপরিমেয় মেধা সহজেই আলোচনার মণিমুক্তাসদৃশ বিষয়গুলো লুফে নিত এবং নিজেকে সমৃদ্ধ করত।

অসাধারণ স্মৃতিশক্তি

ইবনে তায়মিয়ার পরিবার ছিল স্মৃতিশক্তির জন্য বিখ্যাত। তাঁর পিতা ও পিতামহ দু'জনই বিরাট স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন। কিন্তু তকীয়্যুদ্দীন ইবনে তায়মিয়া আল্লাহ্‌প্রদত্ত এই নে'মতের ক্ষেত্রে গোটা পরিবারকে ছাড়িয়ে যান। শৈশবেই তাঁর অদ্ভুত ও অনন্যসাধারণ স্মৃতিশক্তি এবং দ্রুত মুখস্থ করবার ক্ষমতা 'উলামায়ে কিরাম ও তাঁর শিক্ষকমণ্ডলীকে বিস্ময়ের মাঝে নিক্ষেপ করে এবং দামিশ্‌কে এর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। 'উকূদু'দ্দুর্রিয়ার লেখক বলেন ঃ

> একবার হলব (আলেপ্পো)-এর একজন বড় 'আলিম দামিশক আগমন করেন। আগমনের পর শুনতে পান, আহমদ ইবনে তায়মিয়া নামের এক শিশু অদ্ভুত স্মৃতিশক্তির অধিকারী; একবার যা কিছু শোনে দ্রুত তার মুখস্থ হয়ে যায়। এই শিশুকে দেখবার ও তার স্মৃতিশক্তির পরীক্ষা নেবার আগ্রহ সৃষ্টি হল তাঁর। যে রাস্তা দিয়ে ইবনে তায়মিয়া মকতবে যেতেন সেই রাস্তায় এক দর্জির দোকানে বসে তিনি তার অপেক্ষা করতে থাকেন। তাঁর অভিপ্রায়ের কথা জানতে পেরে দর্জি তাঁকে বলল ঃ আপনি এখানেই বসে অপেক্ষা করুন। সেই বাচ্চা এখনই এসে যাবে। কেননা এটাই তার মকতবে যাবার পথ। কিছুক্ষণ পর বেশ কিছু শিশুকে মকতবে যেতে দেখা গেল। দর্জী বলল ঃ ঐ যে দেখুন! যে বাচ্চাটির নিকট বড় স্লেট রয়েছে ওরই

নাম ইবনে তায়মিয়া। শায়খ বাচ্চাটিকে ডাকলেন। সে এলে তিনি তার থেকে শ্লেটটি চেয়ে নিলেন এবং বললেন ঃ বৎস! তোমার এই শ্লেটে যা কিছু লেখা আছে সব মুছে ফেল। শ্লেট পরিষ্কার হয়ে গেলে তিনি ১১ কিংবা ১৩টি হাদীস তাতে লেখেন এবং বলেন, "হাদীসগুলো একবার পড়ে ফেল।" বাচ্চা গভীর মনোযোগের সঙ্গে একবার পড়ল। এরপর শায়খ শ্লেটটি হাতে তুলে নিয়ে হাদীসগুলো তাঁকে শোনাতে বললেন। ইবনে তায়মিয়া সব হাদীস অবলীলায় শুনিয়ে দিল। শায়খ পুনরায় শ্লেটে লিখিত হাদীসগুলো মুছে ফেলতে নির্দেশ দিলেন। অতঃপর শায়খ হাদীসের কতকগুলো সনদ লিখে সেগুলো তাকে পড়তে বললেন। বালক ইবনে তায়মিয়া একবার গভীর মনোযোগ সহকারে সেগুলো দেখল এবং সঙ্গে সঙ্গে তা শুনিয়েও দিল। শায়খ এই অত্যাশ্চর্য ঘটনা দেখে বলেন ঃ যদি এই শিশু বেঁচে থাকে তাহলে কালে সে এক অসাধারণ পুরুষে পরিণত হবে। কেননা এ যুগে এ ধরনের কোন শিশুর তুলনা মেলা ভার।[১]

ইসলামের প্রথম যুগের মুহাদ্দিছগণের স্মৃতিশক্তির যে সব ঘটনা বিশ্বস্ত ইতিহাস গ্রন্থে বর্ণিত আছে এবং হাদীসের রাবী (বর্ণনাকারী) ও ইমামগণের আল্লাহ্‌প্রদত্ত স্মৃতিশক্তির যে সব উদাহরণ অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণে ধরা পড়েছে সে সবের আলোকে ওপরের ঘটনা অসম্ভব মনে করার ও অবিশ্বাস করবার সঙ্গত কোন কারণ নেই। স্বয়ং ইবনে তায়মিয়া (র)-র পরবর্তী জীবন ও তাঁর মুখস্থ ও বর্ণনাশক্তির ঘটনাদৃষ্টেও এর সত্যতা সমর্থিত হয়। আসলেই তিনি ছিলেন অস্বাভাবিক স্মৃতিশক্তির অধিকারী।

শিক্ষা লাভ ও পরিপূর্ণতা অর্জন

ইবনে তায়মিয়া (র) কঠোর পরিশ্রম, গভীর মনোযোগ ও নিবিষ্টচিত্ত সহকারে পড়াশোনা শুরু করেন। তাঁর সমসাময়িক লেখক ও ঐতিহাসিকগণ বর্ণনা করেন, বয়সের স্বল্পতা সত্ত্বেও খেলাধুলার প্রতি তাঁর কোন আকর্ষণ ছিল না এবং তিনি এতটুকু সময় নষ্ট করতেন না। তদ্‌সত্ত্বেও জীবন, স্বীয় পারিপার্শ্বিক সমাজ ও পরিবেশ, নাগরিক জীবনের অবস্থা, মানুষের চরিত্র ও আচার-অভ্যাস সম্পর্কে তিনি সম্পর্কহীন ও বেখবর ছিলেন না। তাঁর লিখিত রচনা থেকে পরিষ্কার জানা যায়, জীবন সম্পর্কে তাঁর অধ্যয়ন ছিল বিস্তৃত ও গভীর এবং মানুষের থেকে দূরে নির্জন গৃহকোণে একাকী কেবল লেখাপড়ার মাঝেই তিনি জীবন কাটিয়ে দেন নি।

---

১. আবূ যুহরাকৃত 'ইবনে তায়মিয়া', উকুদুদ্দুর্রিয়ার হাওয়ালা যোগে, ২১ পৃ.।

ইবনে তায়মিয়া (র) তাঁর যুগের প্রচলিত সব ধরনের জ্ঞান-বিজ্ঞানেই শিক্ষা লাভ করেছিলেন। আরবী ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তিনি বিশেষ মনোযোগ দেন এবং অভিধান ও ব্যাকরণে তিনি গভীর ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। আরবী ব্যাকরণ শাস্ত্রের ইমাম সীবাওয়ায়হ-এর গ্রন্থ 'আল-কিতাব' (আরবী ব্যাকরণের সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য ও জনপ্রিয় গ্রন্থ, এমন কি এতটা জনপ্রিয় যে, কেবল 'আল-কিতাব' বলা হলেও সীবাওয়ায়হ-এর কিতাবই ধরা হয়।) তিনি বিশেষ যত্ন ও মনোযোগের সঙ্গে অধ্যয়ন করেন[১] এবং এর দুর্বল স্থান ও ভুল-ত্রুটিগুলো চিহ্নিত করেন। আরবী ভাষা ও সাহিত্যে অভিধান ও ব্যাকরণের মুহাক্কিক ও সমালোচনাসুলভ দৃষ্টি এবং তাঁর নিজের এই সাহিত্যিক ও বৈয়াকরণিক ক্ষমতা ও পাণ্ডিত্য তিনি তাঁর জ্ঞানগত জীবন, গ্রন্থ রচনা ও আলোচনার ক্ষেত্রে কাজে লাগান। গদ্য ও পদ্যের একটি বিরাট অংশের তিনি হেফাজতের ব্যবস্থা করেন। প্রাথমিক ও জাহিলিয়া যুগের আরবের অবস্থা ও ঘটনাসমূহ তিনি বিস্তারিতভাবে দেখেন এবং ইসলামী যুগ ও মুসলিম হুকুমতগুলোর ইতিহাস ব্যাপক ও গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন। এই গভীর ও বিস্তৃত অধ্যয়ন তাঁকে তাঁর পরবর্তীকালের বিচিত্র জ্ঞান চর্চার জীবনে খুবই কাজে এসেছিল। তাঁর সমসাময়িককালে কেউই বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গি ও ব্যাপকতর অধ্যয়নের ক্ষেত্রে তাঁর মুকাবিলা করতে পারতেন না। জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও অগ্রাধিকার লাভের এও ছিল এক মস্ত কারণ।

অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞান ছাড়াও লেখনী, সুন্দর হস্তাক্ষর, হিসাব ও অংকশাস্ত্রের দিকেও তিনি মনোযোগ দেন এবং এসব উপযুক্ত শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে শিক্ষা লাভ করেন।[২]

ধর্মীয় 'ইলম-এর ক্ষেত্রে ফিক্‌হ, উসূল-ই ফিক্‌হ, ফারায়েয, হাদীস ও তফসীরের প্রতি মনোবিবেশ করেন। হাম্বলী ফিক্‌হ ছিল তাঁর পারিবারিক সম্পদ এবং এক্ষেত্রে স্বয়ং তাঁর পিতা ছিলেন স্নেহপরায়ণ উস্তাদ, অভিজ্ঞ 'আলিম, সর্বোত্তম পরামর্শদাতা ও পথ-প্রদর্শক। সে যুগে হাদীস লেখা, শ্রবণ ও মুখস্থ করার সাধারণ রেওয়াজ ছিল। ইবনে তায়মিয়া (র) সর্বপ্রথম ইমাম হুমায়দীর কিতাব الجمع بين الصحيحين কণ্ঠস্থ করেন। অতঃপর সে যুগের প্রখ্যাত উস্তাদ, 'উলামায়ে কিরাম ও সিরিয়ার বিদ্বানমণ্ডলী থেকে হাদীস শ্রবণ করেন এবং লেখেন। ইবনে 'আবদুল হাদী বলেন, হাদীসের ক্ষেত্রে ইবনে তায়মিয়ার

১. আল-কাওয়াকিবুদ্দুরিয়্যা;
১. আল-কাওয়াকিবুদ্দুর্রিয়্যা, পৃষ্ঠা ২ ;

শায়খ-এর সংখ্যা দুশ' ছাড়িয়ে যাবে।[১] হাদীসের ক্ষেত্রে তাঁর বিশিষ্ট শায়খ ছিলেন ইবনে 'আবদুদ্দাইম আল-মাকদিসী ও তাঁর শ্রেণীর লোক। মুসনাদে ইমাম আহমদ তিনি কয়েকবার শ্রবণ করেন। ঠিক তেমনি সিহাহ্ সিত্তা শ্রবণের সুযোগও তিনি কয়েকবার লাভ করেছিলেন।[২]

তফসীর ছিল ইবনে তায়মিয়া (র)-র প্রিয় বিষয় এবং এর প্রতি তাঁর বিশেষ আকর্ষণ ছিল। তাঁর নিজেরই বর্ণনা, তিনি কুরআনুল করীমের ছোট বড় শতাধিক তফসীর গ্রন্থ অধ্যয়ন করেছেন।[৩] তফসীরশাস্ত্রের প্রতি তাঁর স্বাভাবিক ও প্রকৃতিগত সম্পর্ক ছিল। কুরআন মজীদের তেলাওয়াত, গভীর চিন্তা ও অনুধাবন ও অত্যধিক অধ্যয়নের ফলে আল্লাহ তা'আলা তাঁর ওপর কুরআনের 'ইল্ম-এর খাস ফয়েয নাযিল করেছিলেন। কুরআন ছাড়াও তিনি স্বয়ং এর লেখক ও অবতরণকারীর (আল্লাহ্র) দিকে প্রত্যাবর্তন করতেন এবং আল্লাহ্র নিকট কুরআনের অনুধাবন ও বক্ষ সম্প্রসারণরূপ সম্পদের প্রার্থনা জানাতেন। তাঁর ছাত্রাবস্থা ও কুরআন অনুধাবনের তরীকা (পন্থা) সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন :

ربما طالعت على الاية الواحدة نحو مائة تفسير ثم اسأل الله الفهم واقول يامعلم ادم وابراهيم علمنى وكنت اذهب الى المساجد المهجورة ونحوها وامرغ وجهى فى التراب واسأل الله تعالى واقول يامعلم ابن ابراهيم فهمنى -

কোন কোন সময় একটি আয়াতের জন্য আমি শত শত তফসীর অধ্যয়ন করেছি। অধ্যয়ন করার পর আমি আল্লাহ্র দরবারে দু'আ করতাম যেন ঐ আয়াতের মর্ম উপলব্ধি করতে পারি, করতে পারি অনুধাবন।

আমি মুনাজাত করতাম, "হে আদম ও ইবরাহীমের শিক্ষক! আমাকে তুমি শেখাও"। আমি নির্জন মসজিদ ও জনমানবহীন এলাকার দিকে চলে যেতাম এবং মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে বলতাম, "হে ইব্ন ইবরাহীমের শিক্ষক! আমাকে তুমি উপলব্ধি করবার ক্ষমতা ও বুঝবার শক্তি দান কর।"[৪]

---

১. আল-কাওয়াকিবুদ্দুরিয়্যা, পৃষ্ঠা ২ ;

২. আল-কাওয়াকিবুদ্দুর্রিয়্যা, পৃষ্ঠা ২ ;

৩. তফসীর সূরা নূর (ইবনে তায়মিয়া), পৃষ্ঠা ১৩৬ ;

৪. উকূদুদ্দুররিয়্যা, ১২৬ পৃষ্ঠা ;

সে সময় মিসর ও সিরিয়ায় আশ'আরী 'ইল্‌মে কালামের ছিল প্রাবল্য। সুলতান সালাহুদ্দীন স্বয়ং আশ'আরী 'আকীদা পোষণ করতেন। মিসরীয় ঐতিহাসিক মাকরিযী বলেন, সুলতান শৈশবেই কুত্‌বুদ্দীন আবুল মা'আলী আশ'আরীর মতন যা তিনি আকাইদ সম্পর্কে রচনা করেছিলেন, হেফজ করেছিলেন এবং পরে তিনি তাঁর বংশের শিশু-কিশোরদের তা হেফ্‌জ করাতেন। তিনি ও তাঁর স্থলাভিষিক্তগণ (বনূ আয়্যুব) লোকদেরকে আশ'আরী 'আকীদার অনুগত বানিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁদের রাজত্বে ও তৎপরবর্তী স্থলাভিষিক্তগণের (মিসরের মামলুক সুলতানগণের) যুগ পর্যন্ত আশ'আরী 'আকীদা রাষ্ট্রীয় সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল।

হাম্বলী মযহাবীদেরকে সঠিকভাবেই হোক কিংবা ভুল করেই হোক, আশ'আরীদের প্রতিপক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করা হত। উভয় পক্ষই আলোচনা-সমালোচনা ও বিতর্কে লিপ্ত থাকত। আশ'আরীদের 'ইল্‌মে কালাম ও প্রমাণ-পদ্ধতি বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান ও যুক্তিভিত্তিক দলীল-প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। অপর পক্ষে হাম্বলীগণ শরীয়তের 'নস', কুরআনী আয়াত ও হাদীসে রসূল (সা.)-এর বাহ্যিক অর্থের সাহায্যে আলোচনা করতেন। কালামশাস্ত্রে তেমন গভীর ব্যুৎপত্তি না থাকায় এবং যুক্তি ও দর্শনশাস্ত্রের সঙ্গে সম্পর্কহীনতার কারণে কোন কোন সময় আলোচনা ও বিতর্কে হাম্বলীদের পাল্লা হাল্কা মনে হত। তাদের সম্পর্কে এই ধারণাই প্রতিষ্ঠিত হত, তাঁরা বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞ এবং কোন বিষয়ের কেবল বাহ্যিক ও ভাসাভাসা জ্ঞান রাখেন মাত্র। সম্ভবত এ ধরনের অনুভূতি ইবনে তায়মিয়া (র)-র মত আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ও তীক্ষ্ণ অনুভূতির অধিকারী একজন নওজোয়ান 'আলিমকে 'ইলমে কালামের বিস্তৃত ও গভীর অধ্যয়ন, বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন ও যুক্তিবিদ্যার সঙ্গে সরাসরি অবহিতি লাভ করবার দিকে মনোনিবেশে বাধ্য করেছিল। তিনি জ্ঞানের এসব শাখা সম্পর্কে গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন এবং এতটা ব্যুৎপত্তি লাভ করেন যে, তিনি স্বয়ং সে সব শাস্ত্রের দুর্বলতা ও সে সবের লেখক ও নেতৃস্থানীয় পণ্ডিত, এমন কি গ্রীক দার্শনিকদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও ভ্রান্তিসমূহ সম্পর্কেও অবহিত হতে সক্ষম হন। সে সব শাস্ত্রের সমালোচনায় এমন সব যুক্তিপূর্ণ ও বিজ্ঞোচিত কিতাব লেখেন যার জওয়াব গোটা দার্শনিক মহল দিতে পারেনি।

মোটকথা, ইবনে তায়মিয়া (র) তাঁর যুগে কুরআন ও সুন্নাহর মুখপাত্র হিসাবে ইসলামের সত্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে এবং জ্ঞান ও কর্মের ক্ষেত্রে বিরাজিত ভ্রান্তি ও গোমরাহী দূর করবার জন্য এমন বিস্তৃত ও পরিপূর্ণ 'ইল্‌মী প্রস্তুতি গ্রহণ করেন, সেই উন্নত জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগে ও চিন্তা-চেতনা ও ধর্মীয় নৈরাজ্যের যমানায় যার প্রয়োজন ছিল। তিনি সে সমস্ত অস্ত্রের ব্যবহার শেখেন

যেসব অস্ত্রে তাঁর প্রতিপক্ষ ও ইসলাম বিরোধীরা (য়াহূদী, খ্রিস্টান, দার্শনিক ও বাতেনী সম্প্রদায়) সজ্জিত ছিল। জ্ঞানের ক্ষেত্রে তিনি এমন পাণ্ডিত্য অর্জন করেন যে, তাঁর সমসাময়িকেরা তা দেখে হতবাক হয়ে যান। তাঁর বিখ্যাত প্রতিপক্ষ আল্লামা কামালুদ্দীন আয-যামালকানী জ্ঞানের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ভাষায় তাঁর সামগ্রিকতা ও সর্বব্যাপকতার স্বীকৃতি দিয়েছেন ঃ

قدالان الله له العلوم كما الان لداؤد الحديد كان اذا سئل عن فن من العلم ظن الرائ والسامع انه لايعرف غير ذالك الفنوحكم ان احدا لا يعرفه مثله وكان الفقهاء من سائر الطوائف اذا جلسوامعه استفادوا فى مذاهبهم منه ما لم يكونواعرفوه قبل ذالك ولا يعرف انه ناظراحدا فانقطع منه ولاتكلم فى علم من العلوم سواء كان من علوم الشرع او غيرها الافاق فيه اهله والمنسوبين اليه وكانت له اليد الطولى فى حسن التصنيف ـ

আল্লাহ্ পাক ইবনে তায়মিয়ার জন্য সকল প্রকার জ্ঞান সহজ ও কোমল করে দিয়েছিলেন যেরূপ সহজ ও কোমল বানিয়ে দিয়েছিলেন হযরত দাউদ 'আলায়হি'স-সালামের জন্য লোহাকে। জ্ঞানের যে শাখায়ই তাঁকে প্রশ্ন করা হতো তিনি তাঁর এমন সহজ ও সাবলীলভাবে উত্তর দিতেন যে, দর্শক শ্রোতা মনে করত যে, তিনি এই বিষয়টি ছাড়া আর কিছুই জানেন না। (অর্থাৎ তিনি কেবল এই একটি বিষয়েই বিশেষজ্ঞ) এবং তারা সিদ্ধান্তে পৌছতে যে, জ্ঞানের এই শাখায় তাঁর মত জ্ঞানী পণ্ডিত আর কেউ নেই। প্রতিটি মাযহাব ও ফিক্হ-এর 'আলিমগণ যখন তাঁর মজলিসে শরীক হতেন তখন কোন না কোন বিষয়ে এমন কিছু জিনিস জানতে পারতেন, যেগুলো তারা এর আগে জানতেন না। যুক্তি-তর্কে কিংবা বিতর্ক অনুষ্ঠানে কেউ তাঁকে পরাজিত করতে পারেন নি। কখনো যদি তিনি শর'ঈ কিংবা বুদ্ধিবৃত্তি সংক্রান্ত জ্ঞানের ব্যাপারে কোন কথা বলেছেন তখন সেই শাস্ত্রের অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতকে তিনি অতিক্রম করে গেছেন। লেখনীর তথা গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রেও সর্বাগ্রগামী ছিলেন তিনি।

ইবনে তায়মিয়া (র)-র প্রথম দরস প্রদান

ইবনে তায়মিয়া (র)-র বয়স যখন বাইশ বছর (৬৮২ হি.) তখন তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতা 'আবদুল হালীম ইবনে তায়মিয়া ইনতিকাল করেন। ফলে দারু'ল হাদীস আস-সুকরিয়ায় তাঁর শিক্ষকতার আসন শূন্য হয়।

শিক্ষকতার এ আসন কিন্তু দীর্ঘদিন শূন্য থাকেনি। ৬৮৩ হিজরীর ২রা মুহাররাম তারিখে পিতার যোগ্য সন্তান আহমদ তকীয়্যুদ্দীন ইবনে তায়মিয়া এ আসন অলংকৃত করেন এবং প্রথম দরস প্রদান করেন। এ সময় তাঁর বয়স ছিল

বাইশ বছর। দরস প্রদানকালে দামিশকের মশহূর সুধী মনীষীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। কাযীউ'ল-কুযাত বাহাউদ্দীন ইবনু'য-যাকী আশ-শাফি'ঈ স্বয়ং এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। শাফি'ঈ 'আলিমগণের মধ্যে তিনি ছাড়াও শায়খু'শ-শাফি'ঈয়া শায়খ তাজুদ্দীন আল-ফিযারী, হাম্বলী মযহাবের 'আলিম-'উলামার মধ্যে যয়নুদ্দীন ইবনু'ল-মুনজী আল-হাম্বলীসহ অন্যান্য নেতৃস্থানীয় 'আলিম উপস্থিত ছিলেন। এই দরস-এ উপস্থিত সুধীবৃন্দ অত্যন্ত প্রভাবিত হন এবং এই যুবক ও তরুণ 'আলিমের জ্ঞানের গভীরতা, উপস্থিত বুদ্ধি, সাহসিকতা ও ভাষার আলংকারিকতার স্বীকৃতি দেন। তাঁর অন্যতম প্রখ্যাত ছাত্র হাফিজ ইবনে কাছীর ৬৮৩ হিজরীর ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে এই দরস অনুষ্ঠানের আলোচনায় বলেন ঃ

وكان درسا هائلا وقد كتبه الشيخ تاج الدين الفزارى بخطه لكثرة فوائده وكثرةما استحسنه الحاضرون وقد اطنب الحاضرون فى شكره على حداثة سنه وصغره فانه كان عمره اذ ذاك عشرين سنة وسنتين -

এটা ছিল বিস্ময়কর দর্স; এর ব্যাপক উপকারিতা ও সাধারণ জনগণের নিকট পছন্দনীয় হবার কারণে শায়খ তাজুদ্দীন আল-ফিযারী প্রদত্ত দর্স লিপিবদ্ধ করেন। উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী ইবনে তায়মিয়াকে তাঁর স্বল্প বয়স ও তারুণ্য সত্ত্বেও এ ধরনের মূল্যবান দর্স প্রদানের জন্য অত্যন্ত প্রশংসা করেন এবং তাঁকে বাহবা দেন। কেননা এ সময় তাঁর বয়স ছিল বাইশ বছর মাত্র।[১]

পরবর্তী মাসের (সফর) দশ তারিখে জুমু'আর দিনে ইবনে তায়মিয়া (র) তাঁর পিতার স্থলে উমায়্যা মসজিদে তফসীরের দর্স প্রদান করেন। তাঁর জন্য বিশেষভাবে মিম্বর রাখা হয়েছিল। তিনি ধারাবাহিকভাবে তফসীর বয়ান করা শুরু করেন। দিন দিন লোক সমাগম বেড়ে চলে।

ইবনে কাছীর বলেন ঃ

তিনি তাঁর তফসীরের দর্স প্রদানকালে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা ও নতুন নতুন বিষয়বস্তু সম্পর্কে এত বেশী বর্ণনা দিতেন যে, শ্রোতৃমণ্ডলীর সংখ্যা ক্রমাগত বেড়েই চলে। এরই সঙ্গে তাঁর দীনদারী, যুহদ ও 'ইবাদত-বন্দেগীর কারণে লোকে তাঁর প্রতি আরও বেশী ঝুঁকে পড়ে এবং তাঁর খ্যাতি দূর-দূরান্তের শহর ও দেশগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে। কয়েক বছর যাবত তাঁর এই রুটিন মাফিক অভ্যাসই বজায় থাকে।[২]

---

১. আল-বিদায়া ওয়া'ন-নিহায়া, ১৩শ খণ্ড, ৩০৩ পৃষ্ঠা;

২. আল-বিদায়া ওয়া'ন-নিহায়া, ১৩শ খণ্ড, ৩০৩ পৃষ্ঠা;

হজ্জ

৬৯২ হিজরীতে আমীন আল-বাসিতীর নেতৃত্বে একটি সিরীয় কাফেলার সঙ্গে হজ্জ সম্পাদন করেন। এই কাফেলা মা'আন নামক স্থানে পৌছুলে প্রবল এক ঝঞ্ঝাবায়ু প্রবাহিত হয়। এতে অনেক লোক মারা যায়। ঝঞ্ঝার তাড়নায় উটগুলি পর্যন্ত আপন জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারছিল না। সবাই বেহুশ প্রায় হয়ে গিয়েছিল।[১]

রসূল (স)-এর প্রতি গালি বর্ষণকারীর শাস্তি

৬৯৩ হিজরীতে এমন একটি ঘটনা সংঘটিত হয় যদ্দ্বারা ইবনে তায়মিয়া (র)-র ধর্মীয় চেতনা, মর্যাদাবোধ ও ঈমানী জযবার বাস্তব প্রকাশ ঘটে। দামিশকে উস্‌সাফ নামক জনৈক খ্রিস্টান সম্পর্কে এক দল লোক এসে সাক্ষ্য দেয়, সে সরওয়ারে 'আলম হুযূর সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর শানে গোস্তাখী করেছে। এই অন্যায় কর্মের পর সে জনৈক আরব সর্দারের নিকট আশ্রয় নিয়েছে। এতদ্‌শ্রবণে ইবনে তায়মিয়া (র) ও দারুল হাদীসের শায়খ যয়নুদ্দীন আল-ফারিকী একত্রে সাম্রাজ্যের নায়েব (প্রতিনিধি, স্থলাভিষিক্ত) 'ইযযুদ্দীন আয়বক আল-হামূমীর নিকট গমন করেন এবং ঘটনার প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আমীর বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি দেন এবং অপরাধীকে ডেকে পাঠান। শায়খদ্বয় আমীরের নিকট থেকে উঠে চলে যাচ্ছিলেন। তখন তাঁদের দু'জনের সঙ্গে বহু লোক ছিল। এমন সময় তাঁরা উসসাফকে আসতে দেখেন। তার সঙ্গে একজন আরবও ছিল। আরবীয় লোকটিকে উসসাফের সঙ্গে দেখতে পেয়ে লোকজন তাকে গালি দিতে থাকে। এতে আরবটি বলে, এই খ্রিস্টান লোকটি তোমাদের চেয়ে ভাল। এতে করে জনতা আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং উভয়ের প্রতি প্রস্তর বর্ষণ করতে শুরু করে। ফলে সেখানে হাঙ্গামা সংঘটিত হয়। আমীর ইবনে তায়মিয়া ও ফারিকী দু'জন 'আলিমকেই ডেকে পাঠান এবং নিজের সামনে তাঁদেরকে হেনস্তা করেন। খিস্টান লোকটি অতঃপর মুসলমান হয় এবং তাকে নিরাপত্তার জামানত প্রদান করা হয়। পরে দু'জন 'আলিমকেই মুক্তি দেওয়া হয় এবং আমীর তার কৃতকর্মের জন্য উভয়ের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এ সময়ই তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ الصارم المسلول على شاتم الرسول লিখেন।[২]

৩. আল-বিদায়া ওয়া'ন-নিহায়া, ১৩শ খণ্ড, ৩৩৩ পৃষ্ঠা;

১. আল-বিদায়া ওয়া'ন-নিহায়া, ১৩শ খণ্ড, ৩৩৫-৩৬ পৃষ্ঠা;

৪ঠা শা'বান, ৬৯৫ হিজরীতে হাম্বলীদের শায়খ 'আল্লামা যয়নুদ্দীন ইব্‌ন মুনজী, মাদরাসাতু'ল-হাম্বলিয়ার শায়খ, ইনতিকাল করলে তাঁর স্থলাভিষিক্ত এবং হাম্বলিয়া মাদরাসার প্রধান মুদাররিসের পদেও ইব্‌নে তায়মিয়াকে অধিষ্ঠিত করা হয়।[১]

পয়লা বিরোধিতা

ইবনে তায়মিয়া (র) পঠন-পাঠনে মশগুল ছিলেন এবং বিশিষ্ট ও সাধারণ সকল মহলে তাঁর জনপ্রিয়তা ও খ্যাতি নিত্যই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এমনি মুহূর্তে ৬৯৮ হিজরীতে তাঁর বিরুদ্ধে প্রথম বিক্ষোভ সংঘটিত হয় এবং তাঁর ব্যক্তিসত্তা ও 'আকীদা-বিশ্বাস বিতর্কিত বিষয়ে পরিণত হয়।

উক্ত ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ হল, ৬৯৮ হিজরীতে সিরিয়ার হেমা শহরের কতিপয় অধিবাসী তাঁর নিকট লিখিতভাবে ফতওয়া জানতে চায়, الرحمن على العرش استوى (রাহমান আরশের উপর অধিষ্ঠিত) ثم استوى الى السماء (অতঃপর তিনি আসমানে অধিষ্ঠান করলেন) ও অনুরূপ আয়াত ও ان قلوب بنى ادم بين اصبعين من اصابع الرحمن [আদম বংশধরের হৃদয়গুলো রাহমানের (আল্লাহ্‌র) অঙ্গুলিসমূহের ভেতর দু'টি অঙ্গুলির মাঝে অবস্থিত) এবং يضع الجبار قدمه فى النار (প্রবল পরাক্রমশালী আল্লাহ জাহান্নামের মাঝে পা রাখলেন) ইত্যাদি হাদীস সম্পর্কে 'আলিমগণের গবেষণামূলক ব্যাখ্যা কি এবং আল্লাহ্‌র গুণাবলী সম্পর্কে 'উলামায়ে আহলে সুন্নত ওয়া'ল-জামা'আতের মত ও পথই বা কি?

শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়া এর বিস্তৃত ও পরিষ্কার ব্যাখ্যাসহকারে জওয়াব দেন।[২] আল্লাহ্‌র গুণাবলী সম্পর্কে সাহাবায়ে কিরাম, তাবি'ঈন, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন, মুতাকাল্লিমীন, মুতাকাদ্দিমীন (ইমাম আবুল হাসান আশ'আরী, কাযী আবূ বকর আল-বাকিল্লানী ও ইমামু'ল-হারামায়ন পর্যন্ত)-এর পথ ও মত, তাঁদের কথিত উক্তি, বাণী ও লিখিত রচনাসমূহ থেকে বর্ণনা করেন এবং তাঁদের গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করেন, উল্লিখিত হযরতগণ এ সমস্ত সিফাতের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করাকে অপরিহার্য বিবেচনা করতেন। সে সবের সেই

১. আল-বিদায়া ওয়া'ন-নিহায়া, ১৩শ খণ্ড, ৩৩৫-৪৪ পৃষ্ঠা ;

২. এই জওয়াব العقيدة الحموية الكبرى নামে মশহূর। প্রায় ৫০ পৃষ্ঠার এ পুস্তিকা مجموعه الرسائل الكبرى-এর অন্তর্ভুক্ত। এটি ১৩২৩ হিজরীতে কায়রো থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

হাকীকত স্বীকার করতেন যেগুলো আল্লাহ্‌র শান ও মর্যাদা মাফিক ও তাঁর পবিত্র সত্তার (ليس كمثله شي) যোগ্য এবং তিনি সব রকমের সাদৃশ্য (তাশবীহ) ও দেহধারী হওয়া, অধিকন্তু অস্বীকৃতি বা নঞর্থক (نفى) ও অবকাশমূলক (تعطيل) ধারণা থেকেও তিনি মুক্ত ও পবিত্র অর্থাৎ তাঁরা না এসব গুণকে আল্লাহ্‌ কর্তৃক সৃষ্ট বস্তুর (মাখলূক) সঙ্গে কিয়াস করেন, না তার পবিত্রতা ও শুচিতা নিয়ে বাড়াবাড়ি ও আধিক্য আরোপ করতে গিয়ে সেগুলোকে একেবারে অস্বীকৃতির পর্যায়ে ঠেলে দেন। তাঁরা এর এমন জটিল ব্যাখ্যাও দেন না যদ্দারা তা হাকীকত তথা প্রকৃত সত্য থেকে বহু দূরে নিক্ষিপ্ত হয় এবং তা কেবল অস্পষ্ট ও ধূম্রজালে বন্দী হয়ে পড়ে; বরং তাঁরা যেভাবে স্বয়ং তাঁর সত্তা ও গুণাবলীর (জীবন, জ্ঞান, কুদরত, শ্রবণ, দর্শন, কথা ও ইচ্ছা বা অভিপ্রায়) ওপর ঈমান আনেন এবং সে সবের সেই হাকীকত স্বীকার করেন যা আল্লাহ্‌র পবিত্র সত্তা ও তাঁর মর্যাদা তথা শানে খোদাওয়ান্দীর যোগ্য। ঠিক তেমনি আলফাজ-ই-মানসুস অর্থাৎ কুরআনুল করীমের এমন সব বাক্য বা শব্দসমষ্টি যার অর্থ স্বতঃপ্রকাশিত – যেমন, আল্লাহ্‌র চেহারা (وجه الله), হাত (يد الله), ক্রোধ (غضب), সন্তুষ্টি (رضاء), তিনি আসমানে (فى السماء), 'আরশের ওপর (على العرش), ওপর (فوق) , যেমন, আল্লাহ্‌র হাত তাদের হাতের ওপর (يدالله فوق ايديهم)-কেও যথার্থ অর্থে কোনরূপ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ব্যতিরেকেই মেনে নেন এবং সে সবের এমন সব হাকীকত প্রমাণ করেন যা সেই পবিত্র সত্তা, নজীরবিহীন, উপমাবিহীন, দৃষ্টান্তবিহীন ও কল্পনাতীত সত্তার মর্যাদার যোগ্য। এই দুই প্রকারের গুণের ভেতর উল্লিখিত হযরতদের পথ, মত ও দৃষ্টিভঙ্গি স্বতন্ত্র ও পরস্পরবিরোধী নয় এবং যেভাবে জীবন, মৃত্যু 'ইল্‌ম, কুদরত প্রভৃতির ওপর ঈমান আনয়নের অর্থ অবধারিতভাবেই এটা নয় যে, সৃষ্টিকুল (মখলুকাত), নব সৃষ্ট বস্তু ও প্রাণীসমূহ (মুহদাছাত)-এর ন্যায় কমজোর জীবন এবং সে সবের সীমাবদ্ধ ও ঋণকৃত জ্ঞান ও অপূর্ণ কুদরতের মতই তাঁর জীবন, জ্ঞান ও কুদরত। কিংবা যারা এসব গুণের হাকীকতের ওপর ঈমান আনে তাদেরকে "মুজাস্‌সিমাঃ" (যারা স্রষ্টাকে দেহধারী বিশ্বাস করেন) বলাও ঠিক হবে না। ঠিক তেমনি يدالله فوق ايديهم (আল্লাহ্‌র হাত তাদের হাতের ওপর), ويبقى وجه ربك (আর স্থায়ী থাকবে তোমার প্রতিপালকের চেহারা (সত্তা), الرحمن على العرش استوى প্রভু 'আরশে সমাসীন), ءامنتم

من فى السماء তোমরা কি ঈমান আনয়ন করছ সেই সত্তার ওপর যিনি আসমানে আছেন?) প্রভৃতি আয়াতের কোনরূপ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ছাড়াই আনয়ন থেকে এ অর্থ বের করা ঠিক হবে না যে, এখানে সৃষ্টি ও ধ্বংসশীল বস্তু কিংবা জীবের ন্যায় তাঁর চেহারা ও হাতকে বোঝানো হয়েছে। ঠিক তেমনি স্থান-কাল-পাত্রের দ্বারাও সীমাবদ্ধ কাল, গণ্ডী কিংবা স্থান বোঝা ঠিক হবে না। স্রষ্টার এসব গুণের হাকীকতে যারা বিশ্বাস করেন তাদেরকে দেহবাদী (تجسيم) ও সাদৃশ্যবাদী (تشبيه) বলে ভর্ৎসনা করাও ঠিক হবে না। এক্ষেত্রে তাঁরা প্রথম যুগের মনীষী বুযুর্গ ও পূর্ববর্তী মুতাকাল্লিমগণের যে সমস্ত উক্তি ও বাণী উদ্ধৃত করেছেন তা থেকে এই পথ ও মতেরই সমর্থন মেলে। তাঁরা বলেন, এর বিরুদ্ধে 'নস'গত কিংবা প্রকাশ্যত একটি শব্দও সাহাবা-ই-কিরাম, তাবি'ঈন ও প্রাচীন বুযুর্গদের থেকে প্রমাণিত হয়নি। তাঁদের ভেতর থেকে কেউ একথা বলেন নি, আল্লাহ আসমানের ওপর নন কিংবা তিনি 'আরশের ওপর নন অথবা তিনি সমস্ত জায়গায় আছেন এবং যে সমস্ত জায়গা তাঁর সম্বন্ধের দিক দিয়ে একই বরাবর এবং সেটা এই, না তিনি বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত, না তিনি এর বহির্ভূত; না সংযুক্ত, না বিযুক্ত এবং সেটা এই, তাঁর দিকে অঙ্গুলী দ্বারা সচেতনগতভাবে ইঙ্গিত করা জায়েয নয়। যদি নঞর্থকবাদীদের পথ ও মতই সঠিক হয় তাহলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আল্লায়হি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবা-ই-কিরাম এর বিরুদ্ধে কেন সর্বদা কথা বলতে থাকলেন আর কেনই-বা সারা জীবন সত্য প্রকাশ থেকে বিরত ও নিশ্চুপ রইলেন? শেষাবধি এই পারসিক, রোমক, ইয়াহূদী ও দার্শনিকদের দ্বারা যারা লালিত-পালিত, তারা আসবে এবং উম্মতে মুসলিমাকে বিশুদ্ধ 'আকীদার তা'লীম দেবে।

অতঃপর তিনি প্রমাণ করেছেন, মুতাআখখিরীন (শেষ যুগের মুতাকাল্লিমগণ) কেউ কেউ গ্রীক দর্শনের প্রভাবে আর কেউ কেউ আল্লাহ্র সত্তাকে পবিত্রকরণের উদ্দেশে অতি উৎসাহে ঐ সকল সিফতের এমন সব ব্যাখ্যা করতে লাগল যা আভিধানিক হাকীকত, সাহাব'-ই-কিরামের বোধ, সমঝ ও হাদীসের নস থেকে বহু দূর গিয়ে পড়ে এবং 'না' ও 'অবকাশ'-এর সীমান্ত ছুঁই ছুঁই করে। এই পারম্পর্যে তারা পূর্ববর্তী 'উলামা-ই-কিরাম, সুন্নাহর ইমাম ও খোদ প্রাচীন মুতাকাল্লিমদের পথ থেকে দূরে ছিটকে পড়ে, এমন কি তারা প্রাচীন বুযুর্গদের সম্পর্কে এমন সব শব্দ উচ্চারণ করতে লাগল যদ্দ্বারা তাঁদের জ্ঞানের অবমাননা হয় যাঁরা অত্যন্ত সতর্কতা ও সাবধানতার সঙ্গে কাজ করতেন। তারা বলে, প্রাচীন যুগের বুযুর্গ পণ্ডিতদের তরীকা অধিকতর নিরাপদ ও নির্ভয় ছিল, কিন্তু পরবর্তী

যুগের পণ্ডিতদের তরীকা ছিল অত্যধিক জ্ঞাননির্ভর ও বিজ্ঞোচিত। এ সবই প্রাচীন বুযুর্গদের হাকীকত ও মর্যাদাগত অবস্থা সম্পর্কে অনবহিতির পরিণতি এবং এটা তাদের অজ্ঞতার প্রমাণও বটে। যথার্থ ও মৌলিক জ্ঞান তো প্রাচীন বুযুর্গ ও মনীষীদেরই ছিল যাঁরা আম্বিয়া-ই-কিরাম ও রসূলগণের ওয়ারিছ ও প্রতিনিধি, যাঁরা আল্লাহ্র কিতাব ও সুন্নতে নববীর ধারক ও বাহক। আল্লাহ্র পরিচয় (মা'রিফাত) এবং তাঁর নাম ও গুণাবলী অনুধাবনের ক্ষেত্রে সেই সব লোক কী করে তাঁদের মুকাবিলা করতে পারে যারা দর্শনের দাবীদারদের পক্ষী-শাবকতুল্য এবং যারা ভারতীয় ও গ্রীকদের উচ্ছিষ্টভোজী মাত্র। দার্শনিক ও মুতাকাল্লিমদের শেষ বাণী ও দুনিয়া থেকে বিদায় নেবার মুহূর্তের অন্তিম উক্তি থেকে আমরা জানতে পারি, তারা তাদের সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গী ও অতীতের চুলচেরা বিশ্লেষণের ব্যাপারে লজ্জিত, বিস্ময়াবিষ্ট অবস্থায় অবনত মস্তক এবং নিজেদের ব্যর্থতা ও ভিত্তিহীনতায় মাতমরত ছিলেন। তাঁদের ভেতর কেউ কেউ বলেছেন, আমাদের সারা জীবনের সঞ্চয় কথার তুবড়ি ছোটানো ছাড়া আর কিছু নয়। কেউ বলেছেন, অসীম সমুদ্রের কূলে বসে কেবল হাত-পা ছুঁড়লাম, দাপাদাপি করলাম, মুসলমানদের জ্ঞান-বিজ্ঞান ছেড়ে অন্ধকার বিয়াবান হাতড়ে ফিরলাম। এখন তো অবস্থা এই, যদি আল্লাহ্র অসীম করুণা-সিন্ধু থেকে একটি বিন্দুও না পাই তাহলে আমার কোথাও আর দাঁড়াবার স্থান থাকবে না। তোমরা সাক্ষী থেক, আমার মা যে সুগভীর বিশ্বাস ও সুদৃঢ় প্রতীতি নিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন, সেই বিশ্বাসের ওপর আমি আমার মৃত্যু কবুল করছি।

এই ফতওয়াটি একটি স্থায়ী জ্ঞানগর্ভ পুস্তিকা–যেখানে শায়খুল ইসলাম (ইবনে তায়মিয়া)-এর জ্ঞান, লেখনীগত বৈশিষ্ট্য পুরোপুরি বিদ্যমান। সাবলীলতা, প্রবল যুক্তি, বাগ্মিতা, কুরআন ও হাদীস থেকে সর্বোত্তম সাক্ষ্য পেশ, পন্থার নতুনত্ব, সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধির নিকট আপীল, যথাযথ সহজ স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাভরণ বক্তব্য, ঐতিহাসিক তথ্য, মুতাকাল্লিম ও দার্শনিকদের ওপর নির্ভীক সমালোচনা–এগুলোই সে সব বৈশিষ্ট্য যা সে যুগের সাধারণ রচনাসমূহে বিশেষত ফতওয়া গ্রন্থে (সাধারণত যা ফিকহী ও পারিভাষিক যবানে লিখিত হত) মেলা ভার ছিল।

এই ফতওয়াতে প্রথমবারের মত তিনি এমন খোলাখুলি ও জোরালোভাবে এই আকীদার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দান করেছিলেন যা ছিল তাঁর নিকট প্রাচীন বুযুর্গদের আকীদা এবং আহলে সুন্নত ওয়া'ল-জামা'আতের প্রত্যয়দীপ্ত বিশ্বাস এবং তাঁর বিরোধীদের নিকট ছিল তাজসীম তথা দেহবাদী-এর আকীদা এবং বিকৃত হাম্বলী মতবাদ। এই ফতওয়া যে দৃপ্ত ভাষায় এবং যেরূপ চ্যালেঞ্জিং ভঙ্গিতে লেখা হয়েছিল এবং হাম্বলী মাযহাবী মহলে একে যেভাবে সাদর অভ্যর্থনা জানানো

হয়েছিল তার স্বাভাবিক পরিণতি ছিল এই যে, সর্বসাধারণ ও শাসক মহলের সমর্থনপুষ্ট আশ'আরী ও কালামশাস্ত্রবিদদের মহলে, যারা সরকারী বিচার ও ফতওয়া বিভাগ থেকে শুরু করে শিক্ষক ও লেখক মহল অবধি সকল পর্যায়ে শিক্ষিত মহলেই আসন গেড়ে বসেছিল, অসন্তোষের এক প্রবল স্রোত ও ব্যাপক বিক্ষোভ সৃষ্টি করে। ইবনে কাছীর ৬৯৮ হিজরীর ঘটনাবলী সম্পর্কে লিখতে গিয়ে বলেন ঃ

আলিমদের একটি দল শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়ার বিরোধিতায় নেমে পড়ে। তারা এ ব্যাপারে পীড়াপীড়ি করছিল যে, তিনি হানাফী কাযী শায়খ জালালুদ্দীনের মজলিসে হাযির হবেন এবং তাঁকে তাঁর ফতওয়া সম্পর্কে সেখানে সাফাই পেশ করতে হবে। ইবনে তায়মিয়া এতে সম্মত হন নি। এতে শহরে ঘোষণা দেওয়া হয় যে, ইবনে তায়মিয়া প্রদত্ত ফতওয়া গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু আমীর সায়ফুদ্দীন জাগান ইবনে তায়মিয়াকে সমর্থন করেন এবং যে সব লোক হাঙ্গামা করেছিল তিনি তাদেরকে তলব করেন। ফলে তাদের অধিকাংশই আত্মগোপন করে। আমীর ঘোষণা প্রদানকারী এক দলকে শাস্তি দেন। এতে অবশিষ্ট লোকেরা নিশ্চুপ হয়ে যায়। জুমু'আর দিন শায়খ আপন অভ্যাস মাফিক জামি' মসজিদে যান এবং انك لعلى خلق عظيم। (নিশ্চয়ই আপনি এক মহান চরিত্রের অধিকারী)-এর তফসীর বর্ণনা করেন। পরদিন শনিবার তিনি কাযী ইমামুদ্দীন (শাফি'ঈ)-এর নিকট গমন করেন। একদল বিশিষ্ট গুণী ব্যক্তিরও সেখানে আগমন ঘটে। তারা সকলেই ফতওয়া হামূবিয়া সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন এবং কয়েকটি জায়গার বিশ্লেষণ চান। তিনি সকলকে পরিতৃপ্ত করেন এবং নিশ্চুপ করে দেন। অতঃপর শায়খ প্রত্যাবর্তন করেন এবং স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে।[১]

এ কাহিনী আরও দীর্ঘ হবার সম্ভাবনা ছিল এবং এরপর আরও বিরোধিতা কিংবা হাঙ্গামা সৃষ্টির আশংকা দেখা দিতে পারত। কিন্তু এর পরপরই এমন অবস্থা দেখা দেয় যে, বহুকাল যাবত আর এ ধরনের 'ইল্‌মী (জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ক) মতপার্থক্য ও আলোচনা-সমালোচনা ও বিতর্কের ফুরসৎ মেলেনি। আর এর কারণ ছিল তাতারীদের হামলা। তাতারীদের এই হামলার মুকাবিলায় শায়খুল ইসলাম প্রথমবারের মত একজন মহান মুজাহিদ ও জননেতা হিসাবে আবির্ভূত হন।

---

১. আল-বিদায়া ওয়া'ন-নিহায়া, ১৪শ খণ্ড, ৪র্থ পৃষ্ঠা;

দামিশ্‌ক অভিমুখে তাতারী বাহিনী

৬৯৯ হিজরীতে নতুন বছর শুরু হতেই চতুর্দিক থেকে উপর্যুপরি খবর আসতে লাগল যে, ইরান ও ইরাকের তাতারী শাসক কাযান[১] সিরিয়ার ওপর আক্রমণের অভিপ্রায় পোষণ করছেন এবং তার সেনাবাহিনীর গতি এখন দামিশ্‌ক অভিমুখে। তাতারী আক্রমণের যে তিক্ত অভিজ্ঞতা মুসলিম দেশগুলোর হয়েছিল এবং তারা যে কিংবদন্তী কায়েম করেছিল তাতে করে এ সংবাদে সমগ্র সিরিয়াব্যাপী আতংকের ছায়া নেমে আসে এবং সর্বত্র ভীতি ছড়িয়ে পড়ে। হলব (আলেপ্পো) ও হিমাত থেকে, যা রাজধানী থেকে বেশ দূরে অবস্থিত ছিল, লোকে বেরিয়ে পড়ে এবং রাজধানী অভিমুখে রওয়ানা হয়। লোকের চাপ এত বেশি ছিল যে, হিমাত থেকে দামিশ্‌ক পর্যন্ত ঘোড়ার ভাড়া দু 'শ' দিরহামে গিয়ে পৌঁছে। কিন্তু খুব শিগগির তারা এ সংবাদে আশ্বস্ত হয় যে, মিসরের সুলতান (আল-মালিকু'ন-নাসির মুহাম্মদ ইব্‌ন কালাউন) সিরিয়ার হেফাজত ও তাতারীদের মুকাবিলার উদ্দেশে সসৈন্য আগমন করছেন। ৬৯৯ হিজরীর ৮ই রবীউল আওয়াল তারিখে মিসরীয় বাহিনী দামিশ্‌ক প্রবেশ করে। প্রবল বৃষ্টিপাত ও কাদা-পানি সত্ত্বেও শহরের লোকেরা সুলতান ও তাঁর বাহিনীকে সাদর অভ্যর্থনা জানায়। শহর সাজানো হয়। স্থানে স্থানে সুলতানের জন্য ও মুসলমানদের বিজয় কামনায় দু'আ ও মুনাজাত করা হয়। ১৭ রবীউল আওয়াল তারিখ সুলতান তার বাহিনীসহ তাতারীদের মুকাবিলার উদ্দেশে বহির্গত হন। হানাফী কাযীউ'ল-কুযাত ও বড় বড় আলিম ও শহরের বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ সুলতানের সঙ্গী হন। সমগ্র বাহিনীর সঙ্গে সেচ্ছাসেবক মুজাহিদ ও রিক্রুটদেরও একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যা বর্তমান ছিল। মসজিদে মসজিদে কুনূতে নাযিলা ও দু'আ অনুষ্ঠানের বিশেষ্য ব্যবস্থা করা হয়।

মিসর সুলতানের পরাজয় ও দামিশ্‌কের অবস্থা

দামিশকের বাইরে ২৭শে রবী'উ'ল-আওয়াল তারিখে কাযান ও সুলতানের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মুসলমানগণ দৃঢ়তা সহকারে লড়াই করে এবং বীরত্বের সঙ্গে তাতারী বাহিনীর মুকাবিলা করে। কিন্তু তদ্‌সত্ত্বেও মুসলমানদের পরাজয় ঘটে। সুলতানের বাহিনী মিসর অভিমুখে রওয়ানা হয় এবং দামিশ্‌কবাসী শহর অভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করে। এই পরাজয়, মিসরীয় ফৌজের প্রত্যাবর্তন ও

১. কাযানের মুসলিম নাম ছিল মাহমূদ। তিনি ছিলেন চেঙ্গীষ খানের প্রপৌত্র। ৬৯৪ হিজরীতে আমীর তূযূন (র)-এর প্রচার প্রেরণায় ইসলাম কবুল করলেও মাত্র পাঁচ বছরের সংক্ষিপ্ত মুদ্দতে তাঁর স্বভাব-চরিত্রের আমূল পরিবর্তন, সেই সঙ্গে তাঁর থেকে ইসলামী তা'লীম ও তরবিয়তের বেশি আশা করা যায় না। ফলে মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও তাতারীদের নৃশংসতা ও ধ্বংসাত্মক তৎপরতার মাঝে কোন ফারাক ছিল না।

তাতারীদের বিজয়ীবেশে দামিশক প্রবেশের আশংকায় শহরে অস্থিরতা ও চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছিল। বড় বড় 'উলামায়ে কিরাম ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি শহর ছেড়ে মিসর অভিমুখে পাড়ি জমাবার চিন্তা করছিলেন। স্বয়ং শাফি'ঈ কাযী, মালিকী কাযী, অন্যান্য কতক খ্যাতনামা 'উলামা, শহরের হাকিম, পুলিশ প্রধান, বড় বড় ব্যবসায়ী বণিক ও জনসাধারণ ইতোমধ্যেই শহর পরিত্যাগ করেছিল। সরকারী আমলারা বিদায় নিয়েছিলেন। শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে কেবল দুর্গের ব্যবস্থাপক তখনও দুর্গে অবস্থান করছিলেন। এ ছাড়া কোন দায়িত্বশীল প্রশাসনিক কর্মকর্তা কিংবা ব্যবস্থাপক শহরে ছিলেন না। জিনিসপত্রের দুর্মূল্য আকাশচুম্বী হয়ে গিয়েছিল। বাইরের আসা-যাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এই সুযোগে জেলখানার কয়েদীরা জেলখানা ভেঙে বেরিয়ে আসে এবং শহরে লুটপাটের তাণ্ডব বইয়ে দেয়। অসৎ ও চরিত্রহীন লোকেরা এই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে। তারা বাগানের (যা দামিশ্কবাসীদের আয়-আমদানীর একটা বড় উৎস ছিল) দরজা ভেঙে ফেলে এবং খিড়কিগুলো খুলে নিয়ে যায় এবং সে সবের জড়ে মূলে সব বিক্রি করে দেয়। দামিশ্কে একদিকে এই অরাজক অবস্থা চলছিল আর ঐদিকে তাতার অধিপতি কাযানের আগমন সংবাদে অবশিষ্ট আশা-ভরসাটুকুও মলিন ও নিষ্প্রভ হবার উপক্রম হয়।

কাযানের সঙ্গে ইবনে তায়মিয়া (র)-র মুলাকাত

এরূপ অবস্থা দেখে শহরের সম্মানিত নাগরিকবৃন্দ ও ইবনে তায়মিয়া (র) এক পরামর্শ সভায় মিলিত হন। অতঃপর আলোচনান্তে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, ইবনে তায়মিয়া (র) কতিপয় 'আলিম ও সঙ্গী-সাথী সমভিব্যাহারে কাযানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন এবং দামিশ্কের জন্য শান্তির বার্তা লাভের চেষ্টা চালাবেন।

৬৯৯ হিজরীর ৩রা রবী'উ'ছ-ছানী সোমবার নাবাক[১] নামক স্থানে দামিশ্কবাসীদের প্রতিনিধি ও ইসলামের দূত ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) এবং প্রবল পরাক্রমশালী তাতারী বাদশাহ কাযানের সাক্ষাতকার অনুষ্ঠিত হয়। শায়খ কামালুদ্দীন ইব্নু'ল-আনজা যিনি দামিশ্ক থেকে ইব্নে তায়মিয়া (র)-র সঙ্গে গিয়েছিলেন এবং উক্ত মজলিসে শরীক ছিলেন, উল্লিখিত সাক্ষাতকারের এভাবে বর্ণনা দিয়েছেন ঃ

১. জায়গাটি দামিশ্ক ও হিম্স-এর মধ্যবর্তীতে অবস্থিত। সেখানকার পানি বিশেষভাবে মশহূর। আজকাল সেখানে একটি খামার আছে। ১৯৫১ সনে হিম্স যাবার পথে এই লেখক জায়গাটি দেখেছিলেন।

আমি শায়খ-এর সঙ্গে উক্ত মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। তিনি সুলতান (কাযান)-কে 'আদ্ল ও ইনসাফ সম্পর্কিত কুরআনু'ল করীমের আয়াত ও হাদীস শরীফ এবং আল্লাহ্ ও তদীয় রসূল (স)-এর ইরশাদ ও হুকুম-আহকাম শোনাচ্ছিলেন। তাঁর আওয়াজ ক্রমান্বয়ে উচ্চ গ্রামে উঠছিল এবং তিনি ক্রমেই সুলতানের নিকটবর্তী হয়ে চলেছিলেন, এমন কি এক পর্যায়ে তাঁর হাঁটু সুলতানের হাটুর সঙ্গে লাগার উপক্রম হয়। অবশ্য সুলতান তাতে মনে কিছু নেন নি। তিনি অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে কান লাগিয়ে তাঁর কথা শুনছিলেন। তাঁর সমগ্র দেহ-মন তাঁর প্রতি নিবিষ্ট ছিল। শায়খ-এর ভক্তিপ্রযুক্ত ভয় ও প্রভাব তাঁকে এতটা আচ্ছন্ন করে রেখেছিল এবং তিনি তৎকর্তৃক এতটা প্রভাবিত ছিলেন যে, তিনি সে সমস্ত লোককে জিজ্ঞাসা করেন, কে এই 'আলিম? আমি আজ পর্যন্ত এমন লোক দেখিনি এবং এই লোকের চেয়ে অধিকতর সাহসী ও শক্ত অন্তকরণের লোক আজ পর্যন্ত আমার চোখে পড়েনি। আমার ওপর অদ্যাবধি আর কারুর এমন প্রভাব পড়েনি। লোকে তাঁর পরিচয় তুলে ধরে এবং তাঁর জ্ঞান, বিদ্যাবত্তা ও তাঁর 'আমলী কামালিয়াত সম্পর্কে আলোচনা করে।

ইবনে তায়মিয়া (র) কাযানকে বলেন, তোমার দাবী যে, তুমি মুসলমান এবং আমি জানতে পেরেছি, তোমার সঙ্গে কাযী, ইমাম ও মুওয়ায্যিনও থাকেন। কিন্তু তদ্সত্ত্বেও তুমি আমাদের মুসলমানদের ওপর হামলা করেছ, অথচ তোমার বাপ-দাদা কাফির হওয়া সত্ত্বেও এরূপ কর্ম থেকে বিরত থেকেছেন এবং তারা যে অঙ্গীকার করেছিলেন তা তারা পূর্ণ করেছেন, আর তুমি যে অঙ্গীকার করেছিলে তা তুমি ভঙ্গ করেছ, যা কিছু বলেছিলে তা পুরো করনি এবং আল্লাহ্র বান্দাদের ওপর তুমি জুলুম করেছ।

শায়খ কামালুদ্দীন বলেন, এরূপ কঠোর ভাষায় কথা বলা সত্ত্বেও শায়খ (ইবনে তায়মিয়া) অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে প্রত্যাবর্তন করেন। তাতারীদের হাতে যে সব মুসলিম বন্দী ছিল, শায়খ (র)-এর সুপারিশে তাদের একটি বিরাট সংখ্যককে ছেড়ে দেওয়া হয়। শায়খ (র) বলতেন ঃ গায়রুল্লাহ (আল্লাহবহির্ভূত সত্তা ও শক্তি)-কে কেবল তারাই ভয় পাবে যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে। ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র)- কে কেউ শাসকদের সম্পর্কে তাঁর ভীতি ও আশংকার কথা ব্যক্ত করলে তিনি বলেছিলেন ঃ যদি তুমি নির্দোষ ও নিরপরাধ হতে তাহলে কাউকে ভয় পেতে না।[১]

---

১. الكواكب الدرية فى مناقب الامام المجتهد شيخ الاسلام ابن تيمية রচয়িতাও আশ-শায়খ মার'আ ইব্ন য়ূসুফ আল-কারামী আল-হাম্বলী, পৃ. ২৫, শামিল মজমূ'আ ফারাজুল্লাহ যাকী আল-কুরদী।

অপর এক সঙ্গী কাযীউ'ল-কুযাত আবু'ল-'আব্বাস এর সঙ্গে কিছুটা যোগ করেছেন ঃ

উক্ত মজলিসে ইবনে তায়মিয়া (র) ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদের সম্মুখে খাবার রাখা হয় এবং সকলেই এ খাবারে শরীক হয়। কিন্তু ইবনে তায়মিয়া (র) হাত গুটিয়ে নেন এবং খাবার গ্রহণ করা থেকে নিজেকে বিরত রাখেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল ঃ আপনি খানায় শরীক হচ্ছেন না কেন? উত্তরে তিনি বললেন ঃ কবে থেকে এ খাবার জায়েয? এ তো গরীব মুসলমানদের ভেড়া-বকরীর গোশ্ত দিয়ে তৈরি করা হয়েছে এবং সাধারণ জনগণের সযত্নে রোপিত বৃক্ষের ডাল-পালা জ্বালানি করে রান্না করা হয়েছে। কাযান তার জন্য দু'আ করার আবেদন জানাল। শায়খ নিম্নোদ্ধৃত ভাষায় দু'আ করেন ঃ

হে আল্লাহ্! যদি তুমি মনে করে থাক, কাযানের এ যুদ্ধের পেছনে উদ্দেশ্য তোমার বাণীকে পৃথিবীর বুকে সমুন্নত করা এবং আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করা তাহলে তাকে তুমি সাহায্য কর। আর যদি তার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে রাজ্য লাভ এবং দুনিয়ার লোভ, তাহলে তার সঙ্গে তুমিই বোঝাপড়া কর। আশ্চর্যের বিষয়, শায়খ (র) দু'আ করছিলেন আর কাযান আমীন! আমীন! বলছিল। এদিকে আবার অবস্থা ছিল, আমরা আমাদের কাপড় গোছাচ্ছিলাম যে, এখন তো জল্লাদের প্রতি তাঁর গর্দান উড়িয়ে দেবার হুকুম হবে। অতএব তাঁর রক্তের ছিঁটা যেন আমাদের কাপড়ে না লাগে।

আবুল 'আব্বাস বলেন ঃ

মজলিস যখন ভেঙে গেল এবং আমরা দরবারের বাইরে এলাম তখন আমরা তাঁকে বললাম, আপনি তো আজ আমাদের মেরেই ফেলতে বসেছিলেন! এখন আমরা আর আপনার সঙ্গে যাব না। তিনি বললেন, আমি নিজেই তোমাদের সঙ্গে যাব না। অনন্তর আমরা রওয়ানা হয়ে গেলাম এবং তিনি কিছুটা দেরী করে প্রত্যাবর্তন করেন। নেতৃস্থানীয় খান ও আমীর-উমারা যখন এই ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হ'ল এবং তাঁর উপস্থিতি সম্পর্কে জানতে পারল অমনি চতুর্দিক থেকে তারা এসে ভীড় করতে লাগল এবং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনার্থে ও বরকত লাভের উদ্দেশ্যে তাঁকে ঘিরে ধরল। অতঃপর তিনি যখন দামিশ্‌কে প্রত্যাবর্তন করেন তখন সঙ্গী হিসাবে তিন শ' অশ্বারোহী তাঁকে অনুগমন করে।

পক্ষান্তরে আমাদের অবস্থা ছিল, আমরা পথিমধ্যে থাকতেই একদল আমাদেরকে আক্রমণ করে এবং আমাদের পরনের কাপড় খুলে নেয়।[১]

১. আল-কাওয়াকিবুদ্দুর্রিয়্যাঃ, ২৫ পৃ..

দামিশকে তাতারীদের বিশৃঙ্খল কার্যকলাপ

দামিশ্‌কবাসীরা যদিও তাতারী সুলতানের পক্ষ থেকে শান্তির পরওয়ানা লাভ করেছিল এবং দামিশ্‌কে সে সম্পর্কে ঘোষণাও প্রদান করা হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তদ্‌সত্ত্বেও দামিশ্‌কের পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোতে তাতারীদের ধ্বংসযজ্ঞ ও অরাজকতা অব্যাহত ছিল এবং শহরের আশ্রয় প্রাচীরের বাইরে হাঙ্গামাজনক পরিস্থিতি বিরাজ করছিল। শহরে দ্রব্যমূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং জিনিসপত্রের সীমাহীন আক্রা চলছিল। এদিকে তাতারীরা দামিশ্‌কবাসীদের নিকট দাবী জানায়, সাবেক সরকারের যে পরিমাণ ঘোড়া, অস্ত্রশস্ত্র ও নগদ অর্থ-কড়ি লোকের কাছে লুকানো রয়েছে, সেগুলো তাতারীদের নিকট সোপর্দ করতে হবে। তারা সায়ফুদ্দীন[১] কুবজুককে তাদের পক্ষে সিরিয়ার শাসনকর্তা নিযুক্ত করে। নতুন শাসক নাগরিকদের ওপর কঠোরতা প্রদর্শন করতে শুরু করেন। শহরের ওপর তাতারীদের নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরিই প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। দুর্গাধ্যক্ষ আরজুওয়াস তার দুর্গ সোপর্দ করেন নি। শুধু তাই নয়, দুর্গ প্রত্যপর্ণ করতেও তিনি পরিষ্কার অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। ইবনে কাছীর বলেন, তাঁর এই অস্বীকৃতির পেছনে প্রেরণাদানকারী ছিলেন ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)। তিনি দুর্গাধ্যক্ষকে পয়গাম পাঠান, যতক্ষণ পর্যন্ত দুর্গের একটি ইটও নিরাপদ থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত যেন দুর্গ তাতারীদেরকে সোপর্দ করা না হয়। দুর্গাধ্যক্ষ শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত এ ব্যাপারে অনড় থাকেন এবং তাতারীরা আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও দুর্গের ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়।[২] তারা শহরে জুলুম-নিপীড়ন চালাতে শুরু করে এবং চিরাচরিত অভ্যাস মাফিক সর্বপ্রকার অরাজকতার আশ্রয় নেয়। অগণিত মুসলিম নারী-পুরুষ বন্দী করে এবং ক্রীতদাসে পরিণত করে। কেবল সালিহিয়া মহল্লায় ৪০০ মানুষ নিহত এবং প্রায় চার হাজারের মত বন্দী হয়। বড় বড় শরীফ খান্দান, অভিজাত পরিবার ও 'আলিম-'উলামা ঘরের বালক-বালিকা ও কিশোর-কিশোরীদেরকে দাস-দাসীতে পরিণত করা হয়। কুতুবখানা (লাইব্রেরী) লুট করা হয় এবং ওয়াক্‌ফকৃত কিতাবসমূহ সের দরে বিক্রি করে দেওয়া হয়।

এমন অবস্থা দেখে ইবনে তায়মিয়া (র) পুনর্বার কাযানের সঙ্গে সাক্ষাতের প্রয়োজন অনুভব করেন। তিনি একদল মুসলিমসহ ২৫শে রবী'উ'ছ-ছানী তারিখে পুনরায় সুলতানের সঙ্গে মিলিত হবার উদ্দেশে গমন করেন, কিন্তু দু'দিন অপেক্ষা করা সত্ত্বেও তাঁকে সুলতানের সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হয়নি। ইতোমধ্যে দামিশকে গুজব ছড়িয়ে পড়ে, তাতারীরা (যারা তখনও পর্যন্ত শহরের বাইরে

১. তুর্কী বংশোদ্ভূত ও সম্ভবত তাতারী নও-মুসলিম ছিলেন :

২. আল-বিদায়া ওয়া'ন-নিহায়া, ১৪ খণ্ড, ১৭ পৃ :

ছাউনি ফেলে অবস্থান করছিল) শহরে প্রবেশ করতে চাচ্ছে। একথা শুনে মানুষের অবশিষ্ট ছিটেফোঁটা আশা-ভরসাটুকুও উবে যাবার উপক্রম হয় এবং শহরের সর্বত্র আতংক ছড়িয়ে পড়ে। লোকজন শহর ছেড়ে চলে যেতে চায়। কিন্তু যাবে কোথায়? তাতারীরা দুর্গ জয়ের আয়োজনে মেতে ওঠে। পরিখা খনন করা হতে থাকে। মিনজানীক স্থাপন করা হয়। বেগার খাটানো হবে, এই ভয়ে লোকে যে যার ঘরে বসে থাকে।

ইবনে কাছীর বলেন ঃ

> রাস্তা ও সড়কগুলো ছিল জনশূন্য। কখনো কখনো দু'একজনকে চলাফেরা করতে দেখা যেত। জামে মসজিদে মুসল্লীর সংখ্যা খুবই কমে গিয়েছিল। উমায়্যা মসজিদে জুমু'আর নামাযে বড় কষ্টে এক কাতার পুরা হত এবং কিছু লোক পেছনে দাঁড়াত। প্রয়োজনে কেউ বাইরে বেরুলেও তাতারীদের ছদ্মবেশে বের হত এবং প্রয়োজন ফুরোতেই তাৎক্ষণিকভাবে ফিরে আসত। তারপরও আশংকা থাকত প্রচুর, হয়ত-বা এটাই শেষ বের হওয়া; আর ফিরে নাও আসতে পারি।[১]

১৯ শে জুমাদা'ল-উলা কাযান ইরাক অভিমুখে যাত্রা করেন এবং একজন প্রতিনিধি নিযুক্ত করে তার অধীনে ষাট হাজার সৈন্য সিরিয়ার হেফাজতের জন্য রেখে যান। যাত্রাকালে তিনি ঘোষণা দেন, "আমরা আমাদের প্রতিনিধি ও বিরাট বিপুল সেনাবাহিনী রেখে যাচ্ছি এবং আগামী বছর শীত মওসুমে আমরা ফিরে আসছি। সে সময় আমরা সিরিয়ার সঙ্গে মিসরও জয় করব।" কাযান যদিও চলে গিয়েছিলেন,কিন্তু অপর তাতারী আমীর বূলাঈ দামিশক ও সংলগ্ন এলাকায় লুটতরাজের রাজত্ব কায়েম করে রেখেছিল। বহু জনবসতি বিরান হয়ে গিয়েছিল। বিপুল সংখ্যক মুসলিম শিশুকে ক্রীতদাসে পরিণত করা হয়েছিল। খোদ দামিশ্ক থেকে সে বিরাট অংকের অর্থ আদায় করেছিল। ৮ই রজব তারিখে ইবনে তায়মিয়া (র.) বূলাঈর সেনানিবাসে গিয়ে তার সঙ্গে সাক্ষাত করেন, বন্দীদের মুক্তির ব্যাপারে আলোচনা করেন এবং এক বিরাট সংখ্যককে মুক্ত করাতে সক্ষম হন।[২] এই সব মুক্ত লোকের ভেতর মুসলমান যেমন ছিল, তেমনি ছিল অমুসলিম (যিম্মী) সিরীয় নাগরিকও।[৩]

৩রা রজব তারিখে দামিশকে দুর্গাধ্যক্ষের পক্ষ থেকে প্রদত্ত এক ঘোষণায় বলা হয়, মিসরীয় ফৌজ সিরিয়ার দিকে আসছে। পরবর্তী দিনেই বূলাঈ ও তার তাতারী সঙ্গী-সাথিগণ দামিশ্ক ছেড়ে রওয়ানা হয়। ৭ তারিখ পর্যন্ত দামিশ্ক ও তার আশেপাশে একজন তাতারী সৈন্যও আর অবশিষ্ট ছিল না।

---

১. আল-বিদায়া, ওয়া'ন-নিহায়া, ১৪শ খণ্ড, পৃ.৯ ;

২. আল-বিদায়া, পৃ.১০ ;

৩. ইবনে তায়মিয়া, মুহাম্মদ আবূ যুহ্‌রাকৃত, ৩৯ পৃ ;

৯ই রজব তারিখে সংবাদ পাওয়া গেল, সুলতান (মুহাম্মদ ইবনে কালাউন) ও মিসরীয় ফৌজ তাতারীদের হাত থেকে সিরিয়া মুক্ত করবার জন্য রওয়ানা হয়ে গেছেন। সে সময় দামিশ্‌কে কোন দায়িত্বশীল শাসক কিংবা ব্যবস্থাপক কেউ ছিলেন না। শহরের আশ্রয়-প্রাচীর তাতারীদের হামলার কারণে ভগ্নদশায় পড়েছিল। দুর্গাধ্যক্ষ আরজুওয়াশ ঘোষণা দেন, শহরের অধিবাসীদেরকে আশ্রয় প্রাচীর ও বিভিন্ন ফটকের হেফাজত করতে হবে। কেউ যেন নিজের বাড়ী-ঘরে শুয়ে বসে না কাটায়। সবাই যেন সশস্ত্র অবস্থায় আশ্রয়-প্রাচীরে উপস্থিত থাকে। লোকেরা সকলেই এ নির্দেশ পালন করে। ইবনে কাছীর বলেন, ঐ দিনগুলোতে ইবনে তায়মিয়া (র)-র নিয়মিত রুটিন ছিল, তিনি সারা রাত জেগে শহরের আশ্রয়-প্রাচীর টহল দিয়ে ফিরতেন এবং লোকদেরকে জিহাদ ও রিবাত ফী সাবীলিল্লাহ্ সম্পর্কিত আয়াত পাঠ করে শুনিয়ে সবর করতে ও সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করতেন।[১]

মদের বিরুদ্ধে জিহাদ

মিসরীয় ফৌজ, মুসলিম সুলতানের আগমন ও তাতারীদের যাত্রার সংবাদে দীনদার ধার্মিক মুসলমানদের উৎসাহ-উদ্দীপনা ও মনোবল বেড়ে যায়। তারা সে সব অন্যায় ও গর্হিত কর্ম দূর করতে দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেন যেগুলো এই শিক্ষা-দীক্ষাহীন জাতিগোষ্ঠী এবং সেই গোষ্ঠীর খোদাভীতিবর্জিত শাসকদের যুগে জন্মলাভ করেছিল। হাফিজ ইবনে তায়মিয়া (র) ছিলেন এ ক্ষেত্রে অগ্রগামী। সিরিয়ায় তাতারী প্রতিনিধি সায়ফুদ্দীন কুবজুক শুঁড়িখানার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং তা ছিল তার আমদানীর একটা বিরাট উৎস। তার সংক্ষিপ্ত শাসনামলে অনেক নতুন শুঁড়িখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এখন আর সেগুলোর টিকে থাকবার কোন বৈধ কারণ ছিল না। এদিকে দামিশ্‌কে সে সময় কোন শাসক কিংবা দায়িত্বশীল কর্মকর্তা ছিলেন না। সুতরাং ইবনে তায়মিয়া (র) এ দায়িত্ব নিজের কাঁধেই তুলে নিলেন। তিনি তাঁর ছাত্র ও বন্ধু-বান্ধবকে সঙ্গে করে গোটা শহর টহল দেন। যেখানেই শুঁড়িখানা দৃষ্টিগোচর হয়েছে অমনি তার ভাণ্ড ও পানপাত্র ভেঙে-চুরে দূরে নিক্ষেপ করেছেন, মদ উপুড় করে ঢেলে ফেলে দিয়েছেন এবং সে সব শুঁড়িখানায় যে সব মাতাল ও দুষ্ট প্রকৃতির লোক বাস করত এবং নানাবিধ কুকর্ম ও অসামাজিক ক্রিয়াকাণ্ডে লিপ্ত হ'ত তাদেরকে তিনি শাস্তি দান করেন। এ ধরনের ভূমিকা গ্রহণে সাধারণভাবে গোটা শহরেই সন্তোষ প্রকাশ করা হয়।[২]

---

১. আল-বিদায়া, ১১ পৃ. ;

২. আল-বিদায়া ওয়া'ন-নিহায়া ;

বদ 'আকীদাগ্রস্ত পাহাড়ী লোকদেরকে শায়েস্তাকরণ ও তাদের মাঝে ইসলামের প্রচার

৬৯৯ হিজরীতে যখন তাতারী বাহিনী দামিশকে প্রবেশ করেছিল এবং তারা জনগণের ওপর জুলুম-নিপীড়ন চালিয়েছিল, সে সময় পার্বত্য এলাকার (খ্রিস্টান বাহিনী ও ইসমাঈলী শী'ঈ) অধিবাসীরা তাদের সঙ্গে এ ব্যাপারে পূর্ণ সহযোগিতা করেছিল। মুসলিম ফৌজ যখন তাতারীদের হাতে পরাজিত হয়ে ফিরে আসছিল এবং তাদের এলাকা দিয়ে অতিক্রম করছিল, তখন এসব পাহাড়ী লোকেরা তাদের ওপর আক্রমণ করে বসে, তাদের অস্ত্রশস্ত্র ও ঘোড়া ছিনিয়ে নেয় এবং বহু মুসলমানকে তারা শহীদ করে দেয়। তারা কখনো কোন বাহিনীর আনুগত্য করে নি, না তারা সত্য ধর্ম (দীন-ই-হক)-ই কবূল করেছিল আর না তারা কোন ব্যবস্থাপনারই পাবন্দ ছিল (অর্থাৎ এরা কোন রকম প্রশাসনিক আইন-কানূনেরই ধার ধারত না এবং উচ্ছৃঙ্খল ও বল্গাহীন জীবন যাপন করত)।[১]

সিরিয়ার আকাশ থেকে দুর্যোগের মেঘ কেটে যেতেই ও অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে স্বস্তি লাভের সুযোগ মিলতেই ইবনে তায়মিয়া (র) এই সব হাঙ্গামাবাজ ও অশান্তি উৎপাদনকারী লোকদেরকে শায়েস্তা করা এবং তাদের মাঝে ইসলামের প্রচার জরুরী মনে করেন। সৌভাগ্যবশত সে সময় সালতানাতের নায়েব জামালুদ্দীন আকূশ আল-আফরাম জরদ ও কিসরাওয়ান নামী পাহাড় অভিমুখে অভিযান পরিচালনা করেন। ইবনে তায়মিয়া (র) এ সুযোগকে ফায়দা হাসিলের মোক্ষম মুহূর্ত মনে করে স্বেচ্ছাসেবক ও হাওরানের অধিবাসীদের এক বিরাট সংখ্যক লোক সঙ্গে করে নায়েবে সালতানাতের সহগামী হন। নায়েবে সালতানাতের আগমন বার্তা পেয়েই গোত্রের সর্দার ইবনে তায়মিয়া (র)-র খেদমতে হাযির হয়। শায়খ (র) তাকে তওবা করান এবং তাকে ভালভাবে ও সর্বোত্তম উপায়ে তাবলীগ করেন। এতে বিরাট উপকার হয়। তারা মুসলিম ফৌজের যেসব জিনিপত্র ছিনিয়ে নিয়েছিল সর্দার তা ফিরিয়ে দেবার পূর্ণ যিম্মাদারী গ্রহণ করে। বায়তু'ল মালের পক্ষ থেকে তাদেরকে চাঁদা হিসাবে টাকা ধার্য করা হয়। তারা এ চাঁদা পরিশোধের অঙ্গীকার করে। এই অভিযান ১৩ই যি'ল-কা'দা তারিখে সাফল্যের মাঝ দিয়ে প্রত্যাবর্তন করে।[২]

তাতারীদের পুনরাগমন ও ইবনে তায়মিয়া (র)-র জিহাদ ঘোষণা

৭০০ হিজরীর প্রারম্ভেই তাতারীদের পুনরাগমন সংবাদ দামিশ্‌কে এসে পৌঁছে। লোকের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যায় এবং এতে মিসর ও অন্যান্য নিরাপদ স্থান ও সুরক্ষিত দুর্গাভিমুখে পালাবার হিড়িক পড়ে যায়। লোকে যে যার

১. আল-বিদায়া ওয়া'ন-নিহায়া', ২. আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া;

আসবাব-পত্র, পোশাকাদি, খাদ্যশস্যসহ সামান্যতম জিনিসটুকু পর্যন্ত বিক্রি করে সফরের রসদ সংগ্রহ করতে থাকে। সওয়ারীর ভাড়া মাত্রাতিরিক্তভাবে বেড়ে যায় এবং পশুর দাম কোথা থেকে কোথায় গিয়ে পৌছে। এসব দেখে ইবনে তায়মিয়া (র) দামিশ্‌কের জামি' মসজিদে ওয়াজ-নসীহত ও দর্‌স প্রদানের সিল্‌সিলা অত্যন্ত জোরেশোরে শুরু করেন। লোকদেরকে জিহাদে উজ্জীবিত ও উদ্বুদ্ধ করে তোলেন। পলায়ন রুখবার জন্য তিনি তাদের সুপ্ত আত্মমর্যাদাবোধ জাগিয়ে তোলেন এবং এরূপ ভীরুতা প্রদর্শনের জন্য তাদেরকে নিন্দা ও ভর্ৎসনা করেন। তিনি লোকদেরকে মুসলমানদের জন্য এবং মুসলিম দেশগুলোর হেফাজত ও প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে মুক্ত হস্তে ব্যয় করতে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেন এবং বলেন ঃ মানুষ পালাবার পেছনে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করছে, এখানে থেকেই তা মুসলমানদের হেফাজত ও জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্‌র জন্য ব্যয় করুক। তিনি বলতেন, এবার তাতারীদেরকে খোলা ময়দানে মুকাবিলা করতে হবে। তাদের সঙ্গে জিহাদ এবার ফরয। তাঁর এই উপর্যুপরি বক্তৃতায় মানুষ আবার আশায় বুক বাঁধে। এদিকে শহরে সরকারীভাবে ঘোষণা দেওয়া হয়, আর একটি লোকও সরকারী পরওয়ানা ও অনুমতি ব্যতিরেকে শহর পরিত্যাগ করতে পারবে না। এতে বেশ সুফল দেখা দেয়। পালাবার সিলসিলা বন্ধ হয়। এদিকে মিসর সুলতানের রওয়ানা হবারও সংবাদ এসে যায়। ফলে লোকেরা স্বস্তি ফিরে পায়।

মিসর সফর

রবী'উ'ছ-ছানী মাসে পুনরায় তাতারীদের আগমন সংবাদে আবহাওয়া উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সংবাদ পাওয়া গেল, তারা বেরাহ নামক স্থান পর্যন্ত পৌছে গেছে। শহরে সাধারণভাবে জিহাদের ঘোষণা প্রদান করা হয়। তাতারীদের অগ্রসর হবার সংবাদ উপর্যুপরি এসে পৌছুচ্ছিল। লোকদেরকে সান্ত্বনা প্রদান করা হয় এবং তাদেরকে বলা হয় যেন তারা যে যার কাজে নিয়োজিত থাকে। সুলতান মিসর থেকে রওয়ানা হয়ে গেছেন। ইতোমধ্যে আকস্মিকভাবে সংবাদ এসে পৌছে, সুলতান সিদ্ধান্ত পাল্টিয়েছেন। একথা শুনে তাদের আশার সৌরকরোজ্জ্বল গগু পুনরায় হতাশার কালো মেঘে ছেয়ে গেল এবং লোকজন যে যার পরিবার-পরিজনকে মিসরসহ অন্যান্য নিরাপদ স্থানে পাঠিয়ে দিতে লাগল। এই অবস্থা দেখে ইবনে তায়মিয়া (র) সিরিয়ার ভাইসরয়-এর সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশে (যিনি দামিশ্‌কের বাইরে তাতারীদের প্রতিরোধ করবার জন্য ছাউনি ফেলে অপেক্ষা করছিলেন) গমন করেন। তিনি তাকে আশ্বস্ত করেন এবং বলেন, আমরা মজলুম, তদুপরি অত্যাচারিত ও নিপীড়িত। অন্যায় ও জুলুমের বিরুদ্ধে আমাদের জয় অবশ্যম্ভাবী। আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

ومن عاقب بمثل ماعوقب به ثم بغى عليه لينصرنه الله ان الله لعفوغفور -

কোন ব্যক্তি নিপীড়িত হয়ে তুল্য প্রতিশোধ গ্রহণ করলে ও পুনরায় সে অত্যাচারিত হলে আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন; আল্লাহ নিশ্চয়ই পাপ মোচনকারী, ক্ষমাশীল। [সূরা হাজ্জ ঃ ৬০ আয়াত, ২২]

সিরিয়ার নায়েব ও আমীর-উমারা ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র নিকট আবেদন জানান যেন তিনি স্বয়ং মিসর গিয়ে সুলতানকে সিরিয়ার হেফাজত এবং তাতারীদের বিরুদ্ধে মুকাবিলায় অবতীর্ণ হতে উদ্বুদ্ধ করেন। অনন্তর তিনি যানবাহন যোগে মিসর রওয়ানা হন। তাঁর পৌছুতে পৌছুতে সুলতান কায়রোয় প্রবেশ করেছিলেন। ইবনে তায়মিয়া (র) সুলতানের সুপ্ত মর্যাদাবোধ জাগিয়ে তুলবার প্রয়াস পান এবং বলেন ঃ যদি সিরিয়া আপনার সাম্রাজ্যের অন্তর্গত না হত এবং মিসর ও সিরিয়ার সুলতান হিসাবে সরাসরি আপনি যদি যিম্মাদার নাও হতেন, এতদ্‌সত্ত্বেও যদি সিরিয়ার সাধারণ গণমানুষ আপনার সাহায্যপ্রার্থী হত, তথাপি তাদের সাহায্য করা আপনার অপরিহার্য দায়িত্বের অন্তর্গত ছিল। আর সিরিয়ার হেফাজতের ব্যাপারে যদি আপনার কোন মাথা ব্যথা কিংবা চিন্তা-ভাবনা না থাকে তাহলে আমাদেরকে পরিষ্কার বলে দিন, আমাদের ব্যবস্থা আমরা নিজেরাই করে নিই এবং কাউকে সেখানকার শাসক হিসাবে নির্বাচিত করি যিনি বিপদমুহূর্তে তার খেদমত ও হেফাজত করবেন এবং ভারসাম্যময় অবস্থায় তার থেকে ফায়দা গ্রহণ করবেন। ইবনে তায়মিয়া (র) সুলতানকে নিশ্চয়তা দেন এবার জয় মুসলমানদেরই হবে। তিনি আট দিন যাবত মিসর দুর্গে অবস্থান করেন এবং সুলতানকে জিহাদ ও তাতারীদের মুকাবিলায় অনুপ্রাণিত করতে থাকেন।

ইবনে তায়মিয়া (র)-র ঈমান ও য়াকীন উদ্দীপক আলোচনা ও ঐকান্তিক নিষ্ঠাপূর্ণ প্রয়াসের ফল হল। সুলতান দ্বিতীয়বার সিরিয়া আগমনে উৎসাহিত হন এবং মিসরীয় ফৌজ জিহাদের উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে যায়। এসব শ্রবণে দামিশকবাসিগণ তখনও পুরোপুরিভাবে খুশী হতে পারেনি, এমনি মুহূর্তে তাতারীদের কাছাকাছি আসবার ও সুলতানের ফিরে যাবার সংবাদ এসে পৌছে। সবচে' দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার ছিল, শহরের শাসনকর্তা ইবনু'ন-নুহাস প্রকাশ্যে ঘোষণা জারী করেন যে, সফর করবার মত যার শক্তি রয়েছে সে যেন অবশ্যই দামিশ্‌ক ছেড়ে চলে যায়। এ ঘোষণায় শহরের সর্বত্র হুলস্থুল পড়ে যায়। হাট-বাজার বন্ধ হয়ে যায়। লোকজন বন-জঙ্গল ও মাঠ-ময়দান পানে পালাতে

থাকে। সবার মুখেই এক কথাঃ শত্রুর খোরাকে পরিণত হওয়াই দামিশ্‌কবাসীদের ভাগ্যের লিখন রয়েছে। বড় বড় 'উলামায়ে কিরাম ও দামিশকের নেতৃস্থানীয় ও অভিজাত ব্যক্তিবর্গ শহর ছেড়ে অজানার পথে পাড়ি জমায়। তাদের অনুসারী ও সম্পর্কিত লোকেরা পূর্বেই চলে গিয়েছিল। নেতৃস্থানীয় ও অভিজাত লোকদের হাতে গোণা কয়েকজন লোকই মাত্র দামিশকে থেকে গিয়েছিল। শহরের ঘোষণা দেওয়া হয়, যারা জিহাদে যোগ দিতে আগ্রহী তারা যেন সেনাবাহিনীর সঙ্গে গিয়ে মিলিত হয়। কেননা তাতারীরা খুবই কাছে এসে পড়েছে। 'উলামায়ে কিরামের মধ্যে যাঁরা তখনও দামিশকে ছিলেন (যাঁদের ভেতর ইমামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শরফুদ্দীন ইবনে তায়মিয়াও ছিলেন) তাঁরা নায়েব-ই-সালাতানাতকে সাহস যোগাতে থাকেন এবং আমীরে আরব 'মুহান্না'কেও জিহাদে অনুপ্রাণিত করে তোলেন। ইতিমধ্যে ইবনে তায়মিয়া (র) মিসর থেকে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি সুলতানের আগমন বার্তা ও সালতানাতের আমীর -উমারার জিহাদের ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্পের সুসংবাদ ব্যক্ত করেন। এদিকে এই খবর পাওয়া গেল, তাতার সুলতান ফিরে যাবার ইচ্ছা পোষণ করেছেন এবং ফোরাত নদী পার হয়ে ইরাক পৌঁছে গেছেন। و كفى الله المؤمنين القتال "আর মু'মিনদের সংগ্রামে আল্লাহই যথেষ্ট।"[১]

তাতারীদের সঙ্গে চূড়ান্ত যুদ্ধ ও ইবনে তায়মিয়া (র)-র কৃতিত্বপূর্ণ অবদান

৭০২ হিজরীর রজব মাসে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেল যে, তাতারীরা এবার সিরিয়া অভিমুখে অগ্রসর হতে ইচ্ছুক। এ সংবাদ জনসাধারণের মাঝে আবার চিত্ত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। সালাতে কুনূতে নাযিলার[২] ব্যবস্থা ও বুখারী শরীফ খতম করা হয়। লোকে অভ্যাস মাফিক মিসর ও অন্যান্য নিরাপদ ও সুরক্ষিত স্থান অভিমুখে ধাবিত হয়। মিসর সুলতান ও মিসরীয় সেনাবাহিনীর আগমন যতই বিলম্বিত হচ্ছিল লোকের ভেতর অস্থিরতাও ততই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত ১৮ই শা'বান তারিখে মিসরীয় ফৌজের একটা বড় অংশ খ্যাতনামা তুর্কী আমীরদের নেতৃত্বাধীনে এসে পৌছে। অতঃপর দ্বিতীয় দলটিও এসে পৌছে। লোকের মনে নিরাপত্তার ভাব ফিরে আসে, ফিরে আসে স্বস্তি। কিন্তু এতে আরেকটি ব্যাপার ঘটে। অপরাপর স্থানের আশ্রয় গ্রহণকারী লোকদের আগমনের ধারা শুরু হয়ে যায় এবং উত্তরাঞ্চলীয় শহরগুলো থেকে ব্যাপক হারে লোকজন নিজ নিজ শহর ছেড়ে দামিশকে আসতে থাকে। বিভিন্ন রকমের গুজবও

---

১. আল-বিদায়া ওয়া'ন-নিহায়া, ১৪শ খণ্ড, ১৬ পৃ.;

২. এতদসম্পর্কিত ব্যাখ্যা পুস্তকের শেষোংশে "পরিশিষ্টে" সংযোজিত হয়েছে। সেখানে দেখা যেতে পারে। —অনুবাদক।

ছড়াতে থাকে। সিরিয়ার আমীরগণ একত্র হয়ে শত্রুর মুকাবিলায় অঙ্গীকারাবদ্ধ হন, কসম খান এবং শহরে ঘোষণা প্রদান করা হয় যেন কেউ শহর পরিত্যাগ না করে। ইবনে তায়মিয়া (র) শহর থেকে বাইরে গিয়ে সেনাবাহিনীকে বিষয়টি অবহিত করেন এব, তাদের থেকেও অনুরূপ কসম গ্রহণ করেন। তিনি আমীর-উমারা ও জনগণকে কসম খেয়ে খেয়ে বলতেন ঃ এবার তোমরা অবশ্যই জয়লাভ করবে। এ ব্যাপারে তিনি এতটা নিশ্চিত ছিলেন যে, যদি কেউ বলত, আপনি ইনশাআল্লাহ্ বলুন, তখন তিনি বলতেন, نشاء الله تحقيقا। لاتعليقا আমরা মজলুম, আর মজলুম অবধারিতভাবেই সাহায্যপ্রাপ্ত হয়ে থাকে। ثم بغى عليه لينصرنه الله "অতঃপর যাদেরকে নিপীড়ন করা হয় তাদেরকে আল্লাহ অবধারিতভাবে সাহায্য করবেন।" অতএব আল্লাহ্র এই ওয়াদা মুতাবিক বিজয় আমাদের নিশ্চিত, এতে সন্দেহের অবকাশ নেই বিন্দুমাত্র।[১]

এ সময় একটি প্রশ্ন ওঠানো হয়, আর যাই হোক, তাতারীরা মুসলমান। অতএব, তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করাটা ধর্মীয় বিধান মতে কতটা সঙ্গত? তারা তো কাফিরও নয়, আবার বিদ্রোহীও বলা যায় না তাদেরকে। বিদ্রোহী নয় এজন্য যে, তারা কখনো কোন মুসলিম শাসকের (আমীরের) আনুগত্যাধীনে আসেনি বিধায় তাদেরকে বিদ্রোহের দায়ে অভিযুক্ত করা চলে না। আর সে প্রশ্নও তাই অবান্তর। অতএব, তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা হবে কিসের ভিত্তিতে? 'উলামায়ে কিরাম এ ব্যাপারে দ্বিধা ও দ্বন্দ্বের শিকার হন। ইবনে তায়মিয়া (র) এ দ্বন্দ্বের নিরসন ঘটিয়ে বলেন, তারা খারিজীদের ন্যায় বিবেচিত হবে এবং তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হুকুম এদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। খারিজীরা সায়্যিদুনা 'আলী (রা) ও হযরত মু'আবিয়া (রা) উভয়ের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করেছিল। তারা নিজেদেরকে খিলাফতের অধিক হকদার বলে মনে করত। তাতারীরাও ঠিক তাদের মতই অপরাপর মুসলমানদের তুলনায় নিজেদেরকে হুকুমতের অধিক হকদার মনে করে এবং বলে, আমরা তাদের মুকাবিলায় বেশী হক ইনসাফ কায়েম করতে পারি। তারা মুসলমানদের ওপর জুলুমের মিথ্যা অপবাদ দেয়, অথচ তাদের তুলনায় নিজেরা আরও বেশী মাত্রায় গর্হিত কর্ম ও অশোভন আচরণে লিপ্ত। তাঁর এই বিশ্লেষণের দ্বারা 'উলামায়ে কিরাম তৃপ্ত ও নিশ্চিত হন এবং বিষয়টি তাদের উপলব্ধিতে ধরা দেয়। এক্ষেত্রে তিনি এতটা আত্মবিশ্বাসী ও নিশ্চিত ছিলেন যে, তিনি বলতেন ঃ যদি তোমরা আমাকেও তাতারীদের কাতারে কুরআন শরীফ মাথায় দাঁড়ানো দেখতে পাও সেমত অবস্থায় আমাকেও তোমরা হত্যা করবে। এতে লোকের সকল দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দূরীভূত হয় এবং তাদের মনোবল বেড়ে যায়।

---

১. আল-বিদায়া ওয়া'ন-নিহায়া।

দামিশকে তখন এক শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা বিরাজ করছিল। সুলতানের কোন আগমন সংবাদ পাওয়া যাচ্ছিল না। সিরীয় ও মিসরীয় ফৌজের যুদ্ধ করবার কোন নিশ্চয়তাও ছিল না। ওদিকে প্রতি মুহূর্তে তাতারীদের আগমন সংবাদ এসে পৌছুচ্ছিল। বিভিন্ন শহর থেকে দলে দলে লোকজন পালিয়ে এসে দামিশকে আশ্রয় নিচ্ছিল। গোটা শহরই আশ্রয় গ্রহণকারী লোকজনে ভরে ছিল। ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র.)-র পক্ষে সেনানিবাসে যাবার জন্য বেরিয়ে লোকের ভিড়ে পথ পাওয়াই দুষ্কর হচ্ছিল। যারা তাঁর দৃঢ় সংকল্প ও অটুট মনোবলের বিষয়ে অবহিত ছিল না, তারা তাঁকে এই বলে ভর্ৎসনা করছিল, আপনি তো আমাদেরকে পালাতে বাধা দিচ্ছেন আর এখন দেখছি আপনি নিজেই পালাবার পথ খুঁজছেন? ইমাম (র) তাদের কথার কোন জবাব না দিয়েই নীরবে পাশ কাটিয়ে চলে যান। শহরে কোন প্রশাসক ছিলেন না। গুণ্ডা ও বদমাইশেরা ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে রেখেছিল। লোকে উঁচু জায়গা ও মীনারে আরোহণ করে মুসলিম বাহিনী খুঁজে ফিরত এবং নানাবিধ জল্পনা-কল্পনার আশ্রয় নিত। প্রত্যেকেই যার যার কিসমতের ফয়সালার অপেক্ষায় ছিল, অপেক্ষায় ছিল যুদ্ধ হবে কিনা? যদি যুদ্ধ হয়ই তাহলে কে জয়ী হবে? আল্লাহ না করুন, যদি মুসলিম বাহিনী পরাজিত হয় তাহলে মুসলমানদের আর কোথাও দাঁড়াবার জায়গা থাকবে না, তাদের 'ইযযত-আবরূ ও জান-মালের কোন নিরাপত্তাই থাকবে না।

মোটকথা এ ছিল যেন নিম্নোক্ত আয়াতেরই প্রতিচ্ছবি ঃ

واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله

الظنونا ـ هنالك ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا ـ

যখন তোমাদের চোখ বিস্ফারিত হয়েছিল, তোমাদের প্রাণ হয়ে পড়েছিল কণ্ঠাগত এবং তোমরা আল্লাহ সম্বন্ধে নানাবিধ ধারণা পোষণ করছিলে। তখন মু'মিনগণ পরীক্ষিত হয়েছিল এবং তারা ভীষণভাবে প্রকম্পিত হয়েছিল। [সূরা আহযাব ঃ ১০-১১ আয়াত]

ইবনে তায়মিয়া (র) সিরীয় বাহিনীতে গিয়ে উপস্থিত হলে বাহিনীর আমীর-উমারা তাঁর নিকট এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন, তিনি যেন সম্মুখে অগ্রসর হয়ে সুলতানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং সত্বর আগমনের জন্য তাঁর দরবারে দরখাস্ত পেশ করেন। ইবনে তায়মিয়া (র) সুলতানের সঙ্গে মুলাকাত করেন। ইবনে তায়মিয়া (র)-র সঙ্গে কৃত আলোচনায় ও কথাবার্তায় সুলতানের সংকল্প ও মনোবল আরও অটুট ও দৃঢ় হয়। তিনি ইবনে তায়মিয়া (র)-র সঙ্গে সেনা

ছাউনিতে আসেন। সুলতান তাঁর নিকট এই আগ্রহ ব্যক্ত করেন, যুদ্ধকালে তিনি যেন সুলতানের সঙ্গে থাকেন। ইবনে তায়মিয়া (র) বলেন, প্রত্যেকে তার কওমের পতাকাতলে যুদ্ধ করবে আর এটাই সুন্নত। আমি সিরীয় বাহিনীর সঙ্গে সম্পর্কিত। সেজন্য আমি সেই পতাকাতলেই যুদ্ধ করব। তিনি সুলতানকে পুনরপি জিহাদের তালকীন করেন এবং বলেন, আমি এক আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে বলছি, জয় আমাদেরই হবে। এবারও আমীরগণ তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলেন, ইন্‌শাল্লাহ বলা সমীচীন। তিনি বললেন ঃ انشاءالله تحقيقا لا تعليقا

২৯শে শা'বান জুমু'আর রাতে রমযানের চাঁদ দেখা গেল। দামিশ্‌কবাসী তারাবীহ্‌র প্রস্তুতি গ্রহণ করে। একদিকে ছিল রমযানের আনন্দ, আর অপরদিকে ছিল শত্রুর ভয় ও ভবিষ্যতের আশংকা। জুমু'আর দিন খুব কঠিন অবস্থার মাঝ দিয়ে অতিক্রান্ত হয়। শনিবার দিন লোকে মীনারে আরোহণ করে দেখতে পেল সেনা ছাউনির দিকে ধুলি-বালি উড়ছে এবং অন্ধকার ছেয়ে আছে। তারা বুঝতে পারল, আজই মুকাবিলা হবে। সাধারণের মাঝে ব্যাপকভাবে দু'আ-মুনাজাত শুরু হয়। শিশু ও মহিলারা নিজ নিজ দালান-কোঠায় খালি মাথায় দাঁড়িয়েছিল। শহরে ছিল দারুণ উত্তেজনা। ২রা রমযান শনিবার জোহর বাদ সুলতানের ফরমান জামি' মসজিদে পাঠ করে শোনান হয়। এতে বলা হয়, শনিবার দিন দ্বিপ্রহর হতে সিরীয় ও মিসরীয় ফৌজ সুলতানের সঙ্গে কাতারবদ্ধ হবে। মুসলমানরা যেন আল্লাহ্‌র দরবারে তাঁর সাহায্য ও বিজয়ের জন্য দু'আ করে এবং দুর্গ ও শহরের আশ্রয়-প্রাচীরের হেফাজতে সুদৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করে।

২রা রমযান ছাকহাব প্রান্তরে একদিকে সিরীয় বাহিনী ও মিসরীয় ফৌজ, অপর দিকে তাতারী বাহিনী কাতারবদ্ধ হয়। ইবনে তায়মিয়া (র) ফতওয়া প্রদান করেন, মুজাহিদ বাহিনী যেন সিয়াম ভঙ্গ করে, যাতে করে যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি সৃষ্টি হয়। তিনি এক একটি পতাকা ও এক একটি কোম্পানীর নিকট নিজেই যেতেন। এ সময় তাঁর হাতে খাবার বস্তু থাকত আর তিনি তাদেরকে দেখিয়ে দেখিয়ে ইফতার করতেন এবং হাদীস শোনাতেন, انكم ملاقوالعدو غدا والفطر اقوى لكم - নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ আগামী কাল দুশমনের সঙ্গে তোমাদের মুকাবিলা হবে। সিয়াম ভঙ্গের দ্বারা তোমরা অধিকতর শক্তিশালী হবে।

যুদ্ধ শুরু হ'ল। সুলতান স্বয়ং এ যুদ্ধে তাঁর সেনাবাহিনীর মাঝে উপস্থিত ছিলেন। আব্বাসী খলীফা আবু'র -রবী' সুলায়মান সুলতানের পাশেই ছিলেন। শেষ পর্যন্ত উভয় বাহিনীই একে অপরের ভেতর ঢুকে পড়ে এবং যুদ্ধের ময়দান উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সুলতান অত্যন্ত দৃঢ়তা প্রদর্শন করেন। তিনি তাঁর ঘোড়ার পায়ে শেকল পরিয়ে দিয়েছিলেন যাতে পালাতে না পারে। তিনি এবার আল্লাহ্‌র সঙ্গে

অঙ্গীকার করেন। ভীষণ যুদ্ধ চলে। বড় বড় তুর্কী আমীর এ যুদ্ধে মারা যান। অবশেষে মুসলমানরা বিজয় লাভে ধন্য হয় এবং তাতারীদের পদস্খলন ঘটে। রাতের বেলা তাতারীরা প্রাণ রক্ষার্থে টিলা, পাহাড় ও টিকরীর ওপর গিয়ে আশ্রয় নেয়। মুসলমানগণ সারা রাত জেগে পাহারা দেয় এবং তাদের পালাবার পথে বাধা সৃষ্টি করে। তাদেরকে তীরের মুখে রেখে দেয়। বিপুল সংখ্যক তাতারী নিহত হয়। সকালে মুসলমানেরা তাদেরকে রশিতে বেঁধে বেঁধে নিয়ে আসছিল এবং তাদের গর্দান উড়িয়ে দিচ্ছিল। পলাতকদের একটি বিরাট সংখ্যক ঘাঁটিও বিপজ্জনক স্থানে পড়ে এবং অনেকেই ফোরাত নদীতে নিমজ্জিত হয়ে প্রাণ হারায়।

৪ঠা রমযান সোমবার ইবনে তায়মিয়া (র) দামিশ্‌কে প্রবেশ করেন। লোকেরা তাঁকে মহা আড়ম্বরে অভ্যর্থনা জানায়, মুবারকবাদ দেয় এবং তাঁর জন্য দু'আ করে।

৫ই রমযান মঙ্গলবার (৭০২ হি.) সুলতান তাঁর সাম্রাজ্যের অমাত্যবর্গ, খলীফা এবং শাহী ফৌজের সঙ্গে বিজয়ী বেশে দামিশ্‌কে প্রবেশ করেন।

বিদ'আত প্রত্যাখ্যান ও গর্হিত কর্মের অবসান

তাতারীদের হাঙ্গামা থেকে নিষ্কৃতি মিলতেই ইবনে তায়মিয়া (র) নিয়ম মাফিক পূর্বের মতই জোরেশোরে পঠন-পাঠন, সুন্নাহ্‌র প্রচার-প্রসার এবং বিদ'আত প্রত্যাখ্যানের মিশন শুরু করেন। তিনি শির্‌ক ও জাহিলিয়াতের বিরুদ্ধে জিহাদে মশগুল হয়ে পড়েন যা ছিল তাঁর প্রিয় পেশা এবং তাঁর জীবনের পরম লক্ষ্য। এ যুগেই ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদের সঙ্গে মেলামেশা এবং অজ্ঞ ও জাহিল নেতাদের শিক্ষার ফলে মুসলমানদের মধ্যে এমন বহু আচার-আচরণ এসে গিয়েছিল যেগুলো ছিল জাহিলিয়াতের স্মারক চিহ্ন এবং মুশরিক ও মূর্তিপূজারী জাতিগোষ্ঠীর রীতি। দামিশ্‌কের পাশে কলূত নদীর কিনারে একটি পাথর ছিল। পাথরটি সম্পর্কে জনমনে নানা ধরনের কাহিনী বিস্তার লাভ করেছিল। এটি মূর্খ ও কল্পনাপূজারী মুসলমানদের জন্য একটি ফিত্‌নায় পরিণত হয়েছিল। মুসলমানেরা সেখানে যেত এবং মানত করত। ইবনে তায়মিয়া (র.) ৭০৪ হিজরীর রজব মাসে নিজেই শ্রমিক ও পাথর মিস্ত্রী সহকারে সেখানে যান এবং সেটি কেটে টুকরো করে শির্কের এই দরজাটি চিরতরে বন্ধ করে দেন। আর এভাবেই একটি বিরাট ফিত্‌না খতম হয়।[১]

---

১. আল-বিদয়া ওয়া'ন-নিহায়া, ১৪শ খণ্ড, ৩৪ পৃ.।

তিনি ইসলামী শারী'আত ও সুন্নাহর বিরুদ্ধে যে কাজই সংঘটিত হতে দেখতেন সাধ্যমত তা স্বহস্তেই বদলে দিতে ও বাধা দিতে চেষ্টা করতেন। কেননা এটি ছিল ঈমানের সর্বোচ্চ স্তর এবং ধর্মীয় মর্যাদাবোধের প্রাথমিক দাবী।

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فمن لم يستطع فبلسانه فمن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان -

তোমাদের ভেতর কেউ যদি শরীয়তবিরোধী (মুনকার=গর্হিত) কাজ সংঘটিত হতে দেখতে পাও তবে সে তার হাত দিয়ে তা বদলে দেবে, যদি সে সামর্থ্য না থাকে তবে মুখ দিয়ে তার বিরোধিতা করবে; আর তার সে সামর্থ্যও যদি না থাকে তবে অন্তর দিয়ে তা করবে; আর এটিই হচ্ছে দুর্বলতম ঈমান। [আল-হাদীস]

সালতানাতের তথা রাষ্ট্রীয় কর্মে অতিরিক্ত ব্যস্ততার জন্য শাসন ক্ষমতায় সমাসীন ব্যক্তিবর্গের ফুরসত ছিল না। 'উলামায়ে কিরাম কতক মুহূর্তে অনেক জিনিসকেই গুরুত্ব দিতেন না এবং কতক সময় অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করতে ও বিরোধিতায় অবতীর্ণ হতে ইতস্তত করতেন। আর এজন্যই অধিকাংশ সময় ইবনে তায়মিয়া (র)- কেই এ দায়িত্ব আন্‌জাম দিতে হত। আর এ দায়িত্ব সম্পাদনে তাঁর সহযোগী ও সহকর্মী ছিল তাঁরই ছাত্র ও প্রিয় ভক্ত-অনুরক্তদের একটি দল। এজন্য তিনি সম্মানসূচক حسبة الله। শর'ঈ, নৈতিক ও চারিত্রিক বিষয়ে তদারকীর জন্য এক ধরনের পুলিশ বিভাগ কায়েম করে রেখেছিলেন। ফলে বিদ'আতী ও সুন্নাহর বিরোধিতা, প্রশাসনিক দায়িত্বে নিয়োজিত লোকদের দৃষ্টি এড়াতে এবং 'উলামায়ে কিরামের ক্রোধ ও অসন্তোষ থেকে বাঁচতে যদি সক্ষমও হত, তবুও তারা এই শর'ঈ পুলিশের দৃষ্টি থেকে বেঁচে যেতে পারত না। ৭০৪ হিজরীর রজব মাসেরই ঘটনা। জনৈক বৃদ্ধ লোককে, যে নিজেকে আল-মুজাহিদ ইবরাহীম ইবনু'ল-কাত্তান বলে পরিচয় দিত, তাঁর নিকট নিয়ে আসা হয়। সে বিরাট লম্বা-চওড়া একটি গুডরী পরিহিত ছিল। তার মাথার চুল ও হাত-পায়ের নখ ছিল বড় বড়। গোঁফ এতটা বেড়েছিল যে, তা মুখের ওপর এসে পড়ছিল। সে খুব গালিগালাজ করত এবং খুব বেশী অশ্লীল কথা বলত। এছাড়া নেশাকর বস্তুও সে ব্যবহার করত। ইবনে তায়মিয়া (র) তাঁর গুডরী টুকরো টুকরো করে দেবার হুকুম দেন। হুকুম মিলতেই লোকে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তার গুডরী ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। লোকে তার মাথার চুল কেটে দেয় এবং গোঁফ ছেঁটে দেয়। তার নখ কাটা হয়। অশ্লীল কথাবার্তা বলা ও নেশাকর বস্তু থেকে তাকে তওবা করান হয়।[১]

১. আল-বিদায়া ওয়া'ন-নিহায়া, ৩৩ পৃ;

তেমনি একজন বর্ষীয়ান বিখ্যাত লোক ছিল মুহাম্মদ আল-খাব্বায আল-বিলাসী। সে হারাম বস্তু ব্যবহার করত। ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদের সঙ্গেই ছিল তার ওঠাবসা। সে স্বপ্নফল ব্যাখ্যা করত এবং এমন সব মসলার ব্যাপারে অনধিকার চর্চা করত, যে বিষয়ে তার কোন জ্ঞান ছিল না। ইবনে তায়মিয়া (র.) তাকে ডেকে পাঠান এবং তাকেও তার যাবতীয় অপকর্ম থেকে তওবা করান। ঐতিহাসিক ইবনে কাছীর বলেন যে, এসব ঘটনাও এক শ্রেণীর মানুষের অসন্তোষ সৃষ্টির কারণ হয়েছিল।

ধর্মদ্রোহী (মুলহিদ) ও ফিতনাবাজ লোকদের বিরুদ্ধে জিহাদ

অভ্যন্তরীণ সংস্কার ও সংশোধন ছাড়াও ইবনে তায়মিয়া (র) সে সমস্ত ফিতনাবাজ লোকের ব্যাপারেও উদাসীন ছিলেন না, যারা এ ধরনের প্রতিটি সংকট মুহূর্তে মুসলমানদেরকে বিপদে ফেলতে এবং ইসলামের শত্রুদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র লিপ্ত হতে এতটুকু কার্পণ্য করেনি। ৬৯৯ হিজরীতে যদিও তিনি নায়েবু'স-সালতানাত (সাম্রাজ্যর রিজেন্ট বা ভাইসরয়) আল-আফরামের সঙ্গে জর্দ ও কিসরাওয়ান গিয়ে সেখানকার অধার্মিক ও দুষ্ট প্রকৃতির গোত্রগুলোকে উপযুক্ত শিক্ষা দান ও কঠোরভাবে সতর্ক করেছিলেন এবং তাদের অনেকেই পূর্বকৃত অপকর্ম থেকে তওবা ও ভবিষ্যতে অনুরূপ অপকর্ম থেকে বিরত হবার এবং সাম্রাজ্যের আইন-কানূন ও মুসলিম শাসকদের প্রতি অনুগত থাকার ওয়াদা করেছিল; কিন্তু বিগত দিনের অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায় যে, তারা তাদের দুষ্টামী থেকে বিরত হয়নি এবং তাদের অধিকতর হুশিয়ারী প্রদান ও শায়েস্তা করা দরকার এবং যে কোন বিপজ্জনক মুহূর্তে তাদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবার সমূহ আশংকা বিদ্যমান। অনন্তর যিল-হজ্জ মাসের প্রথম ভাগে ইমাম ইবনে তায়মিয়া (রা) তদীয় শিষ্য-শাগরিদ ও বন্ধু-বান্ধবের একট বিরাট দল নিয়ে দ্বিতীয়বারের মত জর্দ ও কিসরাওয়ান অভিমুখে গমন করেন এবং তাদেরকে তাবলীগ করেন। তাদের একটি বড় অংশই তওবা করে এবং ইসলামের হুকুম-আহকামের প্রতি আনুগত্য অবলম্বন করে।

জর্দ এলাকার রাফেযী (বাতিনী, ইসমাঈলী, হাকিমী ও নুসায়রী) গোত্রগুলো খোলাখুলিভাবে মুসলমানদেরকে কষ্ট ও যন্ত্রণা দিয়েছিল। তারা ক্রুসেডার ও তাতারীদেরকে মুসলিম দেশগুলোর ওপর হামলা পরিচালনায় উস্কানি দিয়েছিল এবং এজন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করেছিল। মুসলমানদের অসহায়ত্ব ও দুর্বলতা থেকে ফায়দা উঠিয়ে তাদের জান-মাল ও 'ইযযত-আবরূর ওপর তারা হামলা চালিয়েছিল। ইবনে তায়মিয়া (র)-র মর্যাদা-দীপ্ত ও জেদী মনের ওপর এ ছিল এক বিরাট ক্ষত। তিনি এই সব প্রকৃতিগতভাবে দুষ্ট কিসিমের মুনাফিককে

ক্ষমা করতে পারছিলেন না যারা এমনতর কঠিন মুহূর্তে ও নাযুক সময়েও মুসলমানদের হেনস্থা করেছিল এবং তাদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছিল ও তাদের প্রতিপক্ষকে সাহায্য করেছিল। ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) তাদের কৃত পাপ ও বিশ্বাসভঙ্গের উপযুক্ত শাস্তি বিধান করতে মনস্থ করেন এবং সেই সঙ্গে চিরদিনের তরে এমনি এক ব্যবস্থা নিতে ইচ্ছা করেন যাতে ভবিষ্যতে কোন যুদ্ধ কিংবা বিপদ মুহূর্তে তারা আর মুসলমানদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে না পারে। তিনি সুলতান আন-নাসির (মিসর ও সিরিয়ার সুলতান)-এর দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করেন এবং তাদের দুষ্টামী ও বিপদের আশংকা সম্পর্কে সতর্ক করেন। একটি পত্রে তিনি সুলতানকে লেখেন ঃ

> তাতারীরা সিরিয়াভিমুখী হলে এসব বাতেনী (নুসায়রী ও ইসমাঈলী) মুসলিম ফৌজের সঙ্গে অত্যন্ত অসদাচরণ করে। এরাই সে সব বাতেনী যারা সাইপ্রাসের (খ্রিস্টান) অধিবাসীদেরকে বার্তা পাঠিয়েছিল, সিরীয় উপকূলের একটি অংশের ওপর তাদেরকে দখল দিয়েছিল এবং তাদের ক্রুসখচিত পতাকা নিজেরাই বহন করেছিল। তারা মুসলমানদের ঘোড়া, অস্ত্রশস্ত্র ও এত বেশী সংখ্যক কয়েদী সাইপ্রাসে পাঠিয়েছিল, যার প্রকৃত সংখ্যা ও পরিমাণ সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহই ভাল জানেন। বিশ দিন পর্যন্ত মেলা বসেছিল যেখানে মুসলিম বন্দী, ঘোড়া ও অশত্রশস্ত্র সাইপ্রাসবাসীদের হাতে (যারা ছিল ক্রুসেডার ও মুসলমানদের প্রতিপক্ষ) বিক্রি হতে থাকে। তাতারীদের আগমনে তারা ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালায়। তাতারীদের মুকাবিলার উদ্দেশে মুসলিম ফৌজ যখন মিসর থেকে যাত্রা করে তখন তাদের চেহারা ফিকে ও বিমর্ষ হয়ে যায়। অতঃপর আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা সুলতানের আগমনের মাঝ দিয়ে মুসলমানদেরকে যখন মহাবিজয় দানে ধন্য করলেন তখন তাদের ভেতর মাতম শুরু হয়। এই নয়, এর চেয়েও অধিক গুরুতর বিষয় তাদের ওখানে সংঘটিত হয়েছে। চেঙ্গীয খানকে মুসলিম দেশগুলোর ওপর হামলা চালাতে এরাই আহ্বান জানিয়েছিল। হালাকূ খানের বাগদাদ অধিকার, আলেপ্পোর বরবাদী ও সালেহিয়ার ধ্বংসযজ্ঞের পেছনেও ছিল এরাই। এ ছাড়া তাদের ইসলামের সঙ্গে শত্রুতা ও মুসলিম হত্যার আরও অনেক ঘটনাই রয়েছে।
>
> তাদের প্রতিবেশে যে সব মুসলমান বসবাস করে, তারা অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত। প্রতি রাতেই তারা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে পাহাড় থেকে নেমে আসে এবং গোলযোগ সৃষ্টি করে, যে সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহ্ই ভাল জানেন। এরা ডাকাতি ও লুটতরাজ করে। শান্তিপ্রিয় অভিজাত পরিবারগুলোকে পেরেশান ও বিব্রত করে এবং নানাবিধ পাপাচার সংঘটন করে থাকে। সাইপ্রাসের

খ্রিস্টানেরা তাদের এলাকায় এলে তারা তাদের মেযবানী করে এবং মুসলমানদের হাতিয়ার তাদেরকে সোপর্দ করে। সৎ ও নেককার মুসলমানের সাক্ষাৎ পেলে তারা হয় তাকে হত্যা করে, নইলে তার সর্বস্ব ছিনিয়ে নেয়। খুব কম মুসলমানই তাদের হাত থেকে বাঁচতে পেরেছে।[১]

৭০৫ হিজরীর ২রা মুহাররাম তারিখে তিনি এক অভিযানের সঙ্গে ঐ সব ফেতনাবাজ মুলহিদদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবার জন্য রওয়ানা হন। তাঁর পেছনে নায়েবু'স-সালতানাত (Regent) একটি বাহিনীসহ দামিশকে থেকে বের হয় ও জর্দ-এর এলাকা, তায়ামিনা ও রাফেযীদের পাহাড়ের ওপর চড়াও হয়। বিদ্রোহী গোত্রগুলোকে সমুচিত শিক্ষা দেওয়া হয় এবং সেখানকার গোটা এলাকা, যা খুবই দুর্গম ও সুরক্ষিত ছিল, মুক্ত করা হয়। ইবনে তায়মিয়া (র) ফতওয়া প্রদান করেন, বনূ নযীরের মত তাদের বাগানের গাছপালা কেটে ফেলা যথার্থ হবে। কেননা এসব বাগানকে তারা তাদের শত্রুর মুকাবিলায় গোপন ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করে এবং এগুলোই তাদের ফৌজী আড্ডা ও যাবতীয় ষড়যন্ত্রের আখড়া। ঐতিহাসিক ইবনে কাছীর লিখেন, শায়খুল ইসলাম-এর উপস্থিতি ও অংশ গ্রহণের ফলে বিরাট লাভ হয় এবং এই সুযোগে তাঁর জ্ঞান ও বীরত্বের ব্যাপক প্রকাশ ঘটে। এরই সঙ্গে তাঁর শত্রুদের অন্তর-মন হিংসায় ও দুঃখের আগুনে জ্বলে পুড়ে ছাই হতে থাকে।[২]

রিফাঈদের সঙ্গে বিতর্ক

৯ই জুমাদা'ল-উলা, ৭০৫ হিজরী রিফাঈ ফকীরদের একটি বিরাট দল নায়েবু'স-সালতানাত-এর নিকট গমন করে। ইবনে তায়মিয়া (র)-ও সেখানে তশরীফ নেন। রিফাঈদের দাবী ছিল, ইবনে তায়মিয়াকে তাদের ওপর তাঁর হুকুম-আহকাম জারী করা থেকে বিরত রাখা হোক এবং তাদেরকে তাদের নিজ অবস্থার ওপর ছেড়ে দেওয়া হোক (অর্থাৎ তাদেরকে তাদের মর্জি মাফিক চলতে দেওয়া হোক)। ইবনে তায়মিয়া (র) এর উত্তরে বলেন, এমনটি সম্ভব নয়। প্রত্যেককেই কুরআন ও সুন্নাহ্র অধীনে থাকতে হবে। কুরআন ও সুন্নাহ্ নির্দেশিত সীমারেখার বাইরে যেই পা ফেলবে, অমনি তাকে প্রত্যাখ্যান ও উক্ত পদক্ষেপের বিরোধিতা করা আমাদের পক্ষে অপরিহার্য হয়ে পড়বে। রিফা'ঈগণ এই সুযোগে তাদের সত্যানুসারিতা ও জনপ্রিয়তা প্রমাণ করবার জন নিজেদের কিছু কর্মনৈপুণ্য ও ভেল্কিবাজি প্রদর্শন করতে চায়। (হকপন্থী হবার অনুকূলে) তাদের দাবী ছিল, আগুন আমাদের ওপর কোনরূপ ক্রিয়া দর্শে না। আগুনের

১. ইবনে তায়মিয়া, মুহাম্মদ আবূ যুহরাকৃত, ৪৫ পৃ.।

২. আল-বিদায়া, ১৪খ. ৫৪ পৃ.।

মাঝে লাফিয়ে পড়ে আমরা তা দেখিয়ে থাকি। আমরা যদি সুস্থ শরীরে ও নিরাপদে আগুন থেকে বেরিয়ে আসতে পারি তাহলে মেনে নিতে হবে যে, আমরা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হকপন্থী এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সাহায্য ও সমর্থনপুষ্ট। ইবনে তায়মিয়া (র) বললেন, এতো শয়তানী ছাড়া আর কিছুই নয়; কিছুতেই সে সব বিশ্বাস করা চলে না এবং তার ওপর নির্ভরও করা যায় না। এ তো স্রেফ প্রতারণাপূর্ণ কলাকৌশল মাত্র। কেননা যে লোক আগুনে লাফিয়ে পড়বে প্রথমে তাকে হাম্মামে নিয়ে গোসল করাতে হবে, তার শরীর সিরকা ও ঘাস দিয়ে ভাল করে ঘসে মেজে ধুতে হবে; তারপর সে আগুনে প্রবেশ করবে এবং তার ক্রীড়া-নৈপুণ্য প্রদর্শন করবে। আর যদি ধরেও নেওয়া হয়, কোন লোক গোসলের পর আগুন প্রবেশ করছে আর সে যদি বিদ'আতী দলের কেউ হয় তবে সে ক্ষেত্রেও তার ওপর নির্ভর করা যাবে না, তাকে বিশ্বাস করা চলবে না, বরং তাকে দাজ্জাল মনে করতে হবে। এমনি মুহূর্তে একজন রিফা'ঈ সুফী (শায়খ সালিহ)-এর মুখ দিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে যায় যে, এই ভেল্কিবাজি তাতারীদের কাছে চলতে পারে, শরীয়তের মুকাবিলায় চলে না। সকলেই একথা ধরে বসে এবং একেই দলীল বানিয়ে নেয়। শেষাবধি এই ফয়সালা হয়, তারা লোহার শেকল গর্দান থেকে নামিয়ে ফেলবে। আর যে কুরআন ও সুন্নাহর বিরোধিতা করবে তার গর্দান উড়িয়ে দেওয়া হবে। ইবনে তায়মিয়া (র) অতঃপর এ বিষয়ে একটি পুস্তিকা প্রণয়ন করেন, যার ভেতর রিফা'ঈ তরীকার ওপর বিস্তারিতভাবে আলোকতপাত করেন এবং উক্ত তরীকার অবস্থা (হালত), পথ ও মত (মাসলাক) ও ধ্যান-ধারণাকে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র সঙ্গে তুলাদণ্ডে ওজন করে দেখিয়ে দেন।[১]

৮ই রজব নায়েবু'স-সালাতানাতের উপস্থিতিতে 'উলামায়ে কিরামের একটি মজলিস অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এতে ইবনে তায়মিয়া (র)-র 'আকীদা-ই ওয়াসিতিয়া' নামক পুস্তিকার ওপর আলোচনা চলে। 'উলামায়ে কিরাম তাঁকে নানা রকম প্রশ্নোত্তর করেন। এর ফলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তাঁর 'আকীদা আহলে সুন্নত ওয়া'ল-জামা'আতের 'আকীদা মাফিক। অতঃপর অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধাসহকারে তাঁকে তাঁর বাড়ী পৌছে দেওয়া হয়। জনসাধারণের এক বিরাট অংশ মশাল হাতে তাঁকে অনুগমন করেছিল যা ছিল যে যুগে কাউকে সম্মান ও শ্রদ্ধা জানাবার একটি পন্থা।[২]

---

১. আল-বিদায়া ওয়া'ন-নিহায়া, ১৪শ খণ্ড, ৩৬ পৃষ্ঠা।

২. আল-বিদায়া ওয়া'ন-নিহায়া, ১৪শ খণ্ড, ৩৬-৩৭ পৃষ্ঠা।

ইবনে তায়মিয়া (র.)-র বিরোধিতা ও মিসরে তলব

দামিশকের বুকে ইবনে তায়মিয়া (র)-র এক ধরনের ধর্মীয় নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব কায়েম হয়ে গিয়েছিল। যদি তিনি দেখতে পেতেন, হুকুমত কোন বিদ'আত কিংবা অন্যায় ও গর্হিত কর্ম প্রতিরোধের ক্ষেত্রে অলসতা করছে অথবা 'ধরি মাছ না ছুই পানি'র ভাব দেখাচ্ছে এবং 'উলামায়ে কিরামও নিশ্চুপ বসে আছেন অমনি তিনি আইন নিজ হাতে উঠিয়ে নিতেন এবং স্বয়ং শর'ঈ আহকাম ও বিধান জারী করতেন। এ ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁর একদল ভক্ত ছাত্র এবং দীনদার ও বিশুদ্ধ 'আকীদাসম্পন্ন বিরাট একদল জনতা আর প্রতিদিনই তাঁর প্রভাব বলয় বাড়ছিল। তাঁর এই ধর্মীয় উত্থান ও ব্যক্তিগত প্রভাব বৃদ্ধি 'আলিমদের একটি দল পসন্দ করতে পারেনি। এর ভেতর তারা তাঁর আত্মম্ভরিতা (خوسری) দেখতে পায়। ফলে একদল হিংসুটে ও ঈর্ষাকাতর লোকের সৃষ্টি হয়, যারা ইবনে তায়মিয়া (র)-র পতন ও অবমাননাকর অপমান দেখতে অভিলাষী ছিল। ঐতিহাসিক ইবনে কাছীর লিখেন ঃ

وكان للشيخ تقى الدين من الفقهاء جماعة يحسدونه لتقدمه عند الدولة وانفراد ه بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر- وطاعة الناس له ومحبتهم له وكثرة اتباعه وقيامه فى الحق وعلمه وعمله -

> শায়খ তকীয়্যুদ্দীন (ইবনে তায়মিয়া)-র প্রতি ঈর্ষাকাতর লোকদের ভেতর একদল 'আলিম ও ফকীহও ছিলেন, যাঁরা রাজদরবারে তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি, সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধের ক্ষেত্রে একাকীই দায়িত্ব পালন, তাঁর প্রতি জনগণের আনুগত্য ও ভালবাসা, তাঁর অনুসারী ও ভক্তবৃন্দের বর্ধিত সংখ্যা, তাঁর ধর্মীয় জোশ, অটুট মনোবল, ইচ্ছাশক্তি ও তাঁর 'ইল্‌ম ও 'আমল দৃষ্টেই তাঁকে হিংসা করত।[১]

ওয়াহদাতু'ল-ওজুদের 'আকীদা প্রত্যাখ্যান

এদিকে এমন কিছু ঘটনা সংঘটিত হয় যদ্দরুন 'আকাইদ সম্পর্কিত বাহাছ পুনরায় ছড়িয়ে পড়ে এবং এ সম্পর্কে আলোচনা-সমালোচনার বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে থাকে।[২] এর থেকেও বড় ব্যাপার ছিল এই যে, তিনি শায়খ মুহ্‌য়ি উদ্দীন

---

১. আল-বিদায়া ওয়া'ন-নিহায়া, ১৪শ খণ্ড, ৩৭ পৃষ্ঠা।

২. একটি বৈঠক ৮ই রজব তারিখে নায়েবু'স-সালতানাতের দরবারে অনুষ্ঠিত হয়। শায়খ-এর উপস্থিতিতে 'আকীদা-ই-ওয়াসিতিয়া' পাঠ করা হয় এবং এর ওপর আলোচনা হয়। এরপর দু'টি

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

ইবনে 'আরাবী (র)-র ওয়াহ্‌দায়তু'ল-ওজুদ মতবাদকে খোলাখুলিভাবে প্রত্যাখ্যান করতেন। মিসর ও সিরিয়ায় তাঁর (ইবনে 'আরাবীর) বিরাট একদল ভক্ত ও সমর্থক ছিল। অধিকন্তু 'উলামা ও মাশায়িখ-ই-কিরামের একটি বিরাট দল তাঁকে একজন অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদার 'আরিফ, মুহাক্কিক 'আলিম, তওহীদের ইমাম ও একজন মহান বুযুর্গ হিসাবে মানতেন। ইবনে তায়মিয়া (র)-র ধারণা ছিল, তাঁর অনুসন্ধান, গবেষণা ও তাঁর ইলহাম (ঐশী প্রেরণা)-সমূহ আম্বিয়া 'আলায়হিমু'স-সালাম -এর আনীত শিক্ষা ও তওহীদের সে সব শিক্ষার বিলকুল পরিপন্থী যে শিক্ষা প্রত্যেক নবী তাঁর যুগে প্রদান করেছিলেন, হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁর শেষ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও পূর্ণতা দান করেছেন, যে শিক্ষা কুরআন ও হাদীস থেকে পরিষ্কার বোধগম্য হয় এবং যা শব্দ ও অর্থগতভাবে সূত্র-পরম্পরায় আমাদের পর্যন্ত এসে পৌছেছে। শায়খ মুহয়িউদ্দীন 'আরাবী ৬৩৮ হিজরীতে (ইবনে তায়মিয়ার জন্মের ২৩ বছর পূর্বে) ইনতিকাল করেছিলেন। তাঁর কিতাব, বিশেষত 'ফুতূহাতে মাক্কিয়্যা' ও 'ফুসূসু'ল-হিকাম' সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল এবং শিক্ষিত মহলে শ্রদ্ধার চোখে দেখা হত। ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) দর্শন, তাসাওউফ ও অধ্যাত্মবাদ খুবই সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে ও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অধ্যয়ন করেছিলেন এবং এই সূত্রে 'ফুতূহাত' ও 'ফুসূস'ও পড়েছিলেন। তিনি স্বীয় গ্রন্থের নানা জায়গায় উক্ত দু'টি কিতাবের উদ্ধৃতি পেশ করেছেন এবং সে সব প্রত্যাখ্যান করেছেন। এ থেকে বোঝা যায়, তাঁর অধ্যয়ন সরাসরি ছিল। তিনি ঐ সব গ্রন্থ অধ্যয়ন থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ঐ সব গ্রন্থের পেশকৃত শিক্ষা ও নবূওতের মাধ্যমে প্রাপ্ত শিক্ষার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের কোন রাস্তা খোলা নেই। তিনি শায়খ ইবনে 'আরাবীর মতবাদের বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন ঃ

> ইবনে 'আরাবী ও তাঁর অনুসারীদের মত হল এই, অস্তিত্ব বা সত্তা (ওজূদ) একই। তাঁরা বলেন, মাখলূকের (সৃষ্ট বস্তুর) অস্তিত্বই স্রষ্টার অস্তিত্ব। তাঁরা ভিন্ন দু'টি অস্তিত্বের কথা স্বীকার করেন না যার ভেতর একে অপরের স্রষ্টা, বরং তাঁরা বলেন, স্রষ্টাই মাখলূক তথা সৃষ্ট বস্তু এবং সৃষ্ট বস্তুই স্রষ্টা।[১] সত্তা ও অস্তিত্বের মাঝে 'প্রভু' ও 'দাসে'র কোন পার্থক্য নেই। সেখানে না কেউ

(পূর্ব পৃষ্ঠার পর) বৈঠকে শায়খ সফীউদ্দীন আল-হিন্দী ও আল্লামা কামালুদ্দীন ইবনু'য-যামালকানীর সঙ্গে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এসব আলোচনায় প্রমাণিত হয়, এই 'আকীদা আহলে সুন্নত ওয়া'ল-জামা'আতের বিরোধী নয়। অতঃপর শায়খ (র) অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। জনসাধারণ মশাল হাতে তাঁকে অনুগমন করেছিল (ইবনে কাছীর, ১৪শ খণ্ড, ৩৬-৩৭ পৃষ্ঠা;)।

১. আর-রাদ্দু'ল-আকওয়াম 'আলা মা ফী ফুসুসি'ল-হিকাম, ১১পৃ.।

স্রষ্টা, না কেউ মাখলূক; না কেউ আহ্বানকারী (দা'ঈ), আর না কেউ আহ্বানে সাড়া প্রদানকারী (মুজীব)। সত্তা যখন চক্ষুগুলোর ওপর উদ্ভাসিত হলেন এবং তিনি যখন তার ভেতর প্রকাশিত হলেন তখন চোখের দিক থেকে তার ভেতর রঙ-বেরঙের ও নানারূপ পার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে, ঠিক যেমন আলোক-রশ্মি বিভিন্ন রঙের সীসা ও কাচের ভেতর দিয়ে বিভিন্ন রঙে প্রতিবিম্বিত হয়।[১] এরই ভিত্তিতে তারা বলে, গো-বৎস পূজার (যা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র পূজা ছিল। আর তা এজন্য যে, বিরাজমান তো একই) কেন বিরোধিতা করেছিলেন? তাদের মতে, মূসা 'আলায়হি'স-সালাম সেই সব 'আরিফীনের একজন ছিলেন যাঁরা প্রতিটি বস্তুর মাঝেই সত্য প্রত্যক্ষ করে থাকেন এবং তাকে প্রতিটি বস্তুর হুবহু প্রতিচ্ছবি মনে করেন। তাদের মতে, ফির'আওন তার দাবী انا ربكم ۱ لاعلی "আমিই তোমাদের সর্বোচ্চ রব"-এর ক্ষেত্রে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, বরং সেটাই সত্য ছিল।[২]

'ফুসূসু'ল-হিকাম' গ্রন্থকারের মতে, ফির'আওন যেহেতু (সৃষ্টিগত দিক থেকে) রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং তিনি যুগ-মানব ছিলেন, সেহেতু তিনি انا ربکم ۱ لاعلی যথার্থই বলেছেন। আর তা এ জন্য যে, যখন সকলেই কোন না কোন অর্থে 'রব' তখন আমি তাদের ভেতর সর্বোচ্চ। কেননা আমাকে প্রকাশ্যে তোমাদের শাসন ক্ষমতা পরিচালনার ও ফয়সালা করবার এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, যাদুকররা যখন ফিরআওনের সত্যতা সম্পর্কে জানতে পারল তখন তারা তার বিরোধিতা করেনি, বরং তার স্বীকৃতি দিয়েছে এবং বলেছে ঃ

اقض ماانت قاض انما تقضى هذه الحيوة الدنيا ـ

তোমার যা ফয়সালা করবার কর; তুমি তো কেবল এই পার্থিব জীবনের কর্তৃত্ব ফলাতে পার।

এজন্যই ফির'আওনের এই কথা বলা যথার্থই ছিল, انا ربكم الاعلى (আমিই তোমাদের সর্বোচ্চ প্রভু) যদিও ফির'আওন যথার্থই সত্যের ওপর ছিল।[৩]

ইবনে 'আরাবী হযরত নূহ 'আলায়হি'স-সালামকে সমালোচনার লক্ষ্যে পরিণত করেন আর তাঁর কাফির জাতিগোষ্ঠীকে সম্মান জানান এবং তাদের যথার্থতার সার্টিফিকেট প্রদান করেন যারা পাথর পূজা করেছে। তিনি বলেন, ওরা

---

১. আর-রাদ্দু'ল আকওয়াম, ১০২ পৃষ্ঠা।

২. এ সব উক্তিকে তিনি 'ফুসূসু'ল-হিকাম' প্রণেতার দিকে সম্পর্কিত করেছেন।

৩. الفرقان بين الحق والباطل ১৪৭ পৃষ্ঠা।

(মূর্তিপূজকরা) প্রকৃত অর্থে আল্লাহ্‌রই 'ইবাদত করেছিল আর এই তুফান ছিল প্রকৃতপক্ষে মা'রিফত-ই-ইলাহীর প্রচণ্ড উত্তাল এবং সেই সমুদ্রের প্রবল উচ্ছ্বাস যার ভেতর তারা নিমজ্জিত হয়।[১]

মনে হচ্ছে, ইবনে তায়মিয়া (র)-র যুগে "ওয়াহদাতু'ল-ওজূদ"-এর 'আকীদার ভেতর চরম বাড়াবাড়ি সৃষ্টি হয়েছিল এবং লোকে এই পর্যায়ে শরীয়ত, বুদ্ধি-জ্ঞান ও নৈতিকতার সকল সীমারেখা অতিক্রম করে গিয়েছিল এবং অস্থির প্রায় অবস্থা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। ইবনে তায়মিয়া (র) লেখেন ঃ

> এই সিলসিলায় একদল ('ইল্‌মে কালাম, দর্শন ও তাসাওউফ সম্পর্কে যারা ওয়াকিফহাল ছিলেন) সবচেয়ে বেশী বিভ্রান্ত হয়। তাদের ভেতর ইবনে সাব'ঈন, সদরুদ্দীন কওনবী (ইবনে 'আরাবীর ছাত্র), বিল্‌য়ানী ও তিলিমসানী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এদের ভেতর তিলিসমানী এ বিষয় সম্পর্কিত জ্ঞান ও পরিচয়ে অগ্রগামী ছিলেন। তিনি ওয়াহদাতু'ল-ওজূদ মতবাদে কেবল বিশ্বাসীই ছিলেন না, বরং এর ওপর 'আমলও করতেন। অনন্তর তিনি মদ পান করতেন এবং নিষিদ্ধ ও অবৈধ কর্মে লিপ্ত হতেন (বিরাজমান অস্তিত্ব ও সত্তা যখন এক, তখন আর হালাল-হারামের পার্থক্য কেন?)।
>
> আমাকে একজন বিশ্বস্ত লোক জানিয়েছেন, তিনি তিলিমসানীর নিকট 'ফুসূসু'ল-হিকাম'-এর পাঠ গ্রহণ করতেন এবং একে তিনি আল্লাহ্‌র ওলী ও 'আরিফগণের বাণী (কালাম) বলে মনে করতেন। যখন তিনি 'ফুসূস' পড়েন এবং দেখতে পান, এর বিষয়বস্তু কুরআন শরীফের প্রকাশ্য ও সুস্পষ্ট বিরোধী তখন তিনি তিলিমসানীকে জিজ্ঞেস করেন, এই কালাম তো কুরআন মজীদের বিরোধী। এর জওয়াবে তিনি বলেন, গোটা কুরআনই তো শির্‌ক-এ পরিপূর্ণ। কেননা তা 'রব' ও বান্দার মাঝে ফরক করে। তওহীদ তো আমাদের কালামে রয়েছে। তার এও উক্তি রয়েছে, কাশ্‌ফ-এর মাধ্যমে সেসব প্রমাণিত হয় যা সুস্পষ্ট জ্ঞান-বুদ্ধিবহির্ভূত ও এর বিরোধী।[২]

---

১. এখানে একথা উল্লেখ করা জরুরী মনে হচ্ছে, শায়খ-ই-আকবর-এর কিতাবাদি ও তৎসম্পর্কিত 'ইল্‌ম সম্পর্কে যারা গভীর আগ্রহ পোষণ করেন তাদের একটি দল মনে করেন, শায়খ (ইব্‌নে 'আরাবী)-এর কিতাব, বিশেষত ফুসূসুল'ল-হিকাম-এ ব্যাপকভাবে মিশ্রণ ও সংযোজন ঘটানো হয়েছে। শায়খ-এর ভক্ত ও তাঁর জ্ঞানের ধারক ও বাহক দামিশ্‌কের শায়খ আহমদ আল-হারূন আল-আসাল দৃঢ়তা সহকারে বলতেন, ফুসূস-এর ১/৩ অংশই ভেজাল ও ভিত্তিহীন।

২. আল-ফুরকানু বায়না'ল হাক্ক ওয়া'ল-বাতিল, ১৪৫ পৃষ্ঠা।

তিলিমসানী ও তার সমচিন্তায় বিশ্বাসী এক সাথী আমাকে স্বয়ং শুনিয়েছেন, আমাদের একবার একটা মৃত কুকুরের পাশে দিয়ে যেতে হয়েছিল। কুকুরের গায়ে ছিল বিশ্রী ঘা। তিলিমসানীর বন্ধু বলল ঃ এও কি খোদাওয়ান্দ তা'আলার সত্তা (যাত)? তিনি এভাবে তার জওয়াব দেনঃ কোন বস্তুই কি তাঁর সত্তা-বহির্ভূত? হ্যাঁ, সব কিছুই তাঁর সত্তার ভেতর আছে।[১]

কতক লোক বলেছিল, অস্তিত্ব ও বিদ্যমান সত্তা যখন এক, তখন স্ত্রী কেন হালাল আর মা কেন হারাম? সেই পণ্ডিত জওয়াব দেন ঃ আমাদের কাছে সবই এক, কিন্তু ঐসব অবগুণ্ঠনধারী (যারা তওহীদে হাকীকী সম্পর্কে অজ্ঞ) বলল, মা হারাম। আমরাও বললাম, হ্যাঁ, তোমাদের ওপর হারাম।[২]

শায়খুল ইসলাম ৭০৪ হিজরীতে শায়খ আবুল ফাত্‌হ নস্‌র আল-মুনজীকে একটি বিস্তৃত চিঠি লেখেন। এতে তিনি প্রকাশ করেন, "তিনি ওয়াহদাতু'ল-ওজূদ মতবাদের সমর্থকদের সৃষ্ট অনিষ্ট আল্লাহ্‌র রাহের পথিক (সালিক)- দের থেকে প্রতিরোধ করাকে প্রায় এতটাই জরুরী মনে করেন যতটা জরুরী মনে করেন তাতারীদের মুকাবিলা ও উৎসাদন করাকে। শায়খ (র) বেশ ভালভাবেই অবগত আছেন, আম্বিয়া 'আলায়হিমু'স-সালামের দাওয়াতের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, বরং বলা চলে, গোটা সৃষ্টি, কিতাব নাযিল ও রসূলদের প্রেরণের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যই হ'ল এটা; দাওয়াত ও আনুগত্য হবে একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যই يكون الدين كله لله। তাঁর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য গোটা সৃষ্টি জগতকে তার স্রষ্টার দিকে আহ্‌বান জানানো। ঐ সব ঐক্য ও মিলনবাদীরা (اتحادى) আল্লাহ্‌র পথের পথিকদের জন্য এই তওহীদকে যে তওহীদ সহকারে আল্লাহ্ পাক স্বীয় সহীফাসমূহ অবতরণ করেছেন এবং তাঁর নবীদেরকে দুনিয়ার বুকে পাঠিয়েছেন সেই ঐক্যের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছেন যার নাম রেখেছে তারা তওহীদ ও এর প্রকৃত কারিগর (حقيقت صالح) - কে অকেজো ও বেকার অভিহিত করা এবং মহাস্রষ্টা (আল্লাহ্ রাব্বু'ল'-আলামীন)কে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনেরই নামান্তর। আমি প্রথম দিকে শায়খ ইবনে 'আরাবী সম্পর্কে ভাল ধারণা পোষণ করতাম এবং আমার দৃষ্টিতে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তাঁর 'ফুতূহাত-ই-মাক্কিয়্যাঃ', 'কুনহা'ল-মুহকাম', 'আল-মারবূত', 'আদ-দুররাতু'ল-ফাখিরা', 'মাতালি'উ'ন-নুজূম' ইত্যাদি গ্রন্থের জ্ঞানগত উপকারিতা ও সূক্ষাতিসূক্ষ্ম বিষয়ক আলোচনা

১. প্রাগুক্ত।

২. আর-রাদ্দু'ল-আকওয়াম, ৪২ পৃষ্ঠা।

প্রাপ্তিই এর কারণ। কিন্তু তখনো পর্যন্ত আমি তাঁর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের যথার্থতা সম্পর্কে জ্ঞান ও 'ফুসূসু'ল-হিকাম' প্রভৃতি গ্রন্থ অধ্যয়নের সুযোগ পাই নি। আমরা তখন আমাদের দীনী ভাইদের সঙ্গে পারস্পরিক আলোচনা ও সত্যান্বেষণের মাঝে মগ্ন ছিলাম এবং আমি তাঁর অনুসরণ করতাম ও প্রকৃত পথের সন্ধান জানতে চাইতাম। যখন প্রকৃত সত্য উদ্ভাসিত হল তখন এই ধারায় আমাদের অপরিহার্য দায়িত্ব, কর্তব্য ও আমাদের করণীয় সম্পর্কে জানা হয়ে গেল। ইতোমধ্যে প্রাচ্য থেকে কয়েকজন বিশ্বস্ত বুযুর্গের আগমন ঘটে। তাঁরা ইসলামী তরীকা, ইসলাম ধর্মের হাকীকত ও ঐ সমস্ত লোকের (ইবনে 'আরাবী, সদর রূমী, তিলিমসানী, ইবনে সাব'ঈন) অবস্থার হাকীকত জানতে চাইলে আমি তাদের সম্পর্কে অপরিহার্য বিষয়াবলী জানতে সক্ষম হই। ঠিক তেমনিভাবে সিরিয়ার পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে কিছু একনিষ্ঠ, ন্যায়নিষ্ঠ ও সত্যান্বেষী আল্লাহ্‌র পথের পথিককে অনুরোধ করে পাঠাই যেন ওয়াহদাতু'ল-ওজূদ মতবাদের সমর্থকদের বাণীর মোটামুটি বক্তব্য, তাদের দাবী সংক্ষিপ্তাকারে গুছিয়ে লেখা হয়। জনাবে ওয়ালা স্বীয় আত্মার আলোক-রশ্মি, প্রকৃতিগত মেধা, নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও কল্যাণ চিন্তার সাহায্যে যা তিনি ইসলাম, মুসলিম ও তরীকতের ভাইদের প্রতি পোষণ করেন, এক্ষেত্রে এমন কোন পদক্ষেপ যেন গ্রহণ করেন যদ্দারা আল্লাহ্‌র রেযামন্দী, দুনিয়া ও আখিরাতে তাঁর মাগফিরাতের সুদৃঢ় আশা করা চলে।"

অতঃপর তিনি বেশ বিস্তারিতভাবে সে সমস্ত 'আকীদা তথা ধর্ম-বিশ্বাস, দৃষ্টিভঙ্গি, পথ ও মতের পর্যালোচনা করেছেন যা "ইত্তিহা'দ"।[১] ও "হু'লূল"[২] সম্পর্কে খৃস্টানদের বিভিন্ন দল-উপদল (যেমন য়া'কূবিয়া, নস্তরিয়া, মালকানিয়া প্রভৃতি) তথাকথিত মুসলিম ফের্কাগুলোর (যেমন রাফিযী ও জাহমিয়াদের নাম উল্লেখ করা যায়) ভেতর প্রচলিত ছিল। অধিকন্তু তিনি 'ইত্তিহাদে মু'আয়্যিন'[৩], 'ইত্তিহাদে মুতলাক'[৪], "হুলূল-ই-মু'আয়্যিন'[৫] ও 'হুলূল-ই-মুতলাক'[৬]-এর বিস্তৃত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন এবং যেসব লোক এসব আকীদা ও দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন তাদের সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এই আলোচনা থেকে তাঁর দৃষ্টির প্রসারতা, পূর্ববর্তী ধর্মসমূহ ও পথ-মত সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানের গভীরতা পরিমাপ করা যায়। অতঃপর শায়খ ইবনু'ল-'আরাবীর মতবাদ ও পর্যালোচনা অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে ও সতর্কতার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন [যার থেকে পরিমাপ করা যায়, তিনি 'ফুতূহাতে মাক্কিয়্যা' ও 'ফুসূসু'ল-হিকাম' খুবই সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে অধ্যয়ন করেছিলেন

১-৬. এতদ্‌সম্পর্কিত ব্যাখ্যা পুস্তকের শেষাংশে "পরিশিষ্টে" দেওয়া হয়েছে। সেখানে দেখা যেতে পারে। —অনুবাদক।

এবং সে সবের বক্তব্যের সার-নির্যাস তাঁর আয়ত্তে এসে গিয়েছিল যদ্দারা সে সবের পেশকৃত বিভিন্নমুখী জ্ঞান ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্বসমূহ (হাকাইক) অনুধাবন করা তাঁর জন্য সহজ হয়ে গিয়েছিল]। এক্ষেত্রে তাঁর ও ওয়াহদাতু'ল-ওজূদ মতবাদের অপরাপর প্রবক্তাদের পার্থক্য ও ইবনে 'আরাবীর কথিত বক্তব্যের হাকীকত তথা সারবত্তা উপলব্ধিতে ধরা পড়ে। এরই সঙ্গে তিনি এর ফলাফল, পরিণতি ও অনিবার্য অনিষ্টকারিতা বর্ণনা করেন, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের প্রতি সম্পূর্ণ নিরাসক্ত ও নির্লিপ্ত থেকে সে সবের প্রতি সন্দেহ ও আশংকা ব্যক্ত করবার পূর্ণ অধিকার প্রদান করেন এবং তার অপরাপর মিত্র (ইত্তিহাদী)- দের ভেতর পার্থক্য রেখা নিরূপণ করেন। উক্ত পত্রেই এক স্থানে তিনি লিখেছেন ঃ

لكن ابن عربى اقربهم الى الاسلام واحسن كلاما فى مواضع كثيرة فانه يفرق بين المظاهر والظاهر فيقر الامر والنهى والشرائع على ما هى عليه ويامر بالسلوك بكثير مما امر به المشائخ من الاخلاق والعبادات ولهذا كثير من العباد ياخذون من كلامه سلوكهم ينتفعون بذالك وان كانوا لايفقهون حقائقه ومن فهمها منهم وافقه فقد تبين قوله ـ

ওঁদের ভেতর ইবনে আরাবী ইসলামের কাছাকাছি অবস্থান করেন এবং তাঁর কথিত উক্তি অনেক জায়গায় তুলনামূলকভাবে ভাল। কেননা তিনি প্রকাশমান বস্তুসমূহ (মাজাহির) ও প্রতীয়মান তথা প্রকাশিতের (জাহির) মধ্যে পার্থক্য করেন, শর'ঈ আদেশ-নিষেধ এবং ধর্মীয় বিধি-বিধান ও হুকুম-আহকামকে যথাস্থানে রাখেন, মাশাইখে কিরাম যে সমস্ত নীতি-নৈতিকতা, 'আমল-আখলাক ও 'ইবাদত-বন্দেগীর প্রতি তাকীদ প্রদান করেছেন সে সব অবলম্বনের জন্য পরামর্শ দেন। এজন্য বহু 'আবেদ ও সূফী তাঁর কথিত উক্তি (কালাম) থেকে আধ্যাত্মিক পথ (সলূক) গ্রহণ করে থাকেন যদিও তাঁরা সে সবের হাকীকত ভাল রকম বোঝেন না। তাঁদের ভেতর যাঁরা সে সব হাকীকত বোঝেন, সে সবের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন ও সমর্থন করেন তার নিকট তাঁর (ইবনে 'আরাবীর) কালামের হাকীকত দিবালোকের ন্যায় উদ্ভাসিত হয়ে যায়।[১]

---

১. শায়খ নসর আল-মুনজীর নামে শায়খুল ইসলামের পত্র جلاء العينين দ্র.।

অপর এক স্থানে লিখছেন ঃ

وهذ ه المعانى كلها هى قول صاحب الفصوص والله تعالى اعلم بما مات الرجل عليه والله يغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياءمنهم والاموات - ربنا اغفرلنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولاتجعل فى قلوبنا غلاللذين امنوا ربنا انك رؤف الرحيم -

এ সমস্ত রচনা সবই "ফুসূসু'ল-হিকাম" গ্রন্থের রচয়িতার। আল্লাহ ভাল জানেন তাঁর শেষ পরিণতি কি হয়েছিল অর্থাৎ কিসের ওপর ভিত্তি করে তিনি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছিলেন। আল্লাহ পাক সমস্ত ঈমানদার মুসলিম নারী-পুরুষকে, চাই জীবিত হোক কিংবা মৃত, ক্ষমা করুন। হে আমাদের রব! আমাদেরকে ও ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা কর এবং মু'মিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের রব! তুমি তো দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু।[১]

অতঃপর সদর রূমীর মতবাদ[২] সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে লিখছেন ঃ هوابعدعن الشريعةالاسلام (সে ইসলামী শরী'আ থেকে বহু দূরে নিক্ষিপ্ত)।[৩] এরপর তিলিমসান ও ইবনে সাব'ঈনকে দৃঢ়তার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি তিলিমসানীর ওপর সবচেয়ে বেশী নাখোশ ছিলেন। ইসলামের প্রতি জিদ ও মমত্ববোধে উদ্দীপ্ত হয়ে তিনি এতদূর পর্যন্ত লিখেছেন ঃ

واما الفاجر التلمسانى فهواخبث القوم واعمقهم فى الكفر فانه لايفرق بين الوجود والثبوت كما يفرق ابن عربى ولايفرق بين المطلق والمعين كما يفرق الرومى ولكن عنده ماثم غيره ولاسوى بوجه من الوجوه وان العبدانما يشهد السوى ما دام محجوبا فاذا انكشف حجابه رأى انه ماثم غير، يبين له الامر ولهذا كان يستحل جميع المحرمات -

১. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ৫৭ পৃ.।

২. আল্লামা-সদরুদ্দীন কওনবী।

৩. শায়খ নসর আল-মুনজীর নামে শায়খুল-ইসলামের পত্র جلاءالعينين পৃ. ৫৭।

এখন বাকী থাকল দুরাচার (ফাসিক) তিলিমসানী।[১] তা এই দলের লোকদের ভেতর তার নষ্টামিই ছিল সবচেয়ে বেশী এবং কুফরীর ক্ষেত্রে সেই ছিল সর্বাপেক্ষা গভীর পানির। আর তা এজন্য যে, সে অস্তিত্ব (ওজূদ) ও সাক্ষ্য-প্রমাণের ভেতর অন্তত ইবনে 'আরাবীও যেমনটি প্রভেদ করেছেন তেমনটিও করে না। তেমনি সে মুতলাক (সম্পূর্ণ, একচ্ছত্র) ও মু'আয়্যিন (معين স্থিরীকৃত, প্রতিষ্ঠিত)-এর মাঝেও কোনরূপ প্রভেদ করে না যেমনটি সদরুদ্দীন কওনবী থেকে বর্ণিত আছে। তার মতবাদ তো এই যে, আল্লাহ্র সত্তা (ذات - যাত) ভিন্ন অপর কোন কিংবা ভিন্নতর কিছুর অস্তিত্বই নেই। বান্দা যদি ভিন্নতর কিছু দেখতে পায় তবে তা কেবল ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ সে পর্দার আড়ালে লুক্কায়িত। যখন এই পর্দা উঠে যাবে তখন সে দেখবে, ভিন্নতর কিছুর অস্তিত্ব নেই। কেবল তখনই প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে সে অবহিত হতে পারবে। আর এরই ভিত্তিতে এই তিলিমসানী সমস্ত অবৈধ ও নিষিদ্ধ বস্তুকে হালাল মনে করত।[২]

পরিশেষে তিনি (ইবনে তায়মিয়া) এরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা লিপিবদ্ধ করছেন ঃ

জাহমিয়া ফের্কার মুতাকাল্লিমগণ কোন কিছুর 'ইবাদত করে না এবং উক্ত ফের্কার যে সমস্ত লোক 'ইবাদত-বন্দেগীতে আগ্রহী তারা সব কিছুরই 'ইবাদত করে। কারণ এই দলের মুতাকাল্লিমদের মনে আল্লাহ্র 'ইবাদত কিংবা কোন কিছুর 'ইবাদতের প্রতি কোন আগ্রহই নেই। তারা নিজেদেরকে নির্গুণ হিসাবে অভিহিত করে। কিন্তু তাদের ফের্কার সাধারণ লোকদের মনে 'ইবাদতের প্রেরণা বিদ্যমান। আর এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক কথা, মন সব সময় অস্তিত্বশীল বস্তুর প্রতিই আকৃষ্ট হয়, ঝুঁকে পড়ে; অস্তিত্বহীন কিংবা শূন্যের দিকে নয়। এজন্য তাদেরকে বাধ্য হয়েই সৃষ্ট বস্তু (মাখলূকাত)-র পূজা-অর্চনা করতে হয়; হয় সাধারণ অস্তিত্বশীল কোন কিছুর অথবা অন্য কোন দৃশ্যমান বস্তুর, যেমন চন্দ্র, সূর্য, মানুষ, মূর্তি প্রভৃতির। তেমনি ইত্তিহাদী (মিলনবাদী)- দের কথিত উক্তি (ওয়াহদাতু'ল-ওজূদ বা সর্বেশ্বরবাদ) পৃথিবীর তাবৎ শির্ক-এর ওপর বেষ্টনী সৃষ্টি করে রয়েছে। তারা আল্লাহ্ তা'আলার তওহীদ তথা একত্ববাদের সমর্থক নয়, বরং তারা এমত পরিমাণ সম-অর্থের তওহীদের সমর্থক যা তাঁর (স্রষ্টার) ও তাঁর সৃষ্টির মাঝে রয়েছে। এজন্য তারা অন্যদেরকে নিজেদের 'রব' বা প্রভু-প্রতিপালকের সমকক্ষ বানায়। আল-কুরআনের ভাষায় وهم بربهم

১. তিলিমসানী তার ভক্তদের মাঝে 'আফীফ তিলিমসানী নামে মশহূর।

২. جلاء العينين পৃ. ৭৮।

يعدلون -এরই ভিত্তিতে একজন নির্ভরযোগ্য লোকের বর্ণনা, সাব'ঈন হিন্দুস্তানে যাবার ইচ্ছা পোষণ করত এবং বলত, কোন ইসলামী ভূখণ্ডে এ ধরনের বিশ্বাস ও মতবাদের স্থান হবার নয়। হিন্দুস্তানের লোকেরা[১] যেহেতু মুশরিক, তারা প্রতিটি বস্তুরই পূজা-অর্চনা করে থাকে- এমন কি গাছপালা, জীব-জন্তু প্রভৃতিরও (তাই তাদের সঙ্গে বেশ ভালই কাটবে)। আর এটাই হল 'ইত্তিহাদী'দের কথিত বক্তব্যের অন্তর্নিহিত সত্য (হাকীকত)। আমি ব্যক্তিগতভাবে কিছু লোককে জানি, যারা দর্শন ও কালাম শাস্ত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত অর্থাৎ তারা ঐসব শাস্ত্রের চর্চা করেন এবং ঐসব ইত্তিহাদীদের প্রদর্শিত পন্থায় খোদাপরস্ত ও 'ইবাদতগুযার তাপসে পরিণত হন। তারা যখন আল্লাহ্ তা'আলার গুণাবলী বর্ণনা করেন তখন বলেন, তিনি (আল্লাহ) এমন নন, তেমন নন এবং তাঁর সিফাত বর্ণনায় তারা মুসলমানদের অনুকরণে বলেন, তিনি (আল্লাহ্) সৃষ্টি বস্তুর মত নন। কিন্তু সেই সঙ্গে স্রষ্টার সে সমস্ত সিফাতও তারা অস্বীকার করেন যে সমস্ত সিফাত তথা গুণাবলী আম্বিয়া 'আলায়হিমু'স সালাম বর্ণনা করেছেন। তাদের ভেতর কারুর যখন বিশেষ ভাব ও মত্ততা দেখা দেয় তখন তারা সরাসরি 'ইত্তিহাদী'দের পথ ধরেন এবং বলতে থাকেনঃ প্রাণীকুল মাত্রেই তো আল্লাহ্। তাদেরকে যখন বলা হয়, একথা বলার পর কোথায় রইল তোমাদের অস্বীকৃতি (যে আল্লাহ্ এমনটি নন, তেমনটি নন) আর কোথায়ই বা তোমাদের এই ইতিবাচক উক্তির তাৎপর্য (যে সমস্ত প্রাণীই খোদা), তখন তারা বলতে থাকে যে, সেটা ছিল আমাদের উন্মত্ততা আর এটি হচ্ছে আমাদের আনন্দ-সুখ (যওক)। এই পথভ্রষ্টদেরকে যদি কেউ বলে, যে আনন্দ-সুখ ও উন্মত্ততা ধর্মীয় 'আকীদা-বিশ্বাসের অনুকূল না হয় তাহলে সেসবের ভেতর একটি অথবা দু'টিই বাতিল হবে। উন্মত্ততা ও আনন্দ-সুখ প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহ্র পরিচিতি ও ধর্মীয় বিশ্বাসেরই পরিণাম ফল আর তা এজন্য যে, আত্মার (কলব) মা'রিফত ও হাল দুটোই পরস্পরের পরিপূরক (متلازم)। অনন্তর জ্ঞান ও মা'রিফতের পরিমাণ মাফিক উন্মত্ততা, মুহব্বত ও হাল হয়ে থাকে অর্থাৎ 'ইল্ম তথা জ্ঞান ও মা'রিফত যে পরিমাপের হবে ঠিক সেই পরিমাপেই 'ইশকে ইলাহীতে উন্মত্ততা, প্রেম ও বেকারার অবস্থার সৃষ্টি হবে। এসব লোক যদি আম্বিয়া 'আলায়হিমু'স-সালাম ও নবীয়ে মুরসালদের রাস্তা ইখতিয়ার করত যাঁরা এমন এক আল্লাহ্র 'ইবাদতের আদেশ করেন যিনি একক ও যাঁর কোন শরীক নেই এবং যারা তাঁর এমন গুণাবলীর বর্ণনা দেন যা স্বয়ং তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন এবং

১. হিন্দুস্তানের আদি অধিবাসীরা।

তাঁর নবীগণ বর্ণনা করেছেন। তারা (ইত্তিহাদীগণ) যদি তাদের পূর্ববর্তী প্রথম যুগের মুসলমানদের অনুসরণ করত তাহলে তারা সৎ পথ পেত, হেদায়েত পেত এবং ঈমান ও য়াকীনের স্বাদ, মিষ্টতা ও অন্তরের প্রশান্তি তারা লাভ করত। কেউ ঠিকই বলেছে[১] যে, আম্বিয়া 'আলায়হিমু'স-সালামের নিকট আল্লাহ তা'আলার সিফাতের সদর্থক জ্ঞান বিস্তৃত এবং (যে সমস্ত সিফাত বা গুণ তাঁর যোগ্য নয়) সে সবের নঞর্থক জ্ঞান সংক্ষিপ্তাকারে বর্তমান রয়েছে (ان الرسل جاءوباثبات مفصل و نفي مجمل)-এর বিপরীতে বে-দীন اهل تعطيل। (জাহমিয়া সম্প্রদায় ও দার্শনিকগণ যাদের দ্বারা ইত্তিহাদীগণ প্রভাবান্বিত) আল্লাহ্‌র গুণাবলীকে 'না' তথা نفى করতে গিয়ে খুবই লম্বা ফিরিস্তির আশ্রয় নেয় আর আল্লাহ্‌র গুণাবলীকে সদর্থক করবার মুহূর্তে খুবই কার্পণ্য করে। কুরআন মজীদ আল্লাহ্‌র গুণাবলীর সদর্থক বর্ণনায় ভরপুর এবং সে ক্ষেত্রে অত্যন্ত বিস্তারিত বর্ণনার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। যেমন ان الله بكل شي عليم (আল্লাহ্ সকল বিষয় সম্পর্কে অবগত) وعلى كل شى قدير, (আর সকল বিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান), انه سميع بصير (আর তিনি শ্রোতা, দ্রষ্টা), وسع كل شى رحمة وعلما (করুণা ও জ্ঞানে তিনি প্রতিটি বিষয়েই ব্যাপক ও বিস্তৃত)। আর নঞর্থের ক্ষেত্রে তিনি একটি ব্যাপক ও অর্থপূর্ণ কথা বলে দিয়েছেন। যেমন ليس كمثله شى (তাঁর মত নয় কোন কিছুই), لم يكن له كفوا احد(তাঁর সমকক্ষ কেউ নয়), هل تعلم له سميا (তুমি কি তাঁর সম গুণসম্পন্ন কাউকেও জান?), سبحن ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين (ওরা যা আরোপ করে তা থেকে তিনি পবিত্র ও মহান তোমার প্রতিপালক যিনি সকল ক্ষমতার অধিকারী। আর শান্তি বর্ষিত হোক রসূলগণের প্রতি)।

এরূপ 'আকীদা-বিশ্বাসের দ্বারা যে নৈতিক বিপর্যয়, বিশৃঙ্খলা ও যে অরাজকতা বিস্তার লাভ করছিল এবং দুরাচার প্রবৃত্তি-পূজারীরা একে যেভাবে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করছিল সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে লিখছেন ঃ

এই 'আকীদার দাবীদারেরা প্রবৃত্তিজাত কামনা-বাসনা, কল্পনা-বিলাসিতা ও 'আকীদাগত যাবতীয় অনিষ্টের মূল হোতা। এর পরিণাম ফল কোথাও কোথাও এভাবে দেখা দিয়েছে, কতক লোক কিশোর বালকদের প্রেমে লিপ্ত

১. স্বয়ং ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) তাঁর রচনায় নানা জায়গায় একথা বলেছেন।

হয় এবং বলে, এদের ভেতর আল্লাহ্‌র তাজাল্লী রয়েছে এবং এরা আল্লাহর সৌন্দর্যের বিকাশস্থল। কতক লোক চুমু খায় এবং আপন প্রেমাস্পদকে বলে, তুমি খোদা। কতক স্বীয় সন্তানাদির ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করে এবং ঈশ্বরত্বের দাবী করে ইত্যাদি।[১]

এ ছিল এমন একটি যুগ যখন আল-মালিকু'ন-নাসির মুহাম্মদ ইবনে কালাউন ছিলেন মিসরের নামেমাত্র সুলতান, আর আমীর রুকনুদ্দীন বায়বার্স আল-জাশনগীর ছিলেন সাম্রাজ্যের উযীরে আ'জম ও সকল দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। জাশনগীর শায়খ নস্‌র আল-মুনজীর একজন ভক্ত ও মুরীদ ছিলেন এবং তিনি শায়খ ইবনে 'আরাবীর প্রতি অতিরিক্ত ভক্তি-শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করতেন। শায়খ সম্পর্কে ইবনে তায়মিয়া (র) যে ধারনা পোষণ করতেন এবং যে ধারণা তিনি মাঝে মাঝেই বক্তৃতার মাঝে ও লিখিতাকারে প্রকাশও করতেন সে সম্পর্কে খবরা-খবর মিসরেও গিয়ে পৌঁছুত। আর এটাই শায়খ নস্‌র আল-মুনজীর ক্রোধের উদ্রেকের জন্য যথেষ্ট ছিল। জাশনগীর সাধারণ তুর্কী আমীরদের ন্যায় মামুলী লেখাপড়া জানতেন যদিও সামরিক প্রতিভা ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তিনি যথেষ্ট যোগ্য ছিলেন। তিনি তাঁর শায়খ-এর মতামত দ্বারা প্রভাবান্বিত ছিলেন এবং ইবনে তায়মিয়া (র) সম্পর্কে সেমত ধারণাই পোষণ করতেন যেমন ধারণা পোষণ করতেন তাঁর শায়খ। সিরিয়া ছিল মিসর সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশ এবং সকল দিক দিয়েই এর অধীনস্থ্‌। মিসরের সুলতান এমন সব লোককে ডেকে পাঠাবার ও তাদের সম্পর্কে ফয়সালা প্রদানের অধিকার রাখতেন, যারা তার দৃষ্টিতে সাম্রাজ্যের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও জন-নিরাপত্তার পক্ষে ক্ষতিকর কিংবা কোনরূপ গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কারণ হতে পারেন। সাধারণত ব্যক্তিগত ঝোঁক বা প্রবণতা কিংবা দরবারী লোকদের অভিপ্রায় কিংবা অভিরুচি এর পেছনে কাজ করত। সে সময়ও অবস্থা তাই ছিল। সাম্রাজ্যের উযীর আ'জম-এর শায়খ নস্‌র আল-মুনজীর ইবনে তায়মিয়া (র)-র সঙ্গে শত্রুতা ছিল আর তিনি ইমামকে নিপীড়ন ও শাস্তির শিকারে পরিণত করতে চাচ্ছিলেন।

মিসরে ইবনে তায়মিয়া (র)

যা-ই হোক, ৭০৫ হিজরীর ৫ই রমাদান তারিখে সিরিয়ায় ইবনে তায়মিয়া (র)-র নিকট মিসরে হাযির হবার ডাক এসে পৌঁছে। এতে তাঁর বন্ধু-বান্ধব ও ছাত্রকুল খুবই উদ্বেগাকুল হয়ে ওঠে। নায়েবু'স-সালতানাত (যিনি তাঁর প্রতি সহানুভূতিপ্রবণ ও অন্যতম ভক্ত ছিলেন) তাঁকে বাধা দিতে চেষ্টা করেন এবং বলেন, আমি ইতিমধ্যেই সুলতানের সঙ্গে পত্র যোগাযোগের মাধ্যমে তাঁকে

---

১. الرد الاقوم على فصوص الحكم-পৃষ্ঠা ৫২।

বোঝাবার ও ব্যাপারটার একটি নিষ্পত্তি ঘটাবার চেষ্টা করছি। কিন্তু ইবনে তায়মিয়া (র) সফরের জন্য এক পায়ে খাড়া ছিলেন। তিনি বললেনঃ মিসর সফরের ভেতর আমি অনেক কল্যাণ ও লাভের সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি। শেষাবধি বন্ধু-বান্ধব ও গুণগ্রাহী ভক্তবৃন্দ নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁকে সজল চোখে বিদায় জানান। জনতা বহু দূর অবধি তাঁর অনুগমন করেছিল আর বিপদাশংকায় সবার মন ছিল ব্যথা ভারাক্রান্ত।

দামিশক থেকে রওয়ানা হয়ে গাযযার জামি মসজিদে এক বিরাট সমাবেশে তিনি দর্স প্রদান করেন।

বন্দী ও মুক্তি

২২শে রমাদান তারিখে তিনি মিসর এসে পৌছেন। সেদিন ছিল শুক্রবার। জুমু'আ বাদ কেল্লার ভেতর এক বিরাট মজলিস অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিচার বিভাগের সদস্যবর্গ ও সাম্রাজ্যের পদাধিকারী ব্যক্তিবৃন্দ অংশ নেন। ইবনে তায়মিয়া (র) সেখানে আলোচনার সূত্রপাত করতে চাইলেন, কিন্তু তাঁকে অনুমতি দেওয়া হয়নি। উপস্থিত কতিপয় ব্যক্তি তাঁর ধর্ম-বিশ্বাস ('আকীদা) ও কতক মসলা[১]-মাসায়েলের ব্যাপারে আপত্তি তোলেন। এর জওয়াব দেবার জন্য তিনি হাম্দ ও ছানা পাঠ করে যেই বক্তব্যের সূচনা করতে গেলেন অমনি তাঁকে বলা হল, আমরা আপনার খুতবা শোনার জন্য এখানে সমবেত হইনি। অতঃপর তিনি জানতে চাইলেন, আমার এই মকদ্দমায় সালিসী করবেন কে আর কেই-বা রায় প্রদান করবেন? তাঁকে কাযী ইবনে মাখলূফ মালিকীর[২] নাম বলা হয়। তিনি তখন তাকে (মাখলূফ মালিকীকে) বললেনঃ আপনি তো আমার প্রতিপক্ষ। প্রতিপক্ষ হিসাবে আপনি কি করে সালিসী করতে পারেন? এতে তিনি অত্যন্ত রাগান্বিত হন এবং ইবনে তায়মিয়ার বিরুদ্ধে রায় ঘোষণা করেন[৩] যার পরিণতিতে তিনি কিছুকাল বুরুজে বন্দী থাকেন। অতঃপর 'ঈদের রাত্রে মিসরের 'জুব' (جب) কূপ নামক বিখ্যাত কয়েদখানায় তাঁকে তাঁর ভাই শরফুদ্দীন 'আবদুল্লাহ ও যয়নুদ্দীন 'আবদুর রহমানসহ স্থানান্তরিত করা হয়[৪] পরবর্তী বছর

---

১. এই 'আকীদা ও মসলা ছিল প্রাচীন কালাম শাস্ত্রবিষয়ক যার ওপর দামিশ্কে একবার নয়, দু'বার নয়, বারবার আলোচনা ও বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ নিয়ে ইবনে তায়মিয়া (র) বই-পুস্তকও লিখেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, استواء على العرش - এর হাকীকত, আল্লাহ্র কালামের হাকীকত এবং হরফ ও আওয়াজের আলোচনা।

২. মিসরে ইবনে তায়মিয়ার বিরাট প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন।

৩. এই বৈঠকের স্মৃতিচারণ স্বয়ং ইমাম ইবনে তায়মিয়া একটি চিঠিতে লিখেছেন। সম্প্রতি المحنة। নামে এটি প্রকাশিত হয়েছে।

৪. ইবনে কাছীর, ৩৮ পৃষ্ঠা।

অর্থাৎ ৭০৬ হিজরীতে 'ঈদের রাতে নায়েব-এ মিসর কয়েকজন বিচারপতি ও ফকীহ্‌র পক্ষ থেকে ইবনে তায়মিয়া (র)- কে মুক্তি দানের জোর তৎপরতা চলে। উপস্থিত কয়েকজন মুক্তির জন্য কতিপয় 'আকীদা থেকে প্রত্যাবর্তনের প্রকাশ্য ঘোষণা দানের শর্ত আরোপ করে। ইবনে তায়মিয়া (র) ব্যাপারটা জানতে পেরে এ ধরনের ঘোষণা প্রদান করতে পরিষ্কার অস্বীকার করেন। ছ'বার তাঁকে দাওয়াত জানান হয় যেন তিনি স্বয়ং এসে এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করেন। কিন্তু তিনি তাতেও রাযী হন নি। তাঁর জওয়াব বরাবর একই ছিল, السجن احب الى مما يدعوننى اليه। (তারা আমাকে যে বিষয়ের দিকে আহ্বান করছে, তার তুলনায় জেলখানা আমার নিকট অধিকতর পসন্দনীয়)।[১]

স্বয়ং শায়খুল ইসলামের ভাষায় মতপার্থক্যের ভিত্তি ও মতামত বিশ্লেষণ

সৌভাগ্যের বিষয়, স্বয়ং শায়খুল ইসলাম (র) তাঁর একটি পুস্তকে মিসরের বিতর্ক সভা, অতঃপর কারাবন্দী থাকাকালীন বিভিন্ন ঘটনা, মুক্তির ব্যাপারে জোর তৎপরতা ও শায়খ কর্তৃক তা অস্বীকার, এতদসত্ত্বেও স্বীয় মত ও পথের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নিজেই করেছেন। পুস্তকটি অতি সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। এই পুস্তকের মাধ্যমে বহু নতুন নতুন ও জরুরী বিষয় সম্পর্কে জানা গেছে। উক্ত পুস্তকের বিভিন্ন স্থান থেকে তার কিছু উদ্ধৃতি এখানে পেশ করা হচ্ছে।[২]

> একদিন জেলের দারোগা আমার নিকট এলেন এবং বললেন ঃ নায়েব-এ মিসর আপনাকে সালাম জানিয়েছেন এবং বলে পাঠিয়েছেন, শেষ পর্যন্ত আপনি কত দিন জেলে থাকতে চান? জেল থেকে বের হবার আপনার কি আদৌ ইচ্ছে নেই? আপনি কি এখনও আপনার "সেই কথা"র ওপর অনড় ও অটল রয়েছেন? আমি ধারণা করলাম যে, এই লোকের মারফত কোন মৌখিক পয়গাম পাঠানো সমীচীন হবে না (এজন্য যে, জানি না সে ঠিকমত পয়গাম পৌঁছুতে পারবে কিনা)। আমি তখন তাকে বললাম, নায়েব সাহেবকে আমার সালাম দেবেন এবং বলবেন, আমি জানি না সেই কথাটা কি ? আমি তো আজ পর্যন্ত এটাই জানতে পারলাম না, কোন্ অপরাধে আমাকে বন্দী করা হয়েছে এবং আমার কসূরই বা কি। অধিকন্তু আমি আপনার প্রেরিত পয়গামের জওয়াব কোন ভৃত্যের মুখে পাঠাতে চাই না।

---

১. ইবনে কাছীর, ৪২ পৃষ্ঠা।

২. এই পুস্তিকাটি দামিশ্‌কের বিখ্যাত কুতুবখানা "আজ-জাহিরিয়্যা"তে শায়খ-এর আপন ভ্রাতা ও জেলখানার সাথী শায়খ শরফুদ্দীন ইবনে তায়মিয়ার হস্ত লিখিত বর্তমান ছিল। আমার পরম বন্ধু শায়খ মুহাম্মদ আবদুর রায্‌যাক হামযা, হারাম শরীফের সাবেক ইমাম-এর আন্তরিক প্রচেষ্টায় ও শায়খ মুহাম্মদ নাফীসের ব্যবস্থাপনায় ও তত্ত্বাবধানে আরও কতিপয় পুস্তিকাসহ এটি প্রকাশিত হয়েছে। সংকলনের নাম "মাজমু'আ 'ইলমিয়া"।

আপনি আপনার বিশ্বস্ত লোকদের থেকে এমন চারজনকে পাঠাবেন যারা সমঝদার হবেন, সত্য কথনে নির্ভীক ও আমানতদার হবেন যাতে করে আমি তাকে কোনরূপ না বাড়িয়ে-কমিয়ে কথা বলতে পারি। কেননা আমি জানি, আমার এ ব্যাপারে অনেক রকম মিথ্যাচার ও বিকৃতির আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছে।

এরপর দারোগা এলেন এবং তার সঙ্গে ছিলেন আরো একজন। তাকে আমি চিনতাম না। কিন্তু লোকেরা আমাকে বলল, তার নাম 'আলাউদ্দীন আত-তাবরিসী। যারা তাকে জানত এবং চিনত তারা তার প্রশংসাও করে। লোকে জানে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে ধৈর্য, সহ্য গুণ ও যে কোন ধরনের তিক্ত কথা শোনার মত শক্তি দান করেছেন এবং যে কোন সাধারণ ও ইতর শ্রেণীর লোকের সঙ্গেও আমি ন্যায় ও ইনসাফের সঙ্গে কথা বলি। সেক্ষেত্রে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত এবং রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল লোকের সঙ্গে কথা বলার বেলায় তো কথাই নেই। কিন্তু দেখতে পেলাম তারা আমার সঙ্গে এমন পন্থা অবলম্বন করল, যদ্দ্বারা পরিমাপ করা যাচ্ছিল, তারা তাদের দাবী মেনে নেবার জন্য আমাকে বাধ্য করতে চাচ্ছিল। তারা একটি চিরকুটও বের করল যাতে সংঘটিতই হয় নি এমন সব ঘটনা, মিথ্যা ও মনগড়া কথা লেখা ছিল এবং তাতে পরিষ্কার আল্লাহ্‌র নাফরমানীর দিকে আহ্বান ছিল। আমি যখন তাদেরকে এর জওয়াব দিতাম এবং তাদেরকে আমার পয়গাম পেশ করতাম তখন তারা তা শুনবার জন্য তৈরি থাকত না, বরং তারা তাদের দাবী মেনে নেবার জন্য পীড়াপীড়ি করত এবং ওয়াদা নিতে চাইত, আমি আর আমার আগের কথায় ও মতে ফিরে যাব না (যদিও কুরআন ও হাদীসে আলোচনা-সমালোচনার ক্ষেত্রে নম্র ও মিষ্ট ভাষা ব্যবহারের নির্দেশ এসেছে। কিন্তু জুলুম করা হলে সেক্ষেত্রে জালিমের বিরুদ্ধে কঠোর ও কর্কশ ভাষা ব্যবহারের ও আত্মমর্যাদাবোধে উদ্দীপ্ত হবার নির্দেশ রয়েছে)। কথা বলার একটা পর্যায়ে আমি তাদেরকে বললাম, এ ব্যাপারে আমার ফয়সালা করবার অধিকার নেই। এ ব্যাপারটা তো আল্লাহ্, তদীয় রসূল (স) ও তামাম দুনিয়ার মুসলমানদের। আল্লাহ্‌র দীনের পরিবর্তন-পরিবর্ধনের কোন ইখতিয়ার আমার নেই। আর আমি তোমাদের কিংবা অপর কারুর কারণে দীন ইসলাম থেকে সরে যেতে পারছি না, তেমনি পারি না মিথ্যা কিংবা অপবাদের স্বীকৃতি দিতে।

যখন আমি দেখলাম, তারা এর ওপর পীড়াপীড়ি করছে তখন আমি কড়া ভাষায় কথা বলি। আমি তাদের বললাম ঃ বাজে কথা ছেড়ে দাও। গিয়ে নিজের চরকায় তেল দাও গে ! আমি তোমাদের কারুর কাছে এ দরখাস্ত

করিনি, আমাকে জেল থেকে বের করে নিয়ে যাও। সে সময় উপরের দরজা বন্ধ ছিল। আমি বললাম ঃ দরজা খোল; আমি চলে যাচ্ছি। যা-ই হোক, এভাবেই আলোচনার যবনিকাপাত ঘটল।

আমি দূতকে বলেছিলাম, আমি এসব মসলা-মাসায়েলের ক্ষেত্রে যা কিছু লিখেছি কিংবা বলেছি তা সব সময় কোন না কোন প্রশ্ন ও ফতওয়া চাওয়ার প্রেক্ষিতে জওয়াব হিসাবে লিখেছি, বলেছি। আমি এ মসলা-মাসায়েলের ব্যাপারে কাউকেই প্রথমে চিঠি লিখিনি কিংবা নিজের থেকে উদ্যোগী হয়ে কাউকে সম্বোধনও করি নি। কোন সত্য-সন্ধানী যখন আমার নিকট আসে, বারবার আমাকে জিজ্ঞাসা করে, ধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে সেক্ষেত্রে কি আমি সত্য গোপন করব কিংবা সে রকম সুযোগ আছে কি! অথচ নবী করীম সাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন,

من سئل عن علم يعلمه فكتمه الجمه الله يوم القيامة بلجام من النار -

'ইল্‌ম বা জ্ঞানের সম্পর্কে কাউকে যদি কিছু জিজ্ঞাসা করা হয় যে সম্পর্কে সে জানে, অতঃপর সে যদি তা গোপন করে তবে আল্লাহ্ পাক কিয়ামতের দিন তার মুখে আগুনের লাগাম পরিয়ে দেবেন।

অপর দিকে আলাহ্ পাক বলেন ঃ

ان الذين يكتمون ماانزلنامن البينات والهدي منْ بعدما بيناه للناس فى الكتاب اولئك يلعنهم الله و يلعنهم اللاعنون -

আমি মানুষের জন্য কিতাবে যে সব স্পষ্ট নিদর্শন ও পথ-নির্দেশ নাযিল করেছি তা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার পরও যারা তা গোপন রাখে আল্লাহ তাদেরকে লা'নত দেন এবং অভিশাপকারিগণও তাদেরকে অভিশাপ দেয়।
[সূরা বাকারা, ১৫৯ আয়াত]

এখন আমি তোমাদের বলায় কি সত্যান্বেষীর জিজ্ঞাসার জওয়াব দানে গড়িমসির আশ্রয় নেব যাতে আমাকেও কুরআন বর্ণিত পরিণতির সম্মুখীন হতে হয়? সুলতান কি আমাকে তা করতে বলেন ? অথবা অপর কোন মুসলমান? আসল কথা এই যে, তোমরা এই সব ভিত্তিহীন কথার ভিত্তিতেই, যে সব কথা তোমাদের কাছে গিয়ে পৌঁছেছে, বাদশাহ্‌র হুকুমকে ঢাল বানাতে চাও।

এরপর দূত বলল, জনাবে ওয়ালা! কথার মাঝে বাদশাহ্‌র নাম দয়া করে টেনে আনবেন না। কেউ বাদশাহ্‌র শানে কথাবার্তা বলে না। আমি বললামঃ জী, হ্যাঁ! এ সময় কেউই বাদশাহ্‌র ব্যাপারে কোন কিছু কথা শুনতে সাহস করে না। আর এই যে ফেতনা তা এজন্যই। আমি সিরিয়া থেকেই একথা শুনেছিলাম, আমি বাদশাহর সমালোচনা করেছি বলে আমাকে অপবাদ দেওয়া হচ্ছে এবং তাঁকেও অপবাদ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমি মনে করতাম, কেউ একথা বিশ্বাস করবে না।

আমি তাকে বললাম, এ ব্যাপারে যে ক্ষতি হবে তজ্জন্য আমি দায়ী হব না। আমার ভয় কিসের আর কিসেরই বা আশংকা! এই মামলায় আমি যদি মারা যাই অর্থাৎ আমাকে যদি মেরে ফেলা হয় তাহলে আমি উন্নত দর্জার শাহাদত লাভ করব। আর এটা আমার জন্য বিরাট সৌভাগ্যের বিষয় হবে। কিয়ামতের দিন আমাকে সন্তুষ্ট করা হবে। আর যারা আমার হত্যার নিমিত্ত হবে, এ ব্যাপারে কোন না কোন ভূমিকা পালন করবে, কিয়ামত পর্যন্ত তারা লা'নত ও অভিশাপের পাত্র হবে। এজন্য যে, সমগ্র উম্মতে মুহাম্মদী জানে, আমি ন্যায় ও সত্যের ওপর মারা যাচ্ছি, যে ন্যায় ও সত্যসহ আল্লাহ পাক তদীয় রসূলকে প্রেরণ করেছেন। আর যদি আমাকে বন্দী করা হয় তাহলে কসম আল্লাহ্‌র! আমার বন্দিত্ব আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে একটি বিরাট নে'আমত হিসাবে পরিগণিত হবে। লোক আমার থেকে কিছু ছিনিয়ে নেবে এমন ভয় আমার নেই। আমি কোন মাদরাসার প্রিন্সিপাল নই, তত্ত্বাবধায়কও নই। আমার কোন জায়গা-জমিও নেই, নেই বিত্ত-সম্পদ। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার আমি মালিক নই, রাষ্ট্রীয় পদেও আমি সমাসীন নই। কি আছে আমার ছিনিয়ে নেবার (যেজন্য আমি ভীত ও শংকিত হব) ? কিন্তু এ ব্যাপারে যা কিছু ক্ষয়ক্ষতি তা তোমাদেরই হবে এজন্য যে, যারা এ ব্যাপারে সিরিয়ায় বসে শত্রুতা করেছে, আমি জানি, তাদের উদ্দেশ্য তোমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা এবং তোমাদের ধর্মের, তোমাদের রাষ্ট্রের ক্ষতি সাধন করা। তাদের কেউ কেউ তাতারীদের দেশে গেছে এবং কেউ কেউ এখনো সেখানেই অবস্থান করছে। সেই সব লোকই তোমাদের দীন-দুনিয়া দু'টোই বরবাদ করতে উঠে পড়ে লেগেছে এবং আমাকে নিছক ঢাল বানিয়েছে। কেননা তারা জানে, আমি তোমাদের বন্ধু ও শুভাকাঙক্ষী এবং আমি তোমাদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় জগতেরই কল্যাণ চাই। এ ব্যাপারে আরও বহু কিছু কথা পর্দান্তরালে রয়ে গেছে যা সময়ে প্রকাশ পাবে। অন্যথায় মিসরে কারুর সঙ্গেই আমার কোন শত্রুতা ছিল না, ছিল না কোন বিরোধ। আমি সদা-সর্বদাই মিসরবাসীদের প্রিয়পাত্র, তাদের এবং তাদের শাসক ও 'আলিম-উলামার বন্ধু ও মদদগার থেকেছি।

সে বলল ঃ সুলতানের নায়েবকে গিয়ে আমি কি জওয়াব দেব?

তাঁকে সালাম বলবে এবং আমার পয়গাম পৌঁছে দেবে, আমি বললাম। আপনি তো অনেক কথাই বলেছেন, সে বলল।

আমি বললাম ঃ মোটামুটি কথা, এই চিরকুটে যা কিছু আছে তার একটা বড় অংশই মিথ্যা। অবশ্য এই কথাটা استوى حقيقة আমি বলেছি এবং মালিকী মযহাবভুক্ত ও মালিকী মযহাববহির্ভূত 'আলিমগণের অনেকেই লিখেছেন যে, এর ওপর আহলে সুন্নত ওয়া'ল জামা'আতের ইজমা' (ঐকমত্য) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গ ও এই উম্মতের ইমাম ও মহান 'উলামায়ে কিরামের কেউই এমত অস্বীকার করেন নি। তা আমি এমন একটি সর্বসম্মত 'আকীদাকে, যাকে কোন 'আলিমই অস্বীকার করেন নি, কি করে ছাড়তে পারি? 'আল্লামা আবূ 'উমার ইব্ন 'আবদি'ল-বার্‌র বলেন ঃ

اهل السنة مجموعون على الاقرار بالصفات الواردة كلها فى القران والسنة - والايمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز الاانهم لايكيفون شيئا من ذالك ولا يجدون فيه صفة محصورة واما اهل البدع الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها - ولايحمل شيئا منها على الحقيقة ويزعمون ان من اقربها مشبهة وعندمن اقربها نافون للمعبود والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله وهم ائمة الجماعة -

কুরআন ও হাদীসে আল্লাহ্ তা'আলার যেসব সিফাতের (গুণ বা গুণবাচক নামের) উল্লেখ আছে তার স্বীকৃতি ও তার ওপর ঈমান আনয়নের অপরিহার্যতা এবং এসব সিফাতের প্রত্যক্ষ অর্থ গ্রহণ ও পরোক্ষ অর্থে তার ব্যবহার না করার অনুকূলে আহলু'স-সুন্নাহ ওয়াল-জামাআতের ইমামগণের মধ্যে ইজমা' (ঐকমত্য) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাঁরা এ সব সিফাতের কোনরূপ দূরতম ব্যাখ্যা (তা'বীল) গ্রহণেরও পক্ষপাতী নন এবং এসব গুণকে সীমাবদ্ধ করতেও প্রস্তুত নন।

পক্ষান্তরে বিদ'আতপন্থিগণ, যেমন জাহমিয়া, মু'তাযিলাদের সমস্ত উপদল ও খারিজী, এরা সকলেই আহলে সুন্নাতের উপরিউক্ত আকীদা প্রত্যাখ্যান

করেছে। তারা উল্লিখিত সিফাতসমূহের প্রত্যক্ষ অর্থ গ্রহণ করে না এবং মনে করে, যারা এ সব গুণ (হাত, পা, কান, চোখ ইত্যাদি) স্বীকার করে তারা মুশাব্বিহা (আল্লাহ্‌র সাদৃশ্য কল্পনাকারী)। তাদের মতে, যারা তা স্বীকার করে তারা মা'বূদের বৈশিষ্ট্য নাকচকারী।

এ ব্যাপারে তাঁদের কথাই সঠিক যাঁরা আল্লাহ্‌র কিতাব ও রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর সুন্নতের বক্তব্য অনুযায়ী মত প্রকাশ করেছেন। আর তাঁরা হলেন আহ্‌লু'স-সুন্নাতের ইমামগণ।

"আশ-শায়খু'ল 'আরিফ আবূ মুহাম্মদ 'আবদুল কাদির গীলানী (র) তদীয় 'গুনিয়াতু'ত্তালিবীন' নামক গ্রন্থে বলেন ঃ

وهوبجهة العلو مستو على العرش محتو على الملك محيط علمه بالاشياء -

তিনি উচ্চ মর্যাদার দিক থেকে আরশের ওপর সমাসীন, সমগ্র বিশ্বজাহান পরিবেষ্টনকারী এবং সমস্ত কিছুর জ্ঞান তাঁর আয়ত্তাধীন।

একটু সামনে এগিয়ে বলেন ঃ

ولايجوزوصفه بانه فى كل مكان بل يقال انه فى السماء على العرش كما قال الرحمن على العرش استوى.............وينبغى اطلاق صفة الاستواءمن غيرتاويل وانه استواء الذات على العرش -[১]

তাঁর প্রতি এরূপ কথা আরোপ করা জায়েয নয় যে, তিনি সর্বত্র বিরাজমান, বরং এভাবে বলতে হবে, তিনি আসমানী জগতে আরশের ওপর সমাসীন। যেমন আল্লাহ্‌র বাণীঃ দয়াময় আরশে সমাসীন (সূরা ৩২ ঃ ৫)। ..... 'সমাসীন' থাকার এই গুণকে কোনরূপ পরোক্ষ বা দূরতম ব্যাখ্যার (তা'বীল) আশ্রয় ব্যতীত গ্রহণ করা উচিত। আর তা হচ্ছে, তাঁর সত্তা আরশের ওপর সমাসীন।

ইবনে মাখলূফ (তা'বীলের মাধ্যমে) যে 'আকীদা-বিশ্বাসের প্রকাশ ঘটান তা স্বয়ং ইমাম মালিক (র) ও তাঁর সাথী ইমামগণ এবং আবুল হাসান

---

১. শায়খ (র) তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে মযহাব চতুষ্টয়ের বিখ্যাত 'আলিমদের আরও বহু উক্তির উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এখানে আমরা মাত্র দু'টি পেশ করলাম।

আশ'আরী ও তাঁর সঙ্গী ইমামদের সমস্ত নস-এর খেলাফ। তাঁরা সকলেই এরই ব্যাখ্যা দান করেছেন আমরা যা বলছি। এরই ওপর ভিত্তি করে হাম্বলী মযহাবের অনুসারিগণ ও আশ'আরীপন্থীদের মধ্যে সন্ধি ও সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং জনগণের মধ্যে ঐক্য ফিরে আসে। যখন হাম্বলীগণ এ সম্পর্কে আবুল হাসান-আশ'আরীর উক্তি খুঁজে পেল তখন তারা বলল, এটা তো শায়খ আল-মুওয়াফফাক[1]-এর কথার থেকে ভাল। আর এভাবেই তাদের ভেতরকার সব রকমের ঈর্ষা-বিদ্বেষ দূরীভূত হয় এবং শাফি'ঈ ফকীহ প্রমুখের মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায় ঃ

الحمد لله على اتفاق كلمة المسلمين -

মুসলিম ঐক্যের জন্য আল্লাহর যাবতীয় প্রশংসা।

আমারও 'আকীদা এই ঃ

هو مستو على العرش حقيقة بذاته بلاتكنيف ولاتشبيه -

তিনি আরশের ওপর সমাসীন রয়েছেন স্ব-সত্তায়, কোনরূপ পরোক্ষ তাৎপর্য ও সাদৃশ্য কল্পনা ব্যতিরেকেই। সে বলল ঃ আপনি এটা লিখে দিন এবং এটাই মেনে চলুন। আমি বললাম ঃ ঠিক এই সব শব্দেই তোমাদের কাছে আমার ঐ 'আকীদা লেখা আছে এবং এ বিষয়ের ওপর দামিশ্‌কেও প্রচুর আলোচনা হয়েছে। তদুপরি এর ওপর মুসলমানরাও একমত। এখন আমি এ ব্যাপারে আর কি বৃদ্ধি করব?

আমি তাকে আরও বললাম, আমি পঞ্চাশটিরও বেশী কিতাব সরবরাহ করেছি, যেগুলোর সবটিই মুহাদ্দিছীন কিরাম, সুফিয়ান 'ইজাম, মুতাকাল্লিমীন ও মযহাব চতুষ্টয়ের 'আলিম ও ফকীহগণের কিতাব। আর সব কিতাবই আমার মত সমর্থন করছে। অতঃপর আমি আমার বিরোধীদেরকে তিন বছর সময় দিচ্ছি, তারা এ সময়ের ভেতর এর বিরুদ্ধে একটি হরফও ইসলামের ইমামগণের থেকে প্রমাণ করে দেখাক। এখন বলুন, আমি কি করব!

চাপরাশী চলে যাবার পর জেল দারোগা এলেন এবং বললেন ঃ নায়েব-এ সুলতান আপনাকে সালাম জানিয়েছেন এবং আপনাকে আপনার 'আকীদা সম্পর্কে নিজ হাতে লিখে দিতে বলেছেন। আমি বললাম ঃ নায়েব সাহেবকে আমার সালাম দেবেন এবং আমার পক্ষ থেকে বলবেন, এ মুহূর্তে আমি

১. শায়খ মুওয়াফফাক উদ্দীন ইবনে কুদামা, যাঁর ঝোঁক হাম্বলী মযহাবের তা'বীলের দিকে।

যা-ই কিছু লিখি না কেন, লোকে বলবে, শায়খ (র) তাঁর আগেকার 'আকীদার ভেতর হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিয়েছেন অথবা তিনি তাঁর 'আকীদা পরিবর্তন করেছেন। ঠিক আজকের মতই দামিশকে যখন আমার বিরোধীরা আমাকে আমার 'আকীদা লিখে দেবার দাবী জানিয়েছিল, তখনও আমি আমার আগের লেখাই পেশ করেছিলাম। আমি বললাম, সিরিয়ায় তিনটি মজলিসে পঠিত 'আকীদা এটিই এবং সিরিয়ার ভাইসরয় সরকারী ডাকের সঙ্গে তা আগেই পাঠিয়েছেন। আর এ সব লেখাই আপনার কাছে বর্তমান রয়েছে। তা ছাড়া 'আকীদা এমন কোন জিনিস নয় যা আমি আমার পক্ষ থেকে মনগড়াভাবে উদ্ভাবন করব, এমন কি দৈনিক একটি করে 'আকীদার ঘোষণা দেব। আমি আগে যে 'আকীদা প্রকাশ করেছি সেই 'আকীদাই এখনো পোষণ করি এবং আপনাদের কাছে আমার যে লেখা রয়েছে সেটি আমারই লেখা। আপনারা সেটি দেখে নিন। এরপর তিনি ফিরে গেলেন। কিছুক্ষণ পর পুনরায় আসলেন এবং আমাকে কিছু লিখে দিতে বললেন। আমি বললাম ঃ বলুন, আমাকে কি লিখতে হবে? তিনি আমাকে ক্ষমাপত্র জাতীয় কিছু এবং আমি যেন কারুর সঙ্গে বিবাদ কিংবা বিরোধিতায় লিপ্ত না হই এ ধরনের অঙ্গীকারনামা লিখে দিতে বললেন। আমি তাকে আমার সম্মতির কথা জানিয়ে বললাম ঃ দেখুন, কাউকে কষ্ট দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়; কারুর থেকে প্রতিশোধও আমি নিতে চাই না, তেমনি কারুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া কিংবা কাউকে আক্রমণ করাও আমার ইচ্ছা নয়। এমন সকলকেই আমি মাফ করছি যারা আমার সঙ্গে বাড়াবাড়ি করেছে। আমি এটা লিখে দিতে চাইলাম। এরপর আমি বললাম, এটা লেখার কোন নিয়ম নেই। কেননা মানুষ তার হক মাফ করে দেবে, এটা লেখার অপেক্ষা রাখে না।

আমি তাঁকে আরও বললাম, শায়খ নস্‌র আল-মুনজীকে প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবশ্যই অবহিত করা দরকার যাতে তিনি চেষ্টা-তদবীর করে এর কিছুটা সংস্কার-সংশোধন ও ইন্তেজাম করেন। আমার একমাত্র লক্ষ্য হল আল্লাহ ও তদীয় রসূল (স)-এর আনুগত্য। আর যে জিনিস আমি আসলে বিপজ্জনক মনে করি তা হল মিসরবাসীদের পারস্পরিক মতবিরোধ এবং একে অপরের কোন কথাকে কেন্দ্র করে না জানি কোথাও গোলযোগ ছড়িয়ে পড়ে যা শুরু হয়ে গেছে ! আর সিরিয়ায় যা কিছু ঘটেছে তা তো আপনার জানাই আছে, অথচ মিসরের তুলনায় সিরিয়ায় ঐক্যের সম্ভাবনা অনেক বেশী। আমি আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে বলছি, গোলযোগের আগুন নেভাতে (তা সে মিসরেই হোক অথবা অন্য কোথাও) সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবার ক্ষেত্রে আমি সবার অগ্রগামী থাকব এবং কল্যাণ ও মঙ্গলের প্রতিষ্ঠায় আমি

কারুর পেছনে থাকব না। আমি এও বলছি, ইবনে মাখলূফ আমার সঙ্গে যে ব্যবহারই করুক, আমি সাধ্যমত তার সঙ্গে ভাল ব্যবহারই করব। তার কল্যাণ কামনায় আমি চেষ্টার কোন ত্রুটি করব না এবং তার শত্রুকেও আমি কখ্খনো সাহায্য করব না। আর প্রকৃত মদদ ও আশ্রয়দাতা তো আল্লাহ্ই ! এটাই আমার নিয়ত এবং এটাই আমার অটুট সংকল্প, অথচ সকল বিষয় ও যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কে আমি ওয়াকিফহাল। কিন্তু এও আমি জানি, শয়তান মু'মিনের দিলে গোলযোগ ও অরাজকতার বীজ নিক্ষেপ করে আর আমি কখ্খনো আমার মুসলিম ভাইদের বিরুদ্ধে শয়তানের সহযোগী হব না।

এই যে চক্র ও পেরেশানীর হাত থেকে মুক্তি পাবার পথ হল আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন করা, তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ও তওবা করা এবং সাচ্চা দিল নিয়ে তাঁরই দরবারে আশ্রয়প্রার্থী হওয়া। কেননা তিনি ভিন্ন আর কোন আশ্রয় নেই।

فانه سبحانه لاملجاء منه الااليه ولاحول ولاقوة الابالله -

এখন বাকী থাকল ইস্তিগাছা তথা সাহায্য প্রার্থনার প্রশ্ন। তা এ ব্যাপারে তামাম দুনিয়ার মুসলমানরা একমত এবং ইসলামের এটা সুস্পষ্ট ও অকাট্য মসলা যে, আল্লাহ তা'আলা ভিন্ন অপর কারুর ইবাদত, কারুর নিকট দু'আ ও সাহায্য প্রার্থনা কিংবা কারুর ওপর তাওয়াক্কুল (নির্ভর) করা জায়েয নয় এবং কেউ যদি আল্লাহ্র নৈকট্যপ্রাপ্ত ফিরিশতা অথবা প্রেরিত পয়গম্বরের ইবাদত তথা বন্দেগী করে কিংবা তার নিকট দু'আ অথবা সাহায্য প্রার্থনা করে, তবে সে মুশরিক। কোন মুসলমানের পক্ষে একথা বলা জায়েয নয়, 'হে জিবরাঈল! হে মীকাঈল ! হে ইবরাহীম! হে মূসা ! ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে মাগফিরাত করুন অথবা আমার ওপর রহম করুন কিংবা আমাকে রিযিক দিন বা আমাকে সাহায্য করুন অথবা আমার ফরিয়াদ শুনুন কিংবা আমার শত্রুর হাত থেকে আমাকে আশ্রয় দিন, 'আমাকে বাঁচান' এবং এ জাতীয় আরো কথা। এ সব একমাত্র আল্লাহ্র জন্যই খাস। এ সব একমাত্র তাঁরই বৈশিষ্ট্যের অন্তর্গত এবং এটি বিরাট গুরুত্বপূর্ণ ও বিখ্যাত মসলা। 'উলামায়ে কিরাম যে সম্পর্কে বিস্তৃত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে গেছেন এবং তাঁরা আল্লাহ ও তদীয় রসূল (সা)-এর নির্ধারিত সীমারেখা ও অধিকারসমূহের ভেতর পার্থক্য বর্ণনা করে গেছেন।[১] এটি ইসলামের

১. এখানে শায়খুল-ইসলাম (র) তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে কুরআন পাকের বহু আয়াত ও হাদীস একত্র করেছেন। বিস্তারিত জানতে চাইলে দেখুন رسالة المحنة شامل رسالہ مجموعه علميه ص ٦٠-٦٢

মূলনীতির অন্যতম। এখন তুমি দূত (ইবনে মাখলূফ) যদি ইসলাম ধর্ম ও খ্রিস্ট ধর্মের ভেতর পার্থক্য করতে না পার, যারা হযরত 'ঈসা মসীহ ও তাঁর শ্রদ্ধেয়া মাতার নিকট দু'আ প্রার্থনা করে তাহলে আমি কি করতে পারি! কিন্তু যারা সায়্যিদা নফীসা[১]-কে 'রব' বানায় এবং বলে যে, তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত লোককে আশ্রয় দেন, বিপদগ্রস্ত লোকের ফরিয়াদ শোনেন, দরকারী সাহায্য করেন এবং তারা তাঁর স্নেহের ছায়া ও প্রভাব তলে আছে, এই বিশ্বাসে তারা তাকে সিজদা করে এবং মানুষ যেভাবে আসমান-যমীনের রব তথা প্রভু-প্রতিপালকের দরবারে কান্নাভেজা কণ্ঠে দু'আ করে, ঠিক তেমনি তারা তার নিকট মিনতি জানায়। তারা এমন জীবিতের ওপর নির্ভর করে যার ইন্তিকাল হয়ে গেছে আর সেই জীবন্ত সত্তার ওপর ভরসা করে না যিনি চিরঞ্জীব থাকবেন, যাঁর লয় নেই, ক্ষয় নেই এবং যিনি অবিনশ্বর। এতে কোনই সন্দেহ নেই, এমন সত্তাকে শরীক করা যিনি সায়্যিদা নফীসা থেকে উত্তম তাদের শরীক করা থেকে অধিকতর শক্তিশালী হবে।[২]

এখন বাকী থাকল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি'স-সালাম-এর অধিকার (আমার পিতামাতা তাঁর ওপর কুরবান হোন)। যেমন তাঁর ভালবাসাকে আপন প্রাণ, সম্পর্কিত জন ও বিত্ত-সম্পদের মুকাবিলায় অগ্রাধিকার প্রদান করা এবং তাঁর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা পোষণ, তাঁকে মর্যাদা প্রদর্শন, তাঁর সুন্নাহর অনুসরণ ও আনুগত্য ইত্যাদি। তা এগুলো তো বিরাট ব্যাপার! ঠিক তেমনি তাঁকে দু'আর ভেতর ওসীলা বানানো নিঃসন্দেহে উত্তম কাজ। কিন্তু তাঁর নিকট দু'আ ও আশ্রয় প্রার্থনা করা এবং তাঁর দোহাই দেওয়া হারাম। আমি এ বিষয়ের ওপর الصارم المسلول على شاتم الرسول নামে একটি পুস্তক লিখেছি। এ পুস্তকে উল্লিখিত সমস্যার বিস্তারিত পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ দিতে চেষ্টা করেছি, যে বিষয়ে আমার জানা মতে এর আগে অন্য কোন পুস্তকে এত ব্যাপক বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করা হয়নি। ঠিক তেমনি সে সমস্ত কায়দা-কানূন ও ঈমানের মূলনীতি সম্বন্ধেও বহু নিবন্ধ ও পুস্তক-পুস্তিকা আমি লিখেছি যেগুলো দীন ইসলাম সম্পর্কে অত্যন্ত উপকারী।

শায়খ (নস্‌র আল-মুনজী)-এর গোচরে একথা আসা দরকার। আমি আশংকা করি, না জানি গোটা ব্যাপারটাই তাঁর হাতছাড়া হয়ে যায় এবং তা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়! এমন কিছু না ঘটে যায়, যার খারাপ পরিণতি

---

১. সায়্যিদা নফীসা আহলে বায়ত-এর অন্যতম এবং তাঁর কবর কায়রোয় অবস্থিত। সাধারণ মানুষ এ কবরকে সম্মান জানিয়ে থাকে।

২. শায়খুল ইসলাম ইমাম তায়মিয়া (র) তওহীদ সম্পর্কিত আয়াত-ই কারীমা ও হাদীস পাক উদ্ধৃত করেছেন। المحنة দেখুন।

তাঁকে, ইবনে মাখলূফ প্রমুখকে সইতে হয়। আমি একথা এজন্য বলছি, আমাকে এ ধরনের কথা বলার জন্য বলা হয়েছে যা তাঁর জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে। আমি তাতে রাযী হই নি। কেননা আমি তাঁর আন্তরিক সুহৃদ। আল্লাহ্র কসম! আমি কখনো তাঁর সঙ্গে প্রতারণা করি নি। যদি তাঁর সঙ্গে প্রতারণা করতাম তাহলে একথা আমি প্রকাশ করতাম না (আমাকে এমন কথা বলতে বলা হয়েছে যা বললে তাঁর ক্ষতি হবে)। সৎ ও আল্লাহভীরুতার কাজে আমি তাঁদের উভয়ের সহযোগী।

আপনি তাঁকে এও বলে দেবেন, সেই বুনিয়াদ যার উপর যাবতীয় কায়-কারবার দুরস্ত হতে পারে তা হল এই যে, সকলেই আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন করুক এবং মাহে রমযানের এই পবিত্র ও বরকতময় দশকে তওবা করুক। মানুষের দিল ও অভ্যন্তর ভাগ যখন ঠিক হয়ে যাবে তখন তার বাহ্যিক দিক আপনা-আপনি ঠিক হয়ে যাবে। "যারা মুত্তাকী ও পরোপকারী–আল্লাহ তাদের সঙ্গেই থাকেন।" [আল-কুরআন]

ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون -

কারা অভ্যন্তরে সংস্কার প্রয়াস, তা'লীম ও তার প্রভাব

আল-কাওয়াকিবু'দ্দুর্রিয়ার লেখক শায়খুল ইসলামের সমসাময়িক ও সহপাঠী শায়খ 'আলামুদ্দীন আল-বারযালীর বরাত দিয়ে লেখেন ঃ

শায়খ যখন মজলিসে গেলেন, দেখতে পেলেন, কয়েদীরা খেল-তামাশা ও আমোদ-প্রমোদে মত্ত। আর এভাবেই তারা নিজেদের মনকে ভুলিয়ে রাখে এবং সময় কাটায়। তাস, দাবা প্রভৃতি খেলার বেশ প্রতাপ। সালাতের কাযা ছিল স্বাভাবিক ব্যাপার। শায়খ এ সবের বিরুদ্ধে আপত্তি তোলেন এবং কয়েদীদেরকে নিয়মিত সালাত আদায়, আল্লাহ্র দিকে মনোনিবেশ, সৎ কর্ম, তসবীহ-তাহলীল, তওবা-ই ইস্তিগফার ও আল্লাহ্র দরবারে দু'আ ও মুনাজাতের প্রতি তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। তিনি তাদেরকে সুন্নাহর তা'লীম ও কল্যাণকর কাজে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করতে শুরু করেন। ফলে অল্পদিনেই 'ইল্ম ও ধর্ম চর্চা এমনভাবে শুরু হয়ে যায় যে, এই জেলখানা অনেক মাদরাসা ও খানকাহ্র চেয়েও বেশী প্রোজ্জ্বল ও বরকতময় হয়ে ওঠে। লোকে শায়খ (র)-এর ব্যক্তিত্বের সঙ্গে এতখানি সম্পৃক্ত এবং জেলের এই ধর্মীয় ও ইলমী পরিবেশের প্রতি এতটা আকৃষ্ট হয়ে পড়ে যে, অনেক কয়েদী জেল থেকে মুক্তি পাবার পরও তাঁর সঙ্গ পরিত্যাগে প্রস্তুত ছিল না, বরং জেলে তাঁর খেদমতে অবস্থান করাকেই অধিকতর পছন্দ করত।[১]

১. আল-কাওয়াকিবুদ্দুররিয়া, ১৮১ পৃষ্ঠা।

চার মাস পর (১৪ই সফর, ৭০৭ হি.) পুনরায় তাঁর মুক্তির চেষ্টা চলে। কাযীউ'ল-কুযাত বদরুদ্দীন ইব্‌ন জিমা'আ স্বয়ং তাঁর সঙ্গে মোলাকাত করেন এবং অনেকক্ষণ কথা বলেন। কিন্তু তিনি জেলের বাইরে আসতে রাযী হন নি। অবশেষে ২৩শে রবী'উ'ল-আওয়াল তারিখে আমীর হুসসামুদ্দীন মুহিন্না ইবন 'ঈসা মালিকু'ল-'আরব[১] স্বয়ং জেলখানায় যান এবং শায়খ (ইবনে তায়মিয়া)-কে কসম দেন। অতঃপর তিনি তাঁকে সাথে করে নায়েব-ই মিসর-এর ঘরে নিয়ে আসেন। আমীর হুসসামুদ্দীন তাঁকে তাঁর সঙ্গে দামিশক নিয়ে যেতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু নায়েব-এ সালাতানাত (সাম্রাজ্যের ভাইসরয়) পরামর্শ দেন, শায়খ (র)-কে এখনও কিছুদিন মিসরে অবস্থান করাই ভাল হবে যাতে লোকে তাঁর 'ইল্‌ম ও মর্যাদা সম্পর্কে পরিমাপ করতে পারে এবং তাঁর থেকে উপকৃত হতে পারে।

ইব্‌ন তায়মিয়া (র)-এর চারিত্রিক সমুন্নতি

ইতোমধ্যে ইব্‌ন তায়মিয়া (র)-র সীরাত তথা জীবন-চরিতের সমুন্নতি অধিকতর উজ্জ্বলভাবে প্রতিভাত হয়। তিনি কোন শক্তির সামনেই তাঁর উন্নত মস্তক অবনত করেন নি কিংবা কোন জাগতিক প্রেরণা অথবা আর্থিক স্বার্থই তাঁর পবিত্র চরিত্রকে কলুষিত করতে পারেনি। তিনি সুলতান প্রদত্ত খেলাত ও উপহার-উপঢৌকনাদি গ্রহণ করতেও পরিষ্কার অস্বীকার করেন।

তাঁর দ্বিতীয় কৃতিত্বপূর্ণ অবদান হল, তিনি জেল থেকে বের হতেই তাঁর সব বিরোধীকে এবং সে সব লোককে যারা তাঁকে কষ্ট দিতে প্রয়াস পেয়েছিল, মাফ করে দেন। এক্ষেত্রে তাঁকে কে কত কষ্ট দিয়েছিল কিংবা কে কতটা বিরোধিতায় নেমেছিল সে বিচারে তিনি যান নি। তিনি পরিষ্কার ঘোষণা দেন, কারুর বিরুদ্ধে তাঁর কোন অভিযোগ নেই এবং কাউকে তিনি জওয়াবদিহিরও সম্মুখীন করতে চান না। কারা মুক্তির পর তিনি সিরিয়াতে যে চিঠি লিখেছিলেন তাতে তিনি বলেন ঃ

تعلمون رضی لله عنكم انى لا احب ان يوذى احد من عموم المسلمين فضلا عن اصحابنا شئ اصلا - لاظا هرا اوباطنا - ولاعندى عتب على احد منهم ولالنوم

১. আমীর হুসসামুদ্দীন আরব বংশে আমীরানা খান্দানের সদস্য এবং সিরিয়ার একজন প্রভাবশালী ও শক্তিশালী রঈস ছিলেন। সিরিয়ার অধিবাসী হবার কারণে তিনি ইব্‌ন তায়মিয়ার জিহাদী তৎপরতা ও সংস্কার-প্রচেষ্টা সম্পর্কে মিসরীয়দের তুলনায় অধিকতর জ্ঞাত ছিলেন। এজন্য তিনি ইব্‌নে তায়মিয়ার মুক্তির ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ দেখান। তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহ, উচ্চ বংশ ও স্বাধীনতাপ্রিয়তার কারণে তিনিও তাঁর আগ্রহে সাড়া দেন এবং কারাগারে বাইরে আসতে সম্মত হন।

اصلا بل لهم عندى من الكرامة والاجلال والمحبة اضعاف ما كان ـ كل بحسبه ولايخلوا الرجل اما ان يكون مجتهدا اومخطئا او مذنبا فالاول ماجور مشكور ـ والثانى مع اجره على الاجتهاد معفوعنه والثالث فالله يغفرلنا وله ولسائر المؤمنين ـ لاحب ان ينتصر من احد بسبب كذبه على وظلمه او عدوانه ـ فانى قد احللت كل مسلم وانا احب الخير لكل المسلمين ـ واريدلكل مؤمن من الخيرمااريده لنفسى والذين كذبواوظلموا هم فى حل من جهتى ـ

আল্লাহ্ পাক আপনার প্রতি প্রসন্ন থাকুন! আপনি অবগত আছেন, আমি চাই না আমার জন্য মুসলমানদের কারুর কষ্ট হোক, আর আমি এও চাই না, সে কষ্ট বাহ্যিক হোক অথবা প্রচ্ছন্ন, কোন মুসলমান পাক। যেখানে সাধারণ মুসলমানের ক্ষেত্রে আমার অবস্থা এই, সেখানে আমার বন্ধুদের (উলামায়ে কিরাম ও আহলে দীন) ক্ষেত্রে তা পছন্দ করবার অর্থাৎ আমার কারণে তাঁরা কোন কষ্ট পাক, প্রশ্নই ওঠে না। কারুর বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই, নেই কোন নিন্দা কিংবা কোন ভর্ৎসনা, বরং প্রকৃত অবস্থা হল, তাঁদের প্রতি আমার সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ, তাঁদের প্রতি আমার ভালবাসা আমার হৃদয়ে আগের চেয়ে অনেক গুণ বেশীই রয়েছে আর প্রত্যেকের প্রতি তাঁদের মর্যাদা মুতাবিক। মানুষ (কোন মানুষের সঙ্গে মতভেদ ও দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের ক্ষেত্রে) হয় মুজতাহিদ হন অথবা হন ভ্রমে নিপতিত কিংবা গোনাহ্গার। মুজতাহিদ সওয়াব ও শোকর দুটোরই হকদার হন, ভ্রমে নিপতিত ব্যক্তি ক্ষমার যোগ্য। থাকল কেবল গোনাহগার। আল্লাহ আমাদেরকে, তাদেরকে ও সমস্ত মু'মিন মুসলমানকে ক্ষমা করুন। আমি চাই না কোন লোক থেকে কেবল এজন্য প্রতিশোধ গ্রহণ করতে যে, সে আমার ওপর অপবাদ আরোপ করেছিল অথবা জুলুম কিংবা বাড়াবাড়ি করেছিল। কেননা প্রত্যেক মুসলমানকে আমি ক্ষমা করে দিয়েছি এবং আমি সমস্ত মুসলমানের কল্যাণ কামনা করি। আমি প্রত্যেক ঈমানদার মুসলমানের জন্য তাই চাই যা আমি নিজের জন্য চাই। যে সমস্ত লোক মিথ্যা বলেছে এবং যারা জুলুম করেছে, আমার পক্ষ থেকে তারা মুক্ত ও স্বাধীন। আমার পক্ষ থেকে তাদের কোন আশংকা নেই।[১]

---

১. ইবনে তায়মিয়া, মুহাম্মদ আবূ যুহ্‌রাকৃত, পৃ. ৬৩।

দর্‌স প্রদান ও জনকল্যাণ

জেল থেকে বেরিয়ে আসবার পর ইবনে তায়মিয়া (র) দরস প্রদান ও জনকল্যাণমূলক কর্মে মশগুল হয়ে পড়েন। মিসরের পরিবেশ তখন তাঁর জন্য উপযোগী ছিল না। 'আলিম-'উলামা ও কাযীগণ তাঁর সম্পর্কে নানা রকমের বিভ্রান্তি ছড়িয়ে রেখেছিল। সূফী সম্প্রদায়ও (যাদের ভেতর তওহীদে ওজূদীর গন্ধ বেশ ভালই পাওয়া যেত) তাঁর প্রতি ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করত এবং তাঁর প্রতি বিতৃষ্ণ ছিল। মযহাব চতুষ্টয়ের ভেতর কেবল হাম্বলী মযহাব ও নানান 'আকাইদের ভেতর থেকে কেবল "আকাইদে সলফ" (প্রাচীন বুযুর্গদের 'আকীদা)-এর ওকালত ও প্রতিনিধিত্বের জন্য দেশে কোন শক্তিশালী প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব বর্তমান ছিল না।[১] অপরাপর মযহাবের বড় বড় কাযী ও 'আলিম বর্তমান ছিলেন। এই সমস্ত কারণে ইবনে তায়মিয়া (র) মিসরে আরো কিছুকাল অবস্থান, দর্‌স প্রদান ও কল্যাণধর্মী কাজে আত্মনিয়োগের সংকল্প গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি দস্তরমত ও দস্তরহীনভাবে দর্‌স প্রদান করতে এবং মজলিস অনুষ্ঠান শুরু করে দেন। নির্ভেজাল 'ইলমী ও কালামশাস্ত্রীয় মসলা-মাসায়েলের ওপর কায়রোর বিখ্যাত মাদরাসা, বিশেষত সালিহিয়া মাদরাসায় তিনি কয়েকটি দর্‌স প্রদান করেন। এর ফলে বিশিষ্ট জনেরা ও বোদ্ধা লোকেরা উপকৃত হয় এবং তারা তাঁর প্রকৃত ধ্যান-ধারণা ও 'আকীদা বিশ্বাস সম্পর্কে অবহিত হয়।

দর্‌স প্রদানের এই ধারা ছ'মাস কাল চলে, যার ফলে সাধারণ ও বিশিষ্ট সকলেই ধর্মীয় ও তত্ত্বগত দিক দিয়ে উপকৃত হয় এবং জনগণ তাঁর ঐকান্তিক নিষ্ঠা, অসাধারণ মেধা, প্রতিভা ও গভীর বিদ্যাবত্তার প্রতি ব্যাপকভাবে আকৃষ্ট হয়।

মায়ের নামে ইবনে তায়মিয়া (র)-র পত্র

ইবনে তায়মিয়া (র) মিসরে এসেছিলেন হঠাৎ করে। তাঁর ধারণা ছিল না, তাঁকে এখানে এত দীর্ঘ সময় অবস্থান করতে হবে। তাঁর মাতাসহ গোটা পরিবারই ছিলেন সিরিয়ায়। তিনি ভালভাবে ফিরে আসবেন, এই আশায় তাঁরা অধীরভাবে অপেক্ষা করছিলেন। ইবনে তায়মিয়া (র) ধর্মীয় মুসলিহাতের খাতিরে যখন কিছুকাল মিসরে অবস্থানের ফয়সালা করলেন তখন তিনি তাঁর ওয়ালেদা মুহতারামাকে তাঁর এই সংকল্পের কথা জানিয়ে দেন এবং এজন্য তাঁর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করেন। প্রেরিত পত্র ছিল সূক্ষ্ম আবেগ-অনুভূতি, পবিত্র ভালবাসা, সন্তান সৌভাগ্য, পুরুষোচিত উৎসাহ-উদ্দীপনা ও দৃঢ়তার সাক্ষাৎ প্রতিফলন আর এ পত্র লেখা হয়েছিল অত্যন্ত সরল ও সাবলীল ভাষায়। প্রেরিত পত্র এখানে উদ্ধৃত করা গেল ঃ

২. আকস্মিকভাবে সে সময় কাযী হাম্বলী খুবই সীমিত জ্ঞান ও উপলব্ধির অধিকারী ছিলেন এবং তাঁরই কারণে হাম্বলীদের পাল্লা ছিল দুর্বল (দ্র. ইবনে কাছীর, পৃ. ১৪/৩৭)।

من احمد بن تيمية الى الوالدة سعيدة -- على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما -

আহমদ ইবনে তায়মিয়ার পক্ষ থেকে মাখদূমা ওয়ালেদা সাহেবার প্রতি। আল্লাহ্ পাক তাঁর অফুরন্ত নে'মত দ্বারা তাঁর চক্ষু শীতল রাখুন, স্বীয় অনুগ্রহ দ্বারা তাঁকে ধন্য করুন এবং তাঁকে স্বীয় দাসীদের অন্তর্গত করুন।

আসসালামু 'আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু,

আমি সেই আল্লাহ পাকের শোকর গুযারী করছি যিনি ভিন্ন অন্য কোন মা'বূদ নেই। প্রশংসার যোগ্য একমাত্র তিনিই এবং তিনিই সকল বস্তুর ওপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ্র রহমত ও শান্তি নাযিল হোক শেষ নবী, মুত্তাকীদের ইমাম, আল্লাহ্র বান্দা ও রসূল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর বংশধরদের ওপর।

আপনার খেদমতে আমি এই পত্র লিখছি। আমার অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করতে গিয়ে আপনাকে জানাচ্ছি, আল্লাহ পাক আমাকে যে নে'মত ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন এবং মহাদানে আমাকে অনুগৃহীত করেছেন, আমি তা বেশ বুঝতে পারছি। এজন্য আমি তাঁর দরগায় শোকর গুযারী করছি। অধিকন্তু আরও বেশী পাবার জন্য তাঁর দরবারে প্রার্থনা জানাচ্ছি। তাঁর নে'মত অফুরন্ত এবং তাঁর অনুগ্রহ সংখ্যাতীত। আপনার অবগতির জন্য লিখছি, এ মুহূর্তে কতক জরুরী কাজের জন্য আমি মিসরে অবস্থান করছি। এক্ষেত্রে আমি যদি কোন প্রকার অলসতা কিংবা গাফিলতির আশ্রয় নিই তাহলে দীন-দুনিয়া উভয়টিরই অকল্যাণ ও ক্ষতির আশংকা রয়েছে। আল্লাহ্র কসম করে বলছি, এখানে আমি আমার নিজস্ব এখতিয়ার কিংবা ইচ্ছায় অবস্থান করছি না আর আপনার থেকে আমার এই সুদূর অবস্থান আমি নিজে এখতিয়ার করি নি। (আমার হৃদয়াবেগ ও আগ্রহের অবস্থা হল,) মন চায়, হায়! আমার যদি পাখির মত দু'টো পাখা থাকত আর আমি যদি পাখায় ভর দিয়ে একবার উড়লেই আপনার কাছে পৌঁছে যেতে পারতাম! কিন্তু হায়! সুদূর মিসর প্রবাসীর হৃদয় কন্দরের গুমরে মরা কান্নার আওয়ায ও চিত্র এবং তার অক্ষমতা ও অসহায়ত্ব একমাত্র ভুক্তভোগী ছাড়া আর কেউ বুঝবে না। আপনি যদি প্রকৃত অবস্থা জানতে পারেন তাহলে আপনি (দীনী জযবা ও বুলন্দ হিম্মতীর কারণে) এ মুহূর্তে আমার মিসরে অবস্থানের পক্ষেই রায় দেবেন। যতদূর আমার ইচ্ছা, আমি এক মাস কালও মিসরে অবস্থান ও বসবাস করবার কখনো সংকল্প নেই নি, বরং আমি প্রত্যহ

মনেপ্রাণে আমার নিজের ও আপনার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে মঙ্গল প্রার্থনা করে থাকি। আপনিও আমাদের জন্য দু'আ করুন যেন আল্লাহ্ পাক আমাদের ভাগ্যে শুভ ও কল্যাণ নির্ধারণ করেন।

আল্লাহ পাক তাঁর অপার অনুগ্রহে কল্যাণ ও রহমত এবং হেদায়াত ও বরকতের এমন সব দরজা উন্মুক্ত করে দিয়েছেন যা প্রথমে আমার কল্পনায়ও ছিল না। আমি সব সময় এখান থেকে বেরিয়ে পড়বার চিন্তায় রয়েছি এবং আল্লাহ্র দরবারে ইস্তেখারা করছি। কেউ যেন একথা মনে না করে, আমরা আপনার নৈকট্য ও সান্নিধ্যের মুকাবিলায় পার্থিব ও জাগতিক কোন স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিচ্ছি। জাগতিক স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়া তো দূরের কথা (নফল পর্যায়ের কোন কিছুর ভেতর থেকে), এমন কিছুর অগ্রাধিকার দেবার জন্যও প্রস্তুত নই যার মুকাবিলায় আপনার নৈকট্য ও খেদমত ধর্মীয় দিক দিয়েও উত্তম। কিন্তু এমন কিছু জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ও সমস্যা রয়েছে যা পরিত্যাগ করলে আমাদের সাধারণ ও বিশেষ দু'ধরনের ক্ষতির আশংকা রয়েছে। যিনি এখানে উপস্থিত তিনিই কেবল তা পরিমাপ করতে পারবেন, অন্য কেউ নয়। আপনার খেদমতে তাই আবেদন, আপনি আল্লাহ্র কাছে অধিক পরিমাণে দু'আ করতে থাকুন যেন তিনি আমাদের অনুকূলে কোন কল্যাণকর ফয়সালা প্রদান করেন (অর্থাৎ আমরা মিসরেই অবস্থান করব– নাকি ঘরে ফিরব)। কেননা আল্লাহ্ই সকল কিছু সম্পর্কে খবরদার, পক্ষান্তরে আমরা একেবারেই বেখবর। সঠিক পরিমাপ সম্পর্কে তিনিই অবহিত, পক্ষান্তরে আমরা অজ্ঞ। তিনি গোপন ও প্রকাশ্য সকল বস্তু সম্পর্কেই ওয়াকিফহাল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ মানুষের সৌভাগ্য এই যে, সে আল্লাহ্র দরবারে মঙ্গল প্রার্থনা করে, তার ভাল-মন্দের ফয়সালার ভার তাঁরই ওপর ন্যস্ত করে এবং তিনি যে ফয়সালা করেন সন্তুষ্ট চিত্তে তা মেনে নেয়। আর তার মন্দ ভাগ্য এই যে, সে ইস্তেখারা ও আল্লাহ্র দরবারে মঙ্গল প্রার্থনা করা পরিত্যাগ করে এবং তাঁর প্রদত্ত ফয়সালায় অসন্তোষ ও অতৃপ্তি প্রকাশ করে।

আম্মা!

আপনি তো জানেন, একজন ব্যবসায়ীও ভিন দেশে থাকা অবস্থায় যখন তার টাকা-পয়সা ও মালমাত্তা নানা হাতে ও নানা জনের কাছে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে ও অবস্থানের মেয়াদ বাড়াতে বাধ্য হয় যতক্ষণ পর্যন্ত না সে বিক্ষিপ্ত টাকা-পয়সা আদায় ও মালমাত্তা গুছিয়ে নিতে সক্ষম হয়। আর আমরা যে মহান উদ্দেশে ও বিরাট কাজের জন্য অবস্থান

করছি তার প্রকৃতিই তো ভিন্ন। এর সঙ্গে পার্থিব লেনদেন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের কোন তুলনাই চলে না। ব্যস! আমাদের আশ্রয় ও শক্তিদাতা একমাত্র আল্লাহ্ই। আপনার ও বাটিস্থ ছোট-বড়, আত্মীয়-পরিজন সকলের ওপর সালাম।

صلى الله على سيدنا محمد واله وسلم تسليما كثيرا -

পুনর্বার বন্দী

মিসর ছিল "ওয়াহদাতু'ল -ওজূদ" 'আকীদার স্থায়ী কেন্দ্র। বিখ্যাত সূফী কবি ইবনু'ল-ফারিদ (র) এই 'আকীদার একজন উৎসাহী প্রচারক ছিলেন। তাঁর কবিতায় ও কাব্যের নানা স্থানে উক্ত মতবাদের ঝলক দেখতে পাওয়া যায়। ৬৩২ হিজরীতে কবি ইনতিকাল করেন। ইবনে তায়মিয়া (র) খোলাখুলিভাবে উল্লিখিত 'আকীদার সমালোচনা ও তা প্রত্যাখ্যান করতেন এবং স্বীয় দরস মাহফিল ও ব্যক্তিগত বৈঠকে তাঁর (ইবনু'ল-ফারিদ-এর) বাণী ও কর্মের সমালোচনা করতে থাকতেন। কেননা তাঁর মতে ওয়াহ্দাতু'ল-ওজূদ 'আকীদা ছিল কুরআন ও সুন্নাহ্র পরিপন্থী এবং এ মতবাদকে তিনি শেষ যুগের সূফী বুযুর্গদের অতিরিক্ত বাড়াবাড়ির অন্তর্গত মনে করতেন। তিনি তাঁর গ্রন্থের নানা জায়গায় হযরত শায়খ 'আবদুল কাদির জীলানী (র) ও শায়খ 'আদীয়্যি ইবন মুসাফির উমুবীর ন্যায় মুহাক্কিক ও দৃঢ় বিশ্বাসী সূফী দরবেশের নাম অত্যন্ত আদব, সম্মান ও শ্রদ্ধার সঙ্গে নিয়েছেন। কিন্তু তিনি তাঁর সমসাময়িক বুযুর্গ, সূফী দরবেশদের সমালোচনা করতে আদৌ ইতস্তত করতেন না, যাঁরা তাঁর মতে গ্রীক দর্শন এবং মিসর ও ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যা (اشراق) দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। শায়খ (র)-এর এসব বক্তৃতা ও সমালোচনায় তাসাওউফপন্থী মহলে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। মিসরের বিখ্যাত শায়খ-ই তরীকত ইবনে 'আতাউল্লাহ্ আল-ইস্কান্দারী (আল-হিকাম প্রণেতা) তাসাওউফপন্থী মহলের পক্ষ থেকে শাসন কর্তৃপক্ষের নিকট ইবনে তায়মিয়া (র)-র বিরুদ্ধে নালিশ করেন। সূফীদের একটি বড় দল স্বয়ং কেল্লায় গিয়ে ইবনে তায়মিয়া (র)-র নামে অভিযোগ পেশ করে। সুলতান এসব অভিযোগে প্রভাবিত হয়ে 'দারু'ল-'আদল'-এ একটি বৈঠক অনুষ্ঠানের এবং এজন্য প্রয়োজনীয় তদন্তের নির্দেশ দেন। এ মজলিসে ইবনে তায়মিয়া (র) স্বয়ং অংশ নেন এবং নিজেই নিজের মোকদ্দমার ওকালতি করেন। তাঁর যুক্তিপূর্ণ ও জোরদার বক্তব্যে সবাই নিশ্চুপ মেরে যায় এবং ইমামের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়।

কিন্তু এতেও ইমামের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রশমিত হয় নি। তাঁর বিরুদ্ধে আরও একটি অভিযোগ ছিল, তিনি প্রকাশ্যে এ কথা প্রচার করেন, আল্লাহ ভিন্ন অপর কারোর দোহাই পাড়া যাবে না এবং স্বয়ং সরওয়ারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর ব্যক্তিসত্তার নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করাও জায়েয নয়। এ অভিযোগ পেশ হলে কতক 'আলিম-'উলামা বলেন, এতে তো দোষের কিছু নেই (অর্থাৎ একথা বলার জন্য ইমামকে অভিযুক্ত করা চলে না)। কাযীউ'ল-কুযাত কেবল এতটুকু বললেন, এ কথার ভেতর অবশ্যই কিছুটা বেয়াদবী আছে। কিন্তু কেউই বলেনি, একথা কুফরের সীমারেখায় গিয়ে পৌঁছেছে। ফলে এ অভিযোগও মাঠে মারা যায়।

অবশেষে নিত্য দিনের অভিযোগ, বিক্ষোভ ও হৈ-হাঙ্গামায় হুকুমতও অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। হুকুমত শায়খ-এর সামনে তিনটি প্রস্তাব পেশ করে এবং তন্মধ্যে যে কোন একটি বেছে নেবার পরামর্শ দেয়ঃ তিনি তাঁর স্বদেশ দামিশ্‌কে ফিরে যাবেন অথবা আলেকজান্দ্রিয়ায় অবস্থান গ্রহণ করবেন। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রে তাঁকে কতক শর্ত মেনে চলতে হবে, নতুবা তিনি কারাগারে গমন করবেন। শায়খ (র) শেষোক্ত প্রস্তাবটিতে অগ্রাধিকার প্রদান করেন। কিন্তু তাঁর ছাত্র ও বন্ধু-বান্ধব তাঁকে দামিশ্‌ক সফরে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকে এবং তাদের পীড়াপীড়িতে তিনি তা মঞ্জুর করেন এবং ৭০৭ হিজরীর ১৮ই শাওয়াল তারিখে তিনি রওয়ানা হয়ে পড়েন। কিন্তু সেদিনই তাঁকে মিসরে ফিরিয়ে আনা হয় এবং বলা হয়, হুকুমত আপনার জেলখানায় থাকাকেই সঙ্গত মনে করছে। কিন্তু কাযী ও 'আলিম-'উলামা এবার দ্বিধান্বিত ছিলেন এই ভেবে, এবার তিনি কোন্ অভিযোগের কারণে জেলে যাবেন। মালিকী মযহাবের কাযী শামসুদ্দীন আত-তিউনিসী পরিষ্কার ভাষায় বলেন, তাঁর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি (বিধায় তাঁকে জেলে পাঠানো যুক্তি ও ন্যায়নীতি বিরোধী)। নূরুদ্দীন মালিকীও ব্যাপারটা বুঝে উঠতে ও মেনে নিতে পারছিলেন না। তিনি নিশ্চুপ ছিলেন। 'আলিম-'উলামা ও বিচারকগণের এই মানসিক টানা-পোড়েন দেখে নিজেই ফয়সালা করেন, তিনি নিজের থেকেই জেলে যাবার জন্য তৈরী। নূরুদ্দীন আয-যাওয়াদী বলেন, তাঁকে এমন জায়গায় রাখা না হোক যা হবে তাঁর মর্যাদা উপযোগী। হুকুমতের পক্ষ থেকে বলা হয়, জেলের ক্ষেত্রে তাঁর প্রতি কোনরূপ আনুকূল্য প্রদর্শন কিংবা বিশেষ সুবিধা প্রদানের তাঁরা বিরোধী। এজন্য তারা আদৌ প্রস্তুত নন। الدولة ماترضى الايمسى الحبس (হুকুমত তো তাকে সেখানেই রাখতে চায় যার নাম জেলখানা)। অনন্তর বিচারকদের বন্দিত্বে তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং এ অনুমতি প্রদান করা হয়, খেদমতের জন্য কেউ তাঁর সঙ্গে থাকতে পারে।[১]

১. বিস্তারিত জানতে চাইলে দ্র. ইব্‌ন কাছীর, ১৪খ, ৪৬ পৃষ্ঠা।

এই বন্দী দশায় ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) রুটিন মাফিক নিয়মিত কাজের মধ্যে নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন। এই বন্দিত্ব নজরবন্দীরই নামান্তর ছিল মাত্র। ছাত্র ও 'আলিম-'উলামা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারতেন এবং তাঁর বিদ্যাবত্তা ও পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা থেকে উপকৃত হতে পারতেন। গুরুত্বপূর্ণ মসলা-মাসায়েলের ব্যাপারে তাঁর নিকট ফতওয়াও গ্রহণ করা হত।

কিছুকাল পরই মাদ্‌রাসা-ই-সালিহিয়ায় কাযী ও ফকীহদের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং সম্মেলনে আগত মেহমানদের সম্মিলিত ইচ্ছা ও ঐকান্তিক আগ্রহে ইবনে তায়মিয়া (র)-কে মুক্ত করে দেওয়া হয়। জনগণ তাঁকে বিপুল অভ্যর্থনা জানায় এবং পূর্বের তুলনায় আরও বেশী করে লোক তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়ে।

রাজনৈতিক পরিবর্তন ও ইবনে তায়মিয়া (র)-র ওপর কঠোরতা বৃদ্ধি

অত্যন্ত আকস্মিকভাবেই মিসরের রাজনৈতিক পরিবর্তন এত দ্রুততার সঙ্গে সংঘটিত হয় যে, ইবনে তায়মিয়া (র)-র জন্য তা বিপদাশংকা বাড়িয়ে তোলে এবং তাঁর প্রতিপক্ষ তাঁর বিরুদ্ধে যা খুশী করবার মওকা পেয়ে যায়। তখন পর্যন্তও মিসরে ও সিরিয়ার প্রকৃত সুলতান ছিলেন নাসির ইবনে কালাউন, যিনি ইবনে তায়মিয়া (র)-র বিদ্যাবত্তা, নিষ্ঠা ও অপরিমেয় মর্যাদার নিদারুণ ভক্ত ছিলেন, ছিলেন সহানুভূতিশীল। ইব্‌নে তায়মিয়া (র)-ই তাঁকে তাতারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামতে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করে তুলেছিলেন। সুলতান তাঁর বীরত্ব, ঈমানী শক্তি ও দৃঢ়তা নিজেই দেখেছিলেন। ৭০৮ হিজরীতে তিনি (সুলতান কালাউন) অনেকগুলো কারণে বিরক্ত হয়ে সাম্রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেন এবং কির্ক-এ গিয়ে অবস্থান করার ও সেখানকার সীমিত রাজত্বে তুষ্টি অবলম্বনের সিদ্ধান্ত নেন।

তাঁর এই সিদ্ধান্তে রুকন উদ্দীন বায়বার্স জাশনগীরের জন্য মিসরের সিংহাসন ফাঁকা হয়ে যায় এবং তিনি তাঁর স্বায়ত্তশাসিত সালতানাতের ঘোষণা দেন। এখন তিনি মিসর ও শাম (বর্তমান সিরিয়া, লেবানন, জর্দান ও ফিলিস্তীন)-এর সার্বভৌম শাসক এবং তাঁর শায়খ নসর আল-মুনজী এই বিশাল বিস্তৃত সাম্রাজ্যের আধ্যাত্মিক নেতা ও বিশেষ উপদেষ্টা। ইব্‌নে তায়মিয়া (র)-কে তাঁর ধর্মীয় 'আকীদা ও গবেষণালব্ধ অভিমত পোষণ করা ছাড়াও (যিনি শায়খ নসর আল-মুনজীর মানসিক প্রবণতার প্রকাশ্য বিরোধী ছিলেন) স্বয়ং সুলতান নাসির ইবন কালাউনের প্রতি সহানুভূতিশীল ও সমর্থক ছিলেন বলে মনে করা হত। এজন্য তাঁর বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের পক্ষে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক

দু'টি ক্ষেত্রের মিলন হয়ে যায়। অনন্তর এই পরিবর্তনের পরই ইব্‌ন তায়মিয়া (র)-কে আলেকজান্দ্রিয়ায় নির্বাসন দেবার এবং সেখান নজরবন্দী জীবন যাপনের সরকারী ফরমান জারী হয়। ৭০৯ হিজরীর সফর মাসের শেষ তারিখে তাঁকে আলেকজান্দ্রিয়ায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কথিত আছে, হুকুমতের এও একটি উদ্দেশ্য ছিল, তাসাওউফ ও তাসাওউফপন্থীদের প্রাচীন কেন্দ্র এই নতুন শহরে সম্ভবত উগ্রপন্থীদের কেউ (তাদের লালিত 'আকীদা-বিশ্বাসের বিরোধিতার কারণে) তাঁকে হত্যা করুক। অপর দিকে হুকুমতও কোনরূপ বদনাম ও ইলযাম ছাড়াই এই মাথা ব্যথার হাত থেকে মুক্তি পাক।[১]

কিন্তু আলেকজান্দ্রিয়াতেও শায়খ ইবনে তায়মিয়া (র)-র সত্বর একদল ছাত্র ও ভক্ত জুটে যায় এবং দলে দলে তাঁর নিকট লোকজনের আগমন শুরু হয়। তিনি সেখানেও নিশ্চুপ ও নিষ্ক্রিয় বসে থাকেন নি। কুরআন ও সুন্নাহ্‌র প্রচার-প্রসার এবং শির্ক ও বিদ'আত প্রত্যাখ্যানই ছিল তাঁর নেশা ও পেশা। সত্বরই জনমনে তাঁর প্রতি ভক্তি ও ভালবাসা সৃষ্টি হয়ে যায় এবং তিনি জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। তাঁর ভাই শরফুদ্দীন ইবনে তায়মিয়া, যিনি ছিলেন সেখানকার সাথী ও কারা সহচর, দামিশকবাসীদের উদ্দেশে লিখিত এক পত্রে বলেন ঃ

وانقلب اهل الثغر اجمعين الى الاخ مقبلين عليه مكرمين له وفى كل وقت ينشر من كتاب الله وسنة رسوله ماتقربه عين المؤمنين وذالك شجى فى حلوق الاعداء ـ واستقر عند عامة المؤمنين وخواصهم من اميروقاض وفقيه ـ ومفت وشيخ وجماعة المجتهدين الا من شذ من الاغمار الجهال مع الذلة والصغار محبة الشيخ وتعظيمه وقبول كلامه والرجوع الى امره ونهيه ـ

আমার শ্রদ্ধেয় ভাইয়ের প্রতি আলেজান্দ্রিয়াবাসী খুবই আকৃষ্ট এবং তিনি তাদের মনে সম্মান ও শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত। তিনি সর্বদাই কুরআন ও সুন্নাহর প্রচার-প্রসারে নিমগ্ন থাকেন। এতে একদিকে যেমন ঈমানদারদের চক্ষু শীতল হয়, অপর দিকে শত্রুরা দারুণ মর্মপীড়ায় ভোগে। শায়খ-এর প্রতি ভালবাসা ও মর্যাদাবোধ সকল শ্রেণীর মানুষের মনে প্রতিষ্ঠিত। এদের ভেতর শাসন কর্তৃত্বে সমাসীন ব্যক্তিবর্গ যেমন রয়েছেন, তেমনি রয়েছেন

---

১. ইবনে কাছীর, ১৪শ খণ্ড, ৪৯ পৃষ্ঠা;

বিচারালয়ের কাযী, ফকীহ, মুফতী, সূফী-দরবেশ ও 'উলামায়ে মুজতাহিদও। নিরেট গণ্ডমূর্খ ছাড়া আর সকলেই তাঁর গুণমুগ্ধ ও ভক্তে পরিণত হয়েছেন। তাঁর বাণী ও আলাপচারিতা সকলের নিকট পছন্দনীয় এবং সকলেই অবনত মস্তকে তাঁর নির্দেশ মেনে চলে।

সে সময় আলেকজান্দ্রিয়াতে সাবঈনিয়্যা ফের্কার বাতিল চিন্তাধারা ও ওয়াহদাতু'ল-ওজূদ মতবাদ বেশ আসন গেড়ে বসেছিল। কতিপয় লোক অত্যন্ত জোরেশোরে ও উৎসাহের সঙ্গে এসব মতবাদ প্রচার করত। বুদ্ধিজীবীদের আসর থেকে নির্গত হয়ে এসব 'আকীদা ও ধ্যান-ধারণা জনগণের নিকট বেশ প্রিয় হয়ে উঠছিল। ঐসব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রূপক বিষয়ের চর্চার ফলে জনসাধারণের আমল-আখলাকের ওপর তার যে কুপ্রভাব পড়তে পারত এবং এর ফলে শরীয়তের প্রকাশ্য বিষয়াদির ক্ষেত্রে যে বল্গাহীন স্বাধীনতা ও দুঃসাহসিকতা প্রদর্শনের মানসিকতা সৃষ্টি হতে পারত তা হচ্ছিল। ইবনে তায়মিয়া (র) অত্যন্ত জোর ও প্রবল উৎসাহের সঙ্গে ঐ সব বাতিল 'আকীদা ও ভ্রান্ত চিন্তাধারার বিরোধিতায় নামেন এবং সে সব প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁর আট মাস আলেকজান্দ্রিয়ায় থাকাকালেই ঐ সব বাতিল 'আকীদা ও ভ্রান্ত চিন্তাধারায় ধস নামে এবং ইতর ও ভদ্র সকলেই এর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। ইবনে তায়মিয়া (র) এদের অনেককেই তওবা করান এবং এ সব মতবাদ ও আকীদা-বিশ্বাসের একজন নেতৃস্থানীয় প্রচারকও তওবা করে।[১]

ইবনে তায়মিয়া (র) আলেকজান্দ্রিয়ার যে স্থানে অবস্থান করছিলেন সেই স্থানটি ছিল খুবই বিস্তৃত ও নয়নাভিরাম। এর একটি খিড়কি ছিল সমুদ্রের দিকে খোলা, আর একটি ছিল শহর অভিমুখে। লোকে অবাধে তাঁর নিকট আসা-যাওয়া করত এবং তাঁর আলাপচারিতা থেকে উপকৃত হত।

রুকন উদ্দীন জাশনগীরের পতন

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) জাশনগীর ও তাঁর শায়খ-এর পতনের ব্যাপারে প্রকাশ্যে ভবিষ্যদ্বাণী করতেন এবং বলতেন, زالت ايامه وانتهت رياسته وقرب القصاء اجله "তার দিন ঘনিয়ে এসেছে, তার রাজত্ব শেষ অংকে উপনীত হয়েছে এবং তার নির্ধারিত কাল নিকটবর্তী।" এরপর তার রাজত্ব এক বছরও পেরোয় নি সুলতান নাসির ইবন কালাউন সাম্রাজ্যের শাসনভার পুনরায় স্বহস্তে গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন এবং ৭০৯ হিজরীর ১৩ই শা'বান তারিখে তিনি দামিশ্‌ক অভিমুখে রওয়ানা হন। দামিশ্‌কবাসীদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল

১. দামিশ্‌কবাসীদের নামে শায়খ শরফুদ্দীনের পত্র; ইবনে কাছীর, ১৪শ খণ্ড, ৫০ পৃষ্ঠা।

হৃদ্যতাপূর্ণ ও গভীর। তারা তাঁকে উষ্ণ ও সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করে। ১৭ই শা'বান তারিখে সাড়ম্বরে তিনি দামিশ্‌ক প্রবেশ করেন। অতঃপর দামিশ্‌ক থেকে মিসর অভিমুখে রওয়ানা হন। মিসরের জনগণও তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার প্রস্তুতি গ্রহণ করে। রুকন উদ্দীন জাশনগীর অতঃপর পরিবর্তিত পরিস্থিতিদৃষ্টে নিজেই ইস্তিফা দেন। ঈদের দিন সুলতানের কাফেলা মিসরে প্রবেশ করে এবং ১১ মাস কয়েক দিন রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন জীবন যাপনের পর পুনরায় ক্ষমতার রজ্জু তিনি স্বহস্তে ধারণ করেন। জাশনগীর মিসর থেকে পলায়ন করেন। অতঃপর ৭ই যি'লকদ তারিখে সিরিয়ার নায়েব আমীর সায়ফুদ্দীনের হাতে তিনি ধরা পড়েন এবং মিসরে তাকে হত্যা করা হয়।

এ ব্যাপারে ঐতিহাসিকেরা একমত, জাশনগীর তাঁর প্রধান মন্ত্রিত্বের (مدار المهامی) যুগে অত্যন্ত জনপ্রিয় ও প্রভাবশালী উযীর ছিলেন। তাঁর স্বশাসিত রাজত্ব ও তাঁর অধঃগতি সাথে সাথেই শুরু হয়। তাঁর রাজত্বের ঘোষণা দেবার পর পরই তাঁর সকল কৃতিত্ব, সৌভাগ্য ও জনপ্রিয়তা নিঃশেষ হয়ে যায় এবং তার পতন কাল শুরু হয়ে যায়। তাঁর আরব্ধ কাজও বিগড়ে যায়। মিসরীয় ঐতিহাসিক মাকরীযী পরিষ্কার লিখেছেন ঃ

وكان رحمه الله خيرا عفيفا كثيرا الحياء وافر الحرمة جليل القدر مهاب السطوة فى ايام امارته فلما تلقب بالسلطنة ورسم باسم الملك اتضع قدره واستضعف جانبه وطمع فيه وتغلب عليه الامراء والمماليك ولم تنجح مقاصده ولاسعد فى شئ من تدبيره الى ان انقضت ايامه واناخ به حمامه -

তিনি (সুলতান রুকন উদ্দীন জাশনগীর) বেশ ভাল, সংযত, সহিষ্ণু, লজ্জাশীল ও প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী আমীর ছিলেন। কিন্তু যেদিন থেকে তিনি সুলতান উপাধি গ্রহণ করলেন এবং শাহী পোশাক অঙ্গে ধারণ করলেন তাঁর মর্যাদায় ভাটা পড়ল, তাঁকে দুর্বল ভাবা হতে লাগল, লোকে তাঁর বিরুদ্ধে সাহসী হয়ে উঠল। আমীর-উমারা ও গোলাম-নফরেরা মাথা তুলে দাঁড়াল। শেষাবধি তিনি তাঁর লক্ষ্য হাসিলে ব্যর্থ হলেন এবং তাঁর সকল কলা-কৌশলই মাঠে মারা যেতে লাগল। আর এভাবেই তাঁর শাসনকাল শেষ হল এবং তাঁর হায়াত জওয়াব দিয়ে বসল।[১]

---

১. খুতাত-ই মিসর, ২য় খণ্ড, ৪১৮ ;

অত্যন্ত বিস্ময়ের ব্যাপার, তার এই অপ্রত্যাশিত পতন ছিল আল্লাহ্‌র এক মুখলিস দা'ঈ হক-এর বিরোধিতা ও যন্ত্রণা দেবার ফলে। আর এভাবেই তিনি উচ্চারিত নিম্নোক্ত শ্লোকের লক্ষ্যে পরিণত হন ঃ

بس تجربه کردیم درین دیر مکافات

بادرد کشاں هر که در افتاد برافتاد

ইবনে তায়মিয়া (র)-র মুক্তি ও শাহী সম্মান লাভ

ইবনে তায়মিয়া (র)-র সমসাময়িক শায়খ আলামুদ্দীন আল-বারযালী বলেন, ঈদের দিন সুলতান যখন মিসরে প্রবেশ করলেন তখন তাঁর সবচেয়ে বেশী তাড়া ও চিন্তা ছিল ইবনে তায়মিয়া (র)-কে মুক্তি দিয়ে যথোপযুক্ত সম্মান ও তা'জীমের সঙ্গে মিসরে নিয়ে আসার। অনন্তর পরদিনই (৭০২ হিজরীর ২রা শওয়াল) আলেকজান্দ্রিয়াতে সুলতানের তলবনামা গিয়ে পৌঁছে এবং ৮ই শওয়াল তারিখে তিনি মিসরের উদ্দেশে রওয়ানা হন। বিরাট একদল মানুষ অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধা সহকারে তাঁকে বিদায় জানায়।

ইবনে তায়মিয়া (র) শাহী দরবারে পৌঁছুলে সুলতান নিজেই কয়েক কদম অগ্রসর হয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। সুলতানের সঙ্গে মিসর ও সিরিয়ার কাযী ও প্রখ্যাত 'উলামায়ে কিরামও উপস্থিত ছিলেন। কাযী জামালুদ্দীন ইবনু'ল-কালানিসী নামে সেনাবাহিনীর একজন কাযী এ সময় উক্ত মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। ইবনে তায়মিয়া (র)-র আগমন ও সুলতান কর্তৃক তাঁকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের চাক্ষুষ ঘটনা তিনি নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

> সুলতান যখন খবর পেলেন, ইবনে তায়মিয়া (র) পৌঁছে গেছেন অমনি তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং শাহী দরবারের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত হেঁটে এলেন। সেখানেই দু'জনের মোলাকাত ও কোলাকুলি হয়। সুলতান ইবনে তায়মিয়া (র)-কে সাথে করে শাহী প্রাসাদের সেই অংশের দিকে অগ্রসর হন, যার খিড়কি ছিল রাজোদ্যানের দিকে উন্মুক্ত। সেখানে বসে উভয়ে ঘণ্টা খানেক যাবত একান্তে কথাবার্তা বলেন। অতঃপর পরস্পর হাত ধরাধরি করে দরবারে ফিরে আসেন। এরপর সুলতান সিংহাসনে উপবেশন করেন। সুলতানের ডান পাশে ছিলেন মিসরের কাযী ইবনে জিমা'আ আর বাম পাশে সাম্রাজ্যের উযীর ইবনু'ল-খলীল। ইবনে তায়মিয়া (র) বসেছিলেন সুলতানের সামনে তাঁর মসনদের পাশেই। এ সময় উযীর সুলতানের নিকট দরখাস্ত পেশ করেন, যিম্মী (ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিম প্রজা)-কুলকে

আগের মতই সাদা পাগড়ী ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা হোক।[১] বিনিময়ে তারা শাহী কোষাগারে বার্ষিক সাত লক্ষ দিরহাম অতিরিক্ত রাজস্ব প্রদানের প্রস্তাব দিয়েছে। এ সময় দরবারীদের মাঝে এক ধরনের নীরবতা পরিলক্ষিত হচ্ছিল। এঁদের ভেতর 'আল্লামা ইবনু'য-যামালকানীও ছিলেন। কাযী ও 'আলিমদের প্রতি লক্ষ করে সুলতান এ ব্যাপারে তাঁদের অভিমত জানতে চান। কিন্তু এরপরও তারা মুখ খোলেন নি। এ সময় ইবনে তায়মিয়া (র) তাঁর হাঁটুর ওপর ভর করে বসে পড়েন এবং অত্যন্ত আবেগোদ্দীপনা ও ক্রোধের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেন এবং উযীরকে কড়া ভাষায় জেরা করতে থাকেন। এ সময় তাঁর কণ্ঠস্বর ক্রমেই উচ্চ গ্রামে উঠছিল এবং সুলতান তাঁকে শান্ত করবার চেষ্টা করছিলেন। সে সময় ইবনে তায়মিয়া (র) এভাবে কথাবার্তা বলেন যেভাবে কথা বলতে অপর কেউ সাহস করতে পারত না। তিনি সুলতানকে সম্বোধন করে বলেন ঃ নিতান্তই আফসোসের বিষয় হবে, (সিংহাসন পুনঃপ্রাপ্তির পর) আপনার এই প্রথম দরবারের উদ্বোধন এমন কোন কার্যের দ্বারা হয় যদ্দ্বারা আপনি এই নশ্বর পৃথিবীর নিকৃষ্ট স্বার্থের জন্য যিম্মীদের কোন সহায়তা করেন। আল্লাহ্ পাক আপনার ওপর কত বড় অনুগ্রহ করেছেন যে, আপনার হৃত সাম্রাজ্যকে আপনার হাতেই ফিরিয়ে দিয়েছেন, আপনার শত্রুকে হেয় ও অপমানিত করেছেন এবং আপনার প্রতিপক্ষের ওপর আপনাকে জয়যুক্ত করেছেন। এতদ শ্রবণে সুলতান বললেন, এ আইন তো জাশনগীরের তৈরী। জওয়াবে ইবনে তায়মিয়া বললেন ঃ এটা তো আপনারই ফরমানে হয়েছিল, সে সময় জাশনগীর আপনারই নায়েব ছিলেন। সুলতান ইবনে তায়মিয়া (র)-র এই সত্য কথনে অত্যন্ত প্রীত হন এবং উক্ত আইন পূর্বের মতই বহাল থাকে।[২]

১. বিগত দিনের তিক্ত অভিজ্ঞতা 'আলিমদেরকে এই সিদ্ধান্তে পৌছুতে বাধ্য করেছিল, ইসলামী সাম্রাজ্যের অমুসলিম প্রজাদের পোশাক-পরিচ্ছদে কিছু বৈশিষ্ট্যসূচক চিহ্নাদি থাকা দরকার। ক্রুসেড যুদ্ধের পর মিসর ও সিরিয়ায় এমন বিপুল সংখ্যক খ্রিস্টান থেকে গিয়েছিল যারা এসব দেশের জন্মসূত্রে নাগরিক ছিল না, বরং তারা ভিন দেশ থেকে এসেছিল। এরা বহিরাক্রমণকারীদের পক্ষে স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে গুপ্তচর বৃত্তি করত। এ ছাড়াও তারা মুসলিম সমাজ জীবনে অনুপ্রবেশ করে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করত। ৭২১ হিজরীর সংঘটিত ঘটনাবলীর বর্ণনা দিতে গিয়ে ইব্‌নে কাছীর লিখেছেন, ২রা জুমাদা'ল-উলা তারিখে কায়রো শহরে বিস্ময়করভাবে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটে ! সুদৃশ্য ঘর-বাড়ী, আলীশান মহল, বেশ কিছু মসজিদ এই অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। লোকেরা এই দুর্ঘটনায় এতটাই অভিভূত ছিল যে, মসজিদে মসজিদে কুনূতে নাযিলা পড়া হয়। পরে তদন্তে দেখা যায়, কতিপয় দুষ্ট খ্রিস্টানের শয়তানীই এর জন্য দায়ী। তারপর থেকে এই নির্দেশ জারী করা হয়, খ্রিস্টানেরা নীল রঙের পোশাক পরিধান করবে, পাগড়ীতে ঘণ্টি বাঁধবে এবং কোথাও তাদের সাহায্য-সহায়তা গ্রহণ করা হবে না। এরপর অগ্নিকাণ্ডের পুনরাবৃত্তি আর ঘটে নি। এসব অভিজ্ঞতার পর কিছুকাল থেকে মিসরের খ্রিস্টানদের ওপর নির্দেশ ছিল, তারা যরদ বর্ণের পাগড়ী পরবে। সুলতান নাসিরের পুনরাগমনে খ্রিস্টানেরা উক্ত নির্দেশ বাতিল করার প্রয়াস চালিয়েছিল।

২. ইবনে কাছীর, ১৪শ খণ্ড, ৫৪ পৃষ্ঠা।

মিসরে সুন্নতে য়ূসুফী

ইবনু'ল-কালানিসী বলেন, স্বয়ং ইবনে তায়মিয়া (র) আমাকে বলেছেনঃ সুলতান যখন আমাকে একান্তে ডেকে নিলেন তখন তিনি আমাকে সে সব কাযীকে হত্যার ব্যাপারে ফতওয়া চান যারা জাশনগীরকে সমর্থন করেছিল এবং সুলতানকে অপসারণের ব্যাপারে ফতওয়া প্রদান করেছিল। তিনি আমাকে সেই ফতওয়া বের করে দেখিয়েছিলেনও। এরই সাথে তিনি আমাকে এও বলেন ঃ ঐ সমস্ত লোকই আপনার বিরুদ্ধে হাঙ্গামা বাঁধিয়েছিল এবং আপনাকে কষ্ট দিয়েছিল। সুলতানের উদ্দেশ্য ছিল, আমি যেন তাঁর কথায় প্রভাবিত হয়ে তাদেরকে হত্যার ফতওয়া দিই। আমি তাঁর মতলব ধরে ফেলি এবং আমি ঐ সমস্ত কাযী ও 'আলিম-উলামার প্রশংসা করতে শুরু করি এবং সুলতানের দ্বারা তাঁদের কোন ক্ষতি হোক তারও ভীষণ বিরোধিতা করি। আমি সুলতানকে বলি ঃ আপনি যদি তাঁদেরকে হত্যা করেন তবে এতে আপনার কি লাভ? আপনি তো তাঁদের বিনিময় পাবেন না। তিনি এরপরও আমাকে (উত্তেজিত করবার জন্য)বললেন ঃ আপনার ক্ষতি করবার জন্য চেষ্টার কোন ত্রুটি তারা করে নি এবং আপনাকে হত্যা করবার জন্য তারা বারবার ষড়যন্ত্র করেছে। আমি বললাম ঃ আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়ে আমার নীতি হল, কেউ যদি আমাকে কষ্ট দেয় তজ্জন্য তার বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই। আমি তাকে সম্পূর্ণরূপে মাফ করে দিই। আর কেউ যদি আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র রসূলের সঙ্গে অপরাধ করে থাকে তাহলে আল্লাহ নিজেই তার বদলা নেবেন। আমি আমার নিজের ব্যাপারে প্রতিশোধ গ্রহণ করি না। এভাবে আমি তাঁকে বোঝাতে থাকলাম। শেষাবধি সুলতান তাঁদের অপরাধ ক্ষমা করলেন।[১]

ইবনে কাছীর লিখেন, মিসরে ইবনে তায়মিয়া (র)-র সর্বাপেক্ষা বড় প্রতিপক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বী মালিকী মযহাবের কাযী ইবনে মাখলূফ বলতেন ঃ আমরা ইবনে তায়মিয়ার মত উদার হৃদয়বিশিষ্ট কোন মানুষ আর দেখিনি। আমরা তাঁর বিরুদ্ধে সুলতানকে উত্তেজিত করতে সাধ্যমত চেষ্টা করেছি (যদিও আমরা তাতে সফল হইনি)। কিন্তু তিনি যখন ক্ষমতা পেলেন, তখন আমাদের সবাইকে পরিষ্কার মাফ করে দিলেন। শুধু তাই নয়, বরং আমাদের হয়ে ওকালতি করলেন।[২]

সুলতানের সঙ্গে বৈঠকের পর শায়খ (র) কায়রোয় এলেন এবং আগের মতই পঠন-পাঠন, সংস্কার-সংশোধন ও তাবলীগী কর্মে মগ্ন হয়ে পড়লেন। তাঁর মুক্তির খবর পেয়ে আগ্রহী ও অত্যুৎসাহী বিদ্যার্থী, তাঁর ভক্ত ও অনুরক্তবৃন্দ

১. ইবনে কাছীর, ১৪শ খণ্ড, ৫৪ পৃ.। ২. প্রাগুক্ত।

চতুর্দিক থেকে ধেয়ে আসতে লাগল। শহরের 'আলিম-'উলামা' হাযির হয়ে নিজেদের ভুলের স্বীকৃতি দিতে লাগলেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগলেন। তিনি সবাইকেই বলে দিলেন, কারোর বিরুদ্ধেই তাঁর কোন অভিযোগ নেই কিংবা কোন দাবী নেই। সবাইকেই তিনি মাফ করে দিয়েছেন। অতঃপর এদিক থেকে পরিপূর্ণ নিশ্চিন্ত হয়ে এবং তাঁর মিশনের পরিপূর্ণতা সাধনের জন্য তাঁকে রাজধানীতে থাকতে হবে অনুমান করে তিনি বাড়ীতে একটি দীর্ঘ পত্র দেন। পত্রে তিনি তাঁর অবস্থার কথা লিখে জানান এবং কিছু জরুরী কিতাব চেয়ে পাঠান।

ইবনে তায়মিয়া (র)-র সম্মানজনক মুক্তি লাভের পর যখন তাঁর বিরোধীরা দেখতে পেল, তাঁর সৌভাগ্য তারকার আরও সমুন্নতি ঘটেছে এবং কোন

'ইল্‌মী সমস্যার ভিত্তিতে এখন আর তাঁর বিরুদ্ধে হাঙ্গামা সৃষ্টি করা কঠিন তখন তারা জনসাধারণকে তাঁর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে চেষ্টা করে। আর ইবনে তায়মিয়া (র)-র বিরুদ্ধে জনসাধারণকে উত্তেজিত করা (অন্তত মিসরে ও যেখানে জনসাধারণ তাঁর সম্পর্কে খুব বেশী ওয়াকিফহাল ছিল না) খুব বেশী কঠিন কাজ ছিল না। অনন্তর ৭১১ হিজরীর ৪ঠা রজব তারিখে কতিপয় কাণ্ডজ্ঞানহীন লোক তাঁর ওপর হাত তোলে এবং তাঁকে যাতনা দেয়। কিন্তু এই খবর হুসায়নিয়্যা মহল্লায় [সাধারণ প্রসিদ্ধি অনুসারে যেখানে সায়্যিদুনা হুসায়ন (রা)-এর মস্তক মুবারক দাফন হয়েছে][১] পৌছুতেই তথাকার অধিবাসীরা শায়খ (র)-এর ওপর হামলার প্রতিশোধ গ্রহণার্থে জমায়েত হয়। শায়খ (র) তাদেরকে এ থেকে নিবৃত্ত রাখেন এবং বলেন ঃ

اما ان يكون الحق لى اولكم اولله فان كان الحق لى فهم فى حل منه وان كان لكم فان لم تسمعوا منى ولم تستفتونى فافعلوا ماشئتم وان كان الحق لله فالله ياخذ حقه ان شاء -

দেখ, প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষেত্রে তিনটি পথ খোলা রয়েছে। প্রতিশোধ গ্রহণ যদি আমার অধিকারে থাকে তাহলে আমি ঘোষণা দিচ্ছি, আমি আমার সে অধিকার প্রত্যাহার করছি। কারোর বিরুদ্ধেই আমার কোন অভিযোগ কিংবা দাবী নেই। আর প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার তোমাদের সঙ্গে সম্পর্কিত হলে

১. এই জনশ্রুতির বিরুদ্ধে ইমাম ইবনে তায়মিয়ার নামে راس سيدنا حسين নামে একটি পুস্তিকা রয়েছে।

সেক্ষেত্রে তোমরা যদি আমার কথা মানতে প্রস্তুত না হও কিংবা সে বিষয়ে আমার নিকট কিছু জানতেও না চাও তাহলে তোমাদের অভিরুচি। কিন্তু এ অধিকার যদি আল্লাহ্র হয় তাহলে তিনি চাইলে সে অধিকার তিনিই আদায় করবেন।

ইতোমধ্যেই 'আসরের ওয়াক্ত এসে যায়। ইমাম জামি' মসজিদে (সম্ভবত জামি' হুসায়নীতে) জামা'আতে শরীক হবার জন্য যেতে উদ্যত হলে তাঁর শুভানুধ্যায়ীরা (বিপদ হবে ভেবে) তাঁকে বাধা দেয়। কিন্তু শায়খ (র) কোনরূপ বাধার তোয়াক্কা না করে মসজিদ যান। সঙ্গে গেল তাঁর বিরাট একদল অনুরক্ত সমর্থক।

এরপর একবার এক প্রকাশ্য মজলিসে একজন 'আলিম তাঁকে খুব কঠোর ভাষায় গালমন্দ করেন। পরে উক্ত আলিম তাঁর ভুল বুঝতে পারেন কিংবা তিনি আশঙ্কা করেন হুকুমতের তরফ থেকে কোন শাস্তি নেমে আসে এর জন্য। তিনি শায়খ (র)-এর নিকট ক্ষমা চান। শায়খ (র) খোলা মনে তাঁকে ক্ষমা করে দেন এবং বলেন, لاانتصر لنفسى "আমি আমার নিজের ব্যাপারে প্রতিশোধ গ্রহণ করি না।"[১]

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) তাঁর মিসর অবস্থানকালে কেবল পঠন-পাঠন ও কুরআন-সুন্নাহ্র প্রচার-প্রসারের মাঝেই নিজেকে সীমিত রাখেন নি, বরং রাজধানীতে অবস্থানের সুযোগে তিনি সুলতানকে মূল্যবান পরামর্শ দেন এবং সুলতানকে দিয়ে কতগুলো জরুরী উপকারী ফরমানও জারী করান। ইবনে কাছীর লিখেছেন, ৭১২ হিজরীতে দামিশকে সুলতানের ফরমান এসে পৌঁছায়, আর্থিক উপহার কিংবা কোন প্রকার ঘুষের বিনিময়ে যেন কাউকে কোন পদে নিযুক্ত করা না হয়। কেননা এর স্বাভাবিক পরিণতি হবে এই ঃ অযোগ্য, অবিশ্বস্ত ও দুর্নীতিপরায়ণ লোকেরা দায়িত্বশীল পদে এসে যাবে এবং যোগ্য, সৎ ও বিশ্বস্ত লোকেরা বঞ্চিত হবে। ইবনে কাছীর বলেন, এই ফরমান ইবনে তায়মিয়ার প্রস্তাব ও প্রচেষ্টারই ফল ছিল।[২] ঠিক তেমনি আরো একটি ফরমান জারী হয়, হত্যাকারী তথা খুনীর ওপর কোন প্রকার জুলুম কিংবা বাড়াবাড়ি করার এখতিয়ার কারোর নেই। হুকুমত তাকে গ্রেফতার করবে এবং শরীয়ত মুতাবিক তার থেকে কিসাস (বদলা, খুনের বদলে খুন) গ্রহণ করবে। ইবনে কাছীর বলেন, এটাও ছিল ইবনে তায়মিয়ার প্রস্তাবনার ফসল।[৩]

---

১. মুহাম্মদ আবূ যুহরাকৃত, ইবনে তায়মিয়া।

২. ইবনে কাছীর, ১৪শ খণ্ড, ৬৬ পৃ.।

৩. ইবনে কাছীর, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৬৬।

দামিশ্‌ক প্রত্যাবর্তন

৭১২ হিজরীর শওয়াল মাসে তাতারীদের হামলার অভিপ্রায়ের খবর উপর্যুপরি এসে পৌছুচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত সুলতান নিজে মিসর থেকে বেরিয়ে তাদের মুকাবিলা করার সিদ্ধান্ত নেন এবং ৮ই শওয়াল তারিখে দামিশ্‌ক অভিমুখে রওয়ানা হন। ২৩ শে শওয়াল তারিখে তিনি দামিশ্‌ক প্রবেশ করেন। সুলতানের সঙ্গে ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)ও ছিলেন যিনি পুরো সাত বছর পর তাঁর স্বগৃহ মা'লূফ-এ আসলেন। লোকে তাঁকে বিপুলভাবে অভ্যর্থনা জানায়। শহরের অধিবাসীবৃন্দ তাদের আনন্দ প্রকাশ করে। পুরুষ ছাড়া বহু মহিলাও তাঁকে এক নজর দেখবার জন্য বাইরে বেরিয়ে আসে। শায়খ-এর এ সফর ছিল জিহাদের নিয়তে। কিন্তু দামিশ্‌কে এসে যখন তিনি জানতে পারেন, তাতারী বাহিনী ফিরে গেছে, তখন তিনি দামিশ্‌ক থেকে বায়তুল-মুকাদ্দাস যিয়ারতের নিয়ত করেন। সেখানে কিছু দিন অবস্থানের পর আরও কয়েকটি জায়গা পরিদর্শন শেষে ১লা যী-কা'দাহ তারিখে তিনি দামিশ্‌ক প্রত্যাবর্তন করেন এবং সার্বক্ষণিকভাবে নিজের কাজে মশগুল হয়ে পড়েন।

ফিক্‌হী মসলা-মাসাইলের প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদান

এবার দামিশ্‌ক প্রত্যাবর্তনের পর যদিও শায়খুল ইসলাম তাঁর পুরনো ধর্মীয়, তত্ত্বগত ও সংস্কার-সংশোধনমূলক কর্মে ব্যাপৃত হয়ে পড়েন এবং অভ্যাস মাফিক পঠন-পাঠন, ফতওয়া প্রদান ও লেখার কাজ শুরু করে দেন, কিন্তু এবার তাঁর ভেতর একটি লক্ষণীয় পরিবর্তন ছিল এই, এ যাবত তাঁর অধিকাংশ মনোযোগ ইসলামের 'আকীদা ও মূলনীতি এবং 'ইলমে কালামের সে সমস্ত সমস্যার দিকে ছিল যে সব সমস্যা আশ'আরীপন্থী ও হাম্বলী মযহাবের অনুসারী 'আলিমগণের মধ্যে বিতর্কের কেন্দ্র হিসাবে বিরাজ করছিল। কিন্তু এবার তাঁর বিশেষ মনোযোগ ফিকহী মাসাইল ও তার অন্তর্গত খুঁটিনাটি বিষয়ের দিকে নিবদ্ধ হয়। মনে হচ্ছিল, এবার তিনি অনুভব করেন, তিনি প্রথমোক্ত বিষয়বস্তুর ওপর প্রয়োজন মাফিক উপকরণ ও দলীল-প্রমাণ সরবরাহ করেছেন এবং তাঁর বক্তৃতামালা, শিক্ষকতা ও লেখনী দ্বারা সত্য উদ্ভাসিত হয়েছে। এবার তিনি তাঁর তত্ত্বগত বৈশিষ্ট্য ও আল্লাহপ্রদত্ত মেধাগত যোগ্যতা নিয়ে ফিকহী মসলা-মাসাইলের দিকে মনোনিবেশ করেন।

কয়েক পুরুষ ধরে ইবনে তায়মিয়া (র)-র খান্দান হাম্বলী মযহাবের অনুসারী হিসাবে চলে আসছিলেন। স্বয়ং ইবনে তায়মিয়া (র)-র অধিকাংশ ফতওয়া হাম্বলী মযহাবানুসারী। কিন্তু তাই বলে তিনি আপাদমস্তক হাম্বলী মযহাবের আনুগত্য করেন নি। কুরআন ও সুন্নাহর বিপুল ভাণ্ডারের ওপর তাঁর যেমন গভীর পাণ্ডিত্য

ও দখল ছিল, ফিকহী মযহাবের মূলনীতি ও প্রমাণপঞ্জীর ব্যাপারে তাঁর যেমন প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ছিল, এরপর তাঁর পক্ষে হাম্বলী মযহাবের চৌহদ্দীর মধ্যে আবদ্ধ থাকা এবং শতকরা এক শ' ভাগ ক্ষেত্রেই তার আনুগত্য মেনে চলা কষ্টকর ছিল। সেজন্য তিনি কতক মুহূর্তে ইমাম চতুষ্টয়ের মযহাবের ভেতর সেই মযহাবকেই অগ্রাধিকার দিতেন যাঁর দলীল-প্রমাণ তাঁর নিকট অধিকতর শক্তিশালী মনে হত এবং যাঁর সঙ্গে সাহাবা-ই-কিরাম ও তাবিঈদের অধিকাংশ জামা'আতের ঐকমত্য থাকত। তিনি তাঁর গভীর জ্ঞান, কুরআন-সুন্নাহ্ থেকে মসলা বের করার শক্তি ও চিন্তার দৃঢ়তা সত্ত্বেও ইমাম চতুষ্টয়ের জ্ঞানগত শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা, সর্বোত্তম ইজতিহাদ, সাধুতা, আল্লাহভীতি ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রাধান্যের স্বীকৃতি দিতেন। তাঁর মতে, তাঁরা (ইমাম চতুষ্টয়) ছিলেন সত্যান্বেষী, সুন্নাহ্র দৃঢ় অনুসারী ও গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী। তাঁদের ইজতিহাদের মৌল উৎস ছিল কিতাবুল্লাহ ও সুন্নতে নববী, কুরআন ও হাদীসের নস (نص), পরিষ্কার ও সুপ্রকাশিত আল্লাহ্র বিধানসমূহ, ইজমা' ও শর'ঈ কিয়াস এবং এ ব্যাপারে তিনি আনুগত্য পোষণকারী ছিলেন, বিদ'আতী (مبتدع) ছিলেন না। আর এজন্য তিনি স্বীয় যুগের সেই সমস্ত এলাকাকে খুবই অপসন্দ করতেন যারা ইমাম চতুষ্টয় সম্পর্কে বল্গাহীন উক্তি ও ধৃষ্টতাপূর্ণ মন্তব্য করত। ঐ সব লোকের মুখ বন্ধ ও মুজতাহিদ ইমামদের সমর্থন ও সহায়তা প্রদানের উদ্দেশে তিনি رفع الملام عن الائمة الاعلام নামে একটি পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। পুস্তিকাটি এতসংক্রান্ত বিষয়ে অন্যতম সর্বোত্তম পুস্তিকা। পুস্তিকার প্রারম্ভে তিনি লেখেন ঃ

يجب على المسلمين بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين كما نطق به القران وخصوصا العلماء الذين هم ورثة الانبياءالذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بهم فى ظلمات البروالبحر - وقد اجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم اذ كل امة قبل مبعث محمد (صلى الله عليه وسلم) علمائها شرارها الا المسلمين فان علمائهم خيارهم فانهم خلفاء الرسول فى امته والمحيون لمامات من سنته بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا و ليعلم انه ليس احد من الائمة المقبولين عندالامة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شئ من سنة دقيق ولاجليل فانهم متفقون اتفاقا

يقينيا على وجوب اتباع الرسول وعلى ان كل احد من الناس يؤخذ من قوله ويترك الا رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا وجد لو احد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلابد له من عذر فى تركه ، وجميع الاعذار ثلاثة اصناف (احدها) عدم اعتقاده ان النبى (صلى الله عليه وسلم) قاله (والثانى) عدم اعتقاده ارادة تلك المسئلة بذالك القول (والثالث) اعتقاده ان ذالك الحكم منسوخ -

কুরআন মজীদের সুস্পষ্ট নির্দেশ মুতাবিক আল্লাহ্ ও তদীয় রসূলের প্রতি ভালবাসার পরই ঈমানদারদের প্রতি বন্ধুত্ব ও ভালবাসার হাত বড়িয়ে দেওয়া তথা তাদেরকে ভালবাসা ওয়াজিব, বিশেষত সেসব 'আলিম-'উলামার বন্ধুত্ব ও ভালবাসা যাঁরা আম্বিয়া-ই কিরামের ওয়ারিছ ছিলেন এবং যাঁদেরকে আল্লাহ তা'আলা সে সব মর্যাদা দান করেছেন যার সাহায্যে আঁধারে আলো ও পথের সন্ধান মেলে। সকল মুসলিম এ ব্যাপারে একমত, এসব হযরত হেদায়েত ও জ্ঞান-বুদ্ধির অধিকারী ছিলেন। হযরত (সা.) -এর নবূওত লাভের পূর্বে অপরাপর (নবীদের) উম্মতের 'আলিম সম্প্রদায় (তাদের অপকর্মের কারণে সবচে' নিকৃষ্ট সম্প্রদায় ছিল। কিন্তু এই উম্মতের আলিম সম্প্রদায় সর্বোত্তম ও সর্বোৎকৃষ্ট সম্প্রদায়। তাঁর কারণ, তাঁরাই হচ্ছেন এই উম্মতের ভেতর রসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের স্থলাভিষিক্ত ও উত্তরাধিকারী। তাঁরা সুন্নাহ্র জীবিতকারী, তাঁদের মাধ্যমে আল্লাহ্র কিতাবের রওনক বৃদ্ধি পায়, তার প্রচলন ঘটে এবং তাঁরাই এর পতাকাবাহী। আল্লাহ্র কিতাব কুরআনুল করীমের তাঁরাই মুখপাত্র ও ব্যাখ্যাতা, কুরআনই তাঁদের রসনার পরিচ্ছদ এবং এটাই তাঁদের প্রমাণপঞ্জী। মনে রাখা দরকার, ঐ সকল ইমামের মধ্যে যাঁরা সাধারণভাবে মুসলমানদের আস্থাভাজন ও জনপ্রিয়, এমন একজনও ছিলেন না যিনি জেনেশুনে রসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের কোন ছোট কিংবা বড় সুন্নতের বিরোধিতা করেছেন। কেননা তাঁরা সবাই নিশ্চিতই এ ব্যাপারে একমত ছিলেন, হুযূর আকরাম (সা.)-এর আনুগত্য ও অনুসরণ ওয়াজিব এবং তিনিই একমাত্র সত্তা যাঁর সমস্ত কথা, বিধি-বিধান অবশ্য গ্রহণীয় (অন্যথায় অপর যে কারোর কোন কথা কবুল করাও যেতে পারে, আবার পরিত্যাগ

করাও যেতে পারে)। ঐ সব ইমামের ভেতর যদি কারোর এমন কোন কথা পাওয়া যায় যা কোন সহীহ হাদীসের বিরোধী তাহলে বুঝতে হবে অবশ্যই উক্ত ইমামের এ বিরোধিতার পেছনে সঙ্গত কোন কারণ থেকে থাকবে, ওযর থাকবে উক্ত হাদীস তরক করার। এ ওযর তিন ধরনের হতে পারে ঃ প্রথমত, উক্ত ইমাম স্বীকারই করেন না, নবী করীম (সা.) এমনটি বলেছেন এবং হাদীসটি বিশুদ্ধ। দ্বিতীয়ত, তাঁর ধারণা, এই হাদীস থেকে এ মসলা বেরিয়ে আসে না এবং এটা হাদীসের মর্ম নয়। তৃতীয়ত, তাঁর গবেষণাপ্রসূত সিদ্ধান্ত হল, এ হুকুম মনসূখ হয়ে গেছে।[১]

তিন তালাকের মসলা

যেভাবে তিনি কতক মুহূর্তে হাম্বলী মযহাবের নির্ধারিত গণ্ডীর বাইরে পা ফেলেছেন এবং প্রাপ্ত দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে অপরাপর মযহাবের অগ্রাধিকার দান করেছেন, ঠিক তেমনি কতক মসলার ক্ষেত্রে তিনি মযহাব চতুষ্টয়ের বিরুদ্ধেও ফতওয়া দিয়েছেন এবং তাঁর নিকট সরাসরি প্রাপ্ত কুরআন ও সুন্নাহ্‌র নস ও দলীল-প্রমাণের অনুসরণ করেছেন। এ ধরনের মসলার সংখ্যা (যেখানে সামগ্রিকভাবে তিনি ইমাম চতুষ্টয়ের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেছেন) সাকুল্যে দু'চারটের বেশী হবে না। এসবের ভেতর সবচে' বিখ্যাত মসলা হল একই মজলিসে তিন তালাকের মসলা।

মসলাটি হল, যদি কেউ তার স্ত্রীকে এক মজলিসে তিন তালাক (চাই একবার শব্দোচ্চারণ করেই হোক কিংবা কয়েকবার ভিন্ন ভিন্ন শব্দোচ্চারণ করেই হোক) দিয়ে দেয় তাহলে ইমাম ও মুসলিম উম্মাহ্‌র ঐকমত্যে উপরিউক্ত ব্যক্তি বিদ'আতী কথা উচ্চারণ করেছে এবং শরীয়তবিরোধী কর্ম করেছে এবং গোনাহগার হয়েছে, কিন্তু তার প্রদত্ত তালাকের বিধান কি? অর্থাৎ এক্ষেত্রে তালাক হবে কিনা এবং তার স্ত্রী তার জন্য বায়েন হবে কি? শরীয়ত মাফিক উক্ত স্বামী রজ'ঈ তালাকের ন্যায় তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারবে কি? শরীয়তের বিধান মাফিক তার জন্য তা সম্ভব হবে কি? (যতক্ষণ পর্যন্ত না সে অপর কোন পুরুষের সঙ্গে নিকাহর আওতায় আসবে, তার সঙ্গে সহবাসের স্বাদ গ্রহণ করবে, অতঃপর কোন কারণে তাকে আবার তালাক দেবে, অতঃপর প্রথমোক্ত স্বামী তাকে পুনরায় বিয়ে না করবে) অথবা তিন তালাক এক তালাক হিসাবেই গণ্য হবে? এবং উক্ত স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়া যাবে। ইমাম চতুষ্টয়, ফিক্‌হ ও

---

১. دفع الملام عن الائمة الاعلام

হাদীসশাস্ত্রের ইমাম (ইমাম আওযা'ঈ, ইবরাহীম নাখ'ঈ, সুফিয়ান ছওরী, ইসহাক ইবনে রাহওয়ায়হ, আবূ ছওর বুখারী), জমহূর সাহাবা ও তাবিঈদের অভিমত হল, বিদ'আত ও গোনাহে লিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও এমতাবস্থায় তিন তালাকই আরোপিত হবে এবং (বিনা তাহলীলে) স্বামী-স্ত্রীর পুনর্মিলন সম্ভব হবে না। ইমাম নববী (র) মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

وقداختلف العلماءفى من قال لامرأته انت طالق ثلاثا فقال الشافعى ومالك وابوحنيفة واحمد وجماهير العلماء من السلف والخلف يقع الثلاث ۔

'আলিমদের মধ্যে এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে, যদি কেউ তার স্ত্রীকে বলে, "তোমাকে তিন তালাক দিলাম" এমতাবস্থায়, ইমাম শাফি'ঈ, মালিক, আবূ হানিফা, আহমদ (ইবনে হাম্বল) এবং পূর্ব ও পরবর্তী যুগের সমস্ত আলিমের মতেই তা তিন তালাক হিসাবে গণ্য হবে।

'আল্লামা ইবনে রুশ্‌দ 'বিদায়াতু'ল-মুজতাহিদ' নামক গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

جمهور فقهاءالامصار على ان الطلاق بلفظ الثلاث حكمه حكم الطلقه الثالثة ۔

সকল বিজ্ঞ ফকীহ এ ব্যাপারে একমত, একই সঙ্গে তিন তালাক উচ্চারণ করলে তা তিন তালাক হিসাবেই বিবেচিত হবে।

শায়খুল ইসলামের প্রিয় শাগরিদ হাফিজ ইবনে কায়্যিম যাদু'ল-মা'আদ নামক গ্রন্থে বলেন ঃ

وهذا قول الائمة الاربعة وجمهور التابعين وكثير من الصحابة ۔

ইমাম চতুষ্টয়, সকল তাবি'ঈ ও অধিকাংশ সাহাবায়ে কিরাম এ মতই পোষণ করেন।

ঐ সকল হযরতের প্রমাণপঞ্জীর ভেতর কতিপয় মরফু' হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে যদ্দ্বারা প্রমাণিত হয়, রাসূল আকরাম (স) এই সব ক্ষেত্রে তিন তালাক কিংবা তিন তালাকের অতিরিক্ত তালাককে তিন তালাক হিসাবেই অভিহিত করেছেন এবং তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে স্বামী থেকে পৃথক হয়ে যাবার পক্ষে ফতওয়া দিয়েছেন।[১]

---

১. এসব হাদীসের সনদ ও মতনের ওপর অপর পক্ষ আপত্তি তুলেছেন এবং প্রথম পক্ষ সেসব আপত্তির মুহাদ্দিসসুলভ জওয়াব দিয়েছেন।

শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়া (র) এবং তাঁর কতক সাথী-বন্ধু ও শাগরিদের অভিমত এই যে, এই তিন তালাক (অর্থাৎ একই বৈঠকে একই মুখে) এক তালাক ও তালাক-ই রাজ'ঈ হিসাবে পরিগণিত হবে এবং এরপর স্বামী তার স্ত্রীকে এভাবে ফিরিয়ে নিতে পারবে যেভাবে একবার এক তালাকের পর ফিরিয়ে নিতে পারে। তিনি লিখেছেন ঃ

وهذا القول منقول عن طائفة من السلف من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الزبير ابن عوام وعبدالرحمن بن عوف ويروى عن على وعن ابن مسعود وابن عباس وهو قول داؤد واكثر اصحابه ويروى عن ابى جعفر احمد (الباقر) ابن على بن حسين وابنه جعفر (الصادق) ولهذا ذهب الى ذلك من ذهب من الشه عة ـ

আর এই অভিমত রসূল আকরাম (স)-এর একদল বিশিষ্ট সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে। এঁদের মধ্যে রয়েছে যুবায়র ইবনে 'আওয়াম, আবদুর রহমান ইবনে 'আওফ (রা)। হযরত আলী, ইবনে মাস'উদ ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও এর সপক্ষে একটি মত পাওয়া যায়। আর এটাই ইমাম দাউদ জাহিরী ও অধিকাংশ সাহাবীর মত। এ ছাড়া আবূ জা'ফর মুহাম্মদ (আল-বাকির) ইবনে আলী ইবনে হুসায়ন ও তৎপুত্র জা'ফর (আস-সাদিক)-এর অভিমতও তাই। আর তাই শী'আদের একটি মযহাবও এই মত গ্রহণ করেছে।[১]

শায়খুল ইসলাম তাঁর এই মতের সমর্থনে কুরআন, হাদীস ও কিয়াস থেকে প্রমাণপঞ্জী পেশ করেছেন।[২]

এই মসলার ক্ষেত্রে ঘটনা এই, চাই এ ব্যাপারে তিনি একা না-ই হন এবং তাঁর পূর্বে প্রাচীন যুগের 'উলামায়ে মুজতাহিদীনের কেউ এ মতও পোষণ করুন, তবুও এ বিষয়ে সন্দেহের লেশমাত্র নেই, এর খ্যাতি ও শোহরত তাঁর ব্যক্তিসত্তার দ্বারাই হয়েছিল এবং এর পতাকা বহন তিনিই করেছিলেন। আর সেজন্যই যখন তিনি এ মসলার ক্ষেত্রে তাঁর পর্যালোচনা ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ পেশ করলেন এবং স্বীয় মতামত প্রকাশ করলেন অমনি সাধারণভাবে ফকীহ মহলে এক ধরনের বিস্ময় ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হল।

---

১. ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৮।

২. বিস্তারিত আলোচনা ও প্রমাণপঞ্জীর জন্য ইবনে কায়্যিম-এর যাদুল-মাআদ بحث فى من طلق ثلاث بكلمة واحدة ৪র্থ খণ্ড এবং اغاثة اللهفان দ্র.

হলফ বি'ত-তালাক-এর মসলা ও ইবনে তায়মিয়ার নজরবন্দী

সে যা-ই হোক, এক সঙ্গে তিন তালাকের মসলা ছিল নির্ভেজাল ফিক্‌হী মসলা এবং ছিল ঘরোয়া ও পারিবারিক সমস্যা যার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া দেখা দিত একটি খান্দানের সামগ্রিক জীবন ও যিন্দেগীর ওপর। কিন্তু দ্বিতীয় যে মসলাটির ব্যাপারে তিনি মযহাব চতুষ্টয় ও বিখ্যাত মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীত মত পোষণ করেন এবং যে বিষয়টি পারস্পরিক সম্পর্ক ও লেনদেন, রাজনীতি ও রাজা-প্রজার পরস্পরের সম্পর্ককে পর্যন্ত প্রভাবিত করত তা ছিল হলফ বি'ত-তালাক-এর মসলা।

সে যুগে হলফ বি'ত-তালাক-এর রেওয়াজ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। লোকে কোন কথার ওপর অত্যধিক জোর ও গুরুত্ব দেবার জন্য অথবা স্বীয় বক্তব্য ও কথার সত্যতা কিংবা দৃঢ় অভিপ্রায় ব্যক্ত করতে অবলীলায় তালাকের আশ্রয় গ্রহণ করত এবং কথার মাঝখানে তালাক টেনে নিয়ে আসত। যেমন, আমি অবশ্যই এমনটি করব, অন্যথায় আমার স্ত্রী তালাক (علی الطلاق لافعلن کذا) অথবা এ আমি কখ্‌খনোই করব না, করলে তালাক (علی الطلاق لامتنعن عن کذا) কিংবা তোমাকে এমনটি করতে হবে, নইলে স্ত্রী তালাক (علی الطلاق لتفعلن کذا) অথবা আমি এই জিনিষ এত মূল্যে খরিদ করেছি, যদি ভুল বলে থাকি তবে স্ত্রী তালাক (علی الطلاق اشتریتها بکذا)। ইবনে তায়মিয়া (র) দেখতে পেলেন, আসলে এটা এক ধরনের কসম (শপথ) এবং তাকীদ প্রদানের একটি পন্থা। কিন্তু লোকে জোর দেবার ও নিশ্চিত বিশ্বাস উৎপাদনের উদ্দেশে কথার মাঝখানে অনর্থক তালাক কথাটি টেনে আনে, অথচ এ ক্ষেত্রে তার আসল মকসূদ তালাক নয়, থাকেও না। প্রকৃতপক্ষে এটি এক প্রকার কসম। কিন্তু একে ভুল বুঝে শর্তাধীনে তালাক (طلاق معلق) ধরে নিয়ে এক্ষেত্রে তালাকের বিধান প্রয়োগ করছে এবং এতে শত শত ঘর ও পরিবার শুধু এ কারণেই ভেঙে যাচ্ছে এবং দাম্পত্য ও পরিবারিক জীবনে গভীর সংকট ও বিশৃংখল অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে।

এরপর হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের যুগ থেকে বায়'আত (খলীফার প্রতি আনুগত্যের শপথ) দৃঢ় ও অধিকতর মযবুত করবার উদ্দেশে বায়'আতের বাক্যের মধ্যে তালাক শব্দটি ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং এই শব্দটি বায়'আতের অংশে পরিণত হয়েছে ঃ যদি আমি অমুকের প্রতি আনুগত্যের শপথ প্রত্যাহার করি তাহলে আমার বিবি তালাক। ইবনে তায়মিয়া (র) এই মসলা নিয়ে গভীর

চিন্তা-ভাবনার পর ফতওয়া দিতে শুরু করেন, এ হলফেরই একটি ধরন মাত্র। এর অন্যথাকারী কিংবা কথিত উক্তি ও বক্তব্যের বিপরীত অবস্থায় শপথ বাক্য উচ্চারণকারী কসম ভঙ্গকারী হিসাবে বিবেচিত হবে এবং এ ক্ষেত্রে কসম ভঙ্গের দায়ে তাকে কাফফারা আদায় করতে হবে; স্ত্রী তালাক হবে না।

যদিও ইবনে তায়মিয়া (র) তাঁর ফতওয়ার সমর্থনে মযহাব চতুষ্টয়ের কতক ইমাম ও তাঁদের কতক সাথীর উক্তি পেশ করেছেন। কিন্তু ঘটনা হল, এই ফতওয়া ছিল ঐ সব মযহাবের মশহূর মত ও ফতওয়া হিসবে-স্বীকৃত অভিমতের বিরোধী এবং তা ছিল ইমামের নতুন গবেষণালব্ধ পর্যালোচনা ও ইজতিহাদী বিশ্লেষণ। ফলে এই ফতওয়ার প্রতিক্রিয়ায় জনমনে সাধারণভাবে চিত্তচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় এবং 'আলিম সমাজ ও কাযী মহল তাঁকে এ ধরনের ফতওয়া প্রদান থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেওয়া প্রয়োজন মনে করেন যাতে করে জনমনে অধিকতর চিত্ত বিক্ষোভ ও চিত্তচাঞ্চল্যের সৃষ্টি না হয়। হাফিজ ইবনে কাছীর ৭১৮ হিজরীর ঘটনাবলীর বিবরণ পেশ করতে গিয়ে লেখেন ঃ

> ১৫ই রবী'উ'ল-আওয়াল বৃহস্পতিবার কাযীউ'ল-কুযাত শামসুদ্দীন ইবনে মুসলিম ইমাম ইবনে তায়মিয়ার সঙ্গে মোলাকাত করেন এবং তাঁকে পরামর্শ দেন যাতে তিনি হলফ বি'ত-তালাক সম্পর্কে ভবিষ্যতে আর কোন ফতওয়া না দেন। শায়খ (র) তাঁর এই পরামর্শ কবুল করেন এবং কাযীউ'ল-কুযাতের খাতিরে ও মুফতীদের রেয়ায়েত করে এই ওয়াদা করেন। জুমাদা'ল-উলার শুরুতে মিসর থেকে সুলতানের ফরমানও এসে পৌছে। এতে ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-কে হলফ বি'ত-তালাক-এর মসলার ক্ষেত্রে ফতওয়া দেওয়া থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছিল। একটি প্রকাশ্য ও সাধারণ মাহফিলে এই ফরমান পড়ে তাঁকে শোনানো হয়। ইমাম এ ফরমান মেনে নেন এবং শহরে এর ঘোষণা দেওয়া হয়। সুলতানের এই ফরমানের পূর্বেই মুফতীদের একটি দল কাযী ইবনে মুসলিমের সঙ্গে সাক্ষাত করেছিলেন। তাঁদের পরামর্শে কাযী সাহেব ইবনে তায়মিয়া (র)-র

১. এই মসলার সঠিক রূপ ও প্রকৃতি এবং উভয়পক্ষের দলীল-প্রমাণ বোঝবার জন্য দ্র. শায়খ মুহাম্মদ আবূ যুহরা মিসরীর 'ইবনে তায়মিয়া' নামক পুস্তকের 'হলফ বি'ত-তালাক' অধ্যায়, ৪৩৬-৩৭ প.

নিকট এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছিলেন, তিনি যেন এই মসলার ব্যাপারে নিশ্চুপ থাকেন। তিনি মতবিরোধ ও হাঙ্গামার হাত থেকে বাঁচবার জন্য তা মেনে নেন।[১]

মনে হয়, সুলতানের ফরমান প্রকাশিত হবার পর এই ধারণায় যে, সরকারের এই মসলার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবার কোনই অধিকার নেই এবং কোন 'আলিমের পক্ষে হুকুমতের ভয়ে তাঁর ইল্‌ম ও 'আকীদা গোপন করা জায়েয নয় অথবা এই মসলার ব্যাপারে তিনি পরিপূর্ণরূপে নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলেন এবং তাঁর বক্ষ আরও উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছিল বিধায় পুনরায় তিনি তাঁর তাহকীক মুতাবিক ফতওয়া দেওয়া শুরু করেন এবং হুকুমতের নিষেধাজ্ঞামূলক ফরমানের কোন পরওয়াই করেন নি। সেজন্য ইবনে কাছীর ৭২০ হিজরীর সংঘটিত ঘটনাবলীর বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন ঃ

> ২২ শে রজব বৃহস্পতিবার দারু'স-সা'আদায় নায়েব-এ সালতানাতের উপস্থিতিতে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এতে মযহাব চতুষ্টয়ের কাযী, মুফতী ও শায়খুল ইসলাম শরীক হন। বৈঠকে শরীক ব্যক্তিবর্গ এই বলে আপত্তি উত্থাপন করেন, তিনি (ইবনে তায়মিয়া) তালাকের মসলায় পুনরায় ফতওয়া দিতে শুরু করেছেন। অনন্তর নায়েব-ই সালতানাত তাঁকে দুর্গের ভেতর নজরবন্দী করবার নির্দেশ জারী করেন এবং তিনি (৭২০ হিজরীর ২২শে রজব) কেল্লার ভেতর অবরুদ্ধ হন।

কিন্তু তাঁর এই বন্দী জীবন খুব দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। পাঁচ মাস আঠার দিন পর ১০ই মুহাররাম ৭২১ হিজরীতে সরাসরি মিসর থেকে তাঁর মুক্তির নির্দেশ এসে পৌছে এবং তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়।[২]

শেষ বন্দিত্ব

৭২১ হিজরী থেকে ৭২৬ হিজরী পর্যন্ত প্রায় সাড়ে পাঁচ বছর শায়খুল ইসলাম পূর্ণ আযাদী ও মনোনিবেশ সহকারে দর্‌স-তাদরীস, গ্রন্থ প্রণয়ন, ফতওয়া প্রদান ও ওয়া'জ-নসীহতের ভেতর মশগুল হয়ে পড়েন। এই সময়ের মধ্যে তিনি বেশীর ভাগ মাদরাসা হাম্বলিয়া অথবা কাসাসীনে অবস্থিত নির্ধারিত মাদরাসায় পাঠ দান করতেন। ইতিমধ্যে তিনি তাঁর পুরনো কিতাবাদি ও ছোট-খাট পুস্তক-পুস্তিকার দিকেও নজর দেন এবং কতিপয় পুস্তক নতুন প্রণয়ন করেন।

---

১. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪র্থ খণ্ড, ৮৭ পৃ.

২. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪র্থ খণ্ড, ৮৭

সম্ভবত তিনি এই সময়ে অনেক বেশী উপকারী কাজ করতে পারতেন এবং তাঁর লেখনী থেকে কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বেশ কিছু মূল্যবান ও দুর্লভ কিতাব বেরিয়ে আসত। কিন্তু তাঁর জ্ঞানগত শ্রেষ্ঠত্ব, কতকগুলো মসলা-মাসাইলের ক্ষেত্রে তাঁর একক সিদ্ধান্ত ও অভিমত তাঁর সমসাময়িক কালের লোকদের জন্য এবং স্বয়ং তাঁর জন্য ছিল এক বিরাট পরীক্ষা যার জন্য তাঁকে বারবার বিরাট মূল্য দিতে হত। এরপরও বেশী দিন নিশ্চিত ও আরামে উপবেশন করা ভাগ্যে জুটত না। মাত্র কিছু দিন অতিবাহিত না হতেই নতুন আরেকটি মসলা আলোচনার বিষয়ে পরিণত হয় যা ইতর-ভদ্র নির্বিশেষে সর্বশ্রেণীর মানুষের মনোযোগ আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়ায় যা তালাকের মসলার মত শুধু নির্ভেজাল ফিকহী মসলা ছিল না, বরং এতে আবেগের উপাদানও ছিল এবং যার ভেতর জনমন বিক্ষুব্ধ করবার মত উপকরণও ছিল প্রচুর। বলা দরকার, মসলাটি ছিল হুযূর আকরাম (স)-এর কবর যিয়ারত সম্পর্কিত।

সতের বছর আগে ইবনে তায়মিয়া (র) ফতওয়া দিয়েছিলেন, কোন কবর যিয়ারতের উদ্দেশে -চাই কি তা রওযা মুবারকই হোক না কেন (এর অধিকারীর ওপর হাযারো দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক) ইহতিমামের সঙ্গে সফর করা (আরবী ভাষায় যাকে شدالرحل বলা হয়) জায়েয নয়। কেননা এ সম্পর্কে হাদীসে উক্ত হয়েছে ঃ

لاتشداالرحال الاالى ثلاثة مساجد : المسجدالحرام ومسجدى هذا والمسجد الاقصى -

তিনটি মসজিদ ব্যতিরেকে আর কোথাওর উদ্দেশে ইহতিমামের সঙ্গে সফর করবে না। মসজিদ তিনটি হল ঃ মসজিদু'ল-হারাম, আমার মসজিদ অর্থাৎ মসজিদে নববী ও মসজিদু'ল-আকসা (বায়তু'ল মাকদিস)।

অতঃপর তিনি স্বাভাবিক নিয়মেই এর শরঈ হেকমত্ এবং এর বিরোধিতার ক্ষেত্রে এর খারাপ ও ক্ষতিকর দিকগুলো তুলে ধরেছেন। এর সংক্ষিপ্তসার এরূপঃ

উল্লিখিত তিনটি মসজিদবহির্ভূত অন্য কোথাও ইহতিমামের সঙ্গে সফরের দ্বারা শির্ক ও শির্কমূলক 'আকীদা ও 'আমলের দরজা খুলে যাবে। লোকে এরূপ যিয়ারতকে ইবাদত ও আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের মাধ্যম মনে করতে থাকবে। সেখানে পৌঁছে শরীয়ত নির্দেশিত সীমারেখা লংঘন করবে এবং

তওহীদের অঞ্চল-প্রান্ত হস্তচ্যুত হবে। হুযূর আকরাম (স) স্বীয় কবর মুবারককে অজ্ঞ জাতিগোষ্ঠী ও রসম-রেওয়াজের হাত থেকে মুক্ত রাখার লক্ষ্যে এতখানি উদ্‌গ্রীব ছিলেন যে, তিনি বলেন ঃ

لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا -

আল্লাহ পাক ইয়াহূদী ও নাসারাদেরকে লা'নত দিন। কেননা তারা তাদের নবীদের কবরগুলোকে মসজিদ বানিয়ে ছেড়েছে।[১]

অধিকন্তু তিনি বড়ই ইহতিমামের সঙ্গে দু'আ করতেন ঃ

اللهم لاتجعل قبرى وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا -

হে আল্লাহ! তুমি আমার কবরকে পূজার স্থান বানিও না। আল্লাহ্‌র ক্রোধ সে সব জাতিগোষ্ঠীর ওপর কঠোরতর হোক যারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদ বানিয়েছে।[২]

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন ঃ

لاتتخذوا قبرى عيدا وصلوا على فان صلاتكم حيثما كنتم تبلغنى -

তোমরা আমার কবরকে আনন্দ উৎসবের স্থান বানিও না, বরং তোমরা আমার উদ্দেশে দরূদ ও সালাম পাঠাবে। আর তোমরা যেখানে থেকেই দরূদ ও সালাম পাঠাও না কেন তা আমাকে পৌছান হবে।[৩]

আর এজন্যই তিনি কোন প্রান্তর কিংবা ময়দানে দাফন হওয়াকে পছন্দ করেন নি, বরং তিনি হযরত 'আইশা (রা)-র কামরায় দাফন হন। স্থান হিসেবে এটি ছিল সবচে' নিরাপদ ও সুরক্ষিত। এসবের একমাত্র দাবী ছিল, রওযা মুবারককে সে সমস্ত সমূহ বিপদাশংকা থেকে মুক্ত ও সুরক্ষিত রাখা এবং ইহতিমামের সঙ্গে দলে দলে যিয়ারতের উদ্দেশে আগমনের অনুমতি না দেওয়া। অবশ্য যাঁরা মসজিদে নববী (স)-তে সালাত আদায়ের নিয়তে আগমন করবেন

---

১. বুখারী ও মুসলিম।

২. মালিক ও মুসনাদ ইমাম আহমদ।

৩. সুনান আবী দাউদ প্রভৃতি।

তাঁরা সুন্নত তরীকায় রওযা মুবারক যিয়ারত করবেন এবং রসূল (স)-এর ওপর দরূদ ও সালাম পাঠাবেন যেভাবে সাহাবা-ই কিরাম (রা) ও তাবি'ঈন পাঠাতেন।[১]

বিভিন্ন কার্যকারণের ভিত্তিতে সতের বছর পূর্বের এই ফতওয়া টেনে বের করা হয় এবং ব্যাপকভাবে তা প্রচার করা হয়। এর ফলে একদিকে যেমন সাধারণ মুসলমানদের আবেগ-অনুভূতিতে আঘাত লাগে, যারা এই যিয়ারতকে এক বিরাট নে'মত ও মহাসৌভাগ্যের বিষয় বলে মনে করত এবং এই নে'মত লাভে যারা গভীরভাবে আগ্রহী ছিল তারা এর ভেতর রসূল আকরাম (স)-এর দরবারের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান ও আদব প্রদর্শনে কমতি লক্ষ্য করেন। অপর দিকে 'উলামায়ে কিরাম এর ভেতর গোটা উম্মার বিরোধিতা ও তাঁর নিজের আত্মম্ভরিতা দেখতে পান। আর সম্ভবত এটাই ছিল তাঁর বিরোধিতার আসল কারণ।

যা-ই হোক, এই মতবিরোধ এতখানি গুরুত্ব লাভ করে এবং এর এতটা চর্চা চলে যে, শেষ পর্যন্ত তৎকালীন হুকুমত ('উলামায়ে কিরাম কর্তক হুকুমতের দৃষ্টি আকর্ষণ অথবা নিজেদের রাষ্ট্রীয় শান্তি-শৃংখলা রক্ষার স্বার্থে) এতে হস্তক্ষেপ করা সমীচীন বোধ করেন এবং ৭২৬ হি. ৭ই শা'বান তারিখে তাঁকে (ইবনে তায়মিয়াকে) বন্দী করবার নির্দেশ জারী হয়। শায়খ (র) এই নির্দেশকে খোশ আমদেদ জানান এবং অত্যন্ত আনন্দ ও উৎফুল্ল মনোভাব প্রকাশ করেন। তিনি তাঁকে বন্দী করবার নির্দেশ জারীর সংবাদ পেতেই বলে ওঠেন ঃ

انا كنت منتظرا ذلك وهذا فيه خيركثير ومصلحة كبيره -

আমি তো এরই অপেক্ষায় ছিলাম। আর এর ভেতর প্রচুর কল্যাণ ও বিরাট স্বার্থ লুকিয়ে রয়েছে।

১. তাঁর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে যতদূর জানা যায় তাতে (আল্লাহ্র ওয়াহদানিয়াত তথা একত্ববাদের যত বেশী পারা যায় ইহতিমাম করতে হবে এবং শিরক্ ও মুশরিকী আমল ও রসম-রেওয়াজের তামাম পন্থা রুদ্ধ কতে হবে) কোন জ্ঞানী ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করতে পারেন না। কিন্তু এর জন্য নবী করীম (স)-এর কবর যিয়ারতকে আদতে বন্ধ করে দেওয়া অনুভূতির তীক্ষ্ণতা ও বাড়াবাড়ির হাত থেকে মুক্ত নয়। আর এটি এমন বিষয়ও নয় যা তাঁর জ্ঞানগত ও ধর্মীয় মর্যাদার পরিপন্থী। তাঁর প্রতি আমাদের সুধারণা ও তাঁর কামালিয়তের স্বীকৃতি দানের পথে প্রতিবন্ধকও নয়। এ মসলা এতটা সঙ্গীনও ছিল না যার জন্য তাঁকে বন্দী করাতে হবে এবং তিনি সেই অবস্থাতেই দুনিয়া থেকে বিদায় নেবেন

শায়খ (র)-কে দামিশ্ক দুর্গে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে তাঁর জন্য একটি প্রাসাদ-কক্ষ খালি করে দেওয়া হয়। বাইরে থেকে পানির ঝর্ণা দুর্গের ভেতর নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা হয়। ইমামের খেদমত ও আরাম-আয়েশের জন্য তদীয় ভ্রাতা যয়নুদ্দীন ইবনে তায়মিয়াকে তাঁর সঙ্গে অবস্থানের অনুমতি প্রদান করা হয়। ব্যয় নির্বাহের জন্য হুকূমত প্রয়োজনীয় অর্থও বরাদ্দ করে।

দুর্গাভ্যন্তরে অবরুদ্ধ হবার পর লোকেরা প্রতিশোধমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনার অবাধ সুযোগ লাভ করে। হিংসুটে ও বিরোধী পক্ষের লোকেরা এ সময় তাঁর বিভিন্ন বন্ধু-বান্ধব ও শাগরিদদের ওপর আক্রমণ চালায়। কতককে পশুপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়ে চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করানো হয় এবং ঢ্যাড়া পেটানো হয়। অতঃপর কাযীউ'ল-কুযাতের হুকুমে একটি জামা'আতকে কয়েদও করা হয়। কিছু দিন পর তাদের সবাইকে ছেড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু শায়খুল ইসলামের বিশিষ্টতম শাগরিদ ও স্থলাভিষিক্ত হাফিজ ইবনে কায়্যিম স্বীয় উস্তাদ ও শায়খ-এর সঙ্গেই থাকেন এবং শায়খ (র)-এর ওফাতের পর মুক্তি পান।[১]

'আলিম ও ধার্মিক লোকদের দুঃখ ও ক্ষোভ প্রকাশ

শায়খুল ইসলাম (র)-এর কয়েদ ও নজরবন্দী যেখানে বিরোধী ও হিংসুটে লোকদের একটি ক্ষুদ্র দলের আনন্দ ও পরিতৃপ্তি লাভের কারণ হয়, সেখানে হাযার হাযার 'আলিম ও লক্ষ লক্ষ মুসলমানের জন্য তা দুঃখ ও বেদনার কারণ হয়। তারা একে সুন্নাহ্‌র মুকাবিলায় বিদ'আতের বিজয় এবং হক ও হকপন্থীদের জন্য অবমাননার সমার্থক হিসাবে ধরে নেয়। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন কোণ থেকে এবং বড় বড় 'আলিম ও ধার্মিক লোকের পক্ষ থেকে সুলতান-ই-মু'আজ্জাম (আল-মালিকু'ন-নাসির)-এর খেদমতে এমন সব চিঠিপত্র আসতে শুরু করে যেসব চিঠিপত্রে এ ঘটনায় তাদের মানসিক প্রতিক্রিয়া ও বিস্ময়ের প্রতিফলন ঘটেছিল। এ ক্ষেত্রে আমরা কেবল একটি চিঠি যা বাগদাদের 'উলামায়ে কিরাম সুলতানের খেদমতে পাঠিয়েছিলেন, উদ্ধৃত করছি। এর থেকেই পরিমাপ করা যাবে, শায়খ (র)-এর দাওয়াত ও খ্যাতি তৎকালীন মুসলিম জাহানে কিভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং সমস্ত হকপন্থী তাঁর ব্যক্তিত্বের সঙ্গে কতখানি সম্পর্কিত ও তাঁর প্রতি কতটা আকৃষ্ট ছিলেন। 'উলামায়ে বাগদাদ লিখেন ঃ

---

১. ইবনে তায়মিয়া, মুহাম্মদ আবূ যুহরাকৃত, ৮০ পৃ.।

لماقرع اهل البلاد المشرقية والنواحى العراقيه التضييق على شيخ الاسلام تقى الدين احمد بن تيميه سلمه الله عظم ذالك على المسلمين وشق على ذوى الدين وارتفعت رؤس الملحدين وطابت نفوس اهل الاهواء والمبتدعين : ولما رأى علماء هذه الناحية عظم هذه النازلة من شماتة اهل البدع واهل الاهواء باكابر الفضلاء وائمة العلماء انهوا حال هذا الامر الفظيع والامر الشنيع الى الله شرفا: وكتبوا اجوبتهم فى الحضرةالشريفة السلطا نيه زادها تصوبب ماجاب به الشيخ سلمه الله فى فتاوا هو ذكروا من علمه وفضائله بعض ماهو فيه وحملوازالك بين يدى مولانا ملك الامراء اعز الله انصاره وضاعف افتداره غيرة منهم على هذا الدين ونصيحة للاسلام وامراء المؤمنين ـ

পূর্বাঞ্চলের শহরগুলো ও ইরাকের অধিবাসীরা যখন জানতে পারল, শায়খুল ইসলাম ও তকীয়্যুদ্দীন আহমদ ইবনে তায়মিয়ার জীবনকে সংকুচিত ও দুর্বিষহ করে তোলা হচ্ছে তখন মুসলিম জনসাধারণ সে সংবাদে অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করে এবং ধার্মিক ব্যক্তিগণ তীব্র মানসিক যাতনা ভোগ করেন। দেখা গেল, এর ফলে ধর্মদ্রোহী (মুলহিদ)-রা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছে, উৎফুল্ল হয়েছে। প্রবৃত্তিপূজারী ও বিদ'আতীরা ইমামের দুরবস্থা দেখে আহ্লাদে আটখানা হয়েছে। এদিককার 'উলামায়ে কিরাম যখন এ ঘটনার গুরুত্ব সম্পর্কে জানতে পারলেন এবং তাঁরা যখন দেখতে পেলেন, বিদ'আতী ও বাতিলপন্থীরা এই শ্রেষ্ঠতম মুসলিম মনীষী ও 'আলিমগণের ইমামের এই অবমাননা ও দুঃসহ সংকেট আনন্দে উৎফুল্ল তখন তারা এই অনভিপ্রেত ঘটনা ও এর (অশুভ) প্রভাব-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সুলতানকে অবহিত করা প্রয়োজন মনে করলেন এবং শায়খ (র)-এর ফতওয়ার সমর্থনে নিজেদের উত্তর লিখে পাঠালেন। তাঁরা শায়খ (র)-এর 'ইল্ম (জ্ঞান ও বিদ্যাবত্তা), তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কে নিজেদের অনুভূতি ও উপলব্ধিও লিপিবদ্ধ করেন এবং এ সবই মালিকু'ল-মু'আজ্জামের খেদমতে পাঠিয়ে দেন। আর এসবের পেছনে উদ্দেশ্য ছিল নিছক একটাই আর তা হ'ল ধর্মীয় মর্যাদাবোধের দাবী ও মুসলিম সুলতানের কল্যাণ কামনা।[১]

---

১. উকূদুদ্দুর্রিয়া, ৩৫০ পৃ.; কাওয়াকিবুদ্দুর্রিয়া, ১৯৮ পৃ.।

কারাগারে ইবনে তায়মিয়া (র)-র কর্মব্যস্ততা

দীর্ঘকাল পর কারাগার জীবনে শায়খ (র) তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলতে এবং একাগ্রতারূপ মহাসম্পদ লাভে সক্ষম হন। সম্ভবত এর প্রতি লক্ষ্য করেই তিনি বলেছিলেন, فيه خير كثير و مصلحة كبيرة তিনি এই নির্জন ও নিঃসঙ্গ জীবনের পরিপূর্ণ মর্যাদা দান করেন এবং পরিপূর্ণ আত্মনিমগ্নতা ও গভীর আগ্রহ সহকারে ইবাদত ও তেলাওয়াতে কালামে পাকের ভেতর মশগুল হয়ে পড়েন। এরপর হাতে যা কিছু সময় থাকত তা অধ্যয়ন, গ্রন্থ রচনা ও স্বীয় গ্রন্থের সংশোধন ও পরিমার্জনের কাজে ব্যয় করতেন। আর এটিও ছিল স্বয়ং এক চিরন্তন ইবাদত। এই অবকাশ জীবনে তাঁর সবচে' বড় নেশা ছিল কুরআন পাক তেলাওয়াত। এবারের বন্দী জীবন ছিল দু'বছরের। এই সংক্ষিপ্ত মুদ্দতে তিনি তাঁর ভাই শায়খ যয়নুদ্দীন ইবনে তায়মিয়ার সাথে কুরআন মজীদ ৮০ বার খতম করেন।[১]

কারাগারে তিনি যা কিছু লিখেছিলেন তার বেশীর ভাগই ছিল তাফসীর সম্পর্কিত। এর কারণও ছিল সম্ভবত তেলাওয়াতের আধিক্য ও কুরআন মজীদ গভীর অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন। কতিপয় মসলা বিষয়ে তিনি পুস্তিকা ও উত্তর পত্র লেখেন। বাইরে থেকে যেসব গুরুত্বপূর্ণ ও বিশেষ তত্ত্বগত প্রশ্নাদি ও ফিক্হী সংক্রান্ত খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ চেয়ে পাঠানো হত তিনি তার জওয়াব দিতেন। সাধারণ দর্স প্রদান ও ওয়া'জ-নসীহত ছাড়া তাঁর আর সব কিছুই রুটিন মাফিক চলছিল, তেলাওয়াতের আধিক্য ও ইবাদতের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছিল।

নতুন বিধিনিষেধ, লেখাপড়ার উপকরণাদি থেকে বঞ্চিত

কারাগারে বসে শায়খ (র) যা কিছুই লিখতেন লোকে তা হাতে হাতে লুফে নিত এবং তা দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছে যেত। অপরাপর যেসব পুস্তক-পুস্তিকা ও মসলা-মাসাইল তিনি জেলখানায় বসে লিখেছিলেন তার ভেতর একটি পুস্তিকা ছিল যিয়ারতের মসলা সম্পর্কিত। এতে তিনি মিসরের আবদুল্লাহ্ ইবনু'ল-আখনাঈ নামক মালিকী মযহাবের একজন কাযীকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।[১] এতে তিনি প্রমাণ করেন, উল্লিখিত কাযী খুবই অল্প জ্ঞানের অধিকারী অকাট মূর্খ ছাড়া আর কিছু নন। কাযী সাহেব এর বিরুদ্ধে

---

১. আল-বিদায়া, ১৩৮ পৃ.।

২. দ্র الاخنائية। মিসর থেকে মুদ্রিত।

সুলতানের নিকট অভিযোগ দায়ের করেন এবং নিজের ক্রোধ প্রকাশ করেন। অতঃপর সুলতান ফরমান জারী করেন, শায়খ-এর নিকট কাগজ কলম দোয়াত যা কিছু আছে তা ছিনিয়ে নেওয়া হোক এবং তাঁর নিকট এমন কিছু যেন না থাকে যার সাহায্যে তিনি লিখতে পারেন।

৭২৮ হিজরীর ৯ই জুমাদা'ল-উখরা এই নির্দেশ পালিত হয়। তাঁর কাছ থেকে লেখাপড়ার সর্ববিধ উপকরণ ছিনিয়ে নেওয়া হয়। ১লা রজব তারিখে তাঁর সমস্ত পাণ্ডুলিপি ও লিখিত পৃষ্ঠা জেল থেকে তুলে 'আদিলিয়া'[২] র বড় কুতুবখানায় (লাইব্রেরী) নিয়ে রাখা হয়। এসব কিতাবের পরিমাণ ছিল ষাট খণ্ডের এবং ১৪টি কাগজের সেরেজা ছিল যাতে তিনি লেখাপড়া করতেন।

কয়লার সাহায্যে লিখন

এত কিছুর পরও শায়খ (র) কোনরূপ ক্ষোভ প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকেন, এমন কি হুকুমতের নিকট অভিযোগটুকু পর্যন্ত তিনি করেন নি। তাঁর থেকে দোয়াত কলম নিয়ে যাবার পর এদিক ওদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বিক্ষিপ্ত কাগজপত্রে কয়লার সাহায্যে লিখতে শুরু করেন। তাঁর কতিপয় পুস্তিকা ও নিবন্ধ কয়লা লিখিত পাওয়া গিয়েছিল এবং বহু কাল এগুলো উক্ত অবস্থায় সুংরক্ষিত থাকে। এরূপ অসহায় ও নিঃসম্বল অবস্থায় তাঁকে শোকরগুযার ও সন্তুষ্টচিত্ত মনে হত। তিনি এও অনুভব করতেন, তিনি জিহাদের ময়দানের মর্দে মুজাহিদের মর্যাদাধারী এবং এক্ষেত্রে অবস্থার কোন হেরফের হয়নি। এক পত্রে তিনি বলেন ঃ

نحن ولله الحمد فى عظيم الجهاد فى سبيله بل جهادنافى هذا مثل جهادنايوم قاذان والجبلية والجهمية والاتحادية وامثال ذلك وذلك من اعظم نعم الله علينا و على الناس ولكن اكثر الناس لا يعلمون -

আলহামদুলিল্লাহ্! আমরা এক বিরাট জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর ভেতর ব্যাপৃত আছি। আমাদের এখানকার জিহাদ কাযানের ঘটনা, কোহিস্তানের জিহাদ, জাহমিয়া ও ইত্তিহাদী (ওয়াহদাতু'ল-ওজূদ মতবাদী) প্রমুখের বিরুদ্ধে

---

২. এই ইমারতটি আজ আল-মাকতাবা জাহিরিয়ার সামনে অবস্থিত। এখানেই ইবনে খাল্লিকান তাঁর বিখ্যাত পুস্তক وفيات الاعيان লিখেছিলেন. আল-ফিয়াহ গ্রন্থ প্রণেতা ইবনে মালিক দরস প্রদান করেছিলেন। বর্তমানে মাজমাউল ইলমী আল-আরাবীর কেন্দ্র।

সংগ্রাম আমাদের অতীত জিহাদগুলোর তুলনায় মোটেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এটি আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে আমাদের ওপর এক বিরাট ইহসান। কিন্তু অধিকাংশই লোকই এর হাকীকত সম্পর্কে অবহিত নয়।[১]

আত্মসমর্পণ ও আত্মতুষ্টি এবং হাম্‌দ ও শোকর

অপর এক পত্রে তাঁর ঈমানী অবস্থা, আল্লাহর ইচ্ছার নিকট আত্মসমর্পণ এবং তাঁর ইচ্ছাকেই সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেবার শান নিম্নোক্তভাবে প্রতিফলিত হয়েছে ঃ

كل ما يقضيه الله تعالى فيه الخير والرحمة والحكمة ان ربى لطيف لما يشاء انه هو القوى العزيزالعليم الحكيم ولايدخل على احد ضرر الامن ذنوبه مااصابك من حسنةفمن الله وما اصابك من سيئة فمن نفسك فالعبد عليه ان يشكر الله ويحمده دائما على كل حال ويستغفر من ذنونه فالشكر يوجب المزيد من النعم والاستغفار يدفع النقم ولايقضى الله للمرء من قضاء الاكان خيرا له ان اصابته سراء شكر وان اصابته ضراء صبر وكان خيراله -

আল্লাহ পাক তাঁর বান্দার জন্য যে ফয়সালাই করেন তার ভেতরেই কল্যাণ, বরকত, রহমত ও হেকমত নিহিত রয়েছে। আর নিশ্চয় আমার রব তাঁর ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ের ক্ষেত্রে অতি সূক্ষ্ম, আর তিনি শক্তিশালী, পরাক্রমশালী ও মহাবিজ্ঞ। মানুষ কেবল তার গোনাহ্‌র কারণেই ক্ষতির সম্মুখীন হয়। (আল্লাহ বলেন) "তুমি যা কিছু ভাল পাও তা আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে লাভ কর আর খারাপ যা কিছু পাও তা তোমার নিজের অর্জিত।" এজন্য বান্দাহ্‌র কর্তব্য সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায় করা, তাঁর হাম্‌দ ও ছানা পাঠ করা এবং নিজ গোনাহ্‌র জন্য তাঁর দরবারে তওবাহ ইস্তিগফার করা। আর তা এজন্য করতে হবে, শোকর আদায় সজীব ও অধিকতর নে'মত লাভের কারণ হয় এবং তওবাহ ইস্তিগফার আল্লাহ্‌র ক্রোধ ও শাস্তিকে প্রদমিত করে। আর আল্লাহ্ তা'আলা তদীয় বান্দাহ্‌র জন্য যে ফয়সালাই করেন তা তার অনুকূলে শুভ প্রমাণিত হয়। হাদীস শরীফে উক্ত হয়েছে ঃ মু'মিন যখন আল্লাহ্‌র তরফ থেকে কোন নে'মত ও আনন্দদায়ক বস্তু লাভ করে তখন শোকর আদায় করে। আর যখন বিপদ মুসীবত আপতিত হয় তখন সবর করে, ধৈর্য ধরে। এটাই তাঁর জন্য কল্যাণ।

১. ইবনে তায়মিয়া মুহাম্মদ আবু যাহরাকৃত।

শায়খ (র) এ অবস্থায় স্বীয় অভিমতের বিশুদ্ধতা ও নিজের নির্দোষিতা সম্বন্ধে পুরোপুরি স্থির নিশ্চিত ছিলেন। তিনি তাঁর অপরাধ স্রেফ এতটুকুই মনে করতেন, তিনি একটি শর'ঈ মসলার ক্ষেত্রে সমসাময়িক শাসকের কথা অমান্য করেছেন এবং যাকে তিনি হক মনে করেছেন, জিদ ধরে তিনি তার ওপর আড় হয়ে দাঁড়িয়েছেন। তিনি তাঁর এ অপরাধের স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং একে তিনি তাঁর ঈমান ও তওহীদের দাবীর পরিপূরক মনে করেন।

غاية ماعندهم انه خولف مرسوم بعض المخلوقين والمخلوق كائنا من كان اذاخالف امر الله تعالى ورسوله لم يجب بل لا تجوز طاعته فى مخالفة امرالله ورسوله باتفاق المسلمين -

আমার বিরুদ্ধে তাদের সবচে' বড় অভিযোগ হল, একজন মানুষের (যিনি অপরাপর মানুষের মতই আল্লাহ্‌র একজন বান্দাহ) নির্দেশ অমান্য করা হয়েছে। সে মানুষ সমসাময়িক শাসক কিংবা সুলতান যিনিই হোন, যখন আল্লাহ ও তদীয় রসূল (স)-এর নির্দেশের বিরোধিতা করবে তখন তার নির্দেশ কখনোই মানা যাবে না, বরং মুসলিম উম্মাহর ঐকমত্যে আল্লাহ্‌র ও তাঁর রসূল (স)-এর বিরোধিতার ক্ষেত্রে তার আনুগত্য জায়েয হবে না।

জীবনের শেষ দিনগুলো ও ইনতিকাল

শায়খুল ইসলামের ভাই যয়নুদ্দীন 'আবদুর রহমান বলেন, কুরআন মজীদ আশি বার খতম করবার পর যখন তিনি পরবর্তী খতমের উদ্দেশে নতুন করে তেলাওয়াত আরম্ভ করে সূরা কামার-এর নিম্নোক্ত আয়াতে গিয়ে পৌছুলেন ঃ

ان المتقين فى جنت ونهر فى مقعد صدق عند مليك مقتدر -

তখন আমার পরিবর্তে 'আবদুল্লাহ ইবন্ মুহিব্ব ও আবদুল্লাহ আয-যুর'আর সঙ্গে (দওর) শুরু করলেন। এ দু'জন বড় নেককার লোক ছিলেন এবং ছিলেন সহোদর ভ্রাতা। শায়খ (র) তাঁদের কিরাআত খুবই পসন্দ করতেন। এই নতুন দওর শেষ হবার আগেই তাঁর জীবনের অন্তিম মুহূর্ত ঘনিয়ে এল।

মৃত্যু রোগ-যন্ত্রণা শুরু হতেই দামিশক-এর নায়েব (শাসনকর্তা) রোগ পরিচর্যার উদ্দেশে আগমন করেন। কুশলাদি বিনিময়ের পর নায়েব ওযরখাহী করতে শুরু করেন এবং বলেন ঃ আমার দ্বারা কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি হলে কিংবা কষ্ট পেয়ে থাকলে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন। জবাবে শায়খ (র) বলেন ঃ

انی قد احللتك وجميع من عادانی وهولايعلم انی علی الحق واحللت السلطا ن المعظم الملك الناصر من حبسه ايای ـ لكونه فعل ذلك مقلدا معذورا و لم يفعله لحظ نفسه وقد احللت كل احد مما بينی وبينه الا من كان عدو الله ورسوله (صلی الله عليه وسلم)

আমি আমার পক্ষ থেকে আপনাকে ক্ষমা করেছি আর তাদেরকেও ক্ষমা করেছি যারা আমার সঙ্গে শত্রুতা করেছে। আর আমি যে সত্যের ওপর আছি তা তারা জানে না। সুলতান মু'আজ্জাম আল-মালিকুন-নাসির আমাকে বন্দী করেছিলেন বলে তাঁর বিরুদ্ধেও আমার কোন অভিযোগ নেই। কেননা তিনি নিজের থেকে এ কাজ করেন নি, বরং 'উলামায়ে কিরামের প্রতি আস্থা ও আনুগত্যের কারণে করেছেন। এজন্য তাঁকে আমি মা'যূর মনে করি। আমার পক্ষ থেকে আমি তাদের সবাইকেই মাফ করেছি, কেবল তাদেরকে নয়, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (স)-এর দুশমন।

ইনতিকালের বিশ-বাইশ দিন আগে তাঁর শরীর এমনই খারাপ হয়ে পড়ে যা পরে আর ভাল হয়নি। আর এ অবস্থায় ২২ শে যি'ল-কা'দাঃ, ৭২৮ হিজরীর রাত্রে পরপারের ডাক এসে পৌছে এবং ৬৭ বছর বয়সে তিনি এই মর জগত ছেড়ে মহালোকে প্রস্থান করেন।

كل من عليها فان ويبقی وجه ربك ذوالجلال والاكرام ـ

মুওয়াযযিন দুর্গের মীনারে চড়ে শায়খু'ল-ইসলাম (র)-এর মৃত্যুবার্তা ঘোষণা করেন। অতঃপর বুরুজে মোতায়েন পাহারারত চৌকিদার সেখানে থেকে উক্ত ঘোষণার পুনরাবৃত্তি করেন। বিদ্যুৎ বেগে এ খবর শহরে ছড়িয়ে পড়ে। দুর্গের দরজা খুলে দেওয়া হয় এবং সর্বসাধারণকে দুর্গে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করা হয়। লোক দলে দলে আসছিল এবং শায়খ (র)-এর মরদেহ যিয়ারত করে যাচ্ছিল। অনেকেই ভালবাসার আতিশয্যে তাঁর কপালে চুমু দিচ্ছিল, যে কপাল ঘণ্টার পর ঘণ্টা তার মালিক (আল্লাহ্)-এর সামনে সিজদাবনত থাকত।

গোসল প্রদানের পূর্বেই কুরআন মজীদ খতম করা হয়। পুরুষদের পর মহিলাদেরকে আসার অনুমতি প্রদান করা হয় এবং তারাও যিয়ারত করে। গোসল প্রদানের সময় কেবল গোসল প্রদানকারীরাই থাকতে পেরেছিলেন।

জানাযা ও দাফন

গোসল প্রদানের পর একটি সালাতে জানাযা দুর্গাভ্যন্তরেই অনুষ্ঠিত হয়। শায়খ মুহাম্মদ তামীম জানাযা পড়ান। জানাযার পর কফিন বাইরে আনা হয়। দুর্গ ও জামি 'মসজিদের মধ্যবর্তী সকল রাস্তা ছিল লোকে লোকারণ্য। চার প্রহর বেলা গড়িয়ে যাবার মুহূর্তে জানাযা জামি' মসজিদে (জামি' উমায়্যা) গিয়ে পৌছে। ভীড়ের চাপ এত বেশী ছিল যে, সৈন্যদেরকে কফিন ঘিরে রাখতে হয়। অন্যথায় জানাযার হেফাজত ও ইন্তিজাম করা ছিল সত্যিই কঠিন। লোকের সংখ্যা অনুমান করা ছিল কষ্টকর। জনতার এই ভীড়ে কেউ উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করে বলল ঃ

هكذا تكون جنائز ائمة السنة

'ইমামু'স-সুন্নাহ্‌র (সুনাহ্‌র ইমামের) জানাযা এমত শানেরই হয়ে থাকে।' এতদ্শ্রবণে লোকে কান্নায় ভেঙে পড়ে।

বাদ জোহর জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। জনতার ভীড় ক্রমেই বাড়ছিল। শেষাবধি পথ-প্রান্তর, গলি-খুপচী ও বাজার-ঘাট সর্বত্রই লোক কানায় কানায় ভর্তি হয়ে যায়। চতুর্দিকেই কেবল মাথা আর মাথাই দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। বাজার-ঘাট ছিল বন্ধ। হোটেল-রেস্তোরাঁও ছিল বন্ধ। খাবার মেলা কষ্টকর ভেবে অনেক লোকই রোযার নিয়ত করে।

জানাযা আদায়ের পর পুনরায় কফিন ওঠানো হয়। কফিনবাহী খাটিয়া কাঁধে বহনের সুযোগ ছিল না। জানাযা হাতে হাতে ও মাথায় মাথায় দ্রুত অগ্রসর হচ্ছিল। চতুর্দিক থেকেই কান্না ও আহাজারির শব্দ ভেসে আসছিল। সেই সাথে লোকের মুখে মুখে তাঁর প্রশংসা ফিরছিল এবং তাঁর জন্য দু'আ গুঞ্জরিত হচ্ছিল। ভক্তির আতিশয্যে লোকে তাদের রুমাল ও কাপড় ছুড়ে জানাযার স্পর্শ লাভ করছিল। ভিড়ের চাপে কার জুতা-চপ্পল যে কোথায় ছিটকে পড়ছিল তার কোন ঠিক-ঠিকানা ছিল না! তেমনি দশা ছিল মাথার রুমাল কিংবা পাগড়ীর। জানাযা এক নজর দেখা ও তার অনুগমনের উদ্দেশে লোকে এত বেশী মত্ত হয়ে গিয়েছিল যে, তাদের কারোরই কাপড়-চোপড় কিংবা জুতা-চপ্পলের প্রতি কোন খেয়াল ছিল না। মাথার ওপর দিয়ে জানাযা গড়িয়ে চলছিল। কখনো কিছু দূর অগ্রসর হচ্ছিল, আবার হটে আসছিল, আবার কখনো একেবারেই থেমে যাচ্ছিল। ঘোড়ার বাজার পৌছুলে লোক সংখ্যা সীমা ছাড়িয়ে যায়। এখানে জানাযা রাখা হয়। কনিষ্ঠ ভ্রাতা যয়নুদ্দীন আবদুর রহমান সামনে এগিয়ে জানাযা পড়ান। এরপর আস-সূফীয়া সমাধিভূমিতে ইমামের ভাই শরফুদ্দীন 'আবদুল্লাহর পাশেই দাফন করা হয়।[১]

---

১. সূফিয়া কবরস্থান বিরাট বড় লেখক ও বুযুর্গদের (যেমন ইব্‌ন আসাকির, ইবনু'স-সালাহ, ইবনু'ল-আছীর, আবুল হাজ্জাজ আল-মিযযী, হাফিজ 'ইমাদুদ্দীন ইব্‌ন কাছীর প্রমুখ) দাফনগাহ হিসাবে খ্যাত। বর্তমানে এর চিহ্ন খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। এখন এরই ওপর বড় বড়

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

ভোরে দুর্গ থেকে জানাযা বেরিয়েছিল, কিন্তু অত্যধিক ভিড়ের কারণে আসরের আযানের মুহূর্তে দাফন করা সম্ভব হয়। গোটা শহরই জানাযার অনুগমন করেছিল। উপস্থিতির সংখ্যা ৬০ হাযার থেকে এক লক্ষের মত হবে বলে অনুমান করা হয়েছিল যার ভেতর ১৫ হাযারের মত মহিলাও ছিল। বিভিন্ন বাড়ী-ঘরের ছাদে দাঁড়িয়ে থাকা নারী-পুরুষ ও শিশু দর্শকের সংখ্যা এর অতিরিক্ত। কোন জানাযায় এত বেশী জনসমাগম দামিশ্কের ইতিহাসে আর দেখা যায়নি। বনী উমায়্যার শাসন আমলে যখন দামিশ্কের জনবসতি বেশী ছিল তখনও সম্ভবত এর অন্যথা ঘটেনি।[১]

গায়েবানা সালাত-ই জানাযা

সুদূর উত্তর ও দক্ষিণ ভূভাগের অধিকাংশ মুসলিম দেশে গায়েবানা জানাযা পড়া হয়। ইবনে রজব তাঁর طبقات الحنابلة নামক গ্রন্থে লেখেন ঃ

وصلى عليه صلاة الغائب فى غالب بلاد الاسلام القريبة والبعيدة حتى فى اليمن والصين واخبر المسافرون انه نودى باقصى الصين للصلاة عليه يوم جمعة الصلاة على ترجمان القران -

নিকট ও দূরবর্তী মুসলিম দেশগুলোতে (ইমামের) গায়েবানা জানাযা পড়া হয়, এমন কি য়ামন ও সূদুর চীনেও তাঁর গায়েবানা জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। ভ্রমণকারীরা বর্ণনা করেছেন, চীনের একটি দূরবর্তী শহরে জুম'আর দিন গায়েবানা জানাযার ঘোষণা নিম্নোক্ত ভাষায় দেওয়া হয়েছিল: কুরআন করীমের মুখপাত্রের জানাযা হবে।

(পূর্ব পৃষ্ঠার পর) ইমারত ও দালান-কোঠা দাঁড়িয়ে আছে। কেবল শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়া (র)-এর কবর জামি'আ সারিয়া হল ও হাসপাতাল ভবনের সামনে এখনও তাঁর অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। ১৩৭০ হিজরীর ১০ই শওয়াল (২৮শে জুলাই, ১৯৫১ খৃ.) তারিমে সিরিয়ার শায়খ আল্লামা মুহাম্মদ বাহজাতুল বায়তার-এর নেতৃত্বে ও সমভিব্যাহারে বর্তমান লেখক উক্ত কবর যিয়ারত করেন। 'আল্লামার মুখে শুনেছি, ভার্সিটির কোন নির্মাণ কর্মের প্রয়োজনে রাতভর কবর স্থানে খনন কাজ চলে। সকালে সিরিয়ার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট শুকরী আল-কুতিলী খ্রিস্টান ভাইস চ্যান্সেলরকে সতর্ক করে দেন, ইবনে তায়মিয়া (র)-র কবর যদি নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয় তাহলে আমি সউদী সুলতান ইবনে সউদকে কী জওয়াব দেব? তাঁর সঙ্গে আমার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। অতঃপর কবরটিকে অক্ষত রেখে দেওয়া হয় যা আজও নিরাপদ হেফাজতেই রয়েছে।

১. ইবনে কাছীর শায়খ আলামুদ্দীন আল-বারযালীর বরাতে যিনি শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র সমসাময়িক ও সহপাঠী ছিলেন এ সমস্ত লিখেছেন (দ্র. ১৪শ. খণ্ডের ১৩৬-৩৯)।

দ্বিতীয় অধ্যায়

উল্লেখযোগ্য গুণাবলী ও কামালিয়াত

শায়খু'ল ইসলাম হাফিজ ইবনে তায়মিয়া (র) তাঁর যুগে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে যে মুজতাহিদের আসন ও মর্যাদা লাভ করেছিলেন এবং তাফসীর, হাদীস ও ফিক্হশাস্ত্রে একই সঙ্গে স্বীয় নেতৃত্ব, গভীর পাণ্ডিত্য ও অস্বাভাবিক দক্ষতার যে ছাপ রেখেছিলেন তার পেছনে তাঁর অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ও মেধার একটি বিরাট ভূমিকা ছিল। আর এটি ছিল তাঁর ওপর আল্লাহ্ পাকের এক মহা দান ও বিরাট এক অনুগ্রহ। ইবনে তায়মিয়া (র)-র যুগে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান এতটা বিস্তৃতি লাভ করেছিল এবং কুরআন ও হাদীসশাস্ত্রের منقولات এত বিশাল ও বিস্তৃত ভাণ্ডার সংগৃহীত হয়ে গিয়েছিল যে, কোন লোকের পক্ষেই অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী হওয়া ব্যতিরেকে সে সব জ্ঞান-ভাণ্ডার আয়ত্তে আনা যেমন সম্ভব ছিল না, তেমনি বিতর্কিত মাসাইল ও সমস্যার ক্ষেত্রে স্বীয় সমসাময়িক খ্যাতনামা 'আলিম ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের সামনে মুখ খোলার সাহসও সঞ্চয় করে উঠতে পারত না। একই সাথে কোন মসলার ব্যাপারে পূর্ববর্তী কোন 'আলিমের পেশকৃত সিদ্ধান্তের সঙ্গে মতভেদের অধিকারও থাকত না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা ইবনে তায়মিয়া (র)-কে যে স্মৃতি ও ধারণ শক্তি দান করেছিলেন তার সাহায্যে তিনি তাফসীর, হাদীস, ফিক্হ, উসূলে ফিক্হ, ইমামদের মতভেদ সম্পর্কিত বিষয়শাস্ত্র, কালামশাস্ত্র, ইতিহাস, সীরাত ও আছার, রিজালশাস্ত্র, অভিধান ও ব্যাকরণশাস্ত্রের যে বিরাট জ্ঞান–ভাণ্ডার তখন পর্যন্ত গড়ে উঠেছিল, যত গ্রন্থ ও উৎস-উপকরণ তখন পর্যন্ত বর্তমান ছিল এবং যে পর্যন্ত তাঁর দক্ষতা ও ক্ষমতা ছিল, অধ্যয়ন করেন এবং স্বীয় শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত স্মৃতিশক্তির সাহায্যে সে সব নিজ বক্ষে ধারণ করেন। অতঃপর তিনি তাঁর জ্ঞানগত ও লেখক জীবনে সে সব থেকে এভাবে সাহায্য-সহায়তা গ্রহণ করেন যেভাবে একজন যুদ্ধাভিজ্ঞ ধানুকী তার তূণীরের সাহায্য নিয়ে থাকে।

সমসাময়িক সকলেই তাঁর অসাধারণ স্মৃতিশক্তি, ধারণ ক্ষমতা, উল্লেখযোগ্য মেধা ও ধী-শক্তির স্বীকৃতি দিয়েছেন। তাঁর সমসাময়িক ও পরবর্তী যুগের সকলেই এ ব্যাপারে একমত ঃ তিনি খুবই স্মতিশক্তির অধিকারী, দ্রুত উপলব্ধিক্ষম এবং তীক্ষ্ণ মেধা ও ধী-শক্তির মালিক ছিলেন। তাঁর সহপাঠী 'আল্লামা 'আলামুদ্দীন আল-বারযালী বলেন ঃ

قل ان سمع شيئا الاحفظه وكان ذكيا كثير المحفوظ ـ

তিনি যা কিছু শুনতেন অমনি তাঁর মুখস্থ হয়ে যেত, খুব কমই বিস্মৃত হতেন। তিনি খুবই ধী-শক্তির অধিকারী ছিলেন। বহুবিধ জিনিস তাঁর স্মৃতির ভাণ্ডারে রক্ষিত ছিল।[১]

রিজালশাস্ত্রের ইমাম ও ইসলামের সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক হাফিজ যাহবী বলেন ঃ

مارأيت اشد استحضارا للمتون وعزوها منه وكانت السنة بين عينيه وعلى طرف لسانه ـ

হাদীসের মূল পাঠ متن অধিক পরিমাণে মনে রাখতে, সময়মত তা থেকে সাহায্য-সহায়তা গ্রহণ করতে, বিশুদ্ধ বরাত প্রদানে এবং সম্পর্ক-সূত্র বর্ণনায় তাঁর চেয়ে অধিক পারঙ্গম আর কাউকে আমি দেখিনি। হাদীসের বিপুল বিস্তৃত ভাণ্ডার যেন তাঁর চোখের সামনে ও ঠোঁটের কোণে ভেসে বেড়াত।[২]

তাঁর স্মৃতিশক্তির সপক্ষে সবচেয়ে বড় দলীল তাঁর সমসাময়িক লোকদের এই সাক্ষ্য, যে হাদীস সম্পর্কে ইবনে তায়মিয়া (র) অজ্ঞতা প্রকাশ করবেন সেটা কোন হাদীসই নয়। হাদীসের ভাণ্ডার যতটা ব্যাপক ও সুবিস্তৃত আর তা সদাসর্বদা স্মৃতির মণিকোঠায় কেবল নয় ঠোঁটের মাথায় ধরে রাখা যতটা শক্ত, তারপরও হাদীস সম্পর্কে এককভাবে তাঁরই স্মৃতিশক্তি ও জ্ঞানের ওপর আস্থা স্থাপন এবং তাঁরই মতামত ও উক্তির ওপর ফয়সালা প্রদান কেবল তখনই করা যেতে পারে, যখন মেনে নেওয়া হয় যে, তাঁর যুগে সর্বাপেক্ষা বড় হাফিজ-ই-হাদীস তিনিই ছিলেন যাঁর স্মৃতিশক্তি তাঁকে কখনই প্রতারিত করে না। হাফিজ যাহবী বলেন ঃ

يصدق عليه ان يقال كل حديث لايعرفه ابن تيمية فليس بحديث ـ

---

১. আর-রাদ্দু'ল-ওয়াফির, পৃ. ৬৬।

২. আল-কাওলু'ল-জলী, পৃ.১০১।

তাঁর সম্পর্কে এ কথা বলা যথার্থ হবে, ইবনে তায়মিয়া যে হাদীস জানেন না না সেটা কোন হাদীসই নয়।[১]

তাঁর কতিপয় সমসাময়িক ব্যক্তি এতদূর পর্যন্ত বলেছেন, কয়েক শতাব্দী যাবত এত বড় স্মৃতিশক্তির অধিকারী কেউ জন্মগ্রহণ করেন নি। 'আল্লামা কামালুদ্দীন ইবনু'য-যামালকানী, যিনি শায়খুল ইসলামের সমসাময়িক ছিলেন, বিতর্ক সভায় যিনি ছিলেন তাঁর প্রতিপক্ষ এবং বহু মসলা-মাসাইলে যিনি তাঁর সঙ্গে তীব্র মতানৈক্য পোষণ করতেন, নিম্নোক্ত ভাষায় তাঁর আল্লাহপ্রদত্ত এই গুণের সাক্ষ্য দিয়েছেন ঃ

لم یر من خمس مائة سنة او قال اربع مائة سنة والشك من الناقل - احفظ منه -

পাঁচ কিংবা চার শতাব্দী (সংখ্যার যথার্থতা সম্পর্কে বর্ণনাকারী দ্বিধান্বিত) যাবত এরূপ স্মৃতিশক্তির অধিকারী মানুষ জন্মান নি।[২]

তাঁর প্রতিভা সম্পর্কে হাফিজ যাহাবী বলেন ঃ كان يتوقد ذكاءا

তিনি প্রতিভার স্ফুলিঙ্গ ছিলেন।

অন্যত্র বলেছেন ঃ كان اية من الذكاء وسرعة الادراك

আল্লাহপ্রদত্ত মেধা, প্রতিভা ও দ্রুত উপলব্ধির ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয় পুরুষ।[৩]

ব্যাপক পাণ্ডিত্য ও সামগ্রিকতা

এই আল্লাহপ্রদত্ত স্মৃতিশক্তি ও সজ্ঞান মেধা শক্তি দ্বারা তিনি পারিবারিক সম্পর্ক, কঠোর পরিশ্রম, অধ্যয়নের প্রতি আগ্রহ, প্রবল জ্ঞান-স্পৃহা, সব চেয়ে বড় কথা, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে তিনি ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে ও তৎকালের প্রচলিত বিভিন্ন শাস্ত্রে এতটা পাণ্ডিত্য লাভে সক্ষম হন যে, সে সময়ে তাঁর চেয়ে বয়ঃজ্যেষ্ঠ ও সর্বজনস্বীকৃত খ্যাতনামা উস্তাদ ও নানা শাস্ত্রের ইমাম তাঁর ব্যাপক পাণ্ডিত্য দৃষ্টে বিস্ময়াভিভূত হয়ে যেতেন এবং সাক্ষ্য দিতেন, তিনি জ্ঞানের গভীর সমুদ্র এবং ইসলামের চলন্ত গ্রন্থাগার বিশেষ এবং প্রতিটি শাস্ত্রে তিনি এতটা দখল রাখেন যে, মনে হয় এই শাস্ত্রটিতেই তাঁর বিশেষ অধিকার রয়েছে। 'আল্লামা তকীয়্যুদ্দীন ইবনে দাকীকু'ল-'ঈদ-এর মর্যাদা হাদীসশাস্ত্রে সর্বজনস্বীকৃত এবং সে যুগের 'উলামায়ে কিরাম সর্বতোভাবে তাঁকে তাঁদের ইমাম ও মুরুব্বী হিসাবে মানতেন। ৭০০ হিজরীতে ইবনে তায়মিয়া (র) মিসরে গেলে 'আল্লামা ইবনে দাকীকু'ল-'ঈদের সাথে মোলাকাত হয়। এই মোলাকাতের পর 'আল্লামা নিম্নোক্ত ভাষায় তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেন ঃ

---

১. আল-কাওয়াকিব, ১৪৫ পৃ.। ২. ঐ ১৪৫। ৩. আর-রাদ্দু'ল-ওয়াফির, ২৯ পৃ.।

لما اجتمعت بابن تيمية رأيت رجلا العلوم كلها بين عينيه ياخذ منها ما يريد ويدع ما يريد ـ

ইবনে তায়মিয়ার সাথে যখন আমার সাক্ষাত হ'ল তখন আমি অনুভব করলাম জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখা-প্রশাখাই তাঁর নখদর্পণে; যেটি ইচ্ছা গ্রহণ করেন এবং যেটি ইচ্ছা পরিত্যাগ করেন।[১]

'আল্লামা কামালুদ্দীন ইবনু'য-যামালকানী যিনি নিজেই একজন প্রখ্যাত 'আলিম ও বহু শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন–নিম্নোক্ত ভাষায় তাঁর বিস্ময় প্রকাশ করেছেনঃ

كل اذا سئل عن فن من العلم ظن الرائى و السامع انه لايعرف غير ذلك الفن و حكم ان احدا لايعرف مثله ـ

জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোন শাখায় যখন তাঁকে প্রশ্ন করা হয় তখন (অবলীলায় তাঁকে প্রশ্নের উত্তর দিতে দেখে) দর্শক ও শ্রোতা মনে করেন, তিনি সংশ্লিষ্ট বিষয় ছাড়া আর কিছু জানেন না এবং তাঁর সম্পর্কে এই ধারণা কায়েম করতে বাধ্য হন, এই শাস্ত্রে তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।[২]

'আল্লামা তকীয়্যুদ্দীন ইবনু'স-সুবকী ছিলেন তাঁর একজন মশহূর প্রতিপক্ষ। شد الرحال সম্পর্কিত মসলাসহ আরও কতক ফিকহী মসলার ক্ষেত্রে তিনি ইবনে তায়মিয়া (র)-র মতামত খণ্ডন করে কিতাব পর্যন্ত লিখেছেন এবং কবিতাকারে তাঁর সম্পর্কে স্বীয় মতামতও প্রকাশ করছেন।[৩] এতদ্‌সত্ত্বেও হাফিজ যাহবীকে লিখিত এক পত্রে তিনি লেখেন ঃ

المملوك يتحقق كبير قدره وزخارة بحره وتوسعه فى العلوم الشريعة والعقلية وفرط ذكائه واجتهاده وبلوغه فى كل ذلك المبلغ الذى لا يتجاوزه الوصف والمملوك يقول ذالك دائما ـ

গরীবের এ ব্যাপারে বেশ ভালই জানা আছে, ইবনে তায়মিয়া একজন জলী'লুল-কদর 'আলিম, 'ইল্‌মে শরীয়তে ও বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞানে গভীর ব্যুৎপত্তির অধিকারী এক অন্তহীন সমুদ্র! সে এও জানে, উন্নত মেধা, শ্রম ও

১. আর-রাদ্দু'ল-ওয়াফির, ৩১ পৃ.।
২. ঐ. ৩০ পৃ.।
৩. দ্র তরজমা আল্লামা তকীয়্যাদ্দীন ইবনুস সুবকী।

চিন্তার জগতে তাঁর অবস্থান কোথায় এবং এও জানে, তিনি 'ইলমী কামালিয়াতে এমন এক স্তরে উপনীত হয়েছেন যে, তাঁর প্রশংসা করাও কঠিন। গরীব তাঁর বৈঠকে সর্বদাই এ কথা স্বীকার ও প্রকাশ করে থাকে।[১]

ইতিহাস তাঁর বিশেষ বিষয় ছিল না এবং ইতিহাসকে তিনি তাঁর আলোচ্য বিষয়ও বানান নি। এতদ্‌সত্ত্বেও ইমাম যাহবীর মত খ্যাতনামা ঐতিহাসিক ও সমালোচক বলেন ঃ

ومعرفته بالتاريخ والسير فعجب عجيب -

ইতিহাস ও জীবন-চরিত (সীরাত) সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান এক কথায় বিস্ময়কর!

ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানের গভীরতা, প্রশস্ত দৃষ্টি ও উপস্থিত বুদ্ধির একটি বিস্ময়কর ঘটনা তাঁরই সুযোগ্য শাগরিদ হাফিজ ইবনে কায়্যিম তদীয় যাদু'ল-মা'আদ নামক গ্রন্থে বিবৃত করেছেন। তিনি বলেন ঃ

একটি মুসলিম দেশে (সম্ভবত সিরিয়া কিংবা ইরাকে) য়াহূদীরা একটি প্রাচীন দস্তাবিজ (লিখিত দলীল) পেশ করে যা দেখতে প্রাচীনকালের লিখিত এবং কাগজও বেশ পুরনো আমলের মত মনে হচ্ছিল। সেখানে লিখিত ছিল, নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম খায়বারের য়াহূদীদেরকে জিযয়া প্রদানের হাত থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছিলেন। লিখিত দস্তাবিজটির ওপর হযরত আলী (রা), সা'দ ইবনে মু'আয (রা) ও সাহাবায়ে কিরামের অনেকেরই দস্তখত ছিল। কতিপয় অজ্ঞ লোক ইতিহাস ও জীবন-চরিত সম্পর্কে এবং সে যুগের অবস্থাদি সম্পর্কে যাদের দৃষ্টি গভীর ও বিস্তৃত ছিল না, তাদের প্রতারণার শিকারে পরিণত হয় এবং এর যথার্থতা সম্পর্কে তাদের নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মে যায়। তারা এর ওপর আমল করতে শুরু করে এবং য়াহূদীদেরকে জিযয়া প্রদানের হাত থেকে নিষ্কৃতি দেবার সিদ্ধান্ত নেয়। এই দস্তাবিজ শায়খুল ইসলামের [ইবনে তায়মিয়া (র)-র] খেদমতে পেশ করা হলে তিনি একে একেবারেই বিশ্বাসের অযোগ্য ও জাল বলে মত প্রকাশ করেন এবং এর জাল ও বানোয়াট হওয়া সম্পর্কে দশটি দলীল পেশ করেন। সে সবের ভেতর একটি দলীল ছিল, দস্তাবিজের ওপর হযরত সা'দ (রা) ইবনে মু'আয-এর দস্তখত রয়েছে, অথচ খায়বার যুদ্ধের আগেই তিনি ইনতিকাল করেছেন। দ্বিতীয়ত, দস্তাবিজে উল্লেখ রয়েছে, য়াহূদীদেরকে জিযয়া থেকে রেহাই দেওয়া হয়েছে, অথচ তখন পর্যন্ত জিযয়ার হুকুমই অবতীর্ণ হয়নি এবং সাহাবা-ই কিরামও এ সম্পর্কে কিছু জানতেন না।

১. আল-কাওয়াকিব, ১৪৬ পৃ.।

জিযয়ার হুকুম খায়বার যুদ্ধের তিন বছর পর তাবূক যুদ্ধের বছর অবতীর্ণ হয়। তৃতীয়ত, এতে উল্লেখ রয়েছে, য়াহূদীদেরকে বেগার (বিনা মজুরির শ্রম) খাটানো যাবে না। এটি একটি অবান্তর বিষয় এজন্য যে, য়াহূদী কিংবা অ-য়াহূদী যেই হোক কারও থেকে বেগার শ্রম গ্রহণ রীতিসিদ্ধ ছিল না। হুযূর আকরাম (সা) ও সাহাবা-ই কিরাম এ ধরনের জুলুম ও যবরদস্তি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। তাঁরা কারো থেকে বেগার শ্রম গ্রহণ করতেন না। এতো অত্যাচারী ও নিপীড়ক বাদশাহ্‌দের আবিষ্কার যা আজ পর্যন্ত চলে আসছে। চতুর্থ দলীল হল, জ্ঞানী-গুণী, সিয়ার ও মাগাযীর লেখক, মুহাদ্দিছ, ফকীহ ও মুফাসসিরদের কেউ এ ধরনের কোন দস্তাবিজের উল্লেখ কিংবা আলোচনা করেন নি এবং ইসলামের প্রথম যুগগুলোতেও এ দলীলের অস্তিত্ব প্রকাশ পায়নি। সঙ্গত কারণেই বলা চলে, এ দস্তাবিজ জাল, ভিত্তিহীন ও বানোয়াট এবং এর সপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ রয়েছে। শায়খু'ল -ইসলামের উল্লিখিত বিশ্লেষণে য়াহূদীদের সকল জারিজুরি ফাঁস হয়ে যায় এবং তাদের কৃত্রিমতার সকল মুখোশ খুলে পড়ে।[১]

তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও প্রখর মেধা নিম্নোক্ত ঘটনা থেকে আঁচ করা যাবে।

ইবনে তায়মিয়া (র)-র সমসাময়িক শায়খ সালিহ তাজুদ্দীন বর্ণনা করেন ঃ একবার আমি তাঁর দরবারে হাযির হলাম। এক ইয়াহূদী তাঁকে তকদীর সম্পর্কে কোন মসলা জিজ্ঞেস করেছিল এবং এ সম্পর্কে তাঁর আপত্তি ও প্রশ্ন আট লাইনের পদ্যে লিখে পাঠিয়েছিল। শায়খ (র) অল্প কিছুক্ষণ ভাবলেন, এরপর জওয়াব লিখতে শুরু করলেন। আমরা যারা মজলিসে উপস্থিত ছিলাম মনে করলাম! হয়তো তিনি গদ্যে জওয়াব দিচ্ছেন। কিন্তু তিনি যখন লেখা ছেড়ে উঠলেন এবং আমাদের একজন কাগজ উঠিয়ে যখন দেখতে পেল, উক্ত য়াহূদী যে ছন্দে ও যে তাল-মাত্রায় প্রশ্ন পাঠিয়েছিল, শায়খ (র) সেই একই ছন্দ ও তাল-মাত্রায় ১৪৮টি শ্লোকের পদ্যে তাৎক্ষণিকভাবে জওয়াব দিয়েছেন, তখন আর আমাদের বিস্ময়ের কোন অবধি রইল না! উত্তর-পত্রে তিনি এত বিপুল জ্ঞানের সমাবেশ ঘটিয়েছেন যে, যদি তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে যাওয়া হত তাহলে দু'টি বিরাট আকারের গ্রন্থের রূপ নিত।[২]

---

১. যাদু'ল-মা'আদ, ১ম খণ্ড, ৩৩৬ পৃ. واماهدية فى عقد الذمة واخذ الجزيةالخ নামক অধ্যায়।

২. আল-কাওয়াকিব, ১৫৪ পৃ.।

তাঁর এই গভীর পাণ্ডিত্য ও ব্যাপকতা দেখে সমসাময়িক ও পরবর্তী যুগের লোকেরা তাঁর সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা বাক্য উচ্চারণ করেছেন। তাঁরা ক্ষণজন্মা মনীষী, নেতৃস্থানীয় বিশ্লেষক, মুজতাহিদদের শেষতম ব্যক্তি এবং আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম (ايت من ايات الله) প্রভৃতি অভিধায় তাঁকে অভিহিত করেছেন। ইবনে সায়্যিদিন্নাস (মৃ. ৪৩৪ হি.) বলেন ঃ

لم ترعين من راه مثله ولارأت عينه مثل نفسه ـ

তাঁর সমসাময়িক লোক ও যারা তাঁকে দেখেছে তাঁর মত আর কাউকে দেখে নি এবং তিনি নিজেও তাঁর সমতুল্য আর কাউকে দেখেন নি।[৩]

হাফিজ শামসুদ্দীন যাহবীর ন্যায় বিস্তৃত দৃষ্টির অধিকারী ঐতিহাসিক ও সমালোচক মনীষী এতদূর পর্যন্ত বলেছেন ঃ

لوحلفت بين الركن والمقام لحلفت انى ما رايت بعينى مثله ولاوالله راى هو مثل نفسه فى العلم ـ

যদি রুক্‌ন ও মকামে ইবরাহীমের মাঝে আমাকে কেউ কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করে তাহলে আমি হলফ করে বলব, 'ইল্‌ম-এর ক্ষেত্রে তাঁর মত আর কাউকে আমি দেখিনি এবং তিনিও তাঁর সমতুল্য আর কাউকে দেখেন নি।

বীরত্ব ও চিন্তার দৃঢ়তা

ইবনে তায়মিয়া (র)-র বীরত্ব, সাহসিকতা ও মৃত্যু সম্পর্কে ভয়শূন্যতা তাঁর সমসাময়িক সকলের এমন কি তুর্কী সর্দার ও ফৌজী অফিসারদের পক্ষেও বিস্ময়কর ছিল। মুগলদের বিরুদ্ধে তিনি যে শৌর্য-বীর্য, পুরুষোচিত সাহস ও নির্ভীকতার পরিচয় দিয়েছিলেন তা সে যুগের বিখ্যাত তুর্কী ফৌজী অফিসার ও অধিনায়ক কুবজুককেও বিস্মিত করে তুলেছিল। হাফিজ সিরাজুদ্দীনের ভাষায় ঃ

وكان اذاركب الخيل يحول فى العدو كاعظم الشجعان ويقوم كاثبت الفرسان وينكى العدو من كثرة الفتك بهم ويخوض بهم خوض رجل لايخاف الموت ـ

তিনি যখন ঘোড়ায় আরোহণ করতেন তো বিরাট বড় বীরের মতই শত্রুব্যূহে প্রবেশ করতেন এবং যখন দাঁড়াতেন তখন দৃঢ়পদ অশ্বারোহীর

৩. প্রাগুক্ত।

মতই দাঁড়াতেন। শত্রুকে আক্রমণের পর আক্রমণ চালিয়ে বিপর্যস্ত করে তুলতেন। এমন বেপরোয়াভাবে শত্রু সারির ভেতর ঢুকে পড়তেন যে, দেখে মনে হত তাঁর বুঝি মরণের ভয় নেই![১]

কিন্তু এখানে যুদ্ধের ময়দানে তিনি কী বীরত্ব দেখিয়েছেন কিংবা তৎকালীন শাসক সুলতানদের মুকাবিলায় কিভাবে সত্য উচ্চারণ করেছেন তার বর্ণনা দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়। কেননা পেছনের পৃষ্ঠাগুলোতে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা আছে। এখানে আমরা তাঁর সে সব বীরত্বব্যঞ্জক খেদমত তুলে ধরতে চাই যা তিনি মসি যুদ্ধে, জ্ঞানের ময়দানে, গবেষণা ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে এবং সত্য প্রকাশের ক্ষেত্রে আঞ্জাম দিয়েছেন। বিদগ্ধ জ্ঞানীরা জানেন, অধিকাংশ মসলা-মাসায়েলের ক্ষেত্রে (যে সব মসলা নিয়ে বিতর্ক দেখা দিয়েছিল) তিনি একক ছিলেন না। সে সব মসলা নিয়ে এর আগেও অনেক আলোচনা হয়েছে এবং বই-পুস্তিকাও লেখা হয়েছে। এছাড়াও তাঁর যুগে আরও কয়েকজন তাঁর সঙ্গে অভিন্ন মত পোষণ করতেন। কিন্তু তিনি যেরূপ নির্ভীকভাবে, স্পষ্ট ভাষায় ও উদাত্ত কণ্ঠে তাঁর নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা ও বিশ্লেষণ তুলে ধরেছেন এবং জনসমক্ষে প্রকাশ করেছেন, লেখায় ও বক্তৃতার মাঝ দিয়ে অবলীলায় ব্যক্ত করেছেন, তেমনটি আর কেউ করেন নি। এ ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন একক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। নির্ভেজাল তওহীদের বিশ্লেষণে, আল্লাহ্ ভিন্ন অপর কারোর নিকট সাহায্য ও আশ্রয় প্রার্থনা প্রত্যাখ্যানে, সে যুগে প্রচলিত বিদ'আত ও গর্হিত কর্মের বিরোধিতায়, ওয়াহদাতু'ল-ওজূদ, হুলূল ও ইত্তিহাদ-এর ন্যায় বিভ্রান্তিমূলক মতবাদের বিরুদ্ধে বাক ও মসি যুদ্ধে, তাসাওউফের দাবীদার ও বি'দআতীদের গোপন প্রতারণার গ্রন্থি উন্মোচনে তিনি যে বীরত্ব ও নির্ভীকতার পরিচয় দিয়েছেন এবং যে সব মসলা ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণকে তিনি সঠিক মনে করতেন, তা সে কালামশাস্ত্র সম্পর্কিতই হোক কিংবা ফিকহী মযহাব সম্পর্কিত আলোচনার ক্ষেত্রেই হোক, সে সব দলীল-প্রমাণ সহযোগে এমন জোরালোভাবে পেশ করতেন যে, সে সব প্রমাণ করতে গিয়ে যে সব মুকদ্দমা ও দলীল-প্রমাণ কায়েম করেছেন এবং জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত তিনি তাঁর নিজস্ব চিন্তাধারায় ও বিশ্বাসে সুদৃঢ় থেকেছেন, এজন্য যে কষ্ট ভোগ করেছেন তা থেকে কেবল তাঁর বীরত্ব ও দৃঢ়তাই নয়, তাঁর মহান মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বেরও প্রমাণ মেলে। ইমাম যাহবী তাঁর জ্ঞান-চর্চা, ধর্মীয় বীরত্ব ও দৃঢ়তার কথা যেরূপ প্রশংসার সঙ্গে পেশ করেছেন নিম্নে তার পরিচয় মিলবে ঃ

১. আল-কাওয়াকিব, ১৬১ পৃ.।

اطلق عبارات احجم عنها الاولون والاخرون وهابوا وجسرهو عليها حتى قام عليه خلق من علماء مصروالشام قياما لامزيد عليه و بدعوه وناظروه وكاتبوه وهو ثابت لايداهن ولايجابى بل يقول الحق المر الذى اداه اليه اجتهاده وحدة ذهنه وسعة دائرته فى السنن والاقوال مع ما اشتهر عنه من الورع كمال الفكر وسرعة الادراك والخوف من الله العظيم والتعظيم لحرمات الله فجرى بينه وبينهم حملات حربية ووقعات شاميةومصرية وكم من نوبة رموه عن قوس واحدة فينجيه الله ـ

তিনি তাঁর বোধগম্য বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে এমন সব টীকা ব্যবহার করেছেন যা পূর্ববর্তী ও শেষ যুগের বিজ্ঞ 'আলিমগণ ব্যবহার করতে সাহস পাননি। ফল দাঁড়ায় এই, মিসর ও সিরিয়ার বিরাট একদল 'আলিম তাঁর বিরোধী হয়ে যান এবং এ সকল 'আলিম তাঁর বিরোধিতার ক্ষেত্রে চেষ্টার কোন ত্রুটি রাখেন নি। তাঁরা ইবনে তায়মিয়া (র)-র ওপর বিদ'আতী হবার অপবাদ দিয়েছেন, তাঁর সঙ্গে বিতর্কে নেমেছেন এবং তাঁকে পত্র লিখেছেন। কিন্তু তিনি সর্বাবস্থায় নিজস্ব চিন্তাধারায় ও 'আকীদা-বিশ্বাসে সুদৃঢ় থেকেছেন, কোন ক্ষেত্রেই তিনি তাদেরকে কোন ছাড় দেননি কিংবা কাউকে বিশেষ খাতিরও করেন নি, বরং সব সময় তিনি সে সব তিক্ত সত্য কথাই বলতে চেয়েছেন যা নিজস্ব ইজতিহাদ, চিন্তা-ভাবনা, মেধা, আচার-অভ্যাস ও কথাবার্তার ওপর পড়েছিল। কেবল এটিই একমাত্র বিষয় ছিল না, বরং এর সঙ্গে তাঁর যুহ্দ, পরহেযগারী, দূরদৃষ্টি, দ্রুত বোধশক্তি, আল্লাহ্-ভীতি, আল্লাহ্‌র নির্ধারিত বিধি-বিধানের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধাও এর অন্তর্গত ছিল। তাঁর ও তাঁর সমসাময়িক বিরোধিতাকারী মহলের ভেতর বড় বড় লড়াই-সংঘর্ষ হয়েছে, সিরিয়ায় ও মিসরে বিরাট মুকাবিলা হয়েছে। বহুবার এমনও হয়েছে যে, সমস্ত দল-উপদল একদিকে, অপরদিকে তিনি একা নিজে। এরপরও আল্লাহ্ পাক তাঁকে তাঁর বিরোধীদের অনিষ্টের হাত থেকে রক্ষা করেছেন, বাঁচিয়ে নিয়েছেন।[১]

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) তাঁর সমসাময়িকদের ভেতর জ্ঞানের গভীরতা ও পাণ্ডিত্যের ক্ষেত্রে অবধারিতভাবেই বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী ছিলেন যা তাঁর সমসাময়িক সকলেই উচ্চ কণ্ঠে স্বীকার করেছেন। কিন্তু তাঁর আসল বৈশিষ্ট্য যা

১. আর-রাদ্দু'ল-ওয়াফির, ৭১ পৃ.।

তাঁকে তাঁর সমসাময়িক খ্যাতনামা 'আলিম ও জ্ঞানীদের মাঝে বিশিষ্টতা দান করেছিল এবং ইতিহাসের পাতায় তাঁকে এক অনন্য ও অসাধারণ মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছিল তা কেবল তাঁর পাণ্ডিত্যের দ্যুতিতেই ছিল না, বরং ছিল তাঁর চিন্তার দৃঢ়তা, অপূর্ব বিশ্লেষণী শক্তি ও তাঁর মুজতাহিদসুলভ রীতি-পদ্ধতিতে। তিনি সেই সব জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শাস্ত্র এবং সেই সমস্ত পুস্তক-পুস্তিকাই পাঠ করেছিলেন যা তাঁর সমসাময়িকেরাও করেছিলেন। এতদ্‌সত্ত্বেও তিনি তাঁর অধীত জ্ঞান-ভাণ্ডার ও পুস্তকাদির ভেতর থেকেই নিজস্ব রাস্তা বের করে নিয়েছেন এবং সত্বরই এক বিশিষ্ট আসন লাভে সক্ষম হয়েছিলেন। আরবী ব্যাকরণ তো সবাই পড়েছিলেন এবং সকলেই সীবাওয়ায়হ্‌র অন্ধ অনুসরণকেই নিজেদের জন্য বাধ্যতামূলক করে নিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে তাঁর উক্তিকে অভ্রান্ত ও শেষ কথা মনে করা হত। কিন্তু ইবনে তায়মিয়া (র) তাঁর "আল-কিতাব" (যাকে ব্যাকরণবিদগণ আরবী ব্যাকরণশাস্ত্রের ঐশী গ্রন্থের মর্যাদা দিয়ে থাকেন) সমালোচনার দৃষ্টিতে অধ্যয়ন করেছিলেন। আবূ হায়্যান নাহভী যখন সীবাওয়ায়হ-এর বরাত দেন তখন তিনি পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দেন, সীবাওয়ায়হ কি নবী ছিলেন (যার সব কথাই আমাদেরকে মানতে হবে)? তাঁর ওপর কি আরবী ব্যাকরণশাস্ত্র নাযিল হয়েছে? তিনি তাঁর "আল-কিতাব" গ্রন্থে আশিটি স্থানে ভুল করেছেন। গ্রীক যুক্তিশাস্ত্র ও দর্শনের অধ্যয়নের ক্ষেত্রে তাঁর যুগের অধিকাংশ 'আলিম ও ফকীহ সংযত ছিলেন এবং যাঁরাই তা অধ্যয়ন করেছেন তাঁরাই কমবেশি এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, দর্শনশাস্ত্রের সবচেয়ে বড় সমালোচক ও মুসলমানদের মধ্যে এর নাড়ি-নক্ষত্র সম্পর্কে যিনি সবচেয়ে বেশী ওয়াকিফহাল, সেই হুজ্জাতু'ল-ইসলাম ইমাম গাযালী (র) তাঁর গ্রন্থে, এমন কি 'ইহ্‌য়াউ'ল-উলূম'কেও গ্রীক অধিবিদ্যা ও নীতি দর্শনের প্রভাব থেকে পুরোপুরি রক্ষা করতে পারেন নি, বরং দর্শনের ঐতিহাসিকগণ তাঁর বহু রচনায় গ্রীক দর্শনের ছায়াপাত লক্ষ্য করেছেন।[১] পক্ষান্তরে ইবনে তায়মিয়া (র) গ্রীক-দর্শন ও যুক্তিশাস্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঝাণ্ডা উঁচিয়েছেন, অথচ কোথাও তাঁকে এর সঙ্গে সমঝোতা করতে দেখা যায় নি। তিনি "কিতাবু'র-রাদ্দু 'আলা'ল-মানতিকিয়্যীন" নামক গ্রন্থে গ্রীক দর্শন ও যুক্তিশাস্ত্রের যুক্তিসিদ্ধ সমস্যা ও প্রতিপাদ্য বিষয়গুলোর ওপর সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচনা করেছেন। সে সবের ওপর কার্যকর ব্যবচ্ছেদ (অপারেশন) চালিয়ে এর পুরো ব্যবস্থাটাকেই আহত এবং স্বীয় ক্ষুরধার ও শাণিত সমালোচনার তীর বর্ষণ করে তিনি এর গোটা অবয়বকেই ঝাঁঝরা করে ফেলেন। ফিক্‌হ ও হাদীসের ক্ষেত্রে আলোচনা ও দৃষ্টি ক্ষেপণের বেশ কিছু কাল আগে

---

১. বিস্তারিত জানতে চাইলে فلسفة الاخلاق فى الاسلام وصلاتها بالفلسفة الاغريقية এবং تاريخ الاخلاق ড. মুহাম্মদ ইউসুফ মূসাকৃত।

থেকেই কতক সীমাবদ্ধ গণ্ডী তৈরী হয়ে গিয়েছিল যে গণ্ডীর বাইরে কদম ফেলতে কেউ সাহস পেতেন না এবং বহু কাল থেকে ফিকহ ও হাদীসের এই বিস্তৃত ভাণ্ডারে আর কিছুই সঞ্চিত হয়নি। ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) বহু ফিকহী মসলার ক্ষেত্রে যেগুলো সমাধান হয়ে গেছে বলে মনে করা হত, সেগুলো সম্পর্কে পুনরায় চিন্তা-ভাবনা করেন এবং স্বীয় গবেষণা ও বিচার-বিশ্লেষণের ফল পরিপূর্ণ সাহসিকতা ও তত্ত্বগত গাম্ভীর্যের সঙ্গে পেশ করেন। এর ফল হল, স্থবির মস্তিষ্কে ও পণ্ডিত মহলের বিবশ কারখানায় পুনরায় স্পন্দন সৃষ্টি হয় এবং চিন্তা-চেতনার বদ্ধ দুয়ার অর্গলমুক্ত হয়। অবশেষে তিনি দৃঢ় চিত্তে কেবল কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে সাহাবায়ে কিরামের অনুসৃত আদর্শের (اثار) আলোকে ফতওয়া দিতে শুরু করেন। হাফিয যাহবী তাঁর জীবদ্দশায় লিখেছেন ঃ

وله الان عدة سنين لا يفتى بمذهب معين بل بماقام الدليل عليه ولقد نصر السنة المحضة والطريقة السلفية ببراهين ومقدمات وامور لم يسبق اليها -

> এদিকে আজ কয়েক বছর যাবত (মযহাব চতুষ্টয়ের ভেতর) কোন একটি নির্দিষ্ট মযহাব মুতাবিক তিনি ফতওয়া দেন না, বরং যে মযহাবের দলীল-প্রমাণকে তিনি সর্বাধিক যুক্তিযুক্ত মনে করেন সেই মুতাবিকই তিনি ফতওয়া দিচ্ছেন। তিনি নির্ভেজাল সুন্নাহ ও ইসলামের প্রথম যুগের বুযুর্গদের অনুসৃত পন্থার সাহায্যে এমন সব দলীল-প্রমাণ, প্রতিপাদ্য ও কার্যকারণ সম্পর্ক কায়েম করেছেন যে ক্ষেত্রে তিনি একক ও তুলনাহীন। তাঁর পূর্বে আর কেউ এমন দলীল-প্রমাণ ও প্রতিপাদ্য কায়েম করতে সক্ষম হননি।[১]

এই সব 'ইজতিহাদ'-এর ক্ষেত্রে কখনো কখনো তাঁকে একক ভূমিকায় দেখা যায়, কখনো ভুল-ভ্রান্তির শিকারও হয়েছেন, যেমনটি সাধারণত ভুলে ভরা মানুষের ক্ষেত্রে ঘটেই থাকে। এমন নয় যে, প্রতিটি মসলার ক্ষেত্রে তাঁর পেশকৃত দলীল-প্রমাণ শক্তিশালী হবেই এবং আমরা তা মানতে বাধ্য হব। কিন্তু এতে সন্দেহের এতটুকু অবকাশ নেই, তিনি তাঁর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে সনিষ্ঠ ও অকপট ছিলেন। তিনি নফ্স-পরস্তী তথা আত্মপূজা, প্রবৃত্তিজাত কামনা-বাসনার আনুগত্য, আরামপ্রিয়তা অথবা কোন মুসলিহাত বা উপযোগিতার খাতিরে কোন ইমামের মত, কোন ফিকহী মযহাব অথবা জমহুর তথা সমষ্টিগত মতামত পরিত্যাগ এবং কোন মসলার ইস্তিম্বাত করতেন না। তিনি ছিলেন সত্যান্বেষী, দলীল-প্রমাণের

১. আল-কাওয়াকিবুদ্দুর্রিয়্যা, পৃ. ১৫৬-৫৭।

পাবন্দ এবং কুরআন ও সুন্নাহ্‌র অনুগত। এ সম্পর্কে ফতহু'ল-বারী প্রণেতা শাফি'ঈ মযহাবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস হাফিয ইবনে হাজার 'আসকালানী (র) যা বলেছেন আমাদের পাঠকদের জ্ঞাতার্থে এখানে তা তুলে ধরছি। তিনি বলেন ঃ

انه شيخ مشائخ الاسلام فی عصره بلا ريب والمسائل التی انكرت عليه ماكان يقولها بالتشهی ولايصر علی القول بها الابعد قيام الدليل عليه غالبا فالذی اصاب فيه وهوالاكثرسيستفاد منه ويترحم عليه بسبة والذی اخطاء فيه لايقلد فيه بل هو معذور لان ائمة عصره شهدواله بان ادوات الاجتهاد فيه حتی كان اشدالمتعصبين عليه والعاملين فی ايصال الشر اليه وهوالشيخ جمال الدين الزملكانی شهد له بذالك ـ

নিঃসন্দেহে তিনি তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠতম বুযুর্গ ছিলেন। যে সমস্ত ক্ষেত্রে তাঁর বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে সেগুলোও তিনি নিজের খেয়াল-খুশির বশবর্তী হয়ে করেন নি। সাধারণত যখন তিনি কোন দলীল-প্রমাণের ব্যাপারে পরিপূর্ণরূপে আশ্বস্ত হতেন তখনই কেবল তিনি তার ওপর অনড় ভূমিকা নিতেন। যে সমস্ত মসলার ক্ষেত্রে তিনি সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত, আর এ জাতীয় মসলার সংখ্যাই অধিক, সে সমস্ত মসলার ক্ষেত্রে আমাদেরকে তাঁর অনুসরণ করা উচিত, উচিত তা থেকে উপকৃত হওয়া এবং এজন্য তাঁর অনুকূলে দু'আ-খায়র করা। যে সমস্ত মসলার ব্যাপারে তাঁর ভুল হয়েছে সে ক্ষেত্রে আমাদের উচিত তাঁর অনুসরণ না করা। এ ব্যাপারে তিনি মা'যূর, ক্ষমার্হ এবং তা এজন্য যে, তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠতম 'আলিম-'উলামা স্বীকার করেছেন, তাঁর ভেতর ইজ্‌তিহাদ করবার সমস্ত শর্তই বিদ্যমান ছিল। এমন কি তাঁর একজন বড় প্রতিপক্ষ, যিনি তাঁকে হেনস্থা করতেও তৈরি থাকতেন অর্থাৎ শায়খ জামালুদ্দীন আয-যামালকানী, তিনিও এর স্বীকৃতি দিয়েছেন।[১]

নিষ্ঠা ও নিবিষ্টচিত্ততা

ইবনে তায়মিয়া (র)-র জীবনের একটি উজ্জ্বলতর দিক ছিল এই, তিনি 'ইলমে দীনের খিদমতের জন্য সর্বদাই নিবেদিত ছিলেন, উৎসর্গীত ছিলেন। তিনি তাঁর গোটা জীবনভর আর কোন কিছুর সঙ্গে সম্বন্ধ রাখেন নি। তাঁর অধিকাংশ সমসাময়িক, বন্ধু-বান্ধব ও সমবয়স্ক, যাঁদের অনেকেই বড় বড় নিষ্ঠাবান বুযুর্গ

১. আর-রাদ্দুল ওয়াফির, ৭৮ পৃ.।

ছিলেন, বিরাট বড় মনীষী ছিলেন, বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় পদে নিযুক্ত থেকেছেন কিংবা রাজা-বাদশাহ্র উপহার-উপঢৌকনে ধন্য হয়েছেন অথবা রাষ্ট্রীয় ভাতা পেয়েছেন, কিন্তু ইব্ন তায়মিয়া (র) গোটা জীবনভর এসব থেকে মুক্ত থেকেছেন। তিনি 'ইলম ও দীনের চর্চা, ফতওয়া প্রদান, দর্স ও তাদরীস তথা পঠন-পাঠন, ওয়া'জ-নসীহত, গ্রন্থ প্রণয়ন, তথ্যানুসন্ধান ও গবেষণা ভিন্ন আর কোন পেশার সঙ্গেই নিজেকে সম্পৃক্ত রাখেন নি। তাঁর একজন সমসাময়িক ব্যক্তি জ্ঞানের প্রতি তাঁর নিস্পৃহ মানসিকতা ও এর সঙ্গে সম্পর্কহীনতার সাক্ষ্য নিম্নোক্ত ভাষায় দিয়েছেন ঃ

ماخالط الناس فى بيع ولا شراء ولامعاملة ولاتجارة ولا مشاركة ولامزارعة ولاعمارة ولاكان ناظرا اومباشرا لمال وقف ـ ولم يقبل جراية ولاصلة لنفسه من سلطان ولا امير ولا تاجر ولاكان مدخرا دينارا ولادرهما ولا متاعا ولا طعاما وانما كانت بضاعته مدة حياته وميراثه بعد وفاتةرضى الله عنه العلم اقتداءبسيد المرسلين فانه قال ان العلماء ورثة الانبياء ان الانبياء لم يورثوا دينارا ولادرهما ولكن ورثوا العلم فمن اخذبه اخذبحظ وافر۔

তিনি লোকের সঙ্গে বেচা-কেনায়, ব্যবসা-বাণিজ্যে, অংশীদারী কারবারে, কৃষিকর্মে, ইমারত নির্মাণে প্রভৃতি কোন ধরনের কাজেই সম্পর্ক রাখেন নি। কখনো ওয়াক্ফ সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক কিংবা মুতাওয়াল্লীও তিনি থাকেন নি। কোন সরকারের ভাতা কিংবা কোন সুলতান, শাসক কিংবা ব্যবসায়ী কর্তৃক প্রদত্ত উপহার-উপঢৌকনও গ্রহণ করেন নি। টাকা-পয়সা, ধন-সম্পদ কিংবা কোন খাদ্য-দ্রব্য তিনি কখনও সঞ্চয় করেন নি। তাঁর জীবিতকালে সম্পদ বা পুঁজি বলতে ছিল একমাত্র 'ইল্ম বা জ্ঞান-ভাণ্ডার আর মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকার বলতেও একমাত্র এটাই ছিল। আর এটাই নবী জীবনের আদর্শ। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আলিমগণ নবীদের ওয়ারিছ। আর কোন নবীই উত্তরাধিকার হিসেবে টাকা-পয়সা কিংবা ধন-সম্পদ রেখে যান নি, যা রেখে গেছেন তা হল 'ইল্ম-এর উত্তরাধিকার। যারা এই উত্তরাধিকার পেয়েছে তারা বড়ই ভাগ্যবান।[১]

---

১. আল-কাওয়াকিবুদ-দুর্রিয়্যাঃ, পৃ. ১৫৬-৫৭।

কাওয়াকিবু'দ-দুরিয়্যার লেখক বিশ্বস্ত লোকদের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন :

انه قد قطع جل وقته وزمانه فى العبادة حتى انه لم يجعل لنفسه شاغلة تشغله عن الله ولم يزاوله لامن اهل ولا من مال -

তিনি তাঁর গোটা কাল ও সময় 'ইবাদত-বন্দেগীর মাঝে কাটিয়েছেন, এমন কি তিনি নিজের জন্যও অপর কোন পেশাই অবলম্বন করেন নি যা তাঁকে আল্লাহ্‌র ধ্যান-জ্ঞান থেকে অন্য দিকে লিপ্ত রাখবে আর চাই তা ধন-সম্পদই হোক কিংবা পরিবার-পরিজনই হোক।[১]

তাঁর পেশা ও 'ইলম সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা, দীনের মধ্যে আত্মনিমগ্নতা ও জীবনের বহুবিধ ব্যস্ততা (যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ কারাগারে ও গৃহে নজরবন্দী অবস্থায় কেটেছে) তাঁকে এতটুকু অবকাশও দেয় নি যাতে করে তিনি বিয়ে করতে পারেন। গোটা জীবনই তিনি একাকী নিঃসঙ্গ অবস্থায় জ্ঞানের অনুসন্ধানে ও জিহাদী যিন্দেগীর মাঝে কাটিয়ে দিয়েছেন। কাওয়াকিবু'দ-দুর্রিয়্যার লেখক তাঁর দৈনন্দিন জীবনের কর্মতালিকা ও সময়-সূচীর বর্ণনা নিম্নোক্তভাবে দিয়েছেন :

ولايزال تارة فى افتاء الناس وتارة فى قضاء حوائجهم حتى يصلى الظهر مع الجماعة ثم كذالك بقية يومه ثم يصلى المغرب ويقراء عليه الدرس ثم يصلى العشاء ثم يقبل على العلوم الى ان يذهب طويل من اليل وهوفى خلال ذالك كله اليل والنهار لايزال يذكرالله تعالى ويوحده ويستغفره -

কখনো তিনি ফতওয়া দানে মশগুল হতেন, কখনো-বা লোকের নানা প্রয়োজন পূরণে। আর এভাবেই জোহরের ওয়াক্ত এসে যেত। তিনি জামা'আতে জোহর আদায় করতেন। এভাবেই দিনের অবশিষ্ট ভাগ কাটত। এরপর তিনি মাগরিব আদায় করতেন। তারপর দর্‌স প্রদান করতেন তিনি। এরপর এশার সালাত আদায় করতেন। অতঃপর দর্‌স ও অধ্যয়ন শুরু হয়ে

১. প্রাগুক্ত ১৫৬ পৃ.।

যেত। আর এভাবেই রাতের একটা বিরাট অংশ অতিবাহিত হত। এরই ভেতর তিনি রাত-দিন সমানভাবে আল্লাহর যিক্‌র, কালিমায়ে তাওহীদ ও দু'আ-ই ইস্তিগফারে মশগুল থাকতেন।[১]

'ইল্‌ম তথা জ্ঞান যদি হয় কোন মুদাররিস কিংবা মুফতীর একটি গরজ, সাময়িক পেশা ও খেদমতের বিষয়, তবে সে ক্ষেত্রে ইবনে তায়মিয়া (র)-র জন্য তা খোরাক ও পরিধেয় পোশাক-পরিচ্ছদে পরিণত হয়েছিল এবং এটি তাঁর অন্যতম স্বভাবে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। শায়খ সিরাজুদ্দীন আবূ হাফ্‌স আল-বাযযার বলেন ঃ

وكان العلم كانه قد اختلط بلحمه ودمه وسائره فانه لم يكن مستعارا بل كان له شعارا او دثارا -

মনে হত 'ইল্‌ম তাঁর শিরা-উপশিরায়, অস্থি-মজ্জায়, শরীরের প্রতিটি রক্ত-কণিকায় মিশে গেছে। 'ইল্‌ম তাঁর নিকট সাময়িক প্রয়োজন কিংবা আপাত চাহিদার বিষয় ছিল না, বরং এ ছিল তাঁর অঙ্গীভূত অঙ্গাবরণ।[২]

তাঁর ইখলাস তথা অকপট নিষ্ঠা ও অকৃত্রিম নিঃস্বার্থপরতার এও একটি বড় দলীল যে, তিনি তাঁর বিরোধী প্রতিপক্ষ ও তাঁর অকল্যাণকামীদের সর্বক্ষেত্রেই অঙ্গবরণ ক্ষমা করেছেন এবং পরিষ্কার ঘোষণা দিয়েছেন ঃ احللت كل مسلم عن ايذائه لى "আমি সমস্ত মুসলমানকে ক্ষমা করেছি যারা আমাকে কষ্ট দিয়েছে কিংবা কষ্টের কারণ হয়েছে।" সুলতান আন-নাসির -এর ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তনের পর বহু পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও তাঁর সবচেয়ে বড় প্রতিপক্ষ কাযী ইবনে মাখলূফকে যেভাবে ক্ষমা করেছেন এবং সুলতানের নিকট তাঁর ও তাঁর সহযোগী সাম্রাজ্যের কর্মকর্তা ও 'আলিমদের যেভাবে প্রশংসা ও তাঁদের জন্য সুপারিশ করেছেন, তা থেকে তাঁর নিঃস্বার্থপরতা, উদার মহানুভবতা ও অকপট নিষ্ঠার পরিচয় মেলে। এ থেকে এও প্রমাণিত হয়, তাঁর সমস্ত ইখতিলাফ 'ইল্‌মী ও ধর্মীয় ভিত্তির ওপর ছিল, এতে স্বীয় প্রবৃত্তি ও ব্যক্তিস্বার্থের সামান্যতম গন্ধও ছিল না। তাঁর এই ইখলাস (নিষ্ঠা) ও নিবিষ্টচিত্ততার ফল হয়েছিল এই, ৬৭ বছরের কর্মব্যস্ত, ঘটনাবহুল ও উত্তাল জীবনে লেখনী, গবেষণা ও জ্ঞান-সম্ভারের এমন এক ভাণ্ডার তিনি রেখে গেছেন যা জ্ঞানীদের একটি গোটা সম্প্রদায়ের জন্য গর্বের ধন হতে পারে। এই ইখলাস ও নিবিষ্টচিত্ততারই ফল হল, তিনি যুগ ও পরিবেশের ওপর এমন এক সুদূরপ্রসারী প্রভাব রেখে গেছেন যাতে করে তাঁকে নিঃসন্দেহে এক নতুন যুগের প্রতিষ্ঠাতা ও একজন যুগন্ধর ব্যক্তিত্বের অধিকারী বলা যেতে পারে।

---

১. আল-কাওয়াকিবুদ-দুর্রিয়্যা, পৃ. ১৫৬। ২. ঐ।

তৃতীয় অধ্যায়

তাঁর লেখনীর বৈশিষ্ট্য

ইবনে তায়মিয়া (র)-র রচনাসমূহ কতকগুলো একক বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল যা সেই যুগের সাধারণ রচনাসমূহ থেকে তাকে অধিকতর উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত করে তোলে। এর ফল হল, কয়েক শতাব্দী গুজরে যাবার পরও, বিরাট গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান ও মেধাগত বিপ্লব সত্ত্বেও তা অদ্যাবধি নতুন বংশধরদের মন-মস্তিষ্ককে প্রভাবিত করে এবং এরই ফলে এই বুদ্ধিবৃত্তিপ্রিয়তা ও নিত্য-নতুন চাহিদার যুগেও তা নতুনভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। এসব বৈশিষ্ট্যের মধ্যে নিম্নোক্ত চারটি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ঃ

১. ইবনে তায়মিয়া (র)-র প্রায় সমস্ত রচনার পাঠকের ওপর এই প্রভাব পড়ে যে, এই গ্রন্থের লেখক শরীয়তের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও দীন তথা ধর্মের রূহ (আত্মা)-এর রহস্যবিদ। তাঁর হাতে ধর্মের বিভিন্ন দিক ও মূলনীতি এসে ধরা দিয়েছে। এজন্য প্রতিটি আলোচ্য বিষয়ে তাঁর আলোচনা-সমালোচনা নীতিগত, কেন্দ্রানুগ, তৃপ্তিকর ও সান্ত্বনাদায়ক ও নিশ্চিত বিশ্বাস উৎপাদকও হয়ে থাকে। তিনি খুঁটিনাটি বিষয়ের পরিবর্তে উসূল তথা নীতির ওপর জোর দেন এবং এভাবে আলোচনার সূত্রপাত করেন যে, পাঠক অনুভব করেন, এটাই দীনের মেযাজ, এই হচ্ছে তার রূহ। আর ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় এটাই হচ্ছে শরীয়তে মুহাম্মদীর দাবী। তিনি তাঁর সমসাময়িক ও অপরাপর লেখকদের তুলনায় তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্যের গোপন রহস্য শরীয়তের এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং দীনের রূহ সম্পর্কে অবহিতি ও তার মুখপাত্র হিসাবে সার্থক প্রতিনিধিত্ব যা তাঁর প্রতিটি ছোট-বড় রচনায় পরিষ্কারভাবে দৃষ্টিগোচর হয়, বিশেষত তিনি যখন 'আকাইদ ও গুরুত্বপূর্ণ 'ইলমে কালাম সম্পর্কিত ফিকহী মসলা-মাসাইলের ওপর আলোচনা করেন।

২. তাঁর দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, তাঁর গ্রন্থে জীবনের ছবি দেখতে পাওয়া যায়। অনুভূত হয়, ঐ সব গ্রন্থ কোন শিক্ষায়তনের কোণে কিংবা বিচ্ছিন্ন কোন দ্বীপে লিখিত হয় নি, বরং ঠিক জীবনের ময়দানে ও জনসাধারণের মাঝে

লেখা হয়েছে। তাঁর রচিত গ্রন্থাদি থেকে খুব সহজেই তাঁর যুগকে চিহ্নিত করা যায় এবং সেই সমাজ ও সভ্যতার মন-মানসিকতা ও চরিত্রের পরিমাপ করা যায় যে সমাজ-সভ্যতার সঙ্গে এ সবের লেখক সম্পর্কিত ছিলেন।[১]

অতঃপর এ সব গ্রন্থ থেকে তাঁর আবেগ ও প্রেরণা, পছন্দ ও অপছন্দেরও পরিমাপ করা যেতে পারে। বোঝা যায়, এ সবের লেখক মন-মস্তিষ্ক ও মানবীয় আবেগ-অনুভূতির অধিকারী একজন মানুষ ছিলেন, কেবল লেখার নিষ্প্রাণ যন্ত্র কিংবা বুদ্ধিপিণ্ড ছিলেন না।

কুরআন তাফসীরের ক্ষেত্রে তিনি যে তরীকা বা পন্থা এখতিয়ার করেছিলেন তার একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল, জীবনের সঙ্গে এর সম্পর্ক ও যোগসূত্র রয়েছে। এর লেখক আয়াতে ইলাহী তথা খোদায়ী নিদর্শনকে তাঁর চারপাশের জীবন ও সমসাময়িক কালের মানুষের ওপর আরোপ করেন এবং ঐ সব আয়াতের দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনের খতিয়ান নেন। সেই সাথে আপন সমসাময়িক লোকদের ও উম্মার বিভিন্ন শ্রেণীর খতিয়ানও গ্রহণ করেন। তিনি আমাদেরকে বলে দেন, এসব আয়াত ও হাকীকত থেকে জীবনের কোথায় বিচ্যুতি ঘটছে এবং এর ফলে কী পরিণতি দেখতে পাচ্ছি।[২] জীবনের এই গুণ তাঁর অপরাপর রচনায় খুবই কম পাওয়া যায় কিংবা পাওয়া যায় না বললেই চলে।

৩. তিনি যে বিষয়বস্তুর ওপরই কলম ধরেন তার ওপর এত প্রচুর উপকরণের সমাবেশ ঘটান যা বিশটির অধিক গ্রন্থে ও শত শত পৃষ্ঠায় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ছড়িয়ে থাকে। তাঁর এই রচনা পদ্ধতি (যাকে বিশ্বকোষ জাতীয় লেখনী-পদ্ধতি বলা যেতে পারে) তাঁর সমস্ত রচনার উল্লেখযোগ্য গুণ, চাই কি তা কুরআন-উক্ত আলোচনার ওপর হোক কিংবা হোক তা বুদ্ধিবৃত্তিক। আর এভাবেই তাঁর গ্রন্থগুলোতে এক জায়গায় এতটা উপকরণ মিলে যে, তাঁর একটি গ্রন্থ অধিকাংশ সময় একটি গ্রন্থাগারের স্থলাভিষিক্তরূপে পরিণত হয় এবং একজন বিদ্যার্থীকে বহু গ্রন্থের দ্বারস্থ হবার হাত থেকে মুক্তি দেয়।[৩] অধিকাংশ সময় এই সব উপকরণ ও মাল-মশলা ও কুরআন-হাদীসের উদ্ধৃতি পেশ করতে আলোচনার প্রান্ত হাত থেকে বেরিয়ে যায় এবং নিবিষ্ট পাঠক তাঁর কথামালা ও উদ্ধৃতির আধিক্যের মাঝে নিজেকে হারিয়ে ফেলেন। তাঁর পক্ষে আলোচনা

---

১. নমুনা হিসাবে দেখুন

اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة اصحاب الجحيم -

২. দ্র. তাফসীর সূরা নূর, সূরা ইখলাস প্রভৃতি।

৩. উদাহরণস্বরূপ দেখুন

منهاج السنة والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح -

গোছান ও আয়ত্তে আনা কঠিন হয়ে পড়ে। এই অসুবিধা ও কাঠিন্য সত্ত্বেও তাঁর [ইবনে তায়মিয়ার (র)] লিখিত কিতাবাদির এই উপকারী দিকটিও খাটো করে দেখার সুযোগ নেই যে, এসব গ্রন্থ পূর্ববর্তী ও সমসাময়িক বুযুর্গ-মনীষীদের কথিত উক্তি ও মতামতের এক ভাণ্ডার এবং আপন বিষয়বস্তুর ওপর একটি ছোটখাটো বিশ্বকোষ বিশেষ। জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগতে এটিও তাঁর এক অবদান যে, তিনি বহু প্রাচীন উপকরণ ও উপাদান আমাদের জন্য সংরক্ষণ করে গেছেন এবং বহু মতামত ও নানা চিন্তাসমষ্টিকে তাঁর গ্রন্থে উদ্ধৃত করে নষ্ট হবার হাত থেকে রক্ষা করেছেন।

৪. তাঁর গ্রন্থাদি সাধারণ কালাম ও ফিক্‌হশাস্ত্রীয় রচনা থেকে এ দিক দিয়েও বিশিষ্ট যে, তাতে এসব বিষয়বস্তুর ওপর লিখিত অপরাপর গ্রন্থের মতে শুষ্ক, জটিল ও "মতন" (متن)-সমূহ দ্বারা ভারাক্রান্ত নয় যার মধ্যে সাধারণত প্রতিটি শব্দ বন্ধন, টীকা ও ফুটনোট দ্বারা ভরপুর থাকে। ইবনে তায়মিয়া (র)-র রচনায় ঋজুতা, জোর, আরবীয়তা (عربية) ও কোথাও (অনিচ্ছাকৃত) অলংকরণ, সাহিত্য ও বাগ্মিতার শান সৃষ্টি হয়ে যায় যা তাঁর কিতাবাদিকে (যা অধিকাংশই বিরাট ভলিউমবিশিষ্ট) চিত্তাকর্ষক, হৃদয়গ্রাহী, জীবন্ত ও ওজস্বী করে তোলে। বিশেষত তিনি যখন প্রাচীন বুযুর্গদের তরীকা-পদ্ধতিকে অগ্রাধিকার ও তাঁদের ধর্মীয় 'ইল্‌ম, আমল ও চিন্তার ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব ও ফযীলতের ওপর আলোচনা করেন তখন তাঁর কলম অত্যন্ত জোরদার এবং তাঁর আলোচনা ছন্দায়িত হয়ে ওঠে। তাঁর সমসাময়িক সাহিত্যিক ও জীবনীকারগণ তাঁর জীবনের বিভিন্ন অবস্থা ও কামালিয়াতের ক্ষেত্রে নানা বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তাঁর ভাষার অলংকরণ ও বাগ্মিতার আলোচনাও করেছেন।

হাফিজ আবু হাফ্‌স বলেন ঃ

يجرى كما يجرى التيار ويفيض كما يفيض البحر ويصير منذ يتكلم الى ان يفرغ كالغائب عن الحاضرين مغمضاعينيه ويقع عليه اذ ذاك من المهابة ما يرعد القلوب ويحير الابصار والعقول -

তাঁর কথায় বন্যার বেগ ও সমুদ্রের উন্মত্ততা পরিলক্ষিত হয়। কথার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এমন মনে হয় যেন তিনি শ্রোতাদের মাঝে উপস্থিত নন, তিনি যেন তাদের মাঝ থেকে হারিয়ে গেছেন। কথা বলার সময় তিনি চোখ

বন্ধ করেন, তারপর তিনি বক্তৃতা করেন। আর এ সময় তিনি এমনই এক ভীতিকর ও মর্যাদাপূর্ণ প্রভাবে উজ্জীবিত হন যা গোটা মজলিসকেই আশ্চর্য রকমের প্রভাবিত করে ফেলে।[১]

তাঁর রচিত গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করলে বোঝা যায়, শব্দের সাবলীলতা ও জ্ঞানের উত্তাল তরঙ্গময়তা কেবল তাঁর মজলিসের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট নয়, তাঁর লেখনীও এক্ষেত্রে তাঁর সহযোগী ছিল। আকশেহরী তাঁর সফরনামায় (ভ্রমণ কাহিনীতে) এই একই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ وقلمه ولسانه متقاربان "তাঁর কলম ও যবান পাশাপাশি হাত ধরাধরি করে চলে।"

তাঁর সৌন্দর্য ও গুণাবলীর সাথে সাথে একজন ঐতিহাসিক ও সমালোচকের পক্ষে একথা প্রকাশ করাও আবশ্যক, তাঁর কিতাবাদি ও আলোচনায় অস্থিরতা ও বিশৃংখলা, এক বিষয়বস্তু থেকে অন্য বিষয়বস্তুর দিকে প্রত্যাগমন, সামান্য সম্পর্কের রেশ ধরে অপর কোন আলোচনার সূত্রপাত এবং উক্ত আলোচনা দীর্ঘ করার আধিক্য লক্ষ্য করা যায় যা তাঁর কিতাবাদি অধ্যয়নকারীর পক্ষে (বিশেষত তাঁর রচনা পদ্ধতি তথা লেখার ধরন ও কথা বলার বিশেষ ভঙ্গীর সঙ্গে যিনি অভ্যস্ত নন) কঠিন পরীক্ষা ও অসুবিধার কারণ হয়ে দেখা দেয়। এর প্রধান কারণ তাঁর মেধার তীক্ষ্ণতা, প্রতিভার প্রাচুর্য, জ্ঞানের ব্যাপ্তি ও তাঁর স্বভাবজাত আবেগ-উদ্দীপনা। মনে হয় তাঁর মেধা ও লেখনী আলোচনা করবার সময় একটি কেন্দ্রবিন্দুর ওপর স্থির নিবদ্ধ হতে পারে না; নিত্য-নতুন বিষয়বস্তুর আগমন ও বহির্গমন এত প্রবলভাবে ও দ্রুততার সাথে ঘটতে থাকে যে, তিনি নির্ধারিত বৃত্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারেন না। আর এটাই ছিল তাঁর দর্স-এর বৈশিষ্ট্য। তাঁর শাগরিদ আবূ হাফ্স আল-বাযযার বলেন ঃ

كان ابن تيمية اذاشرع فى الدرس يفتح الله عليه اسرار العلوم وغوامض ولطائف ودقائق وفنون ونقول واستدلالات بايات واحاديث واستشهاد باشعار العرب وهو مع ذالك كما يجرى التيار ويفيض كما يفيض البحر -

ইবনে তায়মিয়া যখন দরস প্রদানের সূচনা করতেন তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর ওপর 'ইলম তথা জ্ঞানের গুপ্ত রহস্য, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তথ্য, জ্ঞানী-গুণীদের কথিত বাণী ও বর্ণনা, কুরআন পাকের আয়াত ও হাদীসে নববীর দ্বারা

১. আল-কাওয়াকিব, পৃ. ১৫৫;

প্রমাণপঞ্জী, আরবী কবিতার সাক্ষ্য ও উপমা-উদাহরণের উৎসমুখ খুলে দিতেন। মনে হত, প্রবল বেগে পানি প্রবাহিত হচ্ছে এবং সমুদ্র প্রমত্ত বেগে আন্দোলিত হচ্ছে।[১]

এই মেধার বহির্গমন ও স্থানান্তর, বিষয়বস্তুর প্রাচুর্য ও দলীল-প্রমাণ এবং বুদ্ধির প্রাখর্যের কারণে তাঁর তার্কিক ও সমালোচকদেরকে বিতর্ক সভায় খুবই অসুবিধার সম্মুখীন হতে হত। তিনি তাঁর আলোচনায় ও বিতর্কে এত বিস্তর মসলা-মাসাইলের সমাবেশ এবং এত বিভিন্নমুখী জ্ঞানের অনুপ্রবেশ ঘটাতেন যে, তাঁর প্রতিপক্ষকে একটি স্থির কেন্দ্রবিন্দুর ওপর দাঁড়িয়ে আলোচনা করতে খুবই বেগ পেতে হত। এজন্যই সিরিয়া ও মিসরের 'উলামায়ে কিরাম ও ফকীহগণ সাধারণ মজলিসে তাঁর সঙ্গে আলোচনা ও বিতর্কে অবতরণ পরিহার করতে চাইতেন এবং অধিকাংশ সময় অক্ষমতা জ্ঞাপন করতেন। এই অসুবিধা সম্পর্কে তাঁরই একজন সমসাময়িক মনীষী ও তার্কিক শায়খ সফী উদ্দীন আল-হিন্দী নিম্নোক্ত ভাষায় বর্ণনা দিয়েছেন ঃ

مارك يابن تيمية الا كالعصفور حيث اردت ان اقبضه من مكان فر الى مكان اخر ـ

ওহে ইবনে তায়মিয়া! তুমি এক ছোট্ট চিড়িয়া। তোমাকে ধরবার জন্য যখনই একদিকে হতে বাড়াই অমনি তুমি উড়ে গিয়ে অন্যত্র আশ্রয় নাও।[২]

তাঁর এই মেযাজী বৈশিষ্ট্য (যা কোন ঘাটতিজনিত নয়, বরং জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর আধিক্য, পরিপূর্ণতা ও মেধার ক্ষেত্রে তাঁর প্রাচুর্যের কারণে) তাঁর সকল রচনায় পাওয়া যায়। সত্যান্বেষণ যাঁদের জীবনের ব্রত তাঁরা যদি ধৈর্য ও সাহসিকতার সঙ্গে কাজ করেন এবং এই অসুবিধা কাটিয়ে উঠতে চেষ্টা করেন তাহলে এই প্রমত্ত সমুদ্র থেকে বহু মূল্যবান মণিমুক্তা আহরণ করতে পারবেন।

---

১. আল-কাওয়াকিব, পৃ. ১৫৫।

২. নুযহাতু'ল'-খাওয়াতির, ২য় খণ্ড, ১৪০ পৃ. তরজমা মুহাম্মদ বিন 'আবদুর রহীম আল-আরমাবী। (আশ-শায়েখ সফীউদ্দীন আল-হিন্দী)।

চতুর্থ অধ্যায়

বিরোধিতার কারণ এবং তাঁর সমালোচক ও সমর্থক

উপরিউক্ত অসাধারণ বিদ্যাবত্তা, বুদ্ধির পরিপক্বতা, স্বীকৃত নিষ্ঠা ও দীনদারীর সাথে একজন সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের মনে এই প্রশ্ন জাগে, তাঁর সমসাময়িক ও শেষ যুগের কতক মনীষী পণ্ডিত কেন এত কঠোরতার সঙ্গে তাঁর বিরোধিতা করলেন এবং তাঁর ব্যক্তিসত্তা তাঁর যুগ থেকে নিয়ে বর্তমান কাল অবধি কেনই বা আলোচনা ও সমালোচনার বস্তু হয়ে রইল? এ ধরনের একজন সামগ্রিক কামালিয়াতের অধিকারী মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব, মর্যাদা ও গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে সকলে একমত হবেন, এটাই তো ছিল স্বাভাবিক। এ প্রশ্ন জাগা অত্যন্ত স্বাভাবিক ও সঙ্গত আর তাই মনে রাখতে হবে, বিরোধিতা আর মতভেদের মধ্যে দুস্তর ফারাক রয়েছে। মতভেদ জ্ঞানী-গুণী ও গবেষক পণ্ডিতদের অধিকার আর এই অধিকার তাদের থেকে ছিনিয়ে নেয়া যায় না। এখানে মতভেদ নয়, বরং বিরোধিতা পথভ্রষ্টতা ও কুফরীর পর্যায়ে উপনীত হয়েছে এবং আলোচনার বিষয় হয়েছে তাঁর জীবন-চরিত। তাঁর সমসাময়িক ইতিহাসের আলোকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে এই প্রশ্নের জওয়াব দেয়া দরকার।

১. প্রথমত, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার এটাই প্রমাণ, তাঁর ব্যক্তিসত্তা সম্পর্কে শুরু থেকেই দু'টি পক্ষ সৃষ্টি হয়েছে এবং দু'পক্ষের ভেতর প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক সংঘর্ষ চলছে। ইতিহাসে যাঁরাই বিশিষ্ট আসন লাভ করেছেন এবং যাঁরাই অস্বাভাবিক ও অত্যাশ্চর্য কামালিয়াতের অধিকারী হয়েছেন তাঁদের সম্পর্কে হামেশাই এমনটি ঘটতে দেখা গেছে। এক দল তাঁদের ভক্তে পরিণত হয়েছে যারা তাঁদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছে এবং প্রশংসার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ির আশ্রয় নিয়েছে। অন্য দল তাঁদের বিরোধিতা ও সমালোচনায় কোমর বেঁধেছে এবং সেক্ষেত্রেও তারা বাড়াবাড়ির চূড়ান্ত করে ছেড়েছে। আজীমুশ্বান ও অস্বাভাবিক ব্যক্তিত্বদের সম্পর্কে ইতিহাসের এটি এক ধারাবাহিক ও পর্যায়ক্রমিক অভিজ্ঞতা যে, ইতিহাস দর্শন ও মনস্তত্ত্ববিদ্যার কতক অধ্যাপক ও "শ্রেষ্ঠত্ব ও ক্ষণজন্মা প্রতিভা"-র পর্যবেক্ষক একে স্বাভাবিক নিয়ম হিসাবে অভিহিত করেছেন।

২. ইবনে তায়মিয়া (র)-র ব্যক্তিসত্তার মাঝে তাঁর সমসাময়িকদের জন্য সর্বাপেক্ষা বড় পরীক্ষা ছিল, তিনি তাঁর যুগের ও সেই পরিবেশের সাধারণ মেধা ও জ্ঞানগত মানের তুলনায় উন্নততর ছিলেন। আর স্বীয় যুগের সাধারণ মানের তুলনায় উচ্চতর স্থান আল্লাহ্‌র এক অপূর্ব নেয়ামত এবং একটি ঈর্ষাযোগ্য কামালিয়াত। আর এই কামালিয়াতের অধিকারী ব্যক্তিকে তাঁর এই কামালিয়াতের জন্য বিরাট মূল্য দিতে হয়। তাঁকে তাঁর সমকালীন লোকদের পক্ষ থেকে অব্যাহত পরীক্ষার মাঝে কাটাতে হয় এবং সমকালীন ব্যক্তিবর্গও জীবনভর তাঁর থেকে উদ্ভূত এক ধরনের মুসীবত ও সংকটে নিপতিত থাকেন। তারা তাঁর চিন্তার সজীবতা, সমুন্নত দৃষ্টি ও ইজতিহাদী শক্তির সঙ্গী হতে পারেন না এবং তারা তাঁর হিমালয়সম জ্ঞান ও চিন্তাধারা পর্যন্ত পৌঁছুতে ব্যর্থ হন। অপর দিকে তিনিও তাদের নির্ধারিত ও সীমাবদ্ধ পরিভাষা এবং প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞানের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারেন না। তিনি জ্ঞান ও বিচক্ষণতার মুক্ত নীলিমায় এবং কুরআন ও হাদীসের সমুন্নত ও বিস্তৃত পরিসরে অবাধে বিচরণ করেন। তাঁর জ্ঞানের অবতরণ ক্ষেত্র হয় প্রথম যুগের এবং প্রথিতযশা শিক্ষকদের রেখে যাওয়া পুঁথি-পুস্তক ও এর অনুধাবন কর্ম। সুস্পষ্ট জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বহুবিধ শাস্ত্রের মুজতাহিদ ও মুজাদ্দিদ হয়ে থাকেন তাঁর মত ব্যক্তিগণ। মোটকথা, উপলব্ধি ও ধারণ ক্ষমতার এই পার্থক্য তাঁর ও তাঁর সমসাময়িক ব্যক্তিদের মাঝে এমন এক দ্বন্দ্বের সূত্রপাত ঘটায় যার আর নিরসন হয় না। আর এ কখনো তাঁর সমসাময়িকদের তৃপ্ত করতে পারে না। প্রতিটি যুগের কামালিয়াতের অধিকারী ও শাস্ত্রের মুজতাহিদ 'উলামায়ে কিরাম এ বিষয়ে অভিযোগ করেছেন, তাঁদের গবেষণা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান তাঁদের যুগের জ্ঞানগত ও পাঠক্রমের মান থেকে উন্নততর পর্যায়ের এবং 'আলিমদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে যাদের চিন্তার দৌড় পুঁথিগত বিদ্যার বেশী নয়। আর এটাই 'আলিম-উলামা ও জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গের বিরোধিতার কারণ।

৩. বিরোধীদের একটি দল এজন্যই তাঁর বিরোধী ছিল যে, তিনি তাঁর অসাধারণ জ্ঞান, মেধা, আপন ব্যক্তিত্বের চিত্তাকর্ষক ক্ষমতা ও বুলন্দীর কারণে আম-খাস নির্বিশেষে সকলের ভেতর জনপ্রিয় এবং হুকুমতের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ভেতর প্রভাব ফেলে চলেছিলেন। তাঁর জ্ঞান ও বক্তৃতার সামনে অন্য কারুর প্রদীপই আর জ্বলছিল না। তিনি যেখানেই থাকেন সকলের ওপর ছেয়ে যান। দরস প্রদান করলে দরস-এর অপরাপর মাহফিলগুলো নিষ্প্রভ ও রওনকহীন হয়ে পড়ে। তাকরীর করলে জ্ঞান-সমুদ্র উপচে পড়ে। আল্লামা যাহবী নিম্নোক্ত অর্থপূর্ণ কথার ভেতর দিয়ে তাঁর মানসিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন ঃ

غيرانه يغترف من بحر وغيره من الائمة يغترفون من السواقى

মনে হয় যেন তিনি সমুদ্র থেকে পানি ভরছেন আর অপরাপর 'উলামায়ে কিরাম নদী-নালা কিংবা ছোটখাটো খাল-বিল থেকে পানি নিচ্ছেন (আল-কাওয়াকিবুদ্দুর্রিয়া, ১৪৫ পৃ.)।

প্রতি যুগের 'আলিম-'উলামা আর যা-ই হোন, মানুষ ছিলেন এবং মানবীয় মন-মস্তিষ্ক ও মানবীয় অনুভূতি তাঁদেরও ছিল। এজন্য এই হীনমন্যতাবোধ এবং মানবীয় প্রকৃতির এই প্রাচীন দুর্বলতা ও কমযোরী, যার হাত থেকে বেঁচে থাকা কঠিনও বটে, যদি তাদের বিরোধিতার কারণ হয়ে থাকে তাহলে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। ইমাম আবূ হানীফা (র)-র সঙ্গে তীব্র মতানৈক্য ও ঈর্ষা পোষণের কারণ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে নিম্নোক্ত যে কবিতাটি ঐতিহাসিকগণ উদ্ধৃত করেছেন সকল যুগের ক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য ঃ

حسدوا الفتى اذلم ينالوا سعيه فالناس اعداء له وخصوم -

৪. শায়খুল ইসলাম-এর মেযাজী বৈশিষ্ট্যও সমকালীন বহু লোককে তাঁর বিরোধিতায় অবতীর্ণ হতে সাহায্য করেছিল যা সাধারণত সেই সব ক্ষণজন্মা পুরুষের মাঝে দেখতে পাওয়া যায় যাঁরা অসাধারণ রকমের প্রতিভাবান, বিস্তৃত দৃষ্টিসম্পন্ন, যাঁদের জানাশোনার পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থাৎ স্বভাবের উগ্রতা ও অনুভূতির তীক্ষ্ণতা যা কতক মুহূর্তে তাদেরকে তাদের কোন কোন প্রতিপক্ষের কঠোর সমালোচনা এবং তাদের (প্রতিপক্ষের) মূর্খতা, স্থূলবুদ্ধি ও স্বল্প বিদ্যা প্রকাশে উদ্বুদ্ধ করত, তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে তাঁর মুখ দিয়ে এমন সব কথা বের হত যার ফলে তাঁর সমসাময়িক জ্ঞানীমহল এবং তাদের ভক্ত-অনুরক্ত ও ছাত্রদের অন্তর-মানস আহত হত, হত হেনস্থ। এতে তাদের অন্তরে স্থায়ীভাবে ঘৃণা ও বিদ্বেষের বীজ রোপিত হয় যা জ্ঞানগত ও ফিকহী পরিভাষা, কুফর ও গোমরাহীর ফতওয়া এবং অব্যাহত বিরোধিতা ও রেষারেষির আকারে প্রকাশ পেত। ...শায়খুল ইসলামের সমসাময়িক লোকেরা, তাঁর বন্ধু-বান্ধব ও জীবনীকারগণ তাঁর ফযীলত ও মর্যাদা, মানাকিব (প্রশংসা) ও অবস্থা বয়ান করতে গিয়ে এই ' মেযাজী অবস্থা' যা অনেকখানি তাঁর যিন্দেগীর অবস্থা, চিন্তাগত ও 'ইলমী কামালিয়াতের ফল ছিল, উপেক্ষা করেন নি। 'আল্লামা যাহবী, যিনি তাঁর 'ইল্মী ও দীনী কামালিয়াতে খুবই প্রভাবিত ছিলেন, এক স্থানে লিখছেন ঃ

تعتريه حدة فى البحث وغضب وصدمة للخصوم تزرع له عداوة فى النفوس ولولا ذالك لكان كلمة اجماع فان كبارهم خاضعون لعلومه معترفون بانه بحر لاساحل له وكنزليس له نظير -

আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ককালে কখনো কখনো তাঁর মেযাজ উগ্র হয়ে যায় এবং স্বীয় প্রতিপক্ষ আলোচকের ওপর এমনভাবে তিনি আঘাত হানেন যে, এর ফলে তার মনে শত্রুতার বীজ উপ্ত হয়। যদি এমনটি না হতো তাহলে তাঁর মহামর্যাদা ও কামালিয়াতে কেউ দ্বিমত পোষণ করতেন না, সবাই একমত হতেন। কেননা তাঁর সমসাময়িক খ্যাতিমান পণ্ডিত ও শ্রেষ্ঠতম 'আলিম-'উলামা সকলেই তাঁর 'ইল্‌ম ও যোগ্যতার সামনে মস্তকাবনত এবং তাঁরা পরিষ্কার ও সাফ সাফ স্বীকার করেছেন যে, তিনি (ইবনে তায়মিয়া) এক কূল-কিনারাহীন সমুদ্র এবং এমন এক জ্ঞানভাণ্ডার যার কোন নজীর নেই।

তাঁর যিন্দেগীতে এমন কতিপয় ঘটনার সাক্ষাৎ মেলে যে, কোন কোন 'ইলমী কিংবা দীনী (ধর্মীয়) মসলার ক্ষেত্রে স্বীয় সমসাময়িকদের স্বল্প বুদ্ধি অথবা তাদের অধ্যয়ন ও দৃষ্টিভঙ্গির সংক্ষিপ্ততা তিনি বরদাশ্‌ত করতে পারেন নি এবং প্রকাশ্যে ও খোলাখুলি তা তিনি প্রকাশ করে দিয়েছেন। আর এই প্রকাশের কারণে তাঁর সমসাময়িক সেই সব জ্ঞানী-গুণী বন্ধুরা স্থায়ী প্রতিদ্বন্দ্বী ও শত্রুতে পরিণত হয়ে গেছেন। অনন্তর যিয়ারতের মসলার ব্যাপারে তকী ইবন আল-আখনাঈ মালিকী তাঁর অভিমত প্রত্যাখ্যান করেন। এ সম্পর্কে লিখিত তাঁর পুস্তিকা পাঠ করবার পর ইবনে তায়মিয়া (র) তার জওয়াব লেখেন। এতে তিনি তকী মালিকীর স্বল্প বিদ্যা ও জানাশোনার ক্ষেত্রে স্বল্পতার অভিযোগ আনেন এবং বলেন, এই মসলার ব্যাপারে তাঁর লেখার যোগ্যতা নেই। তাঁর এই মতামত তকী মালিকীর আত্মমর্যাদাবোধে আঘাত করে ও তাঁকে কঠিন পরীক্ষার মাঝে নিক্ষেপ করে এবং মর্মপীড়ার কারণ হয়। তাঁর কোন কোন জীবনীকারের ধারণা, তাঁর সর্বশেষ নজরবন্দী, বন্দী জীবনের দীর্ঘসূত্রিতা এবং শেষাবধি তাঁর লেখার উপকরণ (কাগজ, কালি, কলম ইত্যাদি) ছিনিয়ে নেবার পেছনে এই মন্তব্য প্রকাশই দায়ী।[১]

ঠিক তেমনি আবূ হায়্যান মুফাসসির যাঁকে তাঁর যুগে আরবী ব্যাকরণশাস্ত্রের ইমাম মনে করা হত, ইবনে তায়মিয়া (র)-র খেদমতে দীন ভক্ত বেশে হাযির হন এবং তাঁর প্রশংসায় একটি আবেগঘন কাসীদা লিখে আনেন যার প্রথম স্তবক ছিল ঃ

لما اتانا تقى الدين لاح لنا داع الى الله فرد ماله وزر -

তকীয়্যুদ্দীন (ইবনে তায়মিয়া) যখন আমাদের কাছে এলেন তখন আমরা এমন এক আল্লাহ্‌র দাঈকে দেখতে পেলাম যিনি স্বীয় বৈশিষ্ট্যে একক এবং যাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।

---

১. আল-বিদায়া ওয়া'ন-নিহায়া, ১৪ খণ্ড, ১৩৪ পৃ.।

উক্ত কাসীদার একটি স্তবক এরূপ ঃ

يامن يحدث عن علم الكتاب أصغ هذا الامام الذى قدكان يتتظر -

ওহে! সেই ব্যক্তি যিনি পুঁথি-পুস্তকে লিখিত জ্ঞানের কথা আলোচনা করতেন। মন দিয়ে শুনুন, ইনিই সেই ইমাম, বহু কাল ধরে যাঁর অপেক্ষা করা হচ্ছিল।

আলাপ-আলোচনা কালে এক পর্যায়ে আরবী ব্যাকরণশাস্ত্রের কোন সমস্যা নিয়ে কথাবার্তা আরম্ভ হয়। আবূ হায়্যান তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে সীবাওয়ায়হ্-এর উদ্ধৃতি দেন। তাঁর প্রত্যাশা ছিল ইবনে তায়মিয়া (র) সীবাওয়ায়হ-এর নাম শুনতেই নিশ্চুপ মেরে যাবেন এবং তাঁর যুক্তির সামনে মস্তক নুইয়ে দেবেন। কিন্তু তাঁর প্রত্যাশার বিপরীতে জওয়াব মিলল ঃ সীবাওয়ায়হ আরবী ব্যাকরণশাস্ত্রের এমন কোন নিষ্পাপ নবী তো নন যে, তাঁর কোন ভুল হতে পারে না এবং তিনি এ বিষয়ে চূড়ান্ত কথা বলে গেছেন। তিনি তাঁর 'আল-কিতাব' নামক গ্রন্থে ৮০টি জায়গায় ভুল করেছেন যা তুমি বুঝতেও পারবে না। একথা শুনে আবূ হায়্যান ইবনে তায়মিয়া (র)-র প্রতি এত বেশী ক্ষেপে যান যে, তিনি উক্ত কাসীদা তাঁর 'দীওয়ান' থেকে বাদ দিয়ে দেন। এরপর তিনি তাঁর ভক্তই থাকেন নি তাই নয়, বরং চিরদিনের জন্য তাঁর বিরোধী ও সমালোচকে পরিণত হন।

৫. বিরোধিতার একটি কারণ তাঁর কোন কোন গবেষণা, পর্যালোচনা ও কতক বিষয়কে অপর কতক বিষয়ের ওপর অগ্রাধিকার প্রদান, যেসব ক্ষেত্রে তিনি শুধু একক ও স্বতন্ত্র ভূমিকাই পালন করেন নি, বরং মশহূর মযহাব ও ইমাম চতুষ্টয়ের প্রদত্ত অভিমত ও ব্যাখ্যা থেকে স্বতন্ত্র অভিমত ও ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যে সমস্ত লোকের ফিক্হ্শাস্ত্র ও তার বিপরীতের ইতিহাস, আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের কথিত উক্তি ও মসলা-মাসাইলের ওপর ব্যাপক দৃষ্টি রয়েছে তাদের জন্য তো এই একক ভূমিকা কোন আতংকের বস্তু এবং ইবনে তায়মিয়া (র)-র ফযীলত ও কামালিয়াত অস্বীকার করবার হেতু নয়। তাঁরা জানেন, যদি মশহূর ইমামগণের ও আল্লাহ্র প্রিয় আওলিয়ায়ে কিরামের একক ভূমিকা ও মসলা-মাসাইল একত্র করা যায় তাহলে একক ক্ষেত্রসমূহ খুবই হালকা ও মামুলী দৃষ্টিগোচর হবে ও সে সমস্ত লোকের শুভ ধারণা যাঁরা এই একক ভূমিকাকে মকবুল ও সত্য হবার পরিপন্থী মনে করেন এবং একক ও স্বতন্ত্র ভূমিকা পালনকারীর শ্রেষ্ঠত্ব, মর্যাদা ও বিলায়েতের জন্য তাঁর কোন উক্তি, অভিমত ও গবেষণাই প্রখ্যাত কোন গবেষণার বিরোধী হবে না বলে শর্ত আরোপ করেন তারা অসুবিধার মাঝে পড়ে যাবেন। স্বয়ং শায়খ মুহয়ি উদ্দীন ইবন 'আরাবী, যাঁর মর্যাদা ও বিলায়াতের স্বীকৃতি

দিয়েছেন বিরাট সংখ্যক লোক, তিনিও এমন বহু ফিকহ্ ও কালামশাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে একক ভূমিকা নিয়েছেন এবং তাঁর এই ব্যাখ্যা প্রদানের পূর্বে অনুরূপ ব্যাখ্যা কিংবা অভিমত আর কেউ দেন নি। তাঁর এই একক ভূমিকা সেই যুগ থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত সুন্নাহ্‌র 'আলিমগণের ভেতর আলোচনা-সমালোচনার বিষয় হয়ে রয়েছে।[১]

কিন্তু যে সকল লোকের দৃষ্টি 'বিরোধীয়' বিষয়বস্তুর প্রতি তেমন গভীর ও ব্যাপক নয় অথবা যাঁরা 'উলামায়ে মুতাকাদ্দিমীন (ইসলামের আদি যুগের 'উলামা ও বিদ্বানমণ্ডলী)-এর অনুকূলে একক সিদ্ধান্ত ও ভূমিকা গ্রহণের অনুমতি দিতে পারেন, কিন্তু কামালিয়াতের অধিকারী ও সূক্ষ্মদর্শী সমকালীন কোন মনীষীর পক্ষে তার সুযোগ নেই, তাদের জন্য এই একক ভূমিকাও বিরোধিতার কারণ, বিভ্রান্ত 'আকীদা, গোমরাহী ও ইজমা'র অনিষ্টকারিতার পক্ষে দলীলে পরিণত হয়েছে। এই ক্ষেত্রে হাদীসশাস্ত্রে মু'মিনদের আমীর হাফিজ ইবনে হাজার 'আসকালানীর এই উক্তি (যা ওপরে উক্ত হয়েছে) অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ, যথাযথ ও সর্বপ্রকার বাড়াবাড়ি ও অতিশয়োক্তি থেকে মুক্ত।

তিনি বলেন ঃ

فالذى اصاب فيه وهو الاكثر يستفاد منه ويترحم عليه بسببه والذى اخطاء فيه لايقلد فيه بل هو معذور -

যে সমস্ত মসলায় নিজস্ব ইজতিহাদ দ্বারা সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে তিনি সমর্থ হয়েছেন আর সংখ্যার দিক দিয়ে যেগুলো অধিক, সেগুলো থেকে আমাদেরকে ফায়দা নিতে হবে এবং এজন্য তাঁর অনুকূলে আমাদের দু'আ করতে হবে। আর যে সমস্ত মসলার ক্ষেত্রে তিনি ইজতিহাদী ভুলের শিকার হয়েছেন সেক্ষেত্রে তাঁকে অনুসরণ করা যাবে না। এ ক্ষেত্রে তাঁকে মা'যূর বিবেচনা করতে হবে।

৬. তাঁর বিরোধিতার একটি শক্তিশালী কারণ হল, তারা (বিরোধীরা) সেই বাকভঙ্গী, (আল্লাহ্‌র) গুণাবলী ও রূপক বিষয়াবলী (মুতাশাবিহাত)-এর ব্যাখ্যার সেই তরীকা বা পন্থার বিরোধিতা করেছেন যা 'আশ'আরী 'আকীদা' বরং আহলে সুন্নাত ওয়া'ল-জামা'আতের 'আকীদা নামে কথিত ছিল এবং এই 'আকীদা থেকে বিচ্যুতিকে হয় অজ্ঞতা ও মূর্খতা, নয়তো আহলে সুন্নত ওয়াল-জামা'আতের বিরোধিতা হিসাবে অভিহিত করা হত। পূর্বেই বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে, ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) পূর্ণ শক্তিতে ও পরিপূর্ণ সাহসিকতার সঙ্গে এর সাথে দ্বিমত

১. 'আল্লামা নু'মান আল-জালাউ'ল'-আয়নায়ন নামক গ্রন্থে একক অভিমতগুলো একত্র করেছেন। দ্র. উক্ত গ্রন্থের ৪৩ পৃ.।

পোষণ করেন এবং (আল্লাহ্‌র) গুণাবলী সম্পর্কে সাহাবা-ই কিরাম, তাবি'ঈন, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন, মুতাকাল্লিমীন ও মুতাকাদ্দিমীন, ইমাম আবুল হাসান আশ'আরী, কাযী আবূ বকর আল-বাকিল্লানী ও ইমামু'ল-হারামায়ন পর্যন্ত তাঁদের মত ও পথ তাঁদেরই কথিত উক্তি ও রচনাসমূহ থেকে বর্ণনা করেন। তাঁদের লিখিত কিতাবাদি থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করেন, উল্লিখিত সকল মহাত্মাই এই সব সিফাত বা গুণের উপর ঈমান আনা অপরিহার্য ভাবতেন, সে সবের সেই হাকীকত মানেন যা আল্লাহ তা'আলার শান তথা মর্যাদা মুতাবিক ليس كمثله شئ অর্থাৎ তাঁর (স্রষ্টার) অনুরূপ কোন বস্তুই নয়, এর উপযুক্ত এবং তাশ্‌বীহ[১] ও তাজসীম[২] অধিকন্তু নফী[৩] ও তা'তীল[৪] থেকে মুক্ত ও পবিত্র। তিনি দাবী করে বলেন, এর বিপরীত একটি শব্দও সাহাবা-ই কিরাম, তাবি'ঈন ও সলফে সালিহীন থেকে প্রমাণিত নয়।

সে সময় গোটা মুসলিম বিশ্বের ওপর আশ'আরী 'আকীদা-বিশ্বাসী 'উলামায়ে কিরাম ও মুতাকাল্লিমদের প্রভাব ছিল। ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র এই মতানৈক্য যা নির্ভেজাল 'ইল্‌মী তথা তত্ত্বগত বুনিয়াদের ওপর ছিল, একটি বিদ'আত এবং يتبع غير سبيل المؤمنين অর্থাৎ মু'মিনদের নয় এমন পথের অনুসরণের সমার্থক মনে করা হয় এবং তাঁর ওপর তাজসীম-এর অপবাদ আরোপ করা হয়। সে সময় যেহেতু (আল্লাহ্‌র গুণাবলীর) তা'বীল তথা জটিল ব্যাখ্যার ওপরই জোর দেওয়া হচ্ছিল বিধায় তাঁর সমস্ত লেখনী শক্তি এরই মুকাবিলায় ব্যয়িত হয়। তা'বীল-এর প্রত্যাখ্যানে তাঁর এই অনমনীয় ভূমিকার ফলে লোকে তাঁর ওপর 'তাজসীম' (আল্লাহ অবয়ববিশিষ্ট-এই মতবাদ) বিশ্বাসী বলে সন্দেহ করে। এ ব্যাপারে এত দূর বাড়াবাড়ি করা হয় যে, তাঁর ওপর এমন সব বর্ণনার সম্পর্ক আরোপ করা হয় যদ্দারা পরিষ্কার প্রমাণিত হয়, তিনি মুজাস্‌সামা ফির্কার (আল্লাহ অবয়বশিষ্টি এই মতে বিশ্বাসী দল) লোক। উদাহরণস্বরূপ বলা হয়, তিনি দামিশ্‌কের উমায়্যা মসজিদে খুতবা দিচ্ছিলেন। তিনি মিম্বরের এক ধাপ থেকে আরেক ধাপে পা রাখলেন এবং বললেন, যেভাব আমি ওপরের ধাপ থেকে নীচের ধাপে নেমে এলাম, ঠিক তেমনি আল্লাহ পাক ('আরশ-মু'আল্লা থেকে যমীনের নিকটতম আসমানে) নেমে আসেন।[৫] ইমাম

১. স্রষ্টার সঙ্গে কোন কিছুর উপমা দেওয়া ও সাদৃশ্য প্রতিপাদন।

২. আল্লাহ দেহধারী হওয়া।

৩. আল্লাহ্‌র সমস্ত গুণকে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন।

৪. স্রষ্টার সিফতকে অবকাশ দেওয়া কিংবা স্রষ্টাকে সমস্ত গুণ থেকে মুক্ত ভাবা। -(অনুবাদক)

৫. এই বর্ণনা প্রখ্যাত পর্যটক ইবনে বতূতা চাক্ষুষ ঘটনা হিসাবে তাঁর সফরনামায় লিপিবদ্ধ করেছেন। বর্তমান লেখক সিরিয়ার 'আল্লামা শায়খ বাহজাতু'ল-বায়তার-এর সাথে বিষয়টি

(পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন)

ইবনে তায়মিয়া (র) ও তাঁর ছাত্রবৃন্দ অত্যন্ত সজোরে এই অপবাদ প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং বারবার বলেছেন, তিনি যেমন 'তা'তীল' মতবাদ স্বীকার করেন না ঠিক তেমনি-'তাজসীম'-এরও দুশমন। এরপরও তিনি তা'বীল বা জটিল ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে যেভাবে প্রয়োজনাতিরিক্ত জোরের সাথে লিখেছেন এবং বলেছেন তাকেও বিরোধী পক্ষ 'তাজসীম'-এর প্রমাণ হিসাবে পেশ করেছেন। বহু উলামা ও তাঁদের অনুসারীদের ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র বিরোধিতা করবার পেছনে এটিও ছিল একটি শক্তিশালী কারণ। আর প্রকৃত সত্য হল, তা'বীল ও তাজসীমের মাঝের এই পথ এতই বন্ধুর ও নাযুক যে, তা সবার আয়ত্তে আসা মুশকিল। অতঃপর হাম্বলী মযহাবের অনুসারী ও তা'বীল অস্বীকারকারীদের ভেতরকার কতিপয় লোক যখন 'তাজসীম'-এর সীমারেখায় প্রবেশ করল ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র ওপর 'তাজসীম'-এর অপবাদ আরোপ তখন আর অস্বাভাবিক কিংবা কষ্ট-কল্পনা থাকল না। যদিও প্রকৃত ঘটনা হল, তিনি এই অপবাদ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন।

৭. বিরোধিতার আরও একটি কারণ শায়খ-এ আকবর শায়খ মুহ্য়ি উদ্দীন ইবনে 'আরাবীর বিরোধিতা। অনেক লোকের নিকট, বিশেষত যাঁরা তাসাওউফের প্রতি ছিলেন অনুরক্ত, ইবনে তায়মিয়া (র)-র এ ছিল অমার্জনীয় অপরাধ। আর এ অপরাধই তাঁর সমস্ত যোগ্যতা ও অনুগম সৌন্দর্য ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে, যেহেতু তিনি ইবনে 'আরাবীর মশহূর অভিমত ও গবেষণালব্ধ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও তাঁর ওয়াহ্দাতু'ল-ওয়াজূদ মতবাদ সবলে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং তিনি ছিলেন তাঁর বিরোধীদের একজন।

এক্ষেত্রে আমাদের পথ মত ও অভিরুচি ঠিক তাই যা ইমাম রব্বানী মুজাদ্দিদ আলফে ছানী হযরত শায়খ সরহিন্দী (র) স্বীয় মকতূবাত-এ লিপিবদ্ধ করেছেন।

عجائب کاروبار است شیخ محی الدین از مقبولان نظر می اید واکثر علوم اوکه مخالف ارائے اهل حق اند؛ خطاوناصواب ظاهر میشود۔

(পূর্ব পৃষ্ঠার পর) নিয়ে আলোচনা করলে তিনি বলেন, ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বর্ণনাটি একেবারেই ভিত্তিহীন। স্বয়ং ইবনে বতূতাই উল্লেখ করেছেন, তিনি ৭২৬ হিজরীতে রমযান মাসে দামিশ্‌কে এসেছেন। আর এটা স্বতঃসিদ্ধ, শায়খুল-ইসলাম ৭২৬ হিজরীর শা'বান মাসেই অন্তরীণ হয়েছেন।

আশ্চর্য কারবার! শায়খ মুহয়ি উদ্দীনকে মকবুল বান্দাদের ভেতর দৃষ্টিগোচর হচ্ছে, কিন্তু তাঁর অধিকাংশ 'ইল্‌মই-যা আহলে হক তথা সত্যপন্থীদের পথ ও মতের বিরোধী, ভুল ও বেঠিক মনে হয়।[১]

একই পত্রে সামনে অগ্রসর হয়ে তিনি বলেন ঃ

اکثر معارف کشفیه اوکه ازعلوم اهل سنت جدا افتاده است ازصواب دوراست بس متابعات نه کند ان را مگر کسے که دلش مریض است یا مقلدصرف -

তাঁর অধিকাংশ কাশ্‌ফ জ্ঞান যা আহ্‌লে সুন্নত ওয়া'ল- জামা'আতের 'ইল্‌ম-এর সঙ্গে ভিন্ন মত পোষণ করে, বিশুদ্ধ নয়। তাঁর অনুসরণ একমাত্র তারাই করবে যার অন্তর মানস (দিল্‌) অসুস্থ অথবা যে অন্ধ মুকাল্লিদ (ভক্ত অনুসারী)।

কিন্তু শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র প্রত্যাখ্যান ও মতভেদের সম্পর্ক যতটা সেক্ষেত্রে তিনি একা নন। জালাউ'ল-'আয়নায়ন প্রণেতা সে সকল লোকের তালিকা প্রদান করেছেন যাঁরা ঐ সব মসলার ক্ষেত্রে 'ইবনে তায়মিয়া (র)-র সঙ্গে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। তাঁদের কেউ কেউ ঐসব বিষয়ে পুস্তিকা পর্যন্ত রচনা করেছেন। এই তালিকায় 'আল্লামা সাখাবী, 'আল্লামা সা'দুদ্দীন তাফতাযানী, মুল্লা 'আলী কারী, হাফিজ ইবনে হাজার 'আসকালানী, আবূ হায়্যান মুফাস্‌সির, শায়খু'ল-ইসলাম 'ইয্‌যু'দ-দীন ইব্‌নে 'আবদুস সালাম, হাফিজ আবূ যুর'আ, শায়খুল ইসলাম সিরাজুদ্দীন আল-বুলুক্কীনীর মত খ্যাতনামা 'আলিম-উলামা' ও আইম্মায়ে কিরাম দৃষ্টিগোচর হন।

অতঃপর শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র বিরোধিতা শায়খ আকবরের সঙ্গে ব্যক্তিগত ও আবেগ-উত্তেজিত নয়, এ বিরোধিতা ধর্মীয় মর্যাদাবোধ ও শর'ঈ গায়রতের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল যুগেই এর অসংখ্য নজীর মিলবে। আত্মমর্যাদাবোধে উদ্দীপ্ত ব্যক্তিবর্গ ও শরীয়তের মুহাফিজগণ যখনই কারোর এমন কোন উক্তি দেখতে পেয়েছেন যা সুন্নত ও শরীয়তের 'নস' ও এর পর্যায়ক্রমিক অকাট্য 'আকাইদের খেলাফ, যদিও হাকীকতে তা না হয়, কিন্তু মানুষ তার দৃষ্টি, দূরদর্শিতা ও উপলব্ধি শক্তির কারণেই শরীয়তী বিধানের অধীন, সূক্ষ্ম ও অদৃশ্য জগতের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর, অমনি তারা সেই উক্তি প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং যার মুখ দিয়েই এমনতরো উক্তি প্রকাশিত হয়েছে তার মর্যাদা ও খ্যাতি যত উচ্চ মার্গেরই হোক

১. জালাউ'ল-'আয়নায়ন, ৪৩-৪ পৃ.।

না কেন এবং বিলায়াত ও মকবুলিয়াতের যত ব্যাপ্তিই ঘটুক না কেন, তার উক্তি প্রত্যাখ্যান করা থেকে তাদেরকে বিরত রাখতে পারে নি। আর তা এজন্য যে, তাদের নিকট শরীয়তের সম্মান ও মকামে নবূওতের মর্যাদা সকল প্রকার সম্মান ও মর্যাদার উর্ধ্বে ও অগ্রগণ্য ছিল। স্বয়ং হযরত মুজাদ্দিদ আলফে-ছানী (র) এমনতরো ক্ষেত্রে তাঁর ফারূকী রক্তের (উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত) জোশ ও ধর্মীয় মর্যাদাবোধের চিৎকার দাবিয়ে রাখতে পারেন নি এবং সবলে এ জাতীয় উক্তি প্রত্যাখ্যান করেছেন। কেউ তাঁকে লিখেছিল, শায়খ 'আবদুল কবীর য়ামীনী এ মত পোষণ করেন, আল্লাহ 'আলিমু'ল-গায়েব নন অর্থাৎ তিনি অদৃশ্যের খবর জানেন না। এতে তিনি তাকে লেখেন ঃ

> মখদূমী! অধমের এ জাতীয় কথা শোনার মত আদৌ ধৈর্য নেই। এ ধরনের কথা শোনামাত্র আমার প্রতিটি শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত ফারূকী রক্ত[১] সচল হয়ে ওঠে এবং এ জাতীয় কথার অন্যতর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণেরও অবকাশ দেয় না॥ তা এ ধরনের কথা শায়খ কবীর য়ামীনীর হোক কিংবা শায়খ আকবর শামীরই হোক। আমাদের মুহাম্মদ আল-'আরাবী (স.)-র কালাম আবশ্যক, মুহয়ি উদ্দীন (ইবনে) 'আরাবী, সদরুদ্দীন কওনবী ও 'আবদুর রাযযাক কাশীর কালামের আমাদের প্রয়োজন নেই। আমরা তো 'নস' (কুরআন ও সুন্নাহ) চাই, 'ফস'[২] নয়; 'ফুতূহাত-ই মদীনা'[৩] আমাদেরকে 'ফুতূহাত-ই মাক্কিয়্যা'[৪]-র চাহিদা থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছে।[৫]

এই মর্যাদাবোধ ও আবেগ, এই ইখতিলাফ ও ইনকার (মতভেদ ও অস্বীকৃতি)-এর কারণ ধর্মীয় মর্যাদাবোধ এবং কুরআন ও সুন্নাহ্‌র সাহায্য-সমর্থন ভিন্ন আর কিছু নয় এবং এই যে আল্লাহ ও তদীয় রসূল (সা)-কে সকল কিছুর ওপর অগ্রাধিকার প্রদান এবং কাউকে ভালবাসা একমাত্র আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলের জন্যই ভালবাসা কোন লোকের পক্ষে দূষণীয় হতে পারে না, বরং তা তাঁর উচ্চ মর্যাদা ও প্রশংসনীয় গুণাবলীর মধ্যেই গণ্য হবার যোগ্য। কেননা নিম্নোক্ত হাদীসটি সঠিক অর্থে তার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ঃ

ثلث من كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان - من كان الله ورسوله احب اليه مما سواهما - ومن احب عبدا لايحبه الا الله -

---

১. বলা দরকার, মুজাদ্দিদ আলফে-ছানী (র) হযরত ওমর ফারূক (রা)-এর বংশধর ছিলেন (অনুবাদক)।

২. শায়খ আকবর-এর বিখ্যাত গ্রন্থ "ফুসূসূল -হিকাম"-এর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৩. অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষা।

৪. শায়খ আকবরের বিখ্যাত গ্রন্থ।

৫. মকতূবাত-ই ইমাম রব্বানী, ১০০তম পত্র, ১ম খণ্ড।

ومن يكره ان يعود فى الكفر بعد ان انقذه الله كما يكره ان يلقى فى النار -

তিনটি বস্তু যার ভেতর পাওয়া যাবে সে বস্তু তিনটির কারণে ঈমানের স্বাদ ও মিষ্টতা অনুভব করবে। এক, সব কিছুর মুকাবিলায় আল্লাহ ও তদীয় রসূল (সা) তার নিকট প্রিয় হবে; দুই, ভালবাসলে কেবল আল্লাহ্র জন্যই কাউকে ভালবাসবে; তিন, কুফরী থেকে আল্লাহ পাক নাজাত প্রদানের পর পুনরায় কুফরীর দিকে প্রত্যাবর্তন তার নিকট আগুনে নিক্ষিপ্ত হবার মতই অপছন্দনীয় হবে।[১]

৮. একটি দল ইবনে তায়মিয়া (র) সম্পর্কে মারাত্মক ভ্রান্তির শিকার হয়েছিল। কোন কোন অসতর্ক ও পক্ষপাতদুষ্ট লেখক এমন সব উক্তি তাঁর নামে চালিয়েছেন যা আহলে সুন্নত ওয়া'ল-জামা'আতের সাধারণ 'আকীদা বিরোধী এবং যেসব উক্তি মশহূর 'উলামায়ে কিরামের মতে কুফ্র। তাঁর প্রতি এমন সব উক্তিও আরোপ করা হয়েছে যদ্দারা রিসালতের মহামর্যাদার প্রতি বেয়াদবী প্রকাশ পায় এবং তাকে খাটো করা হয় (আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের ও সমস্ত মুসলমানকে এর হাত থেকে পানাহ্ দিন)। এ ধরনের ব্যাপার এককভাবে কেবল ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র সঙ্গেই হয়নি, মুসলিম উম্মাহ্র অপরাপর বুযুর্গ ও শ্রেষ্ঠ সন্তানরাও হিংসুটে ও শত্রুদের এহেন ষড়যন্ত্রের শিকারে পরিণত হয়েছেন। তাঁদের প্রতি এমন সব উক্তি ও আকীদা আরোপ করা হয়েছে যা থেকে তাঁরা একেবারে মুক্ত ও পবিত্র ছিলেন। ষড়যন্ত্রের জাল এতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত করা হয়েছে যে, তাঁদের লিখিত গ্রন্থ ও কিতাবাদিতে এমন সব নিবন্ধ ও অধ্যায় সংযোজন করা হয়েছে যা কুফ্র ও গোমরাহীর হেতু ছিল। এর থেকেও এক কদম অগ্রসর হয়ে (কুফরী উক্তিনির্ভর) স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রন্থ রচনা করে এসব মহান বুযুর্গদের নামে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং ব্যাপকভাবে সে সব গ্রন্থের ফলাও প্রচার করা হয়েছে। হুজ্জাতু'ল-ইসলাম ইমাম গাযালী (র)-র সঙ্গেও একই আচরণ করা হয়েছে। বিরাট এক দল 'আলিমের ধারণা যে,

المضنون به على غير اهله للمضنون به على اهله -

মা'আরিজু'ল-কুদ্স, মিশকাতু'ল-আনওয়ার-এর মত ভিত্তিহীন ও আরোপিত গ্রন্থ ইমাম গাযালী (র)-র শত্রু ও অকল্যাণকামীরা নিজেরা রচনা করে তাঁর নামে চালিয়েছে। শায়খ মুহয়ি উদ্দীন ইবনে 'আরাবীর গ্রন্থের ক্ষেত্রেও ইমাম শা'রানীর ধারণা মতে এমনটিই ঘটেছে এবং নিবন্ধ ও সারাংশের ভেজাল

১. বুখারী ও মুসলিম।

মেশানো হয়েছে। ইমাম শা'রানী (র) স্বয়ং তাঁর নিজের লেখা গ্রন্থ সম্পর্কে একটি চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষণীয় অভিজ্ঞতার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। الاجوبة المرضية। নামক গ্রন্থে তিনি বলেন ঃ

> আমার আল-বাহরি'ল-মাওরূদ ফি'ল-মাওয়াছীক ওয়া'ল-'উহূদ নামক গ্রন্থে কতক হিংসুটে ও পরশ্রীকাতর লোক এমন সব নিবন্ধ ঢুকিয়ে দেয় যা ছিল শরীয়তবিরোধী এবং জামি' আযহারসহ বিভিন্ন জায়গায় এর খুব ফলাও প্রচার করা হয়। এর ফলে এক হাঙ্গামা ও গোলযোগের সূত্রপাত ঘটে। শেষাবধি আমি আমার হাতে লেখা বিশুদ্ধ ও সংরক্ষিত মূল কপিটি 'উলামায়ে কিরামের প্রশংসাসূচক মন্তব্য ও অনুমোদনমূলক অভিমত লিখিত ছিল। এরপর তাঁরা ঐসব সংযোজিত নিবন্ধের গূঢ় রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে সমর্থ হন এবং হাঙ্গামা ও গোলযোগের অবসান ঘটে।

ইবনে তায়মিয়া (র)-র সঙ্গে শুরু থেকেই তাঁর সমসাময়িক ও কোন কোন পরশ্রীকাতর লোকের যেমন আচরণ লক্ষ্য করা গেছে তাতে করে এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে, তাঁর প্রতিও এমন সব কুফরী উক্তি ও অবমাননাকর নিবন্ধের এক বিরাট স্তূপ আরোপ করা হয়েছে। ফলে বহু নিষ্ঠাবান ও ধর্মীয় মর্যাদা রক্ষায় উদ্দীপ্ত 'আলিম এর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাঁর বিরোধিতাই নয়, বরং তাঁকে গোমরাহ, পথভ্রষ্ট, এমন কি কাফির বলতেও তৈরী হয়েছেন। স্বয়ং অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে ও নবম শতাব্দীর শুরুতে পরশ্রীকাতর ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিরোধীদের একটি দল এ ব্যাপারে এতটাই বাড়াবাড়ি করেছিল যে, তারা ফতওয়া দিত, যারা ইবনে তায়মিয়াকে 'শায়খুল-ইসলাম' বলবে তারা কাফির। এসব প্রত্যাখ্যান করে এবং তাঁর সত্যবাদিতা, মর্যাদা ও ইমামতের সপক্ষে হাফিজ-ই-শাম (সিরিয়ার হাফিজ) শামসুদ্দীন আশ-শাফি'ঈ (মৃ. ৮৪২ হিজরী) তাঁর মশহূর গ্রন্থ الرد الوافر على من زعم ان من سمى ابن تيمية شيخ الاسلام كافر লিখেছেন।[১] এতে সাতাশি জন আকাবির ও মশহূর 'উলামা এবং শাস্ত্রবিদ ইমামের রায়, প্রতিক্রিয়া, স্বীকৃতি ও তাঁর (ইবনে তায়মিয়ার) মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে তাঁদের অভিমত উদ্ধৃত করেছেন, সেই গ্রন্থ যেখানে হাফিজ ইবনে হাজার 'আসকালানী ও 'আল্লামা 'আয়নী (র)-র পর্যালোচনা ও অভিমত লিপিবদ্ধ করেছেন, তাঁর সমর্থন করেছেন ও শায়খুল ইসলামের মন খুলে প্রশংসা করেছেন, তাঁকে মুবারকবাদ জানিয়েছেন এবং

---

১. এই কিতাবটি একটি সংকলন আকারে সংকলিত ও বিন্যস্ত করেছেন ফারজুল্লাহ যাকী কুর্দী। শায়খ 'আবদুল কাদির তিলিমসানীর ব্যবস্থাপনায় মাতবা'আ কুর্দিস্তান থেকে ১৩২৯ হিজরীতে মিসরে প্রকাশিত হয়। এটি শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়ার জীবনীর একটি বিরাট মূল্যবান ভাণ্ডার।

প্রকাশ করেছেন যে, তিনি নিঃসন্দেহে একজন বিশুদ্ধ 'আকীদানুসারী, সুন্নী মতাবলম্বী স্বীকৃত শায়খুল-ইসলাম ছিলেন। 'আল্লামা 'আয়নী এত দূর পর্যন্ত লিখেছেন,

من نسبه الى الزندقة فهو زنديق وقد سارت تصانيفه الى الافاق وليس فيها شيء مما يدل على الزيغ والشقاق -

যারা তাঁর (ইবনে তায়মিয়ার) ওপর যিন্দীক-এর অপবাদ দেবে তারা নিজেরাই স্বয়ং মুলহিদ ও যিন্দীক। তাঁর লিখিত রচনা গোটা দুনিয়ায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। তাতে এমন কিছু নেই যা ভ্রান্তিপূর্ণ ও আহলে সুন্নত ওয়া'ল-জামা'আতের 'আকীদা বিরোধী বলে প্রমাণ করা যায়।

মনে হয় এই সিলসিলা বরাবর অব্যাহত ছিল এবং ঐসব ভিত্তিহীন উক্তি ও উদ্ধৃত বিবরণের নকল তস্য নকল হতে থাকে। আর লোকেরা এসব দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে কলম হাতে তুলে নিতে থাকে। এই ধারায় সবচেয়ে অগ্রগামী ছিলেন হিজরী দশম শতাব্দীর মশহূর 'আলিম ও লেখক 'আল্লামা ইবনে হাজার মক্কী[১] যিনি ইবনে তায়মিয়ার বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠিন ফতওয়া লেখেন এবং তাঁর সম্পর্কে তাঁর কলম দিয়ে عبد خذله الله تعالى واضله واعماه واصمه واذله - (আল্লাহ পাক তাকে অপদস্থ, পথভ্রষ্ট, অন্ধ, বোবা ও অবমানিত করেছেন) ইত্যাকার বাক্য পর্যন্ত উচ্চারিত হয়েছে।

কিন্তু ঐ ফতওয়ার এবারত থেকে বোঝা যায়, স্বয়ং 'আল্লামা ইবনে হাজার (র) নিজে ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র লিখিত কিতাব পড়েন নি এবং এ ব্যাপারে তাঁর জানাশোনা ব্যক্তিগত ও সরাসরি ছিল না। তাঁর সমস্ত নির্ভরতা ও ফতওয়ার বুনিয়াদ ছিল সেই সব উক্তি যা ইবনে তায়মিয়া (র)-র নামে সর্বত্র প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল এবং তৎকালে তাঁর বিরোধীরা তাদের স্ব স্ব গ্রন্থে উদ্ধৃত করত এবং আপনাপন মজলিসে আলোচনা করত। তিনি ঐ ফতওয়ায় শায়খুল ইসলামের কালাম ও ফিক্‌হশাস্ত্রীয় تفردات উদ্ধৃত করার পর লিখছেন :

وقال بعضهم ومن نظر الى كتبه لم ينسب اليه اكثر هذه المسائل -

---

১. ৯০৯ হিজরীতে মিসরে জন্ম এবং ৯৭৩ হিজরীতে মক্কা মু'আজ্জমায় তিনি ইনতিকাল করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে তোহফাতু'ল-মুহতাজ, الزواجر عن الصواعق المحرقة ، واقتراف الكبائر - এবং الفتاوى الفقهية والحديثية অত্যন্ত বিখ্যাত। ইনি 'আল্লামা ইবনে হাজার 'আসকালানী (র)-র বিখ্যাত গ্রন্থ 'ফতহু'ল-বারী'র লেখক থেকে ভিন্ন এবং পরবর্তী যুগের লোক। ইবনে হাজার 'আসকালানী (র) হাদীসের মশহূর ইমাম, অত্যন্ত মুহাক্কিক ও বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী 'আলিম। শেষ যুগের 'আলিমদের মধ্যে তাঁর তুলনা মেলা ভার। ইবনে হাজার মক্কী এসব দিকে তাঁর পূর্বসূরীর সমপর্যায়ে পৌঁছতে সক্ষম হন নি।

কেউ কেউ বলেন, যিনিই তাঁর গ্রন্থাদি সরাসরি অধ্যয়ন করেছেন তিনিই উল্লিখিত মসলা-মাসাইলের ক্ষেত্রের অধিকাংশকেই তাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত-করণ সঠিক নয় বলে মনে করেন।

ফতওয়ার শেষে স্বীয় দ্বিধা ও সন্দেহ নিম্নোক্তভাবে প্রকাশ করেছেন ঃ

فان صح عند مكفر او مبتدع يعامله الله تعالى بعد له والايغفر الله لنا وله۔

অর্থাৎ তিনি যদি এমনতরো 'আকীদায় বিশ্বাসী ছিলেন বলে প্রমাণিতও হয় যা বিদ'আত ও কুফরীর হেতু, সেক্ষেত্রে আল্লাহ পাক স্বীয় ইনসাফের ভিত্তিতে তাঁর সঙ্গে আচরণ করবেন অথবা আমাদেরকে ও তাঁকে ক্ষমা করবেন।

এই ফতওয়ার জওয়াব এবং ইবনে তায়মিয়া ও ইবনে হাজার (র)-এর বিজ্ঞোচিত দাবী উত্থাপন করেছেন বাগদাদের প্রখ্যাত বিদ্বজ্জন পরিবারের সদস্য ইরাকের গৌরব ও গর্ব রূহ'ল-মা'আনী প্রণেতা 'আল্লামা মাহমূদ আলূসীর খ্যাতিমান পুত্র 'আল্লামা খায়রুদ্দীন নু'মান আলূসী (র) তাঁর العينين فى محاكمة الاحمدين নামক বিরাট গ্রন্থে। এতে তিনি উক্ত 'আল্লামার (ইবনে হাজার মক্কীর) প্রতিটি বক্তব্যের একটি একটি করে বিস্তারিত জওয়াব দিয়েছেন এবং প্রমাণ করেছেন, তাঁর [ইবনে তায়মিয়া (র)-র] বলে বর্ণিত বক্তব্যের একটি অংশ একেবারেই ভিত্তিহীন ও অপবাদমাত্র এবং শায়খুল ইসলাম [ইমাম তায়মিয়া (র)]-এর গ্রন্থসমূহে বরং এর বিপরীত বক্তব্য ও বর্ণনাই দেখতে পাওয়া যায়। একটি অংশ (যা খুবই হাল্কা) বিস্তৃতির দাবী রাখে। এর যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয় হয়ত তা প্রকৃত সত্য নয় অথবা এটাই তাঁর একমাত্র বক্তব্য নয়। এ ছাড়াও উক্ত গ্রন্থে তিনি (নু'মান আলূসী) শায়খুল ইসলাম-এর জীবন-চরিত ও নানা অবস্থার একটি উল্লেখযোগ্য ও মূল্যবান ভাণ্ডার জমা করে দিয়েছেন।[১]

ইবনে হাজার মক্কীর পর থেকে আজ পর্যন্ত মুহাক্কিক (তত্ত্বজ্ঞ, বিশেষজ্ঞ) 'আলিম, প্রশস্ত দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী ও ন্যায়বান লেখকগণ 'আল্লামা ইবনে হাজারের এতদ্সম্পর্কিত বক্তব্যের সঙ্গে ভিন্নমত প্রকাশ করে আসছেন এবং নিজেদের লিখিত গ্রন্থ ও পুস্তক-পুস্তিকায় শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়া(র)-র নির্দোষিতা এবং তাঁর উচ্চ মরতবা ও মর্যাদার কথা প্রকাশ করে আসছেন। স্বয়ং 'আল্লামা ইবনে হাজার মক্কীর যোগ্য শাগরিদ মুল্লা'আলী কারী[২] শায়খুল ইসলাম

১. গ্রন্থটি ছোট মিসরীয় টাইপে মুদ্রিত, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৬২, হি. ১২৯৮ সনে মিসরের বুলাক নামক প্রকাশনা সংস্থা থেকে প্রকাশিত।

২. আফগানিস্তানের হেরাত প্রদেশের অধিবাসী ছিলেন। তিনি ছিলেন তাঁর যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 'আলিম। মক্কা মু'আজ্জমা সফর করেন এবং সেখানেই বসবাস শুরু করেন। হজ্জের

(পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন)

[ইবনে তায়মিয়া (র)] সম্পর্কে তাঁর উস্তাদের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি তাঁর গ্রন্থে অত্যন্ত উচ্চ কণ্ঠে ইমাম তায়মিয়া (র) সম্পর্কে সপ্রশংস মন্তব্য করেছেন। শরাহ শামাইল-ই তিরমিযী ও মিরকাত শরহে মিশকাতে লেখেন ঃ

ومن طالع شرح منازل السائرين تبين له انهما كان من اكابر اهل السنة والجماعة ومن اولياء هذه الامة -

আর যিনিই মানাযিলু'স-সায়িরীন-এর শরাহ (মাদারিজু'স-সালিকীন) অধ্যয়ন করবেন তার কাছেই এটি স্পষ্ট প্রতিভাত হবে, ইবনে তায়মিয়া ও ইবনে কায়্যিম ছিলেন আহলে সুন্নত ওয়া'ল-জামা'আতের একজন শ্রেষ্ঠ বুযুর্গ এবং এই উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার একজন ওলী।

অতঃপর শেষ যুগে ইমামু'ল-মুতাআখখিরীন শায়খু'ল-ইসলাম শাহ ওয়ালীয়্যুল্লাহ দেহলভী (র) শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র সপক্ষে জোরালো বক্তব্য রেখেছেন এবং পরিষ্কার লিখেছেন, তিনি কেবল সুন্নী 'আকীদাবিশিষ্ট ও পূর্ববর্তী বুযুর্গদের অনুসারী একজন 'আলিমই ছিলেন না, শরীয়তের একজন বড় মুখপাত্র ও ওয়াকীল, কুরআন ও সুন্নাহ্‌র একনিষ্ঠ খাদেম ও উম্মতে মুহাম্মাদিয়্যার একজন জলীলু'ল-কদর 'আলিমও ছিলেন। তিনি ছিলেন ক্ষণজন্মা পুরুষদের অন্যতম যাঁরা কয়েক শতাব্দীর ব্যবধানে জন্মগ্রহণ করেন। যে সমস্ত লোক তাঁর বিরোধিতা ও পদাংক অনুসরণ করেছেন, জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টির ক্ষেত্রে তাঁদের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই। শাহ সাহেব কুরআন-সুন্নাহ্‌র ধারক-বাহক ও 'উলামায়ে ইসলামের সমতা সাধন করে এবং মশহূর হাদীস يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله (এই 'ইল্‌মে কুরআন-সুন্নাহ্‌র ধারক-বাহক প্রতিটি জাতি ও বংশের ন্যায়বান লোকেরাই হবেন) দ্বারা দলীল পেশ করে শায়খু'ল-ইসলাম (ইবনে তায়মিয়া) সম্পর্কে বলেন ঃ

وعلى هذا الاصل اعتقدنا فى شيخ الاسلام ابن تيمية (رحـ) فانا قد تحققنا من حاله انه عالم بكتاب الله ومعانيه اللغوية والشرعية وحافظ لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وا ثار السلف عارف لمعانيهما اللغوية والشرعية استاذ فى النحو

(পূর্ব পৃষ্ঠার পর) নিয়ম-কানূন ও বিধি-বিধান এবং ফিক্‌হ্‌ ও হাদীস সম্পর্কিত অবহিত 'আলিমদের মধ্যে তিনি বিশিষ্ট আসনের অধিকারী ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাদির মধ্যে মিরকাত, শরহে ফিক্‌হ-ই আকবর, শরহে শিফা', শরহে শামাইল তিরমিযী, শরহে নুখবাঃ, শরহে শাতিবিয়াঃ, শরহে জাযারিয়া, খুলাসা কামূস প্রভৃতি বিখ্যাত। তাসাওউফ ও 'ইলমে মা'রিফতেও কামিল ছিলেন। ১০১৪ হিজরীতে ইনতিকাল করেন। মিসরের জামি' আযহারে বিরাট জামা'আত সহকারে তাঁর গায়েবানা জানাযা অনুষ্ঠিত হয়।

واللغة محرر لمذهب الحنابلة فروعه واصوله فائق فى الذكاء ذولسان وبلاغة فى الذب عن عقيدة اهل السنة لم يؤثر عنه فسق ولابدعة اللهم الا هذه الامور التى ضيق عليه لاجلها وليس شىء منها الاومعه دليله من الكتاب والسنة وأثار السلف فمثل هذا الشيخ عزيز الوجود فى العلم ومن يطيق ان يلحق شاعره فى تحريره ؛ والذين ضيقوا عليه ما بلغوا معشار ماأتاه الله تعالى وان كان تضيقه ذالك نا شيئا من اجتهاد ومشاجرة العلماء فى مثل ذالك ماهى الا كمشاجرة الصحابة رضى الله تعالى عنهم فيما بينهم والواجب فى ذالك كشف اللسان الابخير-

এরই ভিত্তিতে আমরা শায়খু'ল-ইসলাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র ওপর 'আকীদা রাখি। তাঁর অবস্থাদি দ্বারা আমাদের নিকট প্রমাণিত হয়ে গেছে, তিনি আল্লাহ্‌র কিতাব কুরআনু'ল-করীমের একজন 'আলিম, এর আভিধানিক ও শর'ঈ অর্থ সম্পর্কে খুবই ওয়াকিফহাল, আরবী ব্যাকরণ ও অভিধানশাস্ত্র সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ, হাম্বলী মযহাবের খুঁটিনাটি বিষয় ও উসূল-এর পরিষ্কার ও বিবাদ মীমাংসাকারী ও বিন্যস্তকারী, একক মেধার অধিকারী, ভাষার ওপর অপূর্ব দখল এবং আহলে সুন্নত ওয়া'ল-জামা'আতের 'আকীদার সমর্থন ও প্রতিরক্ষায় অত্যন্ত বাগ্মী ও স্পষ্টভাষী। তাঁর দ্বারা কোন অন্যায় কিংবা বিদ'আত প্রমাণিত হয়নি। ব্যস! এই কয়েকটি মাত্র মসলার ক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে কঠোরতা করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যেও এমন কোন মসলা নেই যে মাসআলা সম্পর্কে তাঁর নিকট কুরআন, সুন্নাহ্ ও পূর্ববর্তী বুযুর্গদের অনুসৃত আদর্শের ভেতর কোন দলীল ছিল না। জ্ঞানের জগতে এমত মনীষীর তুলনা মেলা ভার। কি লেখনী, কি বক্তৃতায় তাঁর পর্যায়ে উপনীত হন এমন সাধ্য কার? আর যে সমস্ত লোক তাঁর সঙ্গে কঠোরতা ও রূঢ় আচরণ করেছে তাঁর [ইবনে তায়মিয়া (র)-র] কামালিয়াত ও বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্কই ছিল না, যদিও এই কঠোরতা একটি ইজতিহাদী বিষয় ছিল। এতদ্‌সম্পর্কে 'উলামায়ে কিরামের ইখতিলাফ তথা মতভেদ সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর পারস্পরিক মতবিরোধেরই অনুরূপ। অতএব এ ক্ষেত্রে সংযতবাক হওয়াই আমাদের পক্ষে সমীচীন এবং ভাল খারাপ কোন কিছু আমাদের মুখ থেকে যেন বের না হয়।[১]

---

১. উদ্ধৃত অংশটি শাহ সাহেব (র) লিখিত একটি আরবী চিঠির অংশ। চিঠিটি তিনি তাঁরই সমসাময়িক মনীষী মখদূম মু'ঈন উদ্দীন ঠাঠোভী (সিন্ধু প্রদেশের অন্তর্গত ঠাঠের অধিবাসী)-কে তার একটি পত্রের জওয়াবে লিখেছেন। উক্ত পত্রে তিনি শাহ সাহেব (র)-

(পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন)

শাহ ওয়ালিয়ুল্লাহ সাহেব (র)-এর সাফাই ও সাক্ষ্য এবং উল্লিখিত প্রশংসাসূচক মন্তব্যের পর কোন 'আলিম কিংবা লেখকের আক্রমণাত্মক সমালোচনার, ইবনে তায়মিয়া (র)-র জ্ঞান ও চিন্তামার্গের ধারে-কাছে পৌঁছবার যোগ্যতাও যাদের নেই, আদৌ কোন জ্ঞানগত গুরুত্ব বহন করে না। হাকীমু'ল-ইসলাম শাহ ওয়ালিয়ুল্লাহ (র), আল্লাহ পাক যাঁকে গভীর পাণ্ডিত্য, বিচিত্র কামালিয়াত, মুজতাহিদী চিন্তা ও দৃষ্টি, মতভেদের ক্ষেত্রে ভারসাম্যের পথ ও 'উলামায়ে ইসলামের কার কি মর্যাদা সে সম্পর্কে পরিমাপ করবার এক আশ্চর্য ক্ষমতা দিয়েছিলেন। তাই এ ব্যাপারে তাঁর মতামতই চূড়ান্ত হিসাবে বিবেচনার দাবী রাখে।

داستان فصل گل خوش می سراید عندلیب -

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পর) কে ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র কোন কোন একক সিদ্ধান্ত ও তাঁর বিরোধীদের মতভেদের উদ্ধৃতি প্রদান করে তাঁর সম্পর্কে শাহ সাহেব (র)-এর মতামত জানতে চেয়েছিলেন। এই পত্র সংকলনটি শাহ সাহেব (র)-এর প্রখ্যাত ছাত্র খাজা মুহাম্মদ আমীন কাশ্মীরী কর্তৃক সংকলিত। সংকলনটি مناقب ابی عبدالله محمد اسمعیل البخاری وفضيلة ابن تيمية - নামে মাতবা'-ই আহমদী থেকে মুদ্রিত। جلاء العينين গ্রন্থেও এটি অবিকল উদ্ধৃত হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়

আরিফ বিল্লাহ ও মুহাক্কিক আলিম হিসাবে শায়খুল ইসলাম (র.)

সাধারণত শায়খু'ল-ইসলাম ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-কে লোকে একজন মুতাকাল্লিম, তর্কবিশারদ, হাদীসশাস্ত্রবিদ (মুহাদ্দিস) ও ফকীহ্ হিসাবেই জানে। জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর কামালিয়াত তথা পরিপূর্ণতা ও তাঁর যুক্তিতর্কমূলক রচনার যাঁরা পাঠক তারা তাঁর সম্পর্কে যে ধারণা তাদের মন ও মস্তিষ্কে গেঁথে নেন তা হল এই, তিনি [ইবনে তায়মিয়া (র)] একজন অত্যন্ত মেধাবী, ক্ষুরধার বুদ্ধিবৃত্তি ও গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী, শক্তিশালী যুক্তি-প্রমাণ প্রদর্শনকারী এবং একজন জাহিরী 'ইলমের অধিকারী 'আলিমের বেশী কিছু নন। তাঁর বিশিষ্ট শাগরিদ হাফিজ ইবনে কায়্যিম (র)-কে বাদ দিলে [যিনি শায়খু'ল-ইসলামের কিতাব মানাযিলু'স-সায়িরীন-এর শরাহ মাদারিজু'স-সালিকীন-এ তাঁর নিজের ও স্বীয় মাহবূব উস্তাদের জীবনের নিভৃত ও প্রচ্ছন্ন (বাতেনী) দিকটি হেফাজত করেছেন এবং প্রমাণ করে দিয়েছেন, তাঁরা দু'জনেই উন্নত মার্গের 'আরিফ বিল্লাহ ও মা'রিফতের অধিকারী বুযুর্গ ছিলেন] যাঁরা সাধারণ জীবনীকার ও চরিতকারদের সাহায্যে শায়খু'ল-ইসলামকে বুঝবার চেষ্টা করেছেন অথবা তাঁর পরবর্তী অনুসারী ও সম্পর্কিত জনদের দেখে তাঁর সম্পর্কে একটা ধারণা সৃষ্টি করে নিয়েছেন, তাঁরা তাঁকে একজন শুষ্ক ও নীরস মুহাদ্দিস ও জাহিরী 'ইলমের অধিকারী একজন 'আলিমের চেয়ে বেশী মর্যাদা দিতে পারেন নি। কিন্তু মাদারিজু'স-সালিকীন গ্রন্থে হাফিজ ইবনে কায়্যিম কোথাও কোথাও শায়খুল ইসলাম (র)-এর অল্প-স্বল্প যে সব বাণী ও অবস্থার বিবরণ পেশ করেছেন এবং 'আল্লামা যাহবী প্রমুখ তাঁর আলোচনায় তাঁর চরিত্র ও রুচি, অভ্যাস ও চারিত্রিক উৎকর্ষ, তাঁর 'আমল ও দৈনন্দিন বৃত্তির (شغل) যে আলোচনা করেছেন তা সামনে রাখলে একজন ন্যায়বান লোক এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেন, শায়খু'ল-ইসলাম (র)-কে এই উম্মতের ওলী-'আরিফ ও আল্লাহ্ওয়ালা লোকদের মধ্যে গণনা করা উচিত এবং তিনি পরিপূর্ণরূপে নিশ্চিত হয়ে যান, তিনি [ইবনে তায়মিয়া (র)] সেই সব মনযিলে অধিষ্ঠিত এবং তিনি সেই সমস্ত মকসূদ লাভে ধন্য হয়েছেন যা লাভ করতে সাধারণত শত বছরের রিয়াযত ও মুজাহাদা, তরীকতের ইমামদের

সান্নিধ্য এবং সদাসর্বদা যিক্‌র ও মুরাকাবার রাস্তা ইখতিয়ার করা হয় এবং যাকে পরবর্তীকালের সূফিয়ানে কিরাম 'নিসবত মা'আল্লাহ' তথা আল্লাহ্‌র সঙ্গে নিসবত বলে বুঝিয়ে থাকেন।

ذالك فضل الله يؤتيه من يشاء -

সূক্ষ্মদর্শী জ্ঞানীরা এই সত্য সম্পর্কে ওয়াকিফহাল যে, আনন্দ-সুখ তথা আস্বাদন ক্ষমতা ও মা'রিফত, হাকীকী (প্রকৃত) ঈমান ও ইয়াকীন, ইখলাস (নিষ্ঠা) ও দৃঢ়তা, অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা ও চারিত্রিক শুচি-শুভ্রতা, সুন্নাহ্‌র পরিপূর্ণ অনুসরণ ও ফানা ফি'শ-শারী'আত তথা শরীয়তের মাঝে আত্মবিলোপই হল সেই সব যথার্থ লক্ষ্য যার জন্য বিভিন্ন উপায়-উপকরণ অবলম্বন করা হয়। তত্ত্বজ্ঞানী পণ্ডিতগণ এসব লক্ষ্য হাসিলকে কোন একটি ওসীলার মধ্যে সীমাবদ্ধ তা মানেন না, বরং যাঁরা বলার তাঁরা এতদূর পর্যন্ত বলেছেন (আর তাঁরা ভুলও বলেন নি) ঃ

طرق الوصول الى الله بعدد انفاس الخلائق -

প্রাথমিক যুগে এসব লক্ষ্য হাসিলের সর্বাধিক প্রভাবমণ্ডিত, কার্যকর ও শক্তিশালী মাধ্যম ছিল রাসূল আকরাম (সা)-এর সাহচর্য যার (রাসায়নিক) প্রভাব সর্বজনবিদিত। (তাঁর ইনতিকালের কারণে) এই নে'মত থেকে বঞ্চিত হবার পর উম্মতের চিকিৎসকমণ্ডলী ও নবুওতের প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিবর্গ স্ব স্ব যুগে পরিবর্তিত বিভিন্ন প্রক্রিয়া স্থির করেন। শেষে বিভিন্ন কার্যকারণের প্রেক্ষিতে (পবিত্রতম ব্যক্তিত্বের) সাহচর্য ও যিক্‌র-আযকারের আধিক্যের ওপর জোর দেওয়া হয় যার একটি পরিশীলিত, সুসংস্কৃত ও সুবিন্যস্ত তরীকাই আজ তাসাওউফ ও সুলূক নামে সর্বত্র মশহূর হয়ে গেছে। কিন্তু কেউই একথা অস্বীকার করে না, ঐ সব লক্ষ্য অর্জন কেবল যেসব উপায়-উপকরণের ওপর সীমাবদ্ধ নয়; মনোনয়ন ও নির্বাচন এবং আল্লাহ্‌র দান موهبت ভিন্ন ঈমান ও ইহ্‌তিসাব[১] নফসের মুহাসাবা তথা আত্মজিজ্ঞাসা, সুন্নাহ্‌র আনুগত্য ও অনুসরণ, হাদীস ও শামাইল গ্রন্থের সঙ্গে মুহব্বত ও 'আজমতের সাথে ইশতিগাল[২], নফল ইবাদত-বন্দেগী ও দু'আ'-দরূদের আধিক্য, নিয়্যত ও ছওয়াবের আশায় খেদমতে খাল্‌ক তথা সৃষ্টির সেবা, জিহাদ, সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ, দাওয়াত ও তাবলীগ। এ সবের ভেতর যে কোন একটি নিষ্ঠা (استحضار) ও ইহতিমামের সঙ্গে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের মাধ্যম এবং নিসবত লাভের কারণ হতে পারে। মাধ্যম তথা উপায়-উপকরণ ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু লক্ষ্য এক। শায়খুল ইসলাম (র)-এর অবস্থাসমষ্টি থেকে পরিষ্কার জানা যায়, তাঁর এই লক্ষ্য হাসিল ছিল এবং সেটি প্রকাশ করাই এখানে উদ্দেশ্য।

---

১. ছওয়াব লাভের আশায় কোন কাজ করাকে ইহতিসাব বলে।

১. বিস্তারিত জানতে দ্র. صراط مستقيم মওলানা ইসমাঈল শহীদ ও মওলানা আবদুল হাই সংকলিত সৈয়দ আহমদ শহীদ (র)-এর মলফুজাত।

তাঁর খোলামেলা ও সহজ সরল জীবন, তাঁর রুচি, চরিত্র, অভ্যাস ও আচার-আচরণ এবং তাঁর অবস্থাদৃষ্টে এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া যায়, তিনি 'আরিফ (ওলী, দরবেশ), তত্ত্বজ্ঞ 'আলিম, আল্লাহ্‌র মক্‌বূল ও কামিল বান্দাহদের একজন ছিলেন। এর কোন বাহ্যিক মাপযন্ত্র, কম্পাস কিংবা কোন যুক্তিনির্ভর দলীল-প্রমাণ থাকে না। আল্লাহ্‌ওয়ালা ও ওলী-'আরিফদের জীবনী অত্যধিক পড়াশোনা করে করে এবং তাঁদের সাহচর্যে থাকতে থাকতে একজন সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি ও রুচিসম্পন্ন মানুষের এক ধরনের ক্ষমতা ও আত্যন্তিক প্রেম লাভ ঘটে (وجدان) যদ্দ্বারা তিনি এ বিষয়ে ফয়সালা করতে পারেন। কিন্তু এর পরও এমন কিছু অবস্থা ও 'আলামত রয়েছে যদ্দ্বারা পরিমাপ করা যায় যে, এই ব্যক্তি স্বীয় ধর্মীয় মাত্রার ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের তুলনায় উন্নততর এবং ধর্মের বিশুদ্ধতর অবস্থা ও রুচিসমূহ ও আল্লাহ্‌ওয়ালাদের চরিত্র-আখলাক দ্বারা ভূষিত। যেমন আল্লাহ্‌র দাসত্ব (عبوديت) ও প্রতিনিধিত্বের (انابت) এক বিশেষ অবস্থা, ইবাদতের স্বাদ ও মগ্নতা, দু'আ'র স্বাদ ও বিভোরতা, যুহ্‌দ ও দুনিয়ার প্রতি অবজ্ঞা, উৎসর্গ ও বদান্যতা, বিনয় ও নিঃস্বার্থপরতা, আনন্দ ও তৃপ্তি, সুন্নাহ্‌র পরিপূর্ণ আনুগত্য ও অনুসরণ, সালিহ বান্দাদের মাঝে জনপ্রিয়তা, সমসাময়িক 'আলিমগণের সাক্ষ্য, ভক্ত ও অনুসারীদের দীনদারী, উত্তম চরিত্র প্রভৃতি দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায়। আমরা এখানে উল্লিখিত বিষয়বস্তুসমূহের শিরোনামের অধীনে শায়খুল ইসলামের সমসাময়িক ব্যক্তি ও ঐতিহাসিকদের সাক্ষ্য ও তাঁদের প্রতিক্রিয়া উদ্ধৃত করছি।

আল্লাহর দাসত্ব ও প্রতিনিধিত্বের স্বাদ

আল্লাহ্‌র গোলামীর স্বাদ ও আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিত্বের প্রকৃত অবস্থা এ কথার সুস্পষ্ট সাক্ষ্য বহন করে, এই ব্যক্তির অভ্যন্তর ভাগ নিশ্চিত বিশ্বাস (ইয়াকীন) দ্বারা সমৃদ্ধ, আল্লাহ্ তা'আলার 'আজমত ও জাঁকজমকপূর্ণ আড়ম্বর দ্বারা ভরপুর, স্বীয় অসহায়ত্ব, নিরুপায় অবস্থা মহারাজাধিরাজের কুদরত ও গৌরব মহিমার পর্যবেক্ষণ দ্বারা আলোকিত। এই নিশ্চিত বিশ্বাস (ইয়াকীন) ও পর্যবেক্ষণ (مشاهده) যখন কারোর ভেতর কিংবা অন্তরদেশে সৃষ্টি হয়ে যায়, তখন শব্দসমষ্টি ও সকল কাজের মাধ্যমে প্রকাশ ঘটে তার। এই সিলসিলায় হাকীকত ও লৌকিকতার মাঝে আসমান-যমীনের ফারাক। এই ফারাক দৃষ্টিসম্পন্ন ও অত্যন্ত প্রেমের অধিকারী লোকের চোখ এড়িয়ে যেতে পারে না। ليس التكحل فى العينين كالكحل। ইবনে তায়মিয়ার ঘটনাবলী আমাদেরকে বলে দেয় যে, তিনি ইয়াকীন ও মুশাহাদা লাভ করেছিলেন এবং তা তাঁর ভেতর এক ধরনের বিচ্ছিন্নতা ও জোর-যবরদস্তি এবং এক প্রকার প্রতিনিধিত্ব ও গোলামীর (انابت وعبوديت) অবস্থা সৃষ্টি করে দিয়েছিল। পেছনের

পৃষ্ঠাগুলোতে বলা হয়েছে, যখনি কোন মসলার ব্যাপারে সমস্যা দেখা দিত কিংবা কোন আয়াত বোঝার ক্ষেত্রে অসুবিধা হত তখনই তিনি বিজন কোন মসজিদে চলে যেতেন এবং মাটিতে কপাল-ঠেকিয়ে অনেকক্ষণ বলতে থাকতেন, يامعلم ابراهيم فهمني। অর্থাৎ হে ইবরাহীম (আ)-এর শিক্ষক! আমাকে তুমি বুঝবার ক্ষমতা দাও।[১]

ইমাম যাহবী বলেন ঃ

لم أر مثله في ابتهاله واستغاثه وكثرة توجهه ـ

তাঁর মত কান্না-কাটি করতে, আল্লাহ্‌র দরবারে সাহায্য চাইতে ও ফরিয়াদ জানাতে এবং তাঁরই দিকে তাওয়াজ্জুহ্ তথা গভীর মনোনিবেশ করতে আমি আর কাউকে দেখিনি।

তিনি [ইবনে তায়মিয়া (র)] বলেন ঃ

انه ليقف خاطري في المسئلة او الشيء اوالحالة التي تشكل على فاستغفر الله تعالى الف مرة او اكثر اواقل حتى ينشرح الصدر وينجلي اشكال ما اشكل ـ

কোন সময় কোন সমস্যার জট খুলতে আমি যখন হিমশিম খাই অথবা কোন ব্যাপারে যখন সমস্যার মাঝে নিক্ষিপ্ত হই তথা কঠিন সংকট দেখা দেয়, আমি তখন এক হাজার বার আস্তাগফিরুল্লাহ পাঠ করি কিংবা এর কম-বেশী। এর পর সমস্যার জট খুলে যায়, কেটে যায় সংকট, সমাধান হয় সব সমস্যার।

এমতাবস্থায় সভা-সমাবেশ ও হাট-বাজারের হৈ-হট্টগোল তাঁর ক্ষেত্রে কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি করত না। তিনি বলেন ঃ

واكون اذ ذالك في السوق او المسجد اوالدرب اوالمدرسة لا يمنعني ذالك من الذكر والا ستغفار الى ان انال مطلوبي ـ

এমনতরো অবস্থায় আমি বাজারে যাই কিংবা মসজিদে থাকি অথবা কোন গলিতে কিংবা মাদরাসায় অবস্থান করি, আমার যিক্‌র ও তওবা ইস্তিগফারে এ সব আর প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে না। আমি আমার কাজে মগ্ন থাকি যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি মকসূদ হাসিল করতে সক্ষম হই।[২]

১. আল-'উকূদু'দ-দুরিয়্যা, পৃ. ৬।

২. আল-কাওয়াকিবু'দ -দুর্রিয়্যা, পৃ. ১৪৫।

এই ইয়াকীন ও গোলামীর স্বাদ (ذوق عبوديت) যখন সৃষ্টি হয়ে যায় এবং মানুষের প্রতিটি পরতে পরতে তা ছড়িয়ে পড়ে তখন মানুষের মাঝে তার অসহায়ত্ব, দীনতা-হীনতা, স্বীয় নিঃস্বতার এমন অনুভূতি সৃষ্টি হয়ে যায় যে, সে আল্লাহ্‌র শাহী আস্তানায় ভিক্ষার পাত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে যায় এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও রহমতের ভিক্ষা চাইতে থাকে। এ সময় তার শিরা-উপশিরা ও প্রতিটি লোমকূপ থেকে এই আওয়াজ নির্গত হয় ঃ

مفلسانیم آمده در کوے تو شیئاً لله از جمال روے تو
دست بلکشا زنبیل ما افرین بردست وبربازوے تو -

ইবনে তায়মিয়া (র)-র অবস্থা থেকে মনে হয়, তিনি এই দারিদ্র্য-সম্পদ ও বিনয়ের সম্মান লাভে ধন্য ছিলেন। ইবনে কায়্যিম (র) বলেন, "আমি এ সম্পর্কে শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়া (র)-এর এমনতরো অবস্থা দেখেছি যা আর কারো কাছে দেখতে পাইনি। তিনি (ইবনে তায়মিয়া) বলতেন ঃ আমার কাছেও কিছু নেই, আমার ভেতরও কিছু নেই।" অধিকাংশ সময় তিনি এই কবিতাটি আবৃত্তি করতেন ঃ

انا المكدى انا المكدى - وهكذا كان ابى وجدى -

আমি তোমার দুয়ারের ভিখারী, তোমার দরজার ভিখারী আমি। আর আমি নতুন কিংবা অপরিচিত ভিখারী নই; আমরা পুরুষানুক্রমে তোমার দয়ার ভিখারী, আমার বাপ ও দাদাও এই ভিখারীই ছিলেন।

ইবাদতের স্বাদ ও মগ্নতা

ইবাদতের স্বাদ ও এর মাঝে মগ্নতা ততক্ষণ পর্যন্ত আসতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ তার মিষ্টতা ও এর প্রকৃত স্বাদ পাবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না এ তার ব্যথার মলম, মনের খোরাক ও আত্মার শক্তিতে পরিণত হয় এবং এর আসন جعلت قرة عينى فى الصلوة (সালাতকে আমার চক্ষু শীতলকারী বানানো হয়েছে) এবং ارحنا يابلال (হে বিলাল! সালাতের আযান ও ইকামত দ্বারা আমাকে আরাম দাও) দ্বারা সম্বন্ধ বা যোগসূত্র কায়েম করা না হবে। ইবনে তায়মিয়া (র)-র সমসাময়িক লোকেরা ও তাঁর অবস্থা সম্পর্কে যাঁরা জানতেন, তাঁরা সাক্ষ্য দেন, তিনি এই জাগ্রত সম্পদ লাভ করেছিলেন এবং তাঁর নির্জনতা, মুনাজাত ও নফল 'ইবাদত-বন্দেগীর প্রতি বিশেষ আকর্ষণ ছিল। এ ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত বেশী রকমের নিবিষ্টচিত্ত ছিলেন। আল-কাওয়াকিবু'দ-দুররিয়া গ্রন্থে

বলা হয়েছে ঃ

وكان فى ليلة منفردا عن الناس كلهم خاليابربه عز و جل ضارعا اليه مواظبا على تلاوة القران العظيم مكررا لانواع التعبدات الليلية والنهارية وكان اذا دخل فى الصلاة ترتعد فرائضه واعضاوه حتى يميل يمنة ويسرة ـ

রাত্রে তিনি সকল লোক থেকে আলাদা অবস্থান করতেন। সে সময় একমাত্র আল্লাহ্ রাব্বুল-'আলামীনই তাঁর সাথী হতেন। একাকী থাকতেন তিনি এবং সেই সঙ্গে করতেন অশ্রু বিসর্জন। সব সময় তিনি কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতে থাকতেন। দিনরাত বিভিন্ন নফল ইবাদত-বন্দেগীর মাঝে অতিবাহিত করতেন। যখন নামায শুরু করতেন, তাঁর কাঁধ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি কাঁপতে থাকত, এমন কি ডাইনে-বামে স্পন্দিত ও শিহরিত হত![১]

এ ধরনের মন-মানসের অধিকারী ও রুচিসম্পন্ন মানুষের শক্তি ও প্রফুল্লতা যিক্‌রে ইলাহী ও আল্লাহ্‌র 'ইবাদত দ্বারাই কায়েম হয়। এ ক্ষেত্রে কোনরূপ পার্থক্য ঘটলে তার শক্তিই লোপ পেয়ে বসে এবং তিনি অনুভব করতে থাকেন, দিনটি তার উপবাসেই কাটল। ইবনে কায়্যিম (র) বলেন ঃ

وكان اذاصلى الفجر يجلس فى مكانه حتى يتعالى النهار جدايقول هذه غدوتى لولم اتغد هذه الغدوة سقطت قواى ـ

ফজরের সালাত আদায়ের পর তিনি স্বস্থানেই বসে থাকতেন এবং বসে থাকতে থাকতেই বেলা বেড়ে যেত। কেউ জিজ্ঞেস করলে বলতেন ঃ এটাই আমার নাশতা। এই নাশতা গ্রহণ না করলে আমার শক্তিতে ভাটা পড়বে। শেষ পর্যন্ত আমার কর্মশক্তিই লোপ পাবে।[২]

এই আগ্রহ ও ইহতিমামের ওপর আল্লাহ তাআলা দৃঢ়তা দান করেন এবং যিক্‌র-আযকার, 'ইবাদত-বন্দেগী ও অপরাপর আমল অতঃপর তাঁর স্বভাবে পরিণত হয়ে যায়। ইমাম যাহবী লেখেন ঃ

له اوراد واذكار يد منها بكيفية وجمعية ـ

তিনি বিশেষ বিশেষ সময়ের 'আমল ও যিক্‌রসমূহ পাবন্দীর সঙ্গে আদায় করতেন এবং সর্বাবস্থায় অত্যন্ত যত্নের সাথে তা আদায় করতেন।[৩]

১. আল-কাওয়াকিব, পৃ. ১৫৬।

২. আর-রা'দ্দুল-ওয়াফির, পৃ. ৩৬।

৩. ঐ, পৃ. ১৮।

যুহদ ও নির্জনতা অবলম্বন এবং দুনিয়ার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন

যুহ্দ ও দুনিয়ার প্রতি অবজ্ঞার সত্যিকার অবস্থা ততক্ষণ পর্যন্ত সৃষ্টি হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না দুনিয়ার হাকীকত পরিপূর্ণভাবে উদ্ভাসিত এবং ان। الدار الاخرة لهى الحيوان (আর পারলৌকিক জীবনই তো প্রকৃত জীবন) ও وما عند الله خيروابقى (আর যা আল্লাহ্‌র নিকট তাই উত্তম ও স্থায়ী)-এর অবস্থা পুরোপুরি ছেয়ে যায় এবং এই নিশ্চিত বিশ্বাস (ইয়াকীন) ও বিশুদ্ধ মা'রিফত আল্লাহ্‌র সঙ্গে সম্পর্ক ব্যতিরেকে সম্ভব নয়। তাঁর সমসাময়িকগণ তাঁর যুহ্দ, নির্জনতা (تجريد) ও দারিদ্র্য অবলম্বনের কথা নানা জায়গায় উল্লেখ করেছেন। তাঁর সহপাঠী ও সমসাময়িক কালের একজন বিশিষ্ট মনীষী শায়খ 'আলামুদ্দীন আল-বারযালী (মৃ, ৭৩৮ হি.) বলেন ঃ

وجرى على طريقة واحدة من اختيار الفقر والتقلل من الدنياورد ما يفتح به عليه -

শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর [ইবনে তায়মিয়া (র)-র] অবস্থা একই রকম ছিল, আর তা হল, তিনি দারিদ্র্যকেই সর্বদা অগ্রাধিকার দিয়েছেন। দুনিয়ার সাথে নামকাওয়াস্তে অর্থাৎ যতটুকু না হলেই নয় ততটুকুই মাত্র সম্পর্কে রেখেছিলেন, আর যেটুকু পেয়েছেন তাও ফিরিয়ে দিয়েছেন।[১]

কারোর অবস্থা যখন এমন হয় এবং আল্লাহ্ তা'আলা যাঁকে মনের দিক দিয়ে সম্পদশালী করেন তখন রোম ও পারস্য সম্রাটের বিশাল সাম্রাজ্যও তাঁর নিকট তুচ্ছাতিতুচ্ছ মনে হয়। এর প্রতি চোখ তুলে চাওয়াকেও সে গোনাহ্ এবং আল্লাহ্‌র নে'মতের না-শোকরী মনে করে। সে সময় আত্মহারা হয়ে সে বলতে থাকে ঃ

من دلق خود بافسر شابان نمى دبم -
من فقر خود بملك سليمان نمى دبم
از رنج فقر در دل گنج كه يافتم -
اين رنج رابراحت شابان نمى دبم -

তাঁর এই উচ্চ মর্যাদাসন সম্পর্কে যারা জানত না তারা তাঁর সম্বন্ধে ভুল ধারণা করত যে, তিনি সাম্রাজ্যের ওপর লোভাতুর দৃষ্টি নিয়ে তাকান। আর তিনি তাদের এই অজ্ঞতা ও অরুচির ওপর মাতম করেন এই ভেবে যে, এই চিরন্তন সম্পদ লাভের পরও কি এই ধ্বংসশীল রাজ্য ও রাজত্বের দিকে কেউ চোখ তুলে চাইতে পারে? ইবনে তায়মিয়া (র)-র অবস্থা ছিল এই। আল-মালিকু'ন-নাসির

১. আর-রাদ্দু'ল-ওয়াফির, পৃ. ৬৫।
* অর্থ পরিশিষ্টে দেখুন।

একবার তাঁকে বলেছিলেন ঃ আমি শুনেছি, বহু লোক আপনার অনুগত হয়ে গেছে এবং আপনি সাম্রাজ্য কব্জা করার কথা ভাবছেন। শায়খ (র) অত্যন্ত প্রশান্তির সঙ্গে যা উপস্থিত সকলেই শুনেছিল, উত্তর দিয়েছিলেন ঃ

انا افعل ذالك ؟ والله ان ملكك وملك المغل لا يساوى عندى فلسا ـ

এমন কাজ আমি করব? আল্লাহ্র কসম! আপনার ও তাতারী মোগলদের মিলিত সাম্রাজ্যের দাম আমার কাছে এক পয়সাও নয়।[১]

বদান্যতা এবং নিজের তুলনায় অপরকে শ্রেষ্ঠত্ব ও অগ্রাধিকার দান

আল্লাহ্ওয়ালা ও নবী চরিত্রের উত্তরাধিকারপ্রাপ্তদের বিশেষ গুণ হল বদান্যতা ও নিজের তুলনায় অপরকে শ্রেষ্ঠত্ব ও অগ্রাধিকার দান। ইবনে কায়্যিম (র) তদীয় زادالمعاد গ্রন্থে الم نشرح সূরার তাফসীরে লিখেছেন, বক্ষ সম্প্রসারণের সম্পদ এবং ঈমান ও য়াকীনের পরিণাম ফল হ'ল বদান্যতা এবং নিজের তুলনায় অপরকে শ্রেষ্ঠত্ব ও অগ্রাধিকার প্রদান। সেজন্য যে এই সম্পদের কিছুমাত্রও লাভ করবে বদান্যতা ও আত্মোৎসর্গ হবে তার চিহ্ন। শায়খু'ল-ইসলাম (র)-এর সমসাময়িকগণ ও তাঁর বন্ধু-বান্ধব তাঁর বদান্যতার কথা অকুণ্ঠ চিত্তে স্বীকার করেছেন এবং শত মুখে তাঁর প্রশংসা করেছেন। 'আল-কাওয়াকিবু'দ-দুর্রিয়া' গ্রন্থে বলা হয়েছে, وهواحدالاجوادالاسخياء الذين يضرب بهم المثل অর্থাৎ তিনি এমন কতিপয় দানশীল লোকের অন্যতম যাঁদের দানশীলতার খ্যাতি প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়েছে।[২] তাঁর সমসাময়িক আল-হাফিজ ইবনে ফাদলুল্লাহ আল-'উমারী তাঁর বদান্যতার নিম্নরূপ বর্ণনা দিয়েছেন ঃ

كانت تاتيه القناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث فيهب ذلك باجمعه ويضعه عند اهل الحاجة فى موضعه لا ياخذ منه شيئا الا ليهبه ولايحفظه الا ليذهبه ـ

তাঁর নিকট রাশিকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য, উন্নত জাতের ঘোড়া, চতুষ্পদ জন্তু, স্থাবর সম্পত্তি ও মালামাল এলে তিনি সব কিছুই অপর কাউকে দিয়ে দিতেন কিংবা অভাবী লোকদের কাছে রেখে দিতেন। কেবল কাউকে কিছু দিতে কাউকে দেবার জন্যই রাখতেন।[৩] হলেই তিনি সেখান থেকে নিতেন এবং কিছু রাখতে হলে তাও পরবর্তীতে।

---

১. আল-কাওয়াকিবুদ-দুর্রিয়া, পৃ. ১৬৬।

২. আল-কাওয়াকিবু'দ-দুর্রিয়া, পৃ. ১৪৬। ৩. ঐ, পৃ. ১৫৮।

৩.

তাঁর বদান্যতা এত দূর গিয়ে পৌঁছেছিল যে, যখন দেবার মত কিছু থাকত না, তখন শরীরের কাপড় খুলেই দিয়ে দিতেন।

كان يتصدق حتى اذ لم يجد شيئا نزع بعض ثيابه فيصل به الفقراء -

তিনি অকাতরে দান করতেন। যখন দেবার মত কিছু থাকত না তখন নিজের কোন পরিধেয় কাপড়ই তাকে দিয়ে দিতেন এবং দরিদ্র ও অভাবী লোকদের প্রয়োজন মেটাতেন।[১]

وكان يتفضل من قوته الرغيف والرغيفين فيوثر بذالك على نفسه -

খাবারের ভেতর থেকে একটা দু'টো রুটি তিনি বাঁচিয়ে রাখতেন এবং নিজের প্রয়োজন উপেক্ষা করে অন্যকে তা দিয়ে দিতেন।[২]

নিজের মুকাবিলায় অপরকে প্রাধান্য দান (ايثار)-এর একটি নাযুক মকাম হ'ল, মানুষ তার শত্রু ও প্রতিপক্ষের সাথে উদার ও খোলা মন নিয়ে বরং ক্ষমা ও অনুগ্রহ এবং এর চেয়েও অগ্রসর হয়ে দু'আ ও কল্যাণ কামনা নিয়ে মিশবে। এই মকাম কেবল তারাই লাভ করতে পারে যারা আত্মম্ভরিতা ও জৈবিক কামনা-বাসনাগুলোকে পিছে ফেলে বহু দূরে এগিয়ে গেছেন এবং যাদের ওপর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহরাজির এমন বর্ষণ হয়েছে, যাঁরা শান্তি-সুখ এত বেশী পরিমাণে লাভ করেছেন যে, তাঁরা ঐসব বিরোধিতাকে মুকাবিলায় অত্যন্ত তুচ্ছ ও উপেক্ষণীয় মনে করেন এবং যাঁদের ভেতর স্বীয় দুশমন ও বিরোধীদের জন্যও কল্যাণ কামনা ও সহানুভূতির প্রেরণা সৃষ্টি হয়।

ওপরে বলা হয়েছে, ৭০৯ হিজরীতে যখন তিনি দ্বিতীয়বারের মত মুক্তি পান, তখন একদিন সুলতান তাঁকে একা পেয়ে তাঁর নিকট সেসব কাযীর ব্যাপারে ফতওয়া নিতে চান যারা জাশনগীরকে সমর্থন ও সহযোগিতা যুগিয়েছিল এবং সুলতানের অপসারণ ও পদচ্যুতির পক্ষে ফতওয়া প্রদান করেছিল। সুলতান এও বলেছিলেন, এসব কাযী আপনার বিরুদ্ধেও হাঙ্গামা সৃষ্টি করেছিল এবং আপনাকে কষ্ট দিয়েছিল। এর উত্তরে ইবনে তায়মিয়া (র) সেসব লোকের প্রশংসা করেছিলেন, অত্যন্ত বলিষ্ঠ কণ্ঠে তাদের পক্ষে সুপারিশ করেছিলেন এবং তাদের হত্যা করা থেকে সুলতানকে নিবৃত্ত রাখেন। তাঁর সবচেয়ে বড় প্রতিপক্ষ কাযী

১. ঐ, পৃ. ১৫৭।

২. আল-কাওয়াকিবু'দ-দুর্রিয়া, পৃ. ১৫৭।

ইবনে মাখলুফ মালিকীর এই উক্তিও পেছনে উদ্ধৃত করা হয়েছে, "আমরা ইবনে তায়মিয়ার মত উদার ও মহানচেতা আর কাউকে দেখিনি। আমরা সুলতানকে তাঁর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেছি। কিন্তু তিনি যখন ক্ষমতা পেয়েছেন আমাদেরকে পরিষ্কার মাফ করে দিয়েছেন এবং উল্টো আমাদের পক্ষে ওকালতি করেছেন।"

তাঁর যোগ্য শাগরিদ ও সকল সময়ের সাথী হাফিজ ইবনে কায়্যিম বলেন ঃ তিনি শত্রুর জন্যও দু'আ করতেন। আমি তাদের একজনের বিরুদ্ধেও বদ দু'আ করতে দেখিনি। একদিন আমি তাঁর সবচেয়ে বড় প্রতিপক্ষ ও এমন একজন মানুষের মৃত্যু খবর নিয়ে আসলাম, যে শত্রুতা সাধনে এবং যন্ত্রণা প্রদানে সকলের তুলনায় অগ্রগামী ছিল। তিনি আমাকে ধমক দিলেন ও আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজি'উন' পড়লেন। অতঃপর তৎক্ষণাৎ তার বাড়ী গেলেন, তার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করলেন, সমবেদনা জানালেন এবং পরিবারের লোকদেরকে (সান্ত্বনা দিয়ে) বললেন ঃ (তোমরা ভেবো না!) তিনি গেলেও আমি তো রয়েছি। তোমাদের যখন যা দরকার হবে আমাকে বলবে। আমি তোমাদেরকে এ ব্যাপারে সাহায্য করব। এভাবেই তিনি তাদের প্রতি সৌজন্য প্রদর্শন করেন এবং সান্ত্বনামূলক কথাবার্তা বলেন। এতে তারা খুবই প্রীত হয় এবং তাঁকে প্রাণ খুলে দু'আ করে। তারা খুব বিস্মিতও হয়।

ক্ষমা ও সদয় ব্যবহার, শত্রু ও বিরোধীদের সাথে স্নেহ-মমতার এই আসন আর্থিক কুরবানীর তুলনায় খুবই বুলন্দ এবং অগ্রবর্তী আসন (مقام)। এটি সেই আসন যা সিদ্দীক ও বিশিষ্ট আওলিয়ায়ে কিরাম পেয়ে থাকেন। ইবনে তায়মিয়া (র) এই আসনে আসীন ছিলেন এবং এই আসনে সমাসীন কোন কবি ফারসী ভাষায় যা বলেছিলেন তাতে যেন তিনি ইবনে তায়মিয়া (র)-র অবস্থারই প্রতিধ্বনি করেছিলেন ঃ

برکه مارا یارنبود ایزد اور ایار باد -
هر که مارا رنج داده راحتش بسیار باد
بر که اندر راه ماخارے نهد ازدشمنی -
هرگلے کز باغ عمرش بشگفد بے خارباد -

বিনয় ও স্বার্থলেশহীনতা

বিনয় ও স্বার্থলেশহীনতা আল্লাহ্ওয়ালাদের বিশেষ গুণ ও সেই কামালিয়াতের মরতবা যা হাজারো কারামত থেকে বুলন্দ এবং হাজারো ফযীলতের তুলনায় শ্রেষ্ঠতর। এই আসন কেবল তখনই হাসিল হয় যখন মানুষর 'খুদী' তথা আমিত্ব লোপ পায় এবং আত্মার পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধি (تزكيه) ঘটে। শায়খুল-ইসলাম (র)-এর জ্ঞানের পরিপূর্ণতা এবং ধর্মীয় ও জাগতিক ক্ষেত্রে

চরম মার্গে উন্নীত হবার সাথে সাথে এই কামালিয়াতও লাভ হয়েছিল। তাঁর কথা থেকে বোঝা যায়, তিনি স্বার্থলেশহীনতা, সব কিছুই আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে করবার মানসিকতা (للهيت), আত্মনিয়ন্ত্রণ ও নিজ সত্তার অস্বীকৃতির উচ্চতম দরজায় উপনীত হয়েছিলেন। ইবনে কায়্যিম (র) বলেন, তিনি অধিকাংশ সময় বলতেন ঃ مالي شيئ ولا مني شيئ ولا في شيئ কেউ তাঁর মুখের ওপর প্রশংসা করলে তিনি বলতেন ঃ

والله انى الى الان اجدد اسلامى كل وقت وما اسلمت بعد اسلاما جيدا

আল্লাহ্‌র কসম! আমি আজ পর্যন্ত বরাবর আমার ইসলামের তাজদীদ (নবায়ন) করে আসছি এবং এখন পর্যন্ত আমি বলতে পারি না, আমি পরিপূর্ণরূপে মুসলমান।[১]

কখনো কেউ তা'রীফ করলে তিনি এও বলতেন ঃ انا رجل ملة لا رجل دولة আমি মুসলিম উম্মাহর একজন নগণ্য সদস্যমাত্র; তখ্‌ত-তাজের কেউ নই।[২]

স্বার্থলেশহীনতা ও গোলামীর এই দর্জায় পৌঁছে মানুষের এই অবস্থা হয়ে যায় যে, তার নিজের কারুর ওপর কোন হক আছে বলে মনে করেন না। তিনি তার দাবীও করেন না, কারোর বিরুদ্ধে তাঁর কোন অভিযোগও থাকে না। কারোর থেকে তিনি প্রতিশোধও গ্রহণ করেন না। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে [ইবনে তায়মিয়া (র)-কে] সেই আসনেই পৌঁছে দিয়েছিলেন। ইবনে কায়্যিম (র) বলেনঃ

سمعت شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول العارف لا يرى له على احد حقا ولا يشهد له على غيره فضلا؛ ولذالك لا يعاتب ولا يطالب ولا يضارب -

আমি শায়খু'ল-ইসলাম ইবনে তায়মিয়া (আল্লাহ্ তাঁর রূহ্‌কে পবিত্র রাখুন)-র মুখে শুনেছি, তিনি বলতেন ঃ 'আরিফ ব্যক্তি কারো ওপর কোন হক আছে বলে মনে করেন না এবং কারোর ওপর তাঁর কোন ফযীলত (মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব) আছে বলেও মনে করেন না। আর এজন্যই তিনি কাউকে অভিযুক্ত করেন না, কারোর নিকট চান না বা দাবী করেন না কিংবা কাউকে মারধোরও করেন না।[৩]

---

১. মাদারিজু'স-সালিকীন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৯৬।

২. আল-কাওয়াকিবু'দ-দুর্রিয়া, পৃ. ১৬৪।

৩. মাদারিজু'স-সালিকীন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৯৬ও, পৃ. ৪৯৬।

তাঁর অবস্থা সম্পর্কে যিনি জানেন কেবল তিনিই বুঝবেন একথা বলে প্রকারান্তরে তিনি তাঁর নিজের অবস্থাই বর্ণনা করেছেন।

প্রশান্তি ও আনন্দ

এই ঈমান, ইয়াকীন ও আল্লাহ্ তা'আলার সঙ্গে এই নির্ভেজাল সম্পর্ক, সৃষ্টি জগত থেকে পরিত্রাণ, চিত্তের মুক্তি ও সম্পর্কহীনতার পর মানুষের এমন প্রশান্তি ও আনন্দ লাভ ঘটে যে, এই জীবনেই সে জান্নাতী সুখ ও স্বাদ পেতে থাকে। শায়খু'ল-ইসলাম (র) [ইবনে কায়্যিম বর্ণিত] স্বয়ং একবার বলেছিলেন ঃ

ان فى الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الاخرة -

(মু'মিনের জন্য) দুনিয়াতেই এমন এক জান্নাত (বেহেশ্ত) রয়েছে, যে এখানে প্রবেশ করেনি সে পরকালীন জান্নাতেও প্রবেশ করবে না।[১]

চক্ষুষ্মান লোকেরা জানেন, আল্লাহ্ তা'আলা কখনো কখনো তাঁর মুখলিস (নিষ্ঠাবান, অকপট) বান্দাদেরকে এই জীবনেই لاخوف عليهم ولاهم يحزنون -এর সম্পদ দান করেন এবং বান্দা এর নমুনা (দুনিয়ার বিস্তৃতির পরিমাণ মাফিক) এখানেও দেখে নেন। শায়খু'ল ইসলাম (র) ও তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের বিবরণ থেকে জানা যায়, তিনি এই সম্পদ লাভ করেছিলেন। স্বয়ং একবার উত্তেজিত হয়ে তিনি বলেছিলেন ঃ

مايصنع اعدائى بى - ان جنتى وبستانى فى صدرى ان رحت فهى معى لاتفارقنى -

দুশমন আমার কি করবে? আমার জান্নাত, আমার বেহেশতী বাগিচা আমার বক্ষে; যেখানেই যাই কিংবা থাকি না কেন, তা আমার সাথেই থাকবে।[২]

এই প্রশান্তি ও তুষ্টির সম্পর্ক জীবতকালে এবং মৃত্যু-পরবর্তীতে তাঁর সাথেই থেকেছে। ইবনে কায়্যিম (র) লিখেছেনঃ একবার আমি তাঁকে স্বপ্নে দেখলাম। আমি কতকগুলো মন্দ কাজ সম্পর্কে তাঁর সাথে আলোচনা করলাম। এতে তিনি বললেনঃ ঃ

امانا فطريقى الفرح والسرور به -

ভাই! আমার সম্বন্ধ তো আনন্দ ও প্রফুল্লতার সঙ্গে।[৩]

---

১. আর-রাদ্দু'ল-ওয়াফির, পৃ. ৩৬।

২. আল-ওয়াবিল আস-সায়্যিব, পৃ. ৬৬।

৩. ইগাছাতু'ল-হিফান।

ইবনে কায়্যিম বলেন ঃ

وهكذا كانت حاله في الحياة يبدو ذالك على ظاهره وينادى به عليه حاله ـ

তাঁর জীবনে এই অবস্থাই বর্তমান ছিল। তাঁর চেহারায় সর্বদাই খুশীর আমেজ থাকত ও তাঁকে সর্বদাই আনন্দ-উৎফুল্ল দেখা যেত এবং তাঁর সব কিছুর ভেতর এটাই ফুটে উঠত।[১]

সুন্নাহ্‌র পূর্ণ আনুগত্য ও অনুসরণ

এই আসন (কবূলিয়াত ও সিদ্দীকিয়াত)-এর প্রারম্ভ হয় সুন্নাহর আনুগত্য ও অনুসরণ থেকে এবং এর শেষও হয় সুন্নাহ্‌র পরিপূর্ণ আনুগত্য ও অনুসরণের ওপর। হাদীস ও সুন্নাহ্‌র সঙ্গে ইবনে তায়মিয়া (র)-র নিবিড় সম্বন্ধ ও ঘনিষ্ঠতা তাঁর বিরোধীরাও স্বীকার করেন। কিন্তু তাঁর এই নিবিড় সম্বন্ধ ও ঘনিষ্ঠতা কেবল জ্ঞানগত ও দৃষ্টি ক্ষেপণের মধ্যেই ছিল না, কার্যত ও বাহ্যিকভাবেও ছিল। তাঁর সমসাময়িক সকলেই সাক্ষ্য দেন, রিসালাতের মকাম বা আসনের যেমন আদব ও সম্মান এবং সুন্নাহ্‌র আনুগত্য ও অনুসরণের যেমন সযত্ন প্রয়াস ইবনে তায়মিয়া (র)-র এখানে দেখতে পেয়েছি, আর কারুর কাছে তা দেখতে পাইনি। হাফিজ সিরাজুদ্দীন আল-বায্‌যার কসম খেয়ে বলেন ঃ

لاوالله ما رأيت احدا تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا احرص على اتباعه ونصر ماجاء به منه ـ

আল্লাহ্‌র কসম! আমি রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এত আদব ও এত ভক্তি-সম্মান প্রদর্শনকারী, তাঁর আনুগত্য ও অনুসরণকারী এবং তাঁর আনীত দীনের সাহায্য করতে আগ্রহী ইবনে তায়মিয়ার চেয়ে বেশী আর কাউকে দেখিনি।[২]

এই জিনিসটি তাঁর ওপর এত অধিক প্রবল এবং তাঁর জীবনে এত বেশী উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত ছিল যে, দর্শকের মন তা দেখামাত্রই সাক্ষ্য দিত, পরিপূর্ণ আনুগত্য অনুসরণ ও সুন্নাহ্‌র প্রতি প্রগাঢ় প্রেম ও ভালবাসা একেই বলে। 'আল্লামা 'ইমাদুদ্দীন আল-ওয়াসিতী বলেন ঃ

مارأينافي عصرنا هذا من تستجلى لنبوة وسننها من اقواله وافعاله الاهذاالرجل يشهد القلب الصحيح ان هذا هوالاتباع حقيقة ـ

---

১. মাদারিজু'স-সালিকীন।

২. আল-কাওয়াকিবু'দ-দুরিয়া, পৃ. ১৪৯।

আমরা আমাদের যুগে একমাত্র ইবনে তায়মিয়াকেই পেয়েছি, যাঁর জীবনে নবূওতে মুহাম্মদীর নূর এবং যাঁর কথায় ও কাজে সুন্নাহ্‌র আনুগত্য ও অনুসরণ স্পষ্ট প্রতীয়মান ছিল। সুস্থ মন-মানস এ কথার সাক্ষ্য দিত, প্রকৃত আনুগত্য ও পরিপূর্ণ অনুসরণ একেই বলে।[১]

সত্যবাদী পুণ্যাত্মাগণের মধ্যে জনপ্রিয়তা ও সমকালীন উলামায়ে কিরামের সাক্ষ্য

বিরাট এক দঙ্গল জনতা কোন ব্যক্তির যতই তা'রীফ কিংবা প্রশংসা করুক, আল্লাহ্‌র দরবারে তা তার মকবূল হবার এবং তার দৃঢ়তা ও উচ্চ মরতবার দলীল নয়, বরং দলীল তখনই হবে যখন সে যুগের পুণ্যাত্মা ও দৃঢ়চেতা বুযুর্গ ও জ্ঞানী-গুণী ও দূরদর্শী ব্যক্তিদের সাক্ষ্য ও প্রশংসা এর সাথে যুক্ত হবে। অধিকন্তু তাঁর অনুসারী, তাঁর ভালবাসার ও সম্পর্কিত জন এবং তাঁর সঙ্গে ওঠা-বসাকারী ব্যক্তিবর্গের ভেতর সদুপদেশ ও ন্যায়নীতি, শুভ ধারণা, তাকওয়া তথা আল্লাহ্‌ভীতি ও সতর্কতা এবং পরকালের ভয়-ভীতি ও চিন্তা পাওয়া যাবে। তিনি স্বীয় যুগের লোকদের থেকে দীনদারী এবং সোজা-সরল ও মধ্যম পন্থা অনুসরণের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট হবেন। ইবনে তায়মিয়া (রা)-র ব্যাপার ছিল এই যে, সে যুগের বিশিষ্টতম পুণ্যাত্মা ও জ্ঞানী-গুণিগণ তাঁর মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব ও তাঁর 'আকীদার বিশুদ্ধতা ও সুস্থতার সমর্থন করতেন, স্বীকৃতি দিতেন এবং অকুণ্ঠ চিত্তে তাঁর প্রশংসা করতেন। তাঁর বিরোধীদের ভেতর বিরাট সংখ্যক ছিলেন সরকারের কাছের লোক ও দুনিয়া পূজারী যারা পদমর্যাদার প্রতি লোভাতুর এবং সম্পদ ও সম্মানের আকাঙ্ক্ষী ছিল।[২] 'কাওয়াকিব' প্রণেতা লিখছেন ঃ

قالوا ومن امعن النظر ببصيرته لم يرعالما من اهل اى بلد شاء موافقاله الا وراءه من اتبع علماء بلده للكتاب والسنة واشغلهم بطلب الاخرة والرغبة فيها وابلغهم فى الاعراض عن الدنيا والاهمال لها ولايرى عالما مخالفاله منحرفاعنه الاوهو من اكبرهم نهمة فى جمع الدنيا واكثرهم رياءا وسمعة والله اعلم-

লোকে বলে, যিনিই কিছুটা চিন্তা-ভাবনা করবেন তিনিই দেখতে পাবেন, যে শহরেই তাঁর ভক্ত-অনুরক্ত রয়েছে তাঁরা সেই শহরের 'উলামায়ে কিরামের ভেতর কুরআন-সুন্নাহ্‌র সর্বাধিক অনুসরণকারী, আখিরাত তথা পারলৌকিক

---

১. জালা'উ'ল-'আয়নায়ন, পৃ. ৮।

২. এর ভেতর তাঁরা ব্যতিক্রম, যাঁরা কোন ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে কিংবা জ্ঞান ও নীতিগত প্রশ্নে তাঁর বিরোধিতা করেছিলেন। ومامن عام الاوقد خص منه البعض

জীবন কামনায় মশগুল, এর প্রতি সর্বাধিক লোভী, পার্থিব জগতের প্রতি নিস্পৃহ ও উপেক্ষ এবং এর দিকে অমনোযোগী দৃষ্টিগোচর হবে। এর বিপরীতে যাদেরকে তাঁর বিরোধিতায় দেখা যায় -দেখা যাবে তারা দুনিয়ালোভী, লোভী, রিয়াকার তথা প্রদর্শনীসর্বস্ব এবং খ্যাতি ও শোহরত লাভের আকাঙ্ক্ষী। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।[১]

আল্লামা যাহবীর এ কথাও বিস্মৃত হবার মত নয় ঃ

واخيف فى نصر السنة المحفوظة حتى اعلى الله تعالى مناره وجمع قلوب اهل التقوى على محبته والدعاءله -

সুন্নাহ্র সাহায্য ও সমর্থনের অপরাধে তাঁকে অনেক ভয়-ভীতি দেখানো হয়েছে, ধমক দেওয়া হয়েছে, এমনকি শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে সফলকাম ও সম্মানিত করেছেন এবং আল্লাহ্ভীরু লোকদের অন্তর মানসকে তাঁর প্রতি ভালবাসা ও দু'আর জন্য সমবেত করে দিয়েছেন।[২]

অন্তর্দৃষ্টি ও কারামত

যদিও কাশ্ফ ও কারামত বুযুর্গী ও মকবূলিয়াতের অংশ নয়, এর দলীলও নয়। বিশেষজ্ঞগণ পরিষ্কার লিখেছেন যে, الاستقامة فوق الكرامة "ইস্তিকামত তথা স্থৈর্য কারামতের ঊর্ধ্বে।" আর এখন এই মসলা কোন আলোচনা-সমালোচনার মুখাপেক্ষী নয়। কিন্তু এও সত্য, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বহু মকবূল বান্দাহ্কে পুরস্কারস্বরূপ এই সম্পদও দান করে থাকেন এবং তাদের হাত কিংবা মুখ থেকে এমন সব ঘটনার প্রকাশ ঘটে যা তাদের মকবূলিয়াত ও শ্রদ্ধা-সম্মানের সহায়ক শক্তি ও চিহ্নসমূহের অন্তর্গত হয়ে থাকে। আহলে সুন্নত ওয়া'ল- জামা'আতের সর্বসম্মত মসলা হল, كراماةالاولياءحق অর্থাৎ "আওলিয়া-ই কিরামের কারামত সত্য" এবং কুরআন ও হাদীসে অনেক সাক্ষ্য ও ঘটনা আছে। স্বয়ং শায়খুল-ইসলাম (র)-এর গ্রন্থে এই মসলার তাকরীর ও এই হাকীকত তথা মূল তত্ত্বের প্রমাণ রয়েছে।

এসব ঘটনার সাক্ষ্য যা কারামত ও অলৌকিক কর্ম হিসেবে সংঘটিত হয়েছে, তাঁর ছাত্র, বন্ধু-বান্ধব ও সমসাময়িক লোকেরা দিয়েছেন এবং পরবর্তী লোকেরা স্বীকার করেছেন, এসব কারামত এত বেশী মশহূর ও এত অধিক সংখ্যায় বর্ণিত হয়েছে যে, তা অস্বীকার করা সম্ভব নয়। জামি' বুখারীর ভাষ্য 'উমদাতু'ল-কারী প্রণেতা 'আল্লামা 'আয়নী 'তাকরীয আর-রাদ্দু'ল-ওয়াফির' নামক গ্রন্থে লিখছেন ঃ

---

১. আল-কাওয়াকিবু'দ-দুর্রিয়া, পৃ. ১৬১।

২. জালা'উ'ল-'আয়নায়ন, পৃ. ৬।

وهذا الامام مع جلالة قدره فى العلوم نقلت عنه على لسان جم غفير من الناس كرامات ظهرت منه بلا التباس -

তাঁর (ইবনে তায়মিয়ার) জ্ঞানগত মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব ও কামালিয়াতসহ ইবনে তায়মিয়া থেকে এমন কারামতও প্রকাশ পেয়েছে যা বিরাট একদল লোক উদ্ধৃত করেছেন। আর এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।[১]

উল্লিখিত কারামতেরই একটি শাখা "সত্য অন্তর্দৃষ্টি (فراست صادقه) যা মু'মিনশ্রেষ্ঠ (اكبر مؤمنين) ও আওলিয়া-ই মুত্তাকীন (اولياء متقين) তথা আল্লাহভীরু ওলীয়ে কামিলগণের হাসিল হয়ে থাকে। এই অন্তর্দৃষ্টির অত্যাশ্চর্য ও বিরল ঘটনাবলী এখানে উদ্ধৃত করা হচ্ছে। হাফিজ ইবনে কায়্যিম (র) 'মাদারিজু'স-সালিকীন' ও অপরাপর গ্রন্থে এই অন্তর্দৃষ্টির বহু ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন। মাদারিজু'স-সালিকীন গ্রন্থের এক স্থানে তিনি লিখছেন ঃ

ولقد شاهدت من فراسة شيخ الاسلام امورا عجيبة وما لم نشاهده منها اعظم و وقائع فراسته تستدعى سفرا منخما -

আমি শায়খু'ল-ইসলামের অন্তর্দৃষ্টির অত্যাশ্চর্য ও বিরল সব ঘটনা পর্যবেক্ষণ করেছি এবং যেসব ঘটনা আমার পর্যবেক্ষণে আসে নি (বরং সেগুলো আমি বিশ্বস্ত লোকদের মুখ থেকে শুনেছি) সেগুলো আরও বিরাট আকারের। তাঁর অন্তর্দৃষ্টির ঘটনাসমূহ লিপিবদ্ধ করতে হলে বিরাট ভল্যুমের দরকার।[২]

ওয়াহদাতু'ল-ওয়াজূদ, ফানা' ও বাকা', মা'রিফত, কলবের 'আমল প্রভৃতি মসলার ওপর তিনি যা কিছু লিখেছেন, তা থেকে বোঝা যায়, তিনি কার্যতও সে সব স্তর ও মনযিল অতিক্রম করেছিলেন এবং এই সিলসিলায় ازواق عاليه ও احوال الصحيحه হাসিল করেছিলেন। তিনি যা কিছু বলতেন ও লিখতেন, তা কেবল সাধারণ মেধা ও জ্ঞানের শক্তিতে কিংবা কলমের জোরে নয়, বরং তাঁর অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণেরই ফল ছিল তা। এই সব মসলা ও আলোচনার ক্ষেত্রে তাঁর বাণী, দর্শন ও তাঁর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ তত্ত্বজ্ঞ সুফী তাসাওউফ ও শাস্ত্রের মুজতাহিদদের (যেমন মাখদূম শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহ্য়া মুনায়রী ও ইমাম রব্বানী হযরত শায়খ আহমদ সিরাহিন্দীর) বাণী ও দর্শন (كلام) ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সঙ্গে মিলে যায়। 'রিসালাতু'ল'-'উবূদিয়াত' নামক পুস্তিকায় ফানা'-র বিভিন্ন কিসিম, এর বিভিন্ন মরতবা ও মকাম-এর বিস্তারিত বয়ান করতে গিয়ে লিখছেন ঃ

১. আর-রাদ্দু'ল-ওয়াফির, পৃ. ৮৯।

১. মাদারিজু'স-সালিকীন, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৫০।

ফানা' তিন প্রকার ঃ ফানা'-র একটি মকাম তাই, যা আম্বিয়া-ই কিরাম ('আ) ও ওলীয়ে কামিলগণের হাসিল হয়ে থাকে। আরেকটি মকাম সেই সমস্ত ওলী ও পুণ্যাত্মার হাসিল হয়ে থাকে যারা কামালিয়াত ও তরক্কীর সেই দরজায় উপনীত হন না। একটি মকাম মুনাফিক, মুলহিদ (ধর্মদ্রোহী) ও সাদৃশ্যবাদীদের। প্রথম মকাম হল, আল্লাহ্ ব্যতিরেকে সব কিছুই সে এমনভাবে বিস্মৃত হবে যে, কেবল আল্লাহ্‌র জন্যই প্রেম-ভালবাসা ও আল্লাহ্‌রই জন্যই 'ইবাদত-বন্দেগী, আল্লাহ্‌রই ওপর তাওয়াক্কুল বা ভরসা স্থাপন এবং কেবল আল্লাহ্‌রই কামনা অবশিষ্ট থাকবে। এর বাইরে আর কিছুর অস্তিত্ব থাকবে না। শায়খ বায়েযীদ বিস্তামীর কথিত এই উক্তি لاارید الاما یرید তিনি যা চান একমাত্র তা ভিন্ন আর কিছুই আমি চাই না)-এর এই অর্থই গ্রহণ করা উচিত অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ও অভিরুচিই একমাত্র আমার ইচ্ছা-অভিরুচি। আর এর দ্বারা ধর্মীয় ইচ্ছা-ইরাদা বোঝানোই আমার উদ্দেশ্য। বান্দাহ্‌র কামালিয়াত এটাই যে, তার ভেতর সেই ইচ্ছা-অভিরুচি, সেই প্রেম-ভালবাসা, সেই রেযামন্দীই ক্রিয়াশীল থাকবে যার ইরাদা আল্লাহ্ করবেন, তিনি যাতে রাযী হন এবং যা তিনি পছন্দ করেন। এর অর্থ সেই সব খোদায়ী আদেশ-নির্দেশ যার ভেতর বাধ্যতামূলক কিংবা ইচ্ছাধীন নির্দেশ থাকবে। এটাই ফেরেশ্‌তাকুল, আম্বিয়া 'আলায়হিমু'স-সালাম এবং সালিহীন বান্দাহ্‌দের মকাম। যার এই মকাম হাসিল হয়েছে তার 'কাল্‌ব-ই সালীম' তথা বিশুদ্ধ অন্তঃকরণরূপ সম্পদ হাসিল হয়েছে (الامن اتى الله بقلب سليم)। 'উলামায়ে কিরাম এর এই তাফসীর করেছেন যে, বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ গায়রুল্লাহ্‌র 'ইবাদত-বন্দেগী কিংবা গায়রুল্লাহ্‌র ইচ্ছা-অভিরুচি অথবা গায়রুল্লাহ্‌র প্রেম ও ভালবাসা থেকে পাক পবিত্র হবে। এর নাম ফানা' রাখা হোক অথবা না রাখা হোক, এটাই ইসলামের প্রারম্ভ ও শেষ এবং এটাই দীনের গোপন ও প্রকাশ্য তত্ত্ব।

ফানা'র দ্বিতীয় প্রকার ছিল এই যে, আল্লাহ্ ভিন্ন অপর কিছুর পর্যবেক্ষণ থেকে একেবারেই মুক্ত ও বেপরোয়া হয়ে যাবে। এটি এমন একটি মকাম, বহু সালিক (অধ্যাত্ম পথের পথিক)- কে যার সম্মুখীন হতে হয়। তাদের কলবের যিক্‌র, 'ইবাদত ও ঐশী প্রেমের দিকে আকর্ষণ এবং এমন প্রবল মোহ সৃষ্টি হয় যে, তাদের মন-মানস আল্লাহ ভিন্ন অপর কিছুর পর্যবেক্ষণের তাপ কিংবা শক্তি সইতে পারে না এবং স্বীয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ভিন্ন আর কিছু দেখতে পারে না। গায়রুল্লাহ্‌র তাদের দিলে ঠাঁই হয় না, এমন কি তার অনুভূতিটুকু পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে না। এই মকামে যেভাবে এই মোহ ও আকর্ষণের ভূমিকা রয়েছে ঠিক তেমনি কোন দরজায় তাদের মন-মানসের দুর্বলতারও ভূমিকা রয়েছে। কুরআন মজীদে রয়েছে ঃ

واصبح فؤاد ام موسى فارغا وان كادت لتبدى به لولان ربطنا على قلبها -

'মূসা-জননীর হৃদয় অস্থির হয়ে পড়েছিল। আমি তার হৃদয়কে দৃঢ় করে না দিলে সে তার পরিচয় তো প্রকাশ করেই দিত।'

মুফাসসিরগণ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেনঃ হযরত মূসা ('আ)-এর মার অন্তর-মানস হযরত মূসা (আ)-এর খেয়াল ও স্মরণ ছাড়া আর সব কিছু থেকেই মুক্ত হয়ে গিয়েছিল। এ ধরনের ব্যাপার সাধারণত সে সব লোকের ক্ষেত্রে দেখা যায় যাদের ওপর আকস্মিক কোন ভালবাসা কিংবা ভীতি অথবা প্রত্যাশার প্রভাব জেঁকে বসে। সে সময় তাদের অন্তর-মানস সেই বন্ধু কিংবা শত্রু অথবা বাঞ্ছিত জন ভিন্ন আর সব বস্তু থেকে মুক্ত ও খালি হয়ে যায় এবং কোন কোন সময় এই ভালবাসা কিংবা ভীতি অথবা যাঞ্ছার ভেতর এমনভাবে ডুবে যায় যে, তা ছাড়া আর কোন কিছুর অনুভূতিটুকু পর্যন্ত থাকে না। এমন কোন লোকের ওপর যিনি ফানা'র এই মকামের ওপর অবস্থান করছেন যখন এই অবস্থার প্রভাব পরিপূর্ণরূপে জেঁকে বসে তখন তিনি উক্ত জেঁকে বসা অস্তিত্বের দরুন স্বয়ং নিজের অস্তিত্ব পর্যন্ত ভুলে যান। সেই "শুহূদ" (উপস্থিত, আধ্যাত্মিক উন্নতির সেই অবস্থান যেখানে সাধক তত্ত্বে মগ্ন হতে থাকেন)-এর উপস্থিতির প্রভাব এমনভাবে জেঁকে বসে যে, স্বয়ং তার নিজের "শুহূদ" থাকে না। সেই বর্ণিতের স্মরণ ও আলোচনার এমন প্রভাব জেঁকে বসে যে, নিজের চিন্তা-ভাবনা একেবারেই লোপ পেয়ে যায়। এক-এর মা'রিফত বা পরিচয় এমনভাবে ছেয়ে যায় যে, নিজের মা'রিফত বা পরিচয় আর অবশিষ্ট থাকে না। সে সময় সেই এক অস্তিত্ব ব্যতিরেকে সমস্ত উপস্থিত অস্তিত্ব তার দৃষ্টিতে অস্তিত্বহীন ও শূন্য হয়ে যায়। যার আল্লাহ্ তা'আলার ভালবাসা কিংবা মা'রিফতে এই মকাম লাভ ঘটে তার দৃষ্টিতে গোটা সৃষ্টিজগতই অস্তিত্বহীন ও শূন্য হয়ে যায়। যার আল্লাহ তা'আলার ভালবাসা কিংবা মা'রিফতে এই মকাম লাভ ঘটে তার দৃষ্টিতে গোটা সৃষ্টিজগতই অস্তিত্বহীন ও ধ্বংসশীল দৃষ্টিগোচর হয় এবং কেবল আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বই অবশিষ্ট থেকে যায়। আর প্রকৃত ব্যাপার হল, এসব সৃষ্টিজগত প্রকৃত অর্থে অস্তিত্বহীন ও ধ্বংস হয় না, বরং সেই ব্যক্তির "শুহূদ" ও স্মরণ ধ্বংস ও অদৃশ্য হয়ে যায় এবং তিনি সে সবের বোধ ও 'শুহূদ' থেকে ধ্বংস হয়ে যান। যখন এই জিনিসের প্রাধান্য হয়ে যায় এবং বন্ধুর ভেতর এমন দুর্বলতা সৃষ্টি হয়ে যায় যে, তার ভাল-মন্দ কিংবা ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য তথা বিবেচনা শক্তি লোপ পেতে বসে, তখন কোন কোন সময় তিনি নিজেকেই প্রকৃত (عين) বন্ধু মনে করতে থাকেন। গল্পচ্ছলে বলা হয়, একবার এক লোক নদীতে লাফিয়ে পড়ে। তার প্রেমিক দাঁড়িয়ে দেখছিল। সেও তার পেছনে নদীর ভেতর লাফিয়ে

পড়ল। বন্ধু বলল ঃ আমি তো নদীতে লাফিয়ে পড়েছিলাম। তুমি কেন আমার পেছনে লাফিয়ে পড়লে? সে বলল ঃ তোমার ভালবাসা আমার বুদ্ধি-বিভ্রম ঘটিয়েছিল। আমার কোন হুশ ছিল না, এমন কি আমার মনে হয়েছে যে, তুমি আর আমি একই।

এই মকামে পৌঁছে অনেক লোকেরই পা পিছলে গেছে। তারা মনে করেছে, এই হচ্ছে "ইত্তিহাদ" বা (স্রষ্টা ও সৃষ্টির) মিলন এবং প্রেমিক প্রেমাস্পদের সঙ্গে মিলে এক হয়ে যায়, এমন কি তাদের আসল অস্তিত্বের কোন পার্থক্যই আর অবশিষ্ট থাকে না। এ ধারণা একেবারেই অমূলক ও ভ্রান্ত। স্রষ্টার সঙ্গে কোন বস্তুই মিলে-মিশে এক হতে পারে না, বরং ঘটনা হলো, কোন বস্তুই কোন বস্তুর সঙ্গে মিলে এক হতে পারে না। দু'টি বস্তুর মধ্যে পরিপূর্ণ মিলন কেবল তখনই হতে পারে যখন সেই দু'টি বস্তু বদলে যায় অথবা নষ্ট হয় কিংবা তাদের মিলনে তৃতীয় এক বস্তুর সৃষ্টি হয়, যখন কোনটিই আর স্বরূপে কিংবা স্ব-আকৃতিতে অবশিষ্ট থাকে না। যেমন পানি, দুধ, পানি ও মদ একত্রে মিশে তৃতীয় এক জিনিস তৈরি হয়। অবশ্য পছন্দনীয় ইরাদা (ইচ্ছা, আকাঙক্ষা) ও অপছন্দনীয় ইরাদায় মিলন হতে পারে। দু'জন ব্যক্তি পছন্দনীয় ও অপছন্দনীয় ইচ্ছার ভেতর এক হতে পারে। একজন যাকে ভালবাসে, অপরজনও তাকে ভালবাসে। একজন যাকে ঈর্ষা করে, অপরজনও তাকে ঈর্ষা করে। একজন যে জিনিস পছন্দ করবে, অপরজনও সেই জিনিসই পছন্দ করবে। ঠিক তেমনি একজন যার সাথে শত্রুতা করবে, অপরজনও তার সাথে শত্রুতা করবে। কিন্তু সেই পরিপূর্ণ ফানা বা ধ্বংস ও বিলুপ্তি যার ভেতর অপরাপর অস্তিত্বসমূহ একেবারেই অস্তিত্বহীন হতে শুরু হয় আর তার উপস্থিতি ও অনুভূতিটুকু পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে না, এটি একটি অপূর্ণ মকাম। হযরত আবূ বকর ও হযরত ওমর (রা)-এর মত বুযুর্গ আওলিয়া-ই কিরাম৷ মুহাজির ও আনসারদের ভেতর যাঁদের অগ্রগামিতা ও শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত, তাঁরা এই ফানা'র ভেতর পতিত হন নি। যখন তাঁরাই এর থেকে ঊর্ধ্বে ছিলেন তখন আম্বিয়া-ই কিরাম-এর কথা উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এ ধরনের স্বাদ, রুচি ও অবস্থা সাহাবা-ই কিরামের পরবর্তী লোকদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে। তাদের মন-মানসের ওপর কোন কোন সময় এমন ঈমানী অবস্থা (كيفيات) দেখা দিত যে, তাদের হুশ-বুদ্ধি ও বিবেচনা শক্তি লোপ পেয়েছে। সাহাবা-ই কিরাম (রা) বড় পরিপূর্ণ হালত এবং শক্তিশালী মন-মানসের অধিকারী ছিলেন। ঈমানী হালত ও কায়ফিয়াতের সময় তাঁদের বুদ্ধি-বিভ্রম কিংবা হুশ-জ্ঞানের বিলুপ্তি যেমন ঘটত না, তেমনি তাঁদের ভেতর পর্দা বা যবনিকা, দুর্বলতা, মাতলামি ও আত্মবিলুপ্তি, ফানা অথবা আত্মবিহ্বলতা ও উন্মত্ততার অবস্থাও সৃষ্টি হত না। এ অবস্থার সূচনা হয় তাবি'ঈদের যুগে বসরার রিয়াযতকারী অত্যধিক

'আবিদ ('ইবাদত গুযার, 'ইবাদতকারী) লোকদের ক্ষেত্রে। তাঁদের ভেতর কেউ কেউ কুরআন মজীদের তেলাওয়াত শুনে বেহুশ হয়ে যেত। কেউ কেউ মারাও গেছে। উদাহরণ হিসাবে আবূ জুহায়র নাবীনা (অন্ধ), বসরার কাযী যুরারাহ ইব্‌ন আবী আওফার নাম উল্লেখ্য। তেমনি সূফী বযুর্গদেরও ফানা ও নেশাগ্রস্ততার এমন সব অবস্থা লাভ ঘটেছে যে, এমনতরো অবস্থায় তাঁদের ভেতর হুশ্-বুদ্ধি ও সুস্থ বিবেচনা শক্তি লোপ পেয়েছে। এমনতরো অবস্থায় অনেক সময় তাঁদের মুখ দিয়ে এমন সব কথা বেরিয়ে যেত যে, হুশ ফিরে পাবার পরে তাঁরা প্রকাশ্যে ভুল বুঝতে পারতেন। শায়খ বায়েযীদ বিস্তামী, শায়খ আবুল হাসান নূরী ও শায়খ আবূ বকর শিবলী (র) এ অবস্থার সম্মুখীন হয়েছেন এবং তাঁদের থেকে এ ধরনের অনেক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু আবূ সুলায়মান দারানী, মা'রূফ কারখী, ফুযায়ল ইবনে 'ইয়াদ, বরং জুনায়দ বাগদাদী (র) প্রমুখ থেকে এ ধরনের কোন ঘটনা বর্ণিত হয়নি। এমন অবস্থায়ও তাঁদের হুশ-বুদ্ধি ও বিবেচনা শক্তি লোপ পায় নি এবং তাঁরা এ জাতীয় ফানা ও মত্ততাবস্থার মধ্যে পতিত হতেন না। এই সব কামিল বুযুর্গদের মন-মস্তিষ্কে আল্লাহ্‌র মুহব্বত ও তাঁর ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা ছাড়া আর কিছু থাকে না। তাঁদের জ্ঞান এত ব্যাপক ও বিস্তৃত এবং তাঁরা এতখানি বিবেচনা শক্তির অধিকারী হন যে, সব কিছুই তাঁদের চোখে সে সবের নিজস্ব রূপ ও আকৃতিতে ধরা পড়ে। সৃষ্টিজগত তাদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে কিংবা অস্তিত্বহীন হয় না। তাঁদের দৃষ্টিতে সৃষ্টিজগত আল্লাহ্‌র হুকুম ও ইচ্ছার সাথে প্রতিষ্ঠিত, তাঁরই ইচ্ছার অনুগত ও অধীন প্রতিভাত হয়, বরং তসবীহ-তাহলীল ও ফরমাঁবরদারীর ভেতর মশগুল দৃষ্টিগোচর হয়। এভাবে এই পর্যবেক্ষণ তাঁদের অন্তর্দৃষ্টি ও আল্লাহ্‌র স্মরণকে বাড়িয়ে দেয় এবং তাঁর মা'রিফত (পরিচয়)। ইখলাস (নিষ্ঠা), তাওহীদ ও 'ইবাদত-বন্দেগী বর্ধিত করে। এটাই সেই হাকীকত যার দিকে কুরআন আহ্বান জানিয়েছে এবং এটাই মু'মিন, তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত, ওলীয়ে কামিল ও দরবেশ 'আরিফগণের মকাম। আর আমাদের পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম এঁদের সকলেরই ইমাম, সর্দার ও তাঁদের ভেতর পরিপূর্ণতম ও সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত। এজন্য যখন তাঁর মি'রাজ হ'ল, সেখানে গিয়ে আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ তথা নিদর্শনাবলী প্রত্যক্ষ করলেন এবং আল্লাহ্‌র সঙ্গে কথাবার্তা ও অন্তরঙ্গ আলাপ হল, অতঃপর তিনি এই জগতে প্রত্যাবর্তন করলেন তখনও তাঁর অবস্থার মাঝে কোনরূপ পরিবর্তন ঘটেনি এবং এর কোন প্রভাব-প্রতিক্রিয়াও কেউ তাঁর মাঝে অনুভব করে নি, অথচ এমত ক্ষেত্রে হযরত মূসা (আ) বেহুশ ও আত্মবিলুপ্তির মাঝে নিক্ষিপ্ত হতেন।

আরও একটি অবস্থা আছে যাকে কখনো-সখনো ফানা নামে অভিহিত করা হয়। আর তা হল, মানুষ এ কথার সাক্ষ্য দেবে, আল্লাহ ছাড়া কোন বস্তুরই অস্তিত্ব নেই এবং স্রষ্টার অস্তিত্বই সৃষ্টিজগতের অস্তিত্ব এজন্য যে, প্রভু ও ভৃত্যের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। এ জাতীয় ফানা'র ধারণা কিংবা বিশ্বাস সে সমস্ত পথভ্রষ্ট ও ধর্মদ্রোহী (মুলহিদ)-দের যারা হুলূল* ও ইত্তিহাদ*-এর 'আকীদায় বিশ্বাসী। দৃঢ় চিত্তের অধিকারী বুযুর্গের ভেতর কেউ যদি বলেন যে, আল্লাহ ভিন্ন আর কিছুই আমার দৃষ্টিগোচর হয় না অথবা আমি গায়রুল্লাহ্র দিকে দৃষ্টিপাত করি না কিংবা এই জাতীয় অন্য কোন কথা বলেন তখন তার অর্থ হয় এই যে, তাঁকে ছাড়া কোন স্রষ্টা কিংবা তাঁকে ভিন্ন কোন কুশলী ব্যবস্থাপক অথবা তিনি ব্যতিরেকে কোন মা'বূদ আমি দেখতে পাই না অথবা আমি ভালবেসে বা ভীতি সহকারে কিংবা আশা-ভরসার সঙ্গে তিনি ভিন্ন অপর কারোর ওপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করি না এজন্য যে, নিয়ম হল, চোখ সাধারণত তাকেই দেখে যার সঙ্গে হৃদয়-মন জড়িত। যার কোন জিনিসের সঙ্গে ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপিত হবে অথবা আশা-অকাঙ্ক্ষার সম্পর্ক কিংবা ভয়-ভীতি ও ঈর্ষার সম্পর্ক অথবা হৃদয়-মনের সঙ্গে সম্পর্কিত এমন কিছু নয় তখন অন্তর-মানসে তার দিকে মনোনিবেশের কোন ইচ্ছাই জাগবে না, তার দিকে চোখ তুলেও চাইবে না এবং তাকেও দেখবে না। যদি কখনো তার প্রতি চোখ পড়েও যায় তবে তা হবে আচম্বিতে অথবা শুধুই চোখ পড়বে। যেমন কোন লোক কোন দেওয়াল কিংবা পাঁচিল অথবা এমন কোন জিনিষ দেখে যার সাথে তার হৃদয়-মন সম্পর্কিত নয়। পুণ্যাত্মা বুযুর্গগণ কখনো-সখনো নির্ভেজাল তওহীদ এবং পরিপূর্ণ ইখলাস তথা নিষ্ঠা সম্পর্কে কথা বলেন। তার অর্থ হয় এই যে, বান্দাহ্ গায়রুল্লাহ্ (আল্লাহ্ ভিন্ন সকল বস্তুনিচয়)-র দিকে দৃকপাতই করবে না এবং আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কিছুকে ভালবাসবে না কিংবা ভয় করবে না অথবা আশা নিয়ে তার দিকে চোখ তুলেও চাইবে না, বরং হৃদয়-মন তামাম সৃষ্টিজগত থেকে একেবারেই খালি ও মুক্ত থাকবে। (আর তাকালেও) সে সবের দিকে সে আল্লাহ্র নূরের সাথে দেখবে। সত্যেরই মাধ্যমে শুনবে এবং সত্যেরই শক্তিতে সে চলবে। আল্লাহ্ যাকে ভালবাসেন তাকে সে ভালবাসবে; আল্লাহ্ যার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেন তার প্রতি সেও বিদ্বিষ্ট মনোভাব পোষণ করবে। আল্লাহ্ যাকে বন্ধু বানান তাকে সেও বন্ধু বানাবে এবং আল্লাহ্ যার সাথে শত্রুতা করেন সেও তার সাথে শত্রুতা করবে। তার ব্যাপারে আল্লাহ্কে ভয় করবে এবং আল্লাহ্র ব্যাপারে তাকে ভয়

* পরিশিষ্ট দেখুন। -অনুবাদক।

করবে না। এটাই সেই বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ, দীন-ই হানীফপন্থী তওহীদবাদী মুসলিম মু'মিন যার ভেতর নবী মুরসালওয়ালা মা'রিফত, গবেষণা, বিশ্লেষণ ও তওহীদ পাওয়া যায়। এটাই সেই মকাম যার ওপর আম্বিয়া-ই কিরামের অনুসারিগণ অধিষ্ঠিত হয়ে থাকেন এবং এটিই ফানা-ই মাহমূদ তথা প্রশংসিত ফানা'। এই মকামে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গেরই প্রশংসা করেছেন আল্লাহ রাব্বু'ল-'আলামীন এবং তাদেরকে আওলিয়া-ই মুত্তাকীন, পুণ্যাত্মা সংস্কারকদের দল ও বিজয়ী সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

অবশিষ্ট ফানা ফি'ল-ওজূদওয়ালাদের কিসিম ঃ (তওহীদ-ই ওজূদী অথবা ওয়াহদাতু'ল-ওজূদ) আর তা হল কারামেতা (মুসলমানদের ভেতর একটি বিভ্রান্ত সম্প্রদায়। ॥অনুবাদক)-দের মত ফিরআওন বংশধরদের গবেষণা কিংবা বিশ্লেষণ ও তওহীদের মা'রিফাত। সূফী বুযুর্গ ও পুণ্যাত্মা বান্দাদের কারুর নিকটই এর এ অর্থ ছিল না। সৃষ্টি জগতের ভেতর যে জিনিষই আমি আমার চোখ দিয়ে দেখি তাই আসমান-যমীনের 'রব' তথা প্রভু-প্রতিপালক, একথা কেবল তারাই বলতে পারে যারা ধ্বংসাত্মক রকমের গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট এবং যারা বুদ্ধি-বিভ্রান্ত অথবা ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাসের খপ্পরে পতিত কিংবা যারা ক্ষিপ্ততা ও ধর্মদ্রোহিতার ভেতর কোন একটির শিকার। সমস্ত মাশাইখ-এ কিরাম॥দীন ইসলামের ভেতর যাঁরা নেতৃত্বের আসনে সমাসীন এবং যাঁদেরকে অনুসরণ করা হয়ে থাকে তাঁরা সকলেই এই মত ও পথের ওপরই একমত যা এই উম্মাহ্র প্রাচীন বুযুর্গ ও ইমামগণের পথ ও মত ছিল আর তা হল, স্রষ্টা সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সৃষ্টিজগত থেকে একেবারেই স্বতন্ত্র অস্তিত্বের অধিকারী। তাঁর সৃষ্টি জগতে তাঁর সত্তার যেমন কোন অংশ নেই, তেমনি তাঁর সত্তার মাঝেও তাঁর সৃষ্টি জগতের কোন অংশ নেই। তাঁরা সকলের এ বিষয়ে একমত, অসৃষ্ট বস্তু (قديم)-কে সৃষ্ট বস্তু (حادث) থেকে পৃথক এবং স্রষ্টাকে সৃষ্ট জীব বা সৃষ্টি (مخلوق) থেকে বিশিষ্ট জানতে হবে, বুঝতে হবে। এ বিষয়ে তাঁদের যে সব বাণী ও উক্তি বর্ণিত হয়েছে এই সংক্ষিপ্ত নিবন্ধে তা বলার সুযোগ নেই। তাঁরা এও বলেছেন, হৃদয়-মানসে কখনো কখনো এমন সব অসুখ-বিসুখ তথা রোগ-ব্যাধি ও সন্দেহ এসে দেখা দেয় এবং কোন কোন লোকের ওপর এমন সব অবস্থা জেঁকে বসে যে, তাদের সৃষ্টিজগতের অস্তিত্ব পর্যবেক্ষণের সুযোগ ঘটে এবং তাঁরা ন্যায়-অন্যায় তথা ভালমন্দের ভেতর পৃথকীকরণ শক্তির দুর্বলতা কিংবা লোপ পাবার কারণে তাকেই অর্থাৎ সৃষ্টি জগতকেই আসমান যমীনের স্রষ্টা ভাবতে শুরু করে। যেমন এক ব্যক্তি সূর্যের একটি আলোক-রশ্মি দেখছে এবং ভাবছে এটাই সেই আসমানের সূর্য।

এখানে এটাও বোঝা দরকার, স্রষ্টা ও সৃষ্টি জগতের ভেতর পার্থক্যের দু'টি মকাম রয়েছে। একটি মকাম হচ্ছে, বান্দা বিচ্ছেদের পর্যবেক্ষণ করবে এবং প্রাচুর্য ও ভিড় তাকে পেরেশান করবে। তার হৃদয়-মানস এই ভিড় ও বিচ্ছেদের কারণে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকবে। সে হৃদয় ও দৃষ্টির ইতস্তত বিক্ষিপ্ততার মাঝে গ্রেফতার থাকবে। কখনো প্রেম ও ভালবাসা, কখনো ভয় ও কখনো আশা-আকাঙ্ক্ষার কারণে, যা এই সব সৃষ্ট জীবের সঙ্গে কায়েম হয়ে যায়, তার একাগ্রতা তওহীদে হাকীকী হাসিল হবে না। মানুষ যখন এই বিচ্ছেদ ও বিচ্ছিন্নতা থেকে ঐক্যের দিকে, ভিড় থেকে একত্বের দিকে স্থানান্তরিত হয় তখন সে হৃদয়-মানস একাগ্রতা, মানসিক শান্তি এবং সেই লা-শরীক ও একক আল্লাহ্‌র তাওহীদ ও ইবাদতের মিষ্টতা ও স্বাদ লাভ করে এবং তার মন-মানস সৃষ্ট জীবের দিকে মনোযোগী থাকার পর আল্লাহ তা'আলার দিকে সম্পূর্ণভাবে ঝুঁকে যায়। তার মুহব্বত, তার ভয়, তার আশা-ভরসা, তার সাহায্য প্রার্থনা সব কিছুই আল্লাহ্ তা'আলার সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে যায়। এমন অবস্থায় কতক মুহূর্তে তার মন-মানসে সৃষ্ট জীবের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপের সুযোগ আর অবশিষ্ট থাকে না যার সাহায্যে সে স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে পার্থক্য করবে। আল্লাহ্‌র দিকে তার পূর্ণ মনোযোগ ও সৃষ্টির দিক থেকে পরিপূর্ণ পরান্মুখতা লাভ ঘটে যায়। ওপরে আমরা যে দ্বিতীয় প্রকার ফানার কথা আলোচনা করেছি এই অবস্থাও তার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

কিন্তু এরপর বিচ্ছেদের অপর একটি মকাম রয়েছে যা এর চেয়ে সমুন্নত ও উচ্চতর। আর তা হল, বান্দাহ পর্যবেক্ষণ করবে যে, সৃষ্ট জীব আল্লাহ তা'আলার সাথে কায়েম, তাঁর নির্দেশের অনুগত এবং তাঁর ইচ্ছার নিয়ন্ত্রণাধীন। আল্লাহ পাকের ওয়াহদানিয়াতের সামনে সে তার ভিড় ও প্রাচুর্যকে শূন্য ও অস্তিত্বহীন দেখবে। সে এই পর্যবেক্ষণ করবে যে, আল্লাহ তা'আলা এই সৃষ্ট বস্তুসকলের প্রতিপালক (রব), সার্বভৌম প্রভু (ইলাহ), স্রষ্টা ও মালিক। এমনতরো অবস্থায় তার দিল্ (অন্তঃকরণ) আল্লাহ তা'আলার দিকে একাগ্র হয় এবং সে নিষ্ঠা ও ভালবাসা, আশা ও ভয়, সাহায্য প্রার্থনা ও আল্লাহ্‌র ওপর তাওয়াক্কুল এবং আল্লাহ্‌র জন্যই ভালবাসা ও আল্লাহ্‌র জন্যই বিদ্বেষ পোষণের মত অবস্থা লাভ করে। সে স্রষ্টা ও সৃষ্টির ভেতরকার পার্থক্যকে পরিষ্কার দেখতে থাকে এবং এতদুভয়ের মাঝে পরিষ্কার পার্থক্য নির্ণয় করতে থাকে। সে সৃষ্ট জীবের ছিন্নভিন্ন রূপ ও ভিড়কেও দেখতে থাকে এবং এ কথারও সাক্ষ্য দিয়ে থাকে যে, আল্লাহ তা'আলা সব কিছুর প্রতিপালক (রব), সব কিছুর মালিক ও স্রষ্টা (ان الله

(رب كل شيء ومليكه وخالقه وانه هوالله لاالاهو) এটাই সঠিক ও সত্য সরল 'শুহূদ' এবং এটাই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-র গবেষণামূলক ও বিশ্লেষণধর্মী সাক্ষ্য।[১]

তাঁর রচনাবলীতে এ ধরনের গবেষণামূলক বিশ্লেষণ এবং সমূহ সঠিক জ্ঞান আরও অনেক রয়েছে। হাফিজ ইবনে কায়্যিম 'মাদারিজু'স-সালিকীন' নামক গ্রন্থে ইবনে তায়মিয়া (র)-এর গবেষণাধর্মী বিশ্লেষণ ও অবস্থার বহুবিধ ভাণ্ডার একত্র করেছেন। তাঁর এসব জ্ঞান-ভাণ্ডার সংগ্রহ ও অবস্থাদৃষ্টে মুল্লা 'আলী কারী উস্তাদ ও শাগরিদ সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

> যিনিই মানাযিলু'স-সায়িরীন-এর ভাষ্য (মাদারিজু'স-সালিকীন) অধ্যয়ন করবেন তার সামনেই এ সত্য দিবালোকের ন্যায় ধরা পড়বে, তাঁরা দু'জন (ইবনে তায়মিয়া ও ইবনে কায়্যিম) আহলে সুন্নত ওয়া'ল-জামা'আত-এর শ্রেষ্ঠতম বুযুর্গ এবং উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার ওলীকুলের অন্যতম ছিলেন।[২]

---

১. رسالة العبودية فى تفسيرقوله تعالى ياايهاالناس اعبدوا ربكم ৩৫-৮ পৃ.; মিসরের মাতবা'আ-ই হুসায়নিয়া থেকে প্রকাশিত مجموعة رسائل -এর অন্তর্ভুক্ত।

ومن طالع شمع منازل السائرين تبين له انهما كانامن اكابر اهل السنة والجماعة ومن اولياءهذه الامة -

২. মিরকাত শরাহ মিশকাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪২৭

৬ষ্ঠ অধ্যায়

শায়খু'ল-ইসলাম হাফিজ ইবনে তায়মিয়া (র)-এর পূনর্জাগরণ ও সংস্কারমূলক কাজ

শায়খু'ল-ইসলাম হাফিজ ইবনে তায়মিয়া (র) ইসলামের দা'ওয়াত ও সাধনাবহুল সংগ্রাম তথা রেনেসাঁর ইতিহাসে যে গুরুত্বপূর্ণ খেদমত আনজাম দিয়েছেন যদিও তা অনেকাংশে জ্ঞান ও কর্মের নানা শাখা ও দিক জুড়ে রয়েছে তথাপি তা নিম্নোক্ত চার ভাগে ভাগ করা যেতে পারে যা তাঁর সংস্কার ও পুনরুজ্জীবনের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্ব রাখে। গুরুত্বপূর্ণ শাখা চারটি এই ঃ

১. তওহীদী 'আকীদার পুনরুজ্জীবন ও শির্কমূলক 'আকীদা ও আচার-অনুষ্ঠানসমূহ বাতিলকরণ;

২. দর্শন, যুক্তিশাস্ত্র ও 'ইল্‌মে কালাম-এর সমালোচনা ও কুরআন ও সুন্নাহ্‌র রীতি-পদ্ধতি ও পন্থাসমূহকে অগ্রাধিকার প্রদান;

৩. অমুসলিম জাতিগোষ্ঠী ও বিভিন্ন ফের্কার প্রত্যাখ্যান এবং তাদের 'আকীদা-বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান ও সমূহ প্রভাবের মুকাবিলা;

৪. 'ইল্‌মে শরীয়তের পুনরুজ্জীবন ও ইসলামী চিন্তা-চেতনার উন্মেষ ঘটানো।

অমুসলিম ও অনারব জাতিগোষ্ঠীর সংস্রব ও পারস্পরিক মেলামেশা, ইসমাঈলী শী'আ ও বাতেনী হুকূমতের প্রভাব-প্রতিপত্তি, অধিকন্তু জাহিলী ও পথভ্রষ্ট সূফীদের শিক্ষা ও কর্মের ফলে সাধারণ মুসলমানদের ভেতর শির্কমূলক 'আকীদা-বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান ও রীতিনীতির প্রচলন হতে চলছিল। বহু মুসলমান নিজেদের ধর্মীয় নেতা, তরীকতের মাশাইখ ও পুণ্যাত্মা আওলিয়া-ই কিরাম সম্পর্কে এমন সব অতিরঞ্জিত ও শির্কমূলক ধারণা ও 'আকীদা-বিশ্বাস পোষণ করতে শুরু করেছিল যা ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানগণ হযরত 'উযায়র ও 'ঈসা

মসীহ (আ) এবং স্ব স্ব সম্প্রদায়ের সাধু-দরবেশ ও মঠের পাদ্রী-সন্ন্যাসীদের সম্পর্কে পোষণ করত। বুযুর্গানে দীনের মাযারে যা কিছু শুরু হয়েছিল তা ছিল সে সব কাজকর্ম ও আচার-অনুষ্ঠানের সফল অনুকরণ যেগুলো অমুসলিম জাতি-গোষ্ঠীর উপাসনালয়ে এবং তাদের সাধু ব্যক্তিদের কবরের উপর অনুষ্ঠিত হ'ত। কবরবাসীদের নিকট পরিষ্কারভাবে আশ্রয় ও সাহায্য প্রার্থনার মত ব্যাপার শুরু হয়েছিল। তাদের নিকট ফরিয়াদ জানানো, দোহাই দেওয়া, চাওয়া ও দু'আ করার রেওয়াজ চালু হয়ে গিয়েছিল। তাদের কবরের ওপর বড় বড় মসজিদ নির্মাণ এবং স্বয়ং কবরগুলোকেই সিজদাগাহ বানানো, সেগুলোর ওপর প্রতি বছর মেলা বসান এবং দূর-দূরান্তর থেকে সফর করে সেখানে আসা সাধারণ নিয়মে পরিণত হয়েছিল। হি. সপ্তম শতাব্দীর শেষে এর বাড়াবাড়ি এবং 'আকীদা ও 'আমলের বিপর্যয় ও বিকৃতি যে পর্যায়ে গিয়ে পৌছেছিল তার কিছুটা পরিমাপ নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি থেকে করা যাবে যা স্বয়ং শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র রচনাবলী থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। এসব উদ্ধৃতাংশে তিনি কারুর প্রশ্নের জওয়াব দিতে গিয়ে অথবা কোন আলোচনার প্রেক্ষিতে স্বীয় যুগের কোন কোন গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতার উল্লেখ করেছেন এবং এ থেকে তাঁর যুগের ধর্মীয় অধঃপতন ও ইসলামের হৃৎপিণ্ডের ওপর জাহেলিয়াতের হামলা কতটা তীব্র ছিল তার কিছুটা পরিমাপ করা যাবে।

> বহু লোক মৃত ব্যক্তিকে একেবারেই খোদার মর্যাদায় এবং সেই যিন্দা পীর, যে তার কবরের খাদেম অথবা তার স্থলাভিষিক্ত, পয়গম্বরের আসনে বসিয়েছে। তারা মৃত ব্যক্তির কাছে নিজেদের মনোবাঞ্ছা পূরণ এবং বিপদ-আপদ দূরীকরণের নিমিত্ত দাবী-দাওয়া পেশ করে। তারা তাদের সেই যিন্দাপীর অথবা বুযুর্গকে এতটা মর্যাদা দিয়ে রেখেছে যে, সেই পীর বা বুযুর্গ যে বস্তু হালাল করবেন তাই হালাল এবং যে জিনিষকে হারাম করবেন তাই হারাম জানবে। তারা তাদের হিসাব থেকে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্র খোদায়ীর পদ এবং মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামকে নবূওতের আসন থেকে অপসারিত করে দিয়েছে। আকছার এমনও হয় যে, কোন নও মুসলিম অথবা তার অনুসারী ভক্তিবশত সেখানে আসে এবং সাহেব-এ মাযার (মাযারের অধিবাসী)-এর নিকট কোন বাদশাহ্র জুলুম অবসান অথবা অপর কোন মকসূদ পূরণের জন্য দু'আ করে তখন এই সব খাদেম (মাযারের) ভেতরে ঢোকে এবং ফিরে এসে বলে, আমি হযরতের কাছে আপনার মকসূদ আরয করে দিয়েছি এবং হযরত সাহেব পয়গম্বর (সা) সাহেবকে বলে দিয়েছেন, পয়গম্বর সাহেব আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে তা পৌছিয়েছেন। (এরপর) আল্লাহ্ তা'আলা অমুক বাদশাহ্র নিকট তাঁর

নিজের দূত পাঠিয়ে দিয়েছেন, খবরদার! অমুক লোকের ওপর যেন কোন বাড়াবাড়ি কিংবা জুলুম না হয়। এটা কি খোলাখুলি মুশরিক ও খ্রিস্টানদের ধর্ম নয়? এতে তো ভুল বর্ণনা এবং সুস্পষ্ট মূর্খতা রয়েছে যে, একজন মুশরিক ও একজন খ্রিস্টানও যা সইতে পারবে না এবং তারাও এই ধোঁকায় প্রবেশ করতে চাইবে না। এই সমস্ত খাদেম যে রকম অবলীলায় মাযারে আসা মানত ও নযর-নেয়ায এবং ঐ সব মাযারে প্রদত্ত দ্রব্যসামগ্রী খেয়ে ও ভোগ করে থাকে তাতে কুরআন মজীদের এই আয়াতের পূর্ণ ব্যাখ্যা ও চিত্র পাওয়া যাবে ঃ

يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان ليأكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله -

হে মু'মিনগণ! (ইয়াহূদী) পণ্ডিত ও (খ্রিস্টান) সংসার বিরাগীদের ভেতর অনেকে লোকের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করে থাকে এবং মানুষকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে। [সূরা তওবা ঃ আয়াত-৩৪]

প্রকাশ্য কবর পূজা

এই সব মূর্খের ভেতর অনেকে পরিষ্কার কবরের দিকে মুখ করে নামায পড়ে। কোন কোন লোককে এভাবে দু'আ করতে শোনা গেছে ঃ "হযরত! আমার গোনাহ-খাতা মাফ করে দিন, আমার ওপর রহম করুন, দয়া করুন।" কতক লোক কবরকে সামনে করে ও কা'বা শরীফের দিকে পিঠ ফিরিয়ে নামায পড়ে এবং বলে, কবর হচ্ছে বিশিষ্ট লোকদের কিবলা এবং কা'বা হচ্ছে সাধারণ মানুষের (কিবলা)। এও ঐ সব লোকেরই উক্তি। 'ইবাদত-বন্দেগী ও যুহ্‌দ-এর ক্ষেত্রে বিশিষ্ট যিনি এবং যার শত সহস্র মুরীদ মু'তাকিদ তথা ভক্ত ও অনুরক্ত রয়েছে এবং এটাও সম্ভব, তিনি স্বীয় শায়খ-এর অনুসারীদের ভেতর সর্বোত্তম ব্যক্তি সেই লোকই তার শায়খ সম্পর্কে একথা বলেছেন। এমন কোন কোন বুযুর্গও রয়েছেন যিনি বিরাট রিয়াযত ও মুজাহাদা করেন। যখন মুরীদ তার হাতে হাত দিয়ে তওবা করে তখন তিনি সর্বাগ্রে তাকে হেদায়েত করে থাকেন সর্বাগ্রে তার শায়খ (পীর)-এর কবর (মাযার)-এ গিয়ে চিল্লাকাশী[১] করতে যেমনটি মূর্তি পূজারীরা তাদের স্ব স্ব মূর্তির নিকট আসর জমিয়ে বসে থাকে। এই সব কবরপূজারীদের ভেতর অনেক লোকের ঐ সব কবর পূজায় এমনভাবে

১. চল্লিশ দিন যাবত সংসারের ঝামেলামুক্ত হয়ে একাগ্র চিত্তে আল্লাহ্‌র যিক্‌র, তসবীহ-তাহলীল ও ইবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত থাকাকে চিল্লাকাশী বলা হয়। -অনুবাদক।

চোখের পানি আসে, ভক্তিমিশ্রিত বিনয় ভাব ফুটে ওঠে, দু'আ অবস্থা ও হুযূর-ই-কাল্‌ব (একাগ্রচিত্ততা) হাসিল হয় যা তাদের মসজিদে হাসিল হয় না। যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

فی بیوت اذن الله ان ترفع ویذ کرفیهااسمه -

সেসব ঘরে (মসজিদে) যেগুলো সমুন্নত করা এবং সেগুলোতে তাঁর নাম স্মরণ করা আল্লাহর নির্দেশ। [সূরা আন-নূর ঃ আয়াত-৩৬]

আল্লাহ্‌কে ভয় নেই, মাযারবাসীকে ভয়

এসব লোকের 'আকীদা-বিশ্বাস এবং কবর ও মাযারের সাথে সম্পর্ক এত বেশী যে, তারা অবলীলায় গোনাহ্ কবীরা ও নিষিদ্ধ কর্মে লিপ্ত হয়ে থাকে (তাদের মনে এতটুকু সংকোচ স্পর্শ করে না)। কিন্তু তারা যখন কোন মাযারের গম্বুজ কিংবা কলস দেখতে পায় অমনি থেমে পড়ে। একে অপরকে বলে, "খবরদার! মাযারের গম্বুজের কলস দেখা যাচ্ছে" (অতএব আর নয়)। তারা সেই কলসের নীচে শায়িত লোকটির কথা তো মনে করে, ভয় করে, তার থেকে বিপদাশংকাও করে; কিন্তু সেই আল্লাহ্‌র কথা এতটুকু মনে রাখে না, তাঁর নির্দেশের এতটুকু পরওয়া করে না যিনি আসমান যমীনের স্রষ্টা, যাঁর হুকুমে চাঁদের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। তাদের ধারণা, যদি কেউ তাদের সঙ্গে আলোচনায় কিংবা তর্কে প্রবৃত্ত হয় তাহলে স্বীয় প্রতিপক্ষকে ঐ সব বুযুর্গের প্রভাব ও ক্ষমতার কথা বলে ভয় দেখায় যেমন করে মুশরিকেরা হযরত ইবরাহীম 'আলায়হি'স-সালামকে ভয় দেখিয়েছে। কুরআন শরীফে উল্লিখিত হয়েছে ঃ

وحاجه قومه قال اتحاجونی فی الله وقد هدان ولا اخاف ما تشرکون به الا ان یشاء ربی شیئا وسع ربی کل شییء علما - افلا تتذکرون - وکیف اخاف ماشرکتم ولاتخافون انکم اشرکتم بالله مالم ینزل به علیکم سلطانا - فای الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون - الذین امنو ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون -

তার সম্প্রদায় তার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হল। সে বলল ঃ তোমরা কি আল্লাহ্ সম্বন্ধে আমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হবে? তিনি তো আমাকে সৎ পথে পরিচালিত করেছেন। আমার প্রতিপালক অন্যবিধ ইচ্ছা না করলে তোমরা যাকে তাঁর শরীক কর তাকে আমি ভয় করি না, সব কিছুই আমার প্রতিপালকের জ্ঞানায়ত্ত; তবে কি তোমরা অবধান করবে না? তোমরা যাকে

আল্লাহ্‌র শরীক কর আমি কিরূপে তাকে ভয় করব? অথচ তোমরা আল্লাহ্‌র শরীক করতে ভয় কর না যে বিষয়ে তিনি তোমাদেরকে কোন সনদ দেন নি; সুতরাং যদি তোমরা জান তবে বল, দুই দলের ভেতর কোন দল নিরাপত্তা লাভের অধিকারী? যারা ঈমান এনেছে এবং জুলুম (শির্ক) দ্বারা তাদের ঈমানকে কলুষিত করে নি, নিরাপত্তা তাদেরই জন্য এবং তারাই সৎ পথপ্রাপ্ত।[১]

আল্লাহ ও আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও হেয় জ্ঞান করা

এই সব কবর ও মাযারপূজারী তওহীদ ও এক আল্লাহ্‌র ইবাদতে ঠাট্টা-মস্করা করে এবং আল্লাহ্‌কে পরিত্যাগ করে তাদেরকে ভক্তি-সম্মান করে যাদেরকে তারা নিজেদের সুপারিশকারী ও কর্মনিয়ন্তা বানিয়ে রেখেছে। এদের অনেকেই বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জ, যিয়ারত ও হাজ্জীদেরকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে এবং বিশ্বাস করে যে, তাদের ইমাম ও পীর-বুযুর্গের যিয়ারত বায়তুল্লাহ্ শরীফের হজ্জের চেয়ে উত্তম। এ ধরনের 'আকীদা-বিশ্বাস শী'আ ও অনেক সুন্নী নামে কথিত লোকের ভেতরও পাওয়া যায়। কিছু লোক মসজিদ ও পাঞ্জেগানা সালাত আদায়কে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে এবং বিশ্বাস করে যে, এর চেয়ে তাদের পীরের দু'আ উত্তম ও অনেক মরতবাপূর্ণ। এ জাতীয় 'আকীদা ঐ সব শী'আর ভেতর অদ্যাবধি বর্তমান যারা য়ূনুস কায়সীর সাথে নিজেদেরকে সম্পর্কিত করেছে। তাদের গাওয়া নিম্নোদ্ধৃত গান থেকে এর পরিমাপ করা যাবে ঃ

تعالوا نخرب الجامع - ونجعل فيه خماره -
ونكسر المنبر - ونجعل منه طنباره -
ونخرق المصحف - ونجعل منه زماره -
وننتف لحية القاضى - ونجعل منه اوتاره -

এস, আমরা মসজিদ ধ্বংস ও বিরান করি এবং সেখানে আমরা মদের দোকান খুলি; (মসজিদের) মিম্বর ভেঙে এস আমরা তা দিয়ে বাদ্যযন্ত্র তৈরি করি; কুরআন ছিঁড়ে ফেলে তা দিয়ে বাঁশী বানাই এবং (শর'ঈ আদালতের বিচারক) কাযীর দাড়ি উপড়ে এর দ্বারা তাঁত বুনি।

মুশরিক কাফিরদের দুঃসাহস ও ধৃষ্টতা প্রদর্শন

তাদের দুঃসাহসের অবস্থা এমন যে, তারা অবলীলায় মিথ্যা কসম খায়, কিন্তু তারা পীরের নামে মিথ্যা কসম খায় না। তাদের ভেতর কেউ কেউ বলে, যে রিযিক আমার পীরের পক্ষ থেকে মিলবে না আমার জন্য তা কবুল

১. সূরা আনআম; ৮১-৮৩ আয়াত।

নয়। তাদের ভেতর কেউ কেউ বকরী যবেহ করে এবং বলে ঃ আমি আমার আকা (প্রভু)-র নামে যবেহ্ করছি। কেউ কেউ তো পরিষ্কার ভাষায় বলে, তাদের শায়খ (পীর) নবী-রসূলদের থেকেও অতি উত্তম ছিলেন। তাদের কেউ কেউ তাদের (পীরদের) সম্পর্কে উলূহিয়াত (ঈশ্বরত্ব, খোদায়িত্ব)-এর আকীদা পোষণ করে যেমনটি খ্রিস্টানগণ হযরত ঈসা মসীহ (আ) সম্পর্কে বিশ্বাস পোষণ করে। যখন তারা তাদের পীরের কথা আলোচনা করে তখন অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধার সঙ্গে করে এবং তাদের উলূহিয়াতের দাবী করে। তারা তাদের বুযুর্গদের প্রতি বিরাট বিরাট কবিতা রচনা করে রেখেছে যে সব কবিতার ভেতর স্পষ্ট খোদায়ী দাবী রয়েছে, রয়েছে বিরাট বিরাট সব "লান তারানী"*। কেউ বলে, মূসা (আ) তূর পর্বতে আমারই সাথে কথা বলেছিলেন এবং আমারই 'তাজাল্লী' দেখে বেহুশ হয়ে গিয়েছিলেন। কেউ কেউ বলে, 'আরশের ওপর আমিই চীৎকার মেরেছিলাম যাতে সারা বিশ্বে হৈ চৈ পড়ে গিয়েছিল এবং সাত সমুদ্র আমারই ভয়ে সারাক্ষণ উদ্বেলিত ও ঊর্মিমুখর।[১]

বুযুর্গদের সম্পর্কে উলূহিয়াতের 'আকীদা

অনেক মূর্খ জাহিল ও মুশরিক পয়গম্বর ও বুযুর্গানে দীন সম্পর্কে এই 'আকীদা পোষণ করে যে, তাঁরাই (পীর-পয়গম্বরগণই) দুনিয়ার তাবৎ ব্যবস্থাপনা আনজাম দিয়ে থাকেন। জীবের জন্ম ও আহার্যের প্রয়োজন তাঁরাই মিটিয়ে থাকেন এবং বিপদ-আপদ দূর করা তাঁদেরই কাজ। মুসলমানদের 'আকীদা এ কখনো হতে পারে না, অথচ খ্রিস্টানরাও এ জাতীয় 'আকীদা কেবল হযরত ঈসা মসীহ (আ)-এর ক্ষেত্রেই পোষণ করে থাকে। কেননা তারা 'ইত্তিহাদ' ও 'হুলূল'* আকীদায় বিশ্বাসী। এর ভিত্তিতে হযরত ইবরাহীম, মূসা ও অপরাপর আম্বিয়া 'আলায়হিমু'স-সালাম সম্পর্কেও এ জাতীয় 'আকীদা তারা পোষণ করে না। প্রথম শ্রেণীর মূর্খ ও জাহিল হওয়া সত্ত্বেও না।[২]

অনেক লোকের বিশ্বাস, যে শহরে কিংবা যে বস্তীতে কোন পীর বা বুযুর্গের মাযার থাকে সেই পীর বা বুযুর্গেরই বদৌলতে ও বরকতে উল্লিখিত শহর ও বস্তীর লোকেরা রিযিক পেয়ে থাকে। এছাড়া দুঃখ-কষ্টে সাহায্য-সহানুভূতি

---

১. আর-রাদ্দু 'আলা'ল-বাকরী, ৩৫১ পৃ.।

* পরশিষ্ট দেখুন। *

পরিশিষ্ট দেখুন।

২. আর-রাদ্দু 'আলা'ল-বাকরী, ৩২৮ পৃ.।

ও শত্রুর হাত থেকে নিরাপত্তা লাভ ঘটে, দেশ হেফাজতে থাকে। যে লোক সম্পর্কে তাদের এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হয় তার সম্পর্কে তারা বলে, তিনি অমুক শহরের রক্ষক। উদাহরণস্বরূপ তারা বলে থাকে, সায়্যিদা নফীসা মিসর ও কায়রোর রক্ষক, অমুক অমুক বুযুর্গ দামিশক প্রভৃতি শহরের মুহাফিজ আর অমুক অমুক বাগদাদ প্রভৃতি শহরের পাহারাদার। তাদের বিশ্বাস, ঐ সব পুণ্যাত্মা বুযুর্গ ও পীর-পয়গম্বরদের কবরের বরকতেই উল্লিখিত শহর ও বস্তীগুলোর বালা-মুসীবত দূরীভূত হয়ে থাকে।[১]

তাদের অবস্থা এই, যখন দুশমন দামিশক অভিমুখে ধাবিত হল তখন এই সব কবর পূজারীর দল পীর-বুযুর্গদের কাছে ধরনা দেবার উদ্দেশ্যে তাদের কবর ও মাযারগুলোর পানে রওয়ানা হল। তাদের প্রত্যাশা ছিল, এই সব পীর-বুযুর্গ তাদের বিপদ প্রতিরোধে সক্ষম। কোন কবি বলেছেন ঃ

یاخائفین من التتر - لوذو بقبر ابی عمر -

ওহে তাতারদের আক্রমণাশংকায় ভীত-সন্ত্রস্ত ব্যক্তিবর্গ! আবূ ওমরের কবরের আশ্রয়ে এস (তাহলে বাঁচবে)। অপরজন বলেন ঃ

عوذوا بقبرابی عمر - ینجیکم من الضرر -

আবূ ওমরের কবরের আশ্রয় নাও; তিনি তোমাদেরকে সকল প্রকার জ্বালা-যন্ত্রণা ও দুঃখ-কষ্টের হাত থেকে মুক্তি দেবেন।[২]

মাশহাদ[৩]-এর ফেতনা

এই পীর পূজা তথা আওলিয়া-পরস্তী ও কবর (পীর-বুযুর্গদের কবরগুলো সাধারণত মাযার নামেই খ্যাত।—অনুবাদক) পূজার স্বাভাবিক ও অনিবার্য পরিণতিই হল, মসজিদের মুকাবিলায় "মাশহাদ"-এর গুরুত্ব বাড়বে এবং তা সকলের যিয়ারতগাহ, সাধারণ মানুষ ও অজ্ঞ লোকদের হাজত পূরণের কিবলায় পরিণত হবে। অনন্তর মুসলিম জাহানের কোণে কোণে মাশহাদ ও মাযার ব্যাঙের ছাতার মতই গজিয়ে উঠল। হাজার নয়, লাখো লাখো আসল ও নকল কবর রচিত হল। আমীর-উমারা তথা ক্ষমতাসীন শাসকবর্গ অত্যন্ত উদার ও অকৃপণভাবে এবং অত্যন্ত উৎসাহের সাথে এসব রাতের আঁধারে গজিয়ে ওঠা মাশহাদ ও মাযারের নামে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করলেন। এসব মাযার ও বুযুর্গদের জায়গায় গড়ে উঠল আকাশচুম্বী প্রাসাদ এবং নির্মিত হলো

১. আর-রাদ্দু 'আলা'ল-আখনাঈ, ৮২ পৃ.।

২. আর-রাদ্দু 'আলা'ল-বাকরী, ২৭৭-৮ পৃ.।

৩. পরিশিষ্ট দেখুন।

রৌপ্যমণ্ডিত গম্বুজ। পাণ্ডা, ঝাড়ুদার ও খাদেমদের একটি স্থায়ী গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হল। ধুমধাম ও বিরাট জাঁকজমকের সঙ্গে পীর-বুযুর্গদের এসব মাযার সফরের রেওয়াজ দেখা দিল এবং বিরাট বিরাট কাফেলা দূর-দূরান্তের এলাকা থেকে এভাবে সফর করে যেতে থাকল যেভাবে হাজীদের কাফেলা হজ্জে যেত। অনেক সময় এসব কাফেলা হজ্জ কাফেলার চেয়েও বিরাট আকৃতি ধারণ করত। মুসলিম জনসাধারণের সাধারণ মনোযোগ মসজিদ থেকে সরে গিয়ে মাশহাদের প্রতি কেন্দ্রীভূত হলো। হি. সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে 'মাযার ও মাশহাদ'সমূহ তাদের দীনী যিন্দেগীতে তথা ধর্মীয় জীবনে কেন্দ্রীয় মর্যাদা লাভ করেছিল এবং সেগুলো বায়তুল্লাহ্ শরীফের প্রতিদ্বন্দ্বী ও প্রতিপক্ষে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। শায়খু'ল ইসলাম ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-এর লিখিত রচনাবলী থেকে জানা যায়, মাশহাদ-এর এই ফেতনা কতখানি মযবুতভাবে আসন গেড়ে বসেছিল এবং মূর্খ জাহিল ও উদ্দেশ্যবাদী মুসলমানদের সম্পর্ক এর সাথে কতখানি ঘনিষ্ঠ হয়ে গিয়েছিল। এই ফেতনা শক্তিশালী ও বিস্তৃত হবার পেছনে ফাতেমী[১] সালতানাতের দূর পাশ্চাত্য হতে শুরু করে মিসর ও সিরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত শতাব্দীব্যাপী আড়ম্বরপূর্ণ হুকুমতের বিরাট ভূমিকা ছিল। তদুপরি রাফেযী ও শী'আ সম্প্রদায়ের সম্পর্ক শুরু থেকেই মসজিদের তুলনায় মাশহাদ এবং "হারামায়ন শারীফায়ন"[২] এর মুকাবিলায় নজফ ও কারবালার সাথে বেশী ছিল। ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র জন্মের পূর্বেই যদিও মিসর ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত ফাতিমী হুকুমত খতম হয়ে গিয়েছিল, তথাপি তার মানসিক ও সভ্যতাগত প্রভাব তখনও অবশিষ্ট ছিল, বিশেষ করে সিরিয়ায় তখনও বিপুল সংখ্যক ইসমা'ঈলী ও অপরাপর শী'আ বর্তমান ছিল যাদের সাহচর্যের প্রভাব সাধারণ ও অজ্ঞ মুসলমানদের ওপর গিয়ে পড়ছিল। অতঃপর ভ্রান্ত কিসিমের তাসাওউফ, যার ভেতর বুযুর্গদের মাযার ও মাশহাদ বিশেষ গুরুত্ব ও পবিত্রতার দাবীদার এবং এসব মাযার ও মাশহাদে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সমাবেশ (ওরস) প্রভৃতির রেওয়াজ এ সবের (মাযার ও মাশহাদের) রওনক আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল এবং এখন তা শির্ক ও বিদ'আতের বিরাট আড্ডায় পরিণত হয়েছিল। ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) ঐসব মাযার ও মাশহাদ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে লেখেন ঃ

মাযার ও মাশহাদ-এর হজ্জ

> কিছু লোক আছে যারা কবরগুলোর হজ্জ করে। কিছু লোক এসব সফরের আদব ও হুকুম-আহকামের ওপর কিতাব পর্যন্ত লিখেছে যার নাম রেখেছে তারা "মনাসিক হাজ্জ আল-মাশাহিদ" (مناسك حج المشاهد)।

---

১. সাধারণভাবে ফাতেমী সালতানাত নামে মশহুর। মূলত এটি উবায়দী হুকুমত ছিল। দ্র. ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রপথিক, ১ম খণ্ড, ২৯০ পৃ.।

২. মক্কা ও মদীনা শরীফ।

অনন্তর আবূ 'আবদিল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবন নু'মান আল-মুলাক্কাব বি'ল-মুফীদ' নামক একজন শী'আ 'আলিমের উল্লিখিত নামের কিতাব রয়েছে। এতে বহু মাথামুণ্ডুহীন অলীক বর্ণনা আহলে বায়ত-এর নামে পেশ করা হয়েছে। এসব বর্ণনার যে কোন ভিত্তি নেই সে ব্যাপারে তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ অনবহিত নন। কিছু কিছু লোক বিরাট ধুমধামের সাথে ও মহাআড়ম্বর সহকারে পীর-বুযুর্গদের কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে-সফর করে। যদিও তারা একে মানাসিক-এ হজ্জ (হজ্জের আরকান) অথবা হজ্জ বলে না বটে, কিন্তু এতদুভয়ের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। এদের কেউ কেউ কসম খেতে গিয়ে বলে ঃ

وحق النبى الذى تحج اليه المطايا -

তারা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর পানে হজ্জের কথা বলে, কিন্তু বায়তুল্লাহ্ শরীফের পানে হজ্জ করার কথা আলোচনা করে না। কোন কোন হাজীদের হজ্জের পেছনে প্রধান উদ্দেশ্যই থাকে রসূল (সা)-এর কবর মুবারক যিয়ারত, বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জ নয়।[১]

বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জের ওপর প্রাধান্য দান

কিছু কিছু লোক (পীর-বুযুর্গদের) কবর যিয়ারতকে বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জের ওপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে। কোন কোন লোকের এরূপ 'আকীদা রয়েছে যে, যদি অমুক বুযুর্গের কবর দু'তিনবার যিয়ারত করা যায় তাহলে এক হজ্জ হয়ে যাবে। কেউ কেউ কোন কোন বুযুর্গের মাযারকে 'আরাফাত ময়দানের সাথে তুলনা করে থাকে এবং হজ্জ মৌসুমে সেখানে সফরে যায় ও সেখানে উকূফ (অবস্থান) করে থাকে যেরূপ 'আরাফাত প্রান্তরে হাজ্জীগণ অবস্থান করে থাকেন। পূর্ব ও পশ্চিমা দেশগুলোতে এ রকম ঘটনা ঘটে থাকে। কারো কারো 'আকীদায় এই সব পবিত্র স্থান যিয়ারত কিংবা আপনাপন বুযুর্গের কবর যিয়ারতের উদ্দেশে ভ্রমণ হজ্জের সফর অপেক্ষা উত্তম। এক মুরীদ যিনি সাতবার হজ্জ করেছিলেন অপর মুরীদকে বলেন ঃ পীর শায়খ-এর কবর যিয়ারত এই সাত হজ্জের বিনিময়ে বিক্রি করবে? সে তার পীরের সাথে পরামর্শ করল। পীর তাকে এই বলে নিরুৎসাহিত করে, এই ব্যবসায়ে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এদের কাউকে কাউকে একথাও বলতে শোনা গেছে, কেউ সাত বার তার পীরের কবর প্রদক্ষিণ করলে এক হজ্জের সওয়াব পাবে।[২]

---

১. আর-রাদ্দু 'আলা'ল-বাকরী, ২৯৫ পৃ.।

২. আর-রাদ্দু 'আলা'ল-বাকরী, ২৯৭ পৃ.।

মসজিদের জনশূন্যতা, ভগ্ন ও জীর্ণ দশা এবং মাশহাদ (মাযার)-এর জমজমাট ও রমরমা অবস্থা

তাদের অনেকেই মসজিদগুলোকে জনশূন্য, ভগ্নাদশায় ও ধ্বংস-প্রায় অবস্থায় ফেলে রাখে। পক্ষান্তরে মাশহাদ ও মাযারগুলোকে জনবহুল ও জমজমাট রাখে। পাঞ্জেগানা সালাত আদায়ের নিমিত্ত যে সব মসজিদ নির্মিত হয়েছিল তাদের সে সব মসজিদ একেবারেই জনশূন্য ও আলোবিহীন দৃষ্টিগোচর হয়। গরীব মহল্লাবাসী যদি কোনক্রমে ফরাশ কিংবা জায়নামাযের ব্যবস্থা করতে পারল তো করল, নইলে তাও হয় না। দেখে শুনে মনে হয়, এ যেন কোন সরাইখানা যার দেখবার কেউ নেই! এর বিপরীতে মাযার ও মকবরাগুলো দেখুন, উপরে গেলাফ চড়ানো, স্বর্ণ-রৌপ্যের ঝালরমণ্ডিত, মেঝে মর্মর পাথরের মোজাইককৃত, সকাল-সন্ধ্যা দু'বেলাই নযর-নেয়ায আসছে। একি আল্লাহ্ ও তাঁর আয়াতসমূহ এবং তদীয় রাসূল (সা)-এর প্রতি সুস্পষ্ট অবজ্ঞা ও শির্ক-এর প্রতি প্রকাশ্য সম্মান প্রদর্শন নয়? এসব কেন হয়? তাদের বিশ্বাস, মাযারে শায়িত বুযুর্গ ব্যক্তির দু'আ ও তার দোহাই আল্লাহ্র ঘরে গিয়ে আল্লাহ্র নিকট চাওয়া এবং আল্লাহর দোহাই দেবার তুলনায় অধিকতর কার্যকর ও ফলপ্রসু। এজন্য স্বাভাবিকভাবেই আল্লাহ্র ঘরের (মসজিদের) মুকাবিলায় সেই ঘর অগ্রাধিকার লাভ করে যে ঘর বানানো হয় মানবগোষ্ঠীর দু'আর জন্য। যদি মসজিদের জন্যও কোন ওয়াকফ থাকে এবং মাযারের জন্যও কোন ওয়াকফ থাকে, দেখা যাবে মাযারের নামে ওয়াকফ তাদের নিকট অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ এবং মসজিদের তুলনায় পরিমাণে বিরাট অংকের। এক্ষেত্রে তারা 'আরবের মুশরিকদের পদে পদে অনুসরণ করছে যাদের অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক সূরা আন'আম-এ নিম্নোক্ত বর্ণনা দিয়েছেন ঃ

وجعلوالله مما ذرأ من الحرث والانعام نصيبا فقالوا هذالله بزعمهم وهذا لشركائنا - فماكان لشركائهم فلايصل الى الله وما كان لله فهويصل الى شركائهم - ساءمايحكمون -

আল্লাহ্ যে শস্য ও গবাদি পশু সৃষ্টি করেছেন তার ভেতর থেকে তারা আল্লাহ্র জন্য এক অংশ নির্দিষ্ট করে এবং নিজেদের ধারণা অনুযায়ী বলে, 'এটা আল্লাহ্র জন্য এবং এটি আমাদের দেবতাদের জন্য,' যা তাদের

দেবতাদের অংশ তা আল্লাহ্‌র কাছে পৌছায় না এবং যা আল্লাহ্‌র অংশ তা তাদের দেবতাদের কাছে পৌছায়; তারা যা মীমাংসা করে তা নিকৃষ্ট।[১]

ওপরের উদ্ধৃতি থেকে পাঠক পরিমাপ করতে পারবেন, হি. সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে শক্তিশালী মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও এবং যখন ইসলামের বড় বড় ইমাম, শ্রেষ্ঠতম মুহাদ্দিস ও ফকীহ বর্তমান ছিলেন, বিরাট বিরাট মাদরাসা ও জ্ঞানের কেন্দ্র ('ইলমী মারকায) বিদ্যমান ছিল, তথাপি মুসলিম জনসাধারণ কিরূপ মূর্খতাপ্রসূত 'আকীদা ও কার্যকর গোমরাহীতে জড়িত ছিল এবং কোন্ পর্যায়ের শির্কমূলক 'আকীদা ও আমল মুসলিম সমাজ জীবনে সাধারণ মুসলিম মন-মেযাজে আসন গেড়ে বসেছিল। সাধারণ মুসলমান ও অজ্ঞ জাহিলদের কথা বাদ দিলেও বহু 'উলামা ও ফুকাহাও এসব 'আমল-'আকীদা সম্পর্কে বহুবিধ সন্দেহ ও সংশয়ের শিকার ছিল এবং তাদের লেখা ও প্রদত্ত ফতওয়া থেকে অনুমিত হয় যে, শির্ক ও তওহীদ সম্পর্কে তাদের মন-মস্তিষ্কও ততটা পরিষ্কার ও একাগ্র ছিল না যতটা এমন একজনের থাকা উচিত যিনি তওহীদের 'আকীদা সরাসরি কুরআন ও হাদীস থেকে গ্রহণ করেছেন এবং যার সামনে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের সুবর্ণ যুগ ও সাহাবা-ই কিরাম (রা)-এর কল্যাণ ও বরকতময় যমানার নমুনা, বাণী ও কর্ম রয়েছে। এই শ্রেণীটির চিন্তাধারার পরিমাপ, যারা নিজেদের যুগ-যমানার প্রচলিত প্রথা ও প্রাচীন অভ্যাসমূহ দ্বারা প্রভাবিত ছিল, ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র সমসাময়িক শায়খ 'আলী ইবন ইয়া'কূব আল-বাকরী ও আল-আখনাঈর সে সব রচনা থেকে করা যাবে যার প্রত্যাখ্যানে ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) দু'টি বিস্তৃত গ্রন্থ লেখেন।[২] যে গ্রন্থ থেকে ইতিপূর্বে উদ্ধৃতি পেশ করা হয়েছে।

---

১. সূরা আন'আম, ১৩৬ আয়াত; আয়্যামে জাহিলিয়াতে মুশরিকদের নির্বুদ্ধিতা ও আল্লাহ তা'আলার প্রতি ধৃষ্টতাপূর্ণ কাজের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। তারা উৎপন্ন ফসল বা গবাদি পশু আল্লাহ্ ও দেবতাদের জন্য উৎসর্গ করত। ভাল বস্তু দেবতাদের ভাগে দিত, অধিকন্তু আল্লাহ্‌র ভাগ থেকে দেবতাদের ভাগে মিশিয়ে দিত এই বলে যে, আল্লাহ্ মুখাপেক্ষী নন, তাঁর প্রয়োজন নেই; দেবতারা মুখাপেক্ষী, তাদের প্রয়োজন রয়েছে। অথচ তারা এটুকু বুঝতে চেষ্টা করত না যে, মুখাপেক্ষী দেবতা কিরূপে মা'বূদ হতে পারে!

২. تلخيص كتاب الاستغاثه المعروف بالرد على البكرى - مطبعة سلفيه مصر سنة ١٣٤٦ هـ اور كتاب الرد على الاخنائى واستحباب زيارة خير البرية الزيارة الشرعية - ايضا مطبعه سلفيه سنة ١٣٤٦هـ

শেষোক্ত গ্রন্থটি প্রথমোক্ত গ্রন্থের হাশিয়ায় লিখিত।

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র সংস্কার কর্ম এবং শির্কমূলক 'আকীদার প্রত্যাখ্যান ও বিরোধিতা

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) ঐ সব শির্কমূলক কর্মকাণ্ড ও রীতিনীতির বিরুদ্ধে জিহাদী ও পুনর্জাগরণের পতাকা তুলে ধরেন এবং সাধারণ মানুষের সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি, অধিকন্তু বিশিষ্ট ও সাধারণ নির্বিশেষে সকলের রোষ ও ভর্ৎসনার দিকে একেবারেই ভ্রূক্ষেপ না করে তিনি প্রচলিত কর্মকাণ্ড, রীতিনীতি, শির্কমূলক 'আকীদা ও ধ্যান-ধারণা প্রত্যাখ্যান করেন এবং ঐসব 'আকীদা ও কল্পিত ধ্যান-ধারণার ওপর কুঠারাঘাত করেন যা ছিল শির্কমূলক কর্মরীতির বুনিয়াদ।

ঐসব মাযারে জনতার ভিড় ও শির্কমূলক কর্মকাণ্ড ও রীতিনীতির সবচেয়ে বড় কারণ ছিল, জনসাধারণ ঐসব মাযারবাসীর নিকট নিজ নিজ মকসূদ হাসিল ও উদ্দেশ্য পূরণের নিমিত্ত দু'আ করত, তাদের নামে দোহাই দিত, তাদের আশ্রয় প্রার্থনা করত। ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) তাঁর রচনায় পরিষ্কারভাবে লিখেন, আল্লাহ্ ভিন্ন অপর কারোর নিকট দু'আ আদৌ জায়েয নয় এবং এটি সুস্পষ্ট শির্ক যা মুসলমানদের অজ্ঞতা ও অমুসলিম জাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে মেলামেশার দ্বারা মুসলমানদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে। আর-রাদ্দু 'আলা'ল-বাকরী গ্রন্থে তিনি বলেন ঃ

গায়রুল্লাহ্‌র নিকট দু'আ ও সাহায্য কামনার প্রতি নিষেধাজ্ঞা

রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর শিক্ষামালা অধ্যয়ন করা এবং তা ভালভাবে উপলব্ধির পর নিশ্চিত ও অকাট্যভাবেই জানা যায়, তিনি তাঁর উম্মতকে কোন মৃত পয়গম্বর কিংবা পুণ্যবান লোকের কাছে দু'আ করবার অনুমতি দেন নি, না ফরিয়াদ জ্ঞাপন হিসাবে, আর না সাহায্য কামনা হিসাবে আর না উপকার পাবার আশায়। ঠিক তেমনি তাঁর উম্মতের পক্ষে কোন মৃতের কিংবা জীবিত ব্যক্তির সামনে সিজদাবনত হওয়া কিংবা জীবিত কিংবা মৃতকে সিজদা করা জায়েয নয় এবং যে সব 'আমল ইবাদতের শামিল (জীবিত কিংবা মৃতের সামনে অনুমোদিত নয়) তেমন কিছু। আমরা বেশ ভালই জানি যে, তিনি ঐসব বিষয়কে নিষেধ করছেন এবং এগুলো সেসব শির্ক-এর অন্তর্গত, আল্লাহ্ পাক ও তদীয় রসূল (সা) যেগুলোকে হারাম বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু যেহেতু বিগত যমানাগুলোতে অজ্ঞতা ও মূর্খতা ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছিল এবং নবূওতের শিক্ষা ও রিসালতের চিহ্নাদি সম্পর্কে জানাশোনা খুবই কম ছিল, সেজন্য বহু 'উলামা' ততক্ষণ পর্যন্ত ঐ সব অজ্ঞ মূর্খদেরকে কাফির বলতে

সতর্কতা অবলম্বন করেছেন যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদের সামনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের শিক্ষা এবং দীন সম্পর্কিত বিধি-বিধান স্পষ্ট প্রতিভাত হয়েছে।[১]

অন্য একবার তিনি লিখছেন ঃ

মৃতের নিকট স্বীয় প্রয়োজনীয় জিনিস চাওয়া অথবা তার নিকট ফরিয়াদ জানানো প্রচলিত রীতি হিসাবে অনেক জায়গায় দেখতে পাওয়া যায়। শরীয়তে মুহাম্মদীর সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। প্রকৃতপক্ষে এটি এক প্রকার মূর্তিপূজা। এজন্যই ঐ সব দু'আকারীর সামনে কখনো কখনো শয়তান মাযারে শায়িত বুযুর্গের বেশে অথবা কোন অদৃশ্য বস্তুর আকৃতিতে এসে থাকে। অনেক সময় মূর্তিপূজকদের ক্ষেত্রেও এমনটি ঘটতে দেখা যায়, বরং ঘটনা এই যে, যেমনটি হযরত ইবনে 'আব্বাস (রা) বলেন ঃ মূর্তিপূজার সূচনা কবর থেকেই হয়েছে।[২]

আরও একবার তিনি বলেন ঃ

কোন মৃতের কিংবা অদৃশ্য ব্যক্তির নিকট কিছু চওয়া, চাই তিনি পয়গম্বরই হোন অথবা না-ই হোন, এমন 'আমলের অন্তর্গত যা হারাম। এই ব্যাপারে মুসলিম ইমামগণ একমত। আল্লাহ্ এবং তদীয় রসূল (সা) এ বিষয়ে যেমন আদেশ করেন নি, তেমনি সাহাবায়ে কিরাম (রা) ও তাবি'ঈদের কেউই এমনটি করেন নি এবং মুসলিম ইমামগণের কেউ তা পছন্দও করেন নি। যে দীন এ মুহূর্তে আমাদের সামনে ও সংরক্ষিত আকারে চলে আসছে তা থেকে সুস্পষ্টভাবে একথা প্রমাণিত হয় যে, ইসলামের সর্বোত্তম ও সোনালী যুগে আদৌ এর কোন প্রচলন ছিল না। কোন লোক মুশকিলে কিংবা বিপদে-আপদে পড়লে কিংবা কারোর কোন প্রয়োজন দেখা দিলে কেউ অতীত কালের কোন বুযুর্গ কিংবা পয়গম্বরের নাম ধরে ধরে একথা বলত না, ياسيدى فلان انا فى حسبك (হুযূরে ওয়ালা! আমি আপনার আশ্রিত)। আমি আপনার গিলাফ ধরেছি অথবা ওহে বাবা বুযুর্গ! আমার জরুরত আপনি মিটিয়ে দিন, পূরণ করে দিন আমার সকল জরুরী হাজত, যেমনটি সে যুগের কোন কোন মুশরিক তাদের এমন সব সাধু পুরুষের নাম ধরে বলত যারা হয় মারা গেছে অথবা সেখানে বর্তমান নেই। অন্য কোথা থেকেও একথা প্রমাণিত হয় না যে, কোন সাহাবী আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর ইনতিকালের পর তাঁর অথবা অন্য কোন

---

১. আর-রাদ্দু 'আলা'ল-বাকরী, ৩৩৭ পৃ.।

১. ঐ, ৫৬ পৃ.।

পয়গম্বরের রওযা মুবারকের পাশে গিয়ে কিংবা দূরে থেকে তাঁর কিংবা তাঁদের দোহাই দিয়েছেন। সাহাবা-ই কিরাম (রা)-এর সাথে কাফির মুশরিকদের বড় বড় যুদ্ধ হয়েছে, বহু বার তাঁদের শত্রুদের বিরুদ্ধে দৌড়াতে হয়েছে, ভীষণ সংঘর্ষ হয়েছে, মাঝে মাঝে মারাত্মক সংকটজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। এতদ্‌সত্ত্বেও তাঁরা কখনো না কোন নবীর দোহাই দিয়েছেন, আর না নবী ভিন্ন অপর কারোর দোহাই পেড়েছেন, না আল্লাহ্‌র কোন সৃষ্ট জীবের কসম খেয়েছেন, না কোন আম্বিয়া (আ) কিংবা গায়র আম্বিয়ার কবরে দু'আর জন্য গেছেন, আর না নামায পড়বার জন্যই গিয়েছেন। ইমাম মালিক (র) ও কতক 'উলামা তো এতটুকুও পছন্দ করেন নি যে, কোন লোক রওযা মুবারকের পাশে গিয়ে নিজের জন্যই দু'আ করবে। তাঁরা পরিষ্কার বলেছেন যে, এটি এমন এক বিদ'আত যার নজীর সাহাবায়ে কিরাম (রা) ও তাবি'ঈদের যুগে মেলে না।[১]

তিনি তাঁর বিখ্যাত 'আত-তাওয়াসসুল ওয়া'ল-ওয়াসীলা' নামক গ্রন্থে লিখছেন ঃ

ফেরেশতাকুল ও আম্বিয়া 'আলায়হিমু'স-সালামের নিকট তাঁদের ইনতিকালের পর অথবা তাঁদের অবর্তমানে দু'আ করা, তাঁদের কাছে চাওয়া, তাঁদের দোহাই দেওয়া, তাঁদের নিকট কিংবা তাঁদের প্রতিকৃতির নিকট সুপারিশ কামনা এমন একটি নতুন দীন (ধর্ম) আল্লাহ্ পাক যা আমাদের জন্য শরীয়ত হিসাবে অনুমোদন দেন নি, আর এ দীনসহ কোন নবীকেও পাঠান নি এবং এর সমর্থনে কোন আসমানী কিতাবও নাযিল করেন নি।[২]

গায়রুল্লাহ্‌র নিকট দু'আ হারাম হবার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য

উক্ত গ্রন্থের এক জায়গায় তিনি এই হারামের তাৎপর্য বয়ান করতে গিয়ে লিখছেন ঃ

ফেরেশতাকুল আমাদের জন্য দু'আ ও ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে, একথা বলা সত্ত্বেও আমাদেরকে ফেরেশতাদের নিকট দু'আ করতে আল্লাহ্ পাক নিষেধ করেছেন। তেমনি আম্বিয়া-ই-কিরাম (আ), নেককার ও সালিহ্ বান্দাহগণ যদিও তাঁদের কবরে জীবিত, যেমন কোন কোন আলামত (اثار) থেকে এতে জানা যায় যে, তারা জীবিত মানুষদের জন্য দু'আও করেন, কিন্তু কারোরই স্বয়ং তাদের নিকট দু'আ করা জায়েয নয় এবং সলফে সালিহীন তথা প্রাচীন বুযুর্গদের থেকেও এমনতরো বর্ণনা পাওয়া যায় না। কেননা এ

১. আর-রাদ্দু আলা'ল-বাকরী, ২৩৪ পৃ.।

২. قاعده جليله فى التوسل والوسيله ১৫ পৃ.।

জাতীয় কর্মের মাধ্যমে শির্ক-এর রাস্তা খুলে যায় এবং তাঁদের পূজা শুরু হয়। এর বিপরীতে তাঁদের জীবদ্দশায় তাঁদের নিকট কিছু চাওয়া হলে কিংবা প্রার্থনা পেশ করলে তা শির্ক পর্যন্ত পৌঁছায় না। দ্বিতীয় বিষয় হলো, ফেরেশতাকুল, আম্বিয়া-ই-কিরাম ও পুণ্যবান লোকেরা তাঁদের ইনতিকালের পর জীবিত লোকদের জন্য যা কিছু দু'আ ও ক্ষমা প্রার্থনা করেন তা একটি আল্লাহ্ কর্তৃক সৃজন নির্ধারিত (تكويني) ব্যাপার যার ভেতর অপরের প্রার্থনা ও দু'আর কোন ভূমিকা নেই। এর বিপরীতে জীবিতাবস্থায় প্রার্থীর চাওয়া শরীয়ত অনুমোদিত। ইনতিকালের পর তাঁরা ঐ সব বস্তুর জন্য আর দায়ী (مكلف) থাকেন না।

কবরবাসীর নিকট দু'আকারীদের বিভিন্ন শ্রেণী ও এর রূপ

এক জায়গায় তিনি কবরের নিকট দু'আ ও সওয়ালকারীদের বিভিন্ন প্রকার ও অবস্থা লিখে আলাদা আলাদা হুকুম বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ

কেউ যখন কোন পয়গম্বর কিংবা পুণ্যবান লোকের কবরের পাশে গিয়ে দাঁড়ায় কিংবা এমন কোন কবরের কাছে যায় যে কবর সম্পর্কে তার ধারণা, এটি কোন পয়গম্বর অথবা আল্লাহ্‌র কোন সালিহ্ বান্দাহ্‌র কবর হবে (অথচ তাদের ধারণা সত্য নয়) আর এই ভেবে তারা সেই কবরে প্রার্থনা জানায়, যাচ্ঞা করে, সিজদা করে। এগুলো তিন ধরনের হয়ে থাকে।

প্রথমত, তারা কবরবাসীর নিকট নিজ নিজ প্রয়োজন পূরণের নিমিত্ত হাত পাতে, প্রার্থনা জানায়। যেমন, তার নিকট তারা তাদের পালিত জীব-জানোয়ারের অসুখ-বিসুখ সারিয়ে দেবার অথবা ঋণ পরিশোধের কিংবা স্বীয় দুশমন থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ অথবা নিজেদের পরিবার-পরিজনের ও পালিত পশুগুলোর শরীর স্বাস্থ্য যেন ভাল থাকে তজ্জন্য আবেদন জানায় এবং এমনও সব বিষয়ের জন্য আবেদন জানায় যা পূরণের ক্ষমতা আল্লাহ্ ভিন্ন আর কারোর নেই। এ তো সুস্পষ্ট শির্ক, আর যারা এতে লিপ্ত তাদের তওবাহ করানো উচিত। যদি তওবাহ করে তবে তো ভাল, অন্যথায় তাদের কতল করতে হবে।

আর যদি তারা বলে যে, আমি এই মাযারবাসী কিংবা এই পয়গম্বর অথবা এই বুযুর্গ ওলীর নিকট এজন্যই আবেদন করছি, আমার প্রার্থনা জানাচ্ছি যেহেতু তিনি আমার তুলনায় আল্লাহ্‌র অধিকতর প্রিয়ভাজন, নিকটজন। তিনি যদি আমার এ সব ব্যাপারে আল্লাহ্‌র দরবারে একটু সুপারিশ করেন, সেজন্য তাকে আমি ওসীলা বা মাধ্যম বানাচ্ছি যেমন করে রাজা-বাদশাহ্‌র দরবারে কার্য সিদ্ধির জন্য সেখানকার বিশিষ্ট ও সাধারণ লোকদের ওসীলা বানানো হয়ে থাকে, তাহলে এ আমলও খ্রিস্টান ও মুশরিকদের আমলের

মতই। কেননা তারাও এ কথাই বলে, তারা তাদের সাধু-সন্ন্যাসী ও মঠবাসী লোকদেরকে (আহবার ও রুহবান) কেবল সুপারিশকারী হিসেবেই নিয়ে থাকে এবং নিজেদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য আল্লাহ্র দরবারে তাদের দিয়ে সুপারিশ করাতে চায় মাত্র। ঠিক তেমনি মুশরিকদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে অবহিত করেছেন, (মূর্তিপূজার কারণ হিসেবে) তারা বলে যে, مانعبدهم الاليقربونا الى الله زلفى অর্থাৎ আল্লাহ্র নিকট সান্নিধ্যে পৌছিয়ে দেবে বলেই আমরা দেব-মূর্তিগুলোর পূজা-অর্চনা করি। আরও ইরশাদ হচ্ছে ঃ

ام اتخذوا من دون الله شفعاء ط قل اولوكانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون - قل لله الشفاعة جميعا ط له ملك السموات والارض ثم اليه ترجعون -

তবে কি ওরা আল্লাহ্ ব্যতিরেকে অন্যকে সুপারিশ ধরেছে? বল, 'ওদের কোন ক্ষমতা না থাকলেও এবং ওরা না বুঝলেও?' বল, 'সকল সুপারিশ আল্লাহ্রই ইখতিয়ারে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্রই; অতঃপর তাঁরই নিকট তোমরা ফিরে যাবে।' [সূরা যুমার ঃ ৪৩-৪৪]

আরও ইরশাদ হচ্ছে ঃ

مالكم من دونه من ولى ولاشفيع - افلاتتذكرون -

আরও ইরশাদ হচ্ছে ঃ তিনি ভিন্ন তোমাদের কোন অভিভাবক নেই এবং সাহায্যকারীও নেই; তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?

(সূরা সজদা ঃ ৪)

এমনি ইরশাদ হচ্ছে ঃ

من ذالذى يشفع عنده الاباذنه -

কে সে, যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর নিকট সুপারিশ করবে?

[সূরা বাকারা ঃ ২৫৫]

দ্বিতীয়ত, উক্ত বুযুর্গ কিংবা মাযারবাসীর নিকট কোন কর্মের তলব করা হবে না কিংবা তার নিকট দু'আও করা হবে না। তাঁর নিকট কেবল এতটুকু দরখাস্ত পেশ করা হবে, তিনি আবেনদকারীর আবেদনে সাড়া দিয়ে আবেদনকারীর উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য একটু দু'আ করে দেবেন যেন তার মকসূদ পুরা হয়। যেমনটি কোন লোক জীবিত লোকের নিকট গিয়ে বলে যে, আপনি আমার জন্য একটু দু'আ করুন, যেমন করে সাহাবায়ে কিরাম (রা) হুযূর আকরাম (সা)-এর নিকট দু'আর জন্য দরখাস্ত করতেন। জানা দরকার, জীবিত মানুষের ক্ষেত্রে তো এটা জায়েয এবং শরীয়ত

অনুমোদিতও। কিন্তু একজন মৃত পুণ্যাত্মা অথবা একজন পয়গম্বর এই দুনিয়া থেকে বিদায় নেবার পর তাঁর নিকট দু'আর দরখাস্তের পেছনে শরীয়তের কোন সমর্থন নেই এবং এটি শরীয়তসম্মত কোন কর্ম নয় যে, আমরা কোন পীর-বুযুর্গ কিংবা পয়গম্বরের নিকট তাঁর ইনতিকালের পর বলি, আপনি আমাদের জন্য দু'আ করুন অথবা আপনি আপনার প্রভু প্রতিপালক (রাব্ব)-কে বলে কয়ে আমাদেরকে এটা সেটা পাইয়ে দিন। কোন সাহাবী কিংবা তাবি'ঈ থেকেও এ জাতীয় কর্মের প্রমাণ নেই এবং এটা কোন ইমামেরও মসলা নয়। কোন হাদীসও এর প্রমাণ হিসাবে পেশ করা যাবে না। পক্ষান্তরে এর বিপরীতে সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, হযরত ওমর (রা)-এর যমানায় একবার দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে লোকেরা হযরত 'আব্বাস (রা)- কে দিয়ে দু'আ করিয়েছিল এবং তাঁকে ওসীলা (বন্ধু, মাধ্যম) বানিয়েছিল এবং বলেছিল, 'হে আল্লাহ! এর আগে যখন আমরা দুর্ভিক্ষাবস্থার মুখোমুখি হতাম তখন তোমার নবী (সা)-কে ওসীলা বানাতাম আর তুমি বৃষ্টি বর্ষণ করতে। এখন আমরা আমাদের পয়গম্বর (সা)-এর চাচাকে ওসীলা বানাচ্ছি। অতএব, তুমি তোমার রহমতের বারিধারা পাঠাও। অনন্তর বৃষ্টি হয়েছে। তাঁরা তাঁদের এই প্রয়োজন ও বিপদের মুহূর্তে তো রওযা মুবারকের কাছে যান নি এবং একথা বলেন নি, 'হে আল্লাহ্র রসূল! আমাদের জন্য আপনি দু'আ করুন এবং বৃষ্টি পাঠাবার ব্যবস্থা করুন। আমরা আপনার নিকট ফরিয়াদ জানাচ্ছি।' কোন সাহাবী কখনো এরকম করেন নি। এটি এমনই এক বিদ'আত কুরআন ও হাদীসে যার কোন প্রমাণ মেলে না।

তৃতীয় সূরত হল, যিয়ারতকারী একথা বলবে, 'হে আল্লাহ্! অমুক পীর কিংবা বুযুর্গের তোফায়লে, তোমার দরবারে যার বিরাট সম্মান ও মর্যাদা– আমাকে অমুক জিনিসটি দিয়ে দিন, আমার সঙ্গে এমনতরো আচরণ করুন।' তা অনেক লোকের অভ্যাসই এমন। কিন্তু এমনটি করা কোন সাহাবী কিংবা তাবি'ঈ অথবা প্রাচীন বুযুর্গদের কারোর থেকেই বর্ণিত নেই যে, তাঁরা এভাবে দু'আ করতেন। কোন কোন 'উলামায়ে কিরাম ও বুযুর্গ এর কেবল আঁ-হযরত (সা)-এর জন্য এজাযত দিয়েছেন এবং কেউ কেউ বলেন যে, তাও আঁ-হযরত (সা)-এর জীবদ্দশায় ছিল, চিরদিনের জন্য নয়।[১]

---

১. রিসালা যিয়ারাতি'ল-কুবূর মাশমুলা মাজমু' রাসাইল, ১০৬-১২ পৃ. সংক্ষেপিত। তাওয়াস্সুল সম্পর্কে ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র মতবাদ বিখ্যাত ও সকলের জানা। বিস্তারিত জানতে চাইলে দ্র. قاعده جليله في التوسل والوسيله কিন্তু অধিকাংশ ইমাম ও উলামা এ ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেন।

জীবিত লোকের নিকটও এমন কিছু চাওয়া জায়েয নয় যা ইহজাগতিক কার্য-কারণের উর্ধ্বে

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (রা) কেবল এটুকুকেই যথেষ্ট মনে করেন নি যে, কোন মৃত বুযুর্গ কিংবা পীর-পয়গম্বর অথবা মাযারবাসীর নিকট কিছু চাওয়া, প্রার্থনা দু'আ করা জায়েয নয়, বরং কোন জীবিত লোকের নিকটও এমন কোন বস্তু দাবী করা কিংবা কোন জিনিস চাওয়া যা পার্থিব বস্তুনিচয়ের উর্ধ্বে এবং 'কুদরত'-এর 'কুন ফায়াকুন' (كن فيكون)-এর সঙ্গে সম্পর্কিত অথবা সেসব বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত যা কেবল আল্লাহ্র কুদরত ও ইচ্ছা-অভিরুচির সাথেই সঙ্গতিশীল হতে পারে এবং যেগুলোকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নিজের সঙ্গে নির্দিষ্ট রেখেছেন, তাঁর মতে, নাজায়েয ও শির্ক। তিনি তদীয় পুস্তিকা 'যিয়ারাতু'ল-কুবূর'-এ বলেন ঃ

> বান্দাহ্র কাম্য বা ঈপ্সিত বস্তু যদি সেসব বিষয় ও কার্যাবলীর সাথে সম্পর্কিত হয়, যার ওপর কেবল আল্লাহ্র অসীম কুদরত বা ক্ষমতা রয়েছে তা আল্লাহ্ ভিন্ন অপর কারোর নিকট চাওয়া৷ চাই তিনি বাদশাহ্ই হন, নবী হন, পীর অথবা বুযুর্গ হন, হন জীবিত অথবা মৃত—জায়েয নয়। উদাহরণত, নিজের কিংবা জীব-জানোয়ারের রোগ-মুক্তির মাধ্যমে স্বাস্থ্য কামনা, কোন নির্দিষ্ট কারণ ছাড়াই স্বীয় ঋণ পরিশোধ প্রার্থনা , গৃহবাসীদের শান্তি ও নিরাপত্তা এবং ইহলৌকিক ও পারলৌকিক বালা-মুসীবতের পরিহার অথবা শত্রুর ওপর জয় লাভ, কলবের হেদায়েত, গোনাহ্র মাগফিরাত, জান্নাত তথা বেহেশতে প্রবেশ, জাহান্নামের হাত থেকে পরিত্রাণ, বিদ্যা লাভ, কুরআন শরীফ পড়তে পারা, আত্মার সংস্কার, চারিত্রিক পরিশুদ্ধি, নফসের পবিত্রতা ইত্যাদি। এসব কেবল আল্লাহ্র নিকটই চাওয়া যেতে পারে। কোন লোকের পক্ষে কোন রাজা-বাদশাহ অথবা পীর-পয়গম্বরের নিকট, চাই তিনি জীবিত হোন অথবা মৃত-একথা বলা জায়েয নয় যে, আপনি আমার গোনাহ-খাতা মাফ করে দিন, আমাকে আমার শত্রুর ওপর জয়যুক্ত করে দিন, আমার রোগ-ব্যাধি নিরাময় করে দিন, আমার স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা দিন অথবা আমার ঘরের লোকেরা আমার পশুগুলো যেন ভাল থাকে ইত্যাদি। এ ধরনের দু'আ ও ফরমায়েশ জায়েয নয়। যদি কোন লোক কোন সৃষ্ট জীবের নিকট এ জাতীয় প্রার্থনা জানায় চাই৷ সে যে কেউ হোক, তাহলে সে মুশরিক এবং সে এমন সব মুশরিকদের মধ্যে পরিগণিত হবে যারা ফেরেশতাদেরকে ইবাদত করত, নবী-রসূলদেরকে পূজা করত, তাঁদের মূর্তি তৈরি করে তার সামনে প্রণতি জানাত, ভক্তি ও শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করত, যেমন খ্রিষ্টান সম্প্রদায় হযরত 'ঈসা মসীহ (আ) ও তাঁর সম্মানিতা মা হযরত মরিয়ম (আ)-এর উদ্দেশে দু'আ করত।

---

১ الواسطة بين الخلق والحق ৪৫-৪৬ পৃ.।

মধ্যস্থতার হাকীকত

এই ক্ষেত্রে মধ্যস্থতার একটি বিতর্ক সৃষ্টি করা হয় থাকে এবং যে সমস্ত লোক হুযূর আকরাম (সা)-এর অথবা কোন ওলী-বুযুর্গের কিংবা পুণ্যাত্মার নিকট দু'আ অথবা সুপারিশ করাবার বিরোধী, তাঁদের সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে, তাঁরা মধ্যস্থতা অস্বীকার করেন। অথচ নবী-রসূলগণ স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে মধ্যস্থতা ও যোগসূত্র স্থাপনকারী এবং তাঁদের ব্যতিরেকে আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌছা, এক কথায় অসম্ভব। ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) সুস্পষ্টভাবে এর জওয়াব প্রদান করেছেন এবং বলেছেন, মধ্যস্থতার দু'টো অর্থ রয়েছে, যার একটি অর্থ সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং সকলেই সে বিষয়ে একমত এবং তারই ওপর সমগ্র দীন-এর বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত। আরেকটির অর্থ বাতিল, ভিত্তিহীন ও মনগড়া। তিনি এ বিষয়ে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ পুস্তিকাই রচনা করেছেন যার নাম الواسطة البين الخلق والحق - এতে তিনি বলেছেন,

রসূলের মধ্যস্থ হবার অর্থ যদি হয় এই যে, সৃষ্টিজগতের জন্য এমন একজন মধ্যস্থতাকারী আবশ্যক যিনি আল্লাহ্র হুকুম-আহকাম ও তাঁর ইচ্ছা-অভিরুচি আল্লাহ্র সৃষ্ট জীবকে বাতলে থাকেন, তাহলে এটি সর্বৈব সত্য এজন্য যে, আল্লাহ্র সৃষ্টির পক্ষে তাঁর (আল্লাহ্র) বিধি-বিধান, পালনীয় নির্দেশ, তাঁর পছন্দ ও অপছন্দনীয় বিষয়সমূহ জানবার জন্য তাঁরা ভিন্ন আর কোন মাধ্যম নেই। আল্লাহ্ পাক তাঁর প্রিয়বন্ধু ও মকুবল বান্দাহ্দের জন্য যেসব নে'মতরাজি রেখেছেন (মৃত্যু- পরবর্তী জীবনে) এবং তাঁর শত্রুদের জন্য যে আযাবের ওয়াদা করেছেন, তা তাঁদের ভিন্ন জানা যায় না। আল্লাহ্ পাকের কোন্ নাম ও গুণাবলী আল্লাহ্ তা'আলার অবিভাজ্য সত্তার শান ও মর্যাদার উপযোগী আর কোন্টি উপযোগী নয় কেবল বুদ্ধিবলে তা জানা যায় না, তা বুদ্ধির অগম্য। এসব হাকীকত ও বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ মাত্র আম্বিয়া 'আলায়হিমু'স-সালামের মাধ্যমেই হতে পারে, যাঁদেরকে আল্লাহ্ পাক স্বীয় বান্দাদের হেদায়েত ও তা'লীম প্রদানের জন্য পাঠিয়েছেন। এটি এমন একটি মৌলিক বিষয় যার ওপর কেবল মুসলমানরাই নন, বরং ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানরা পর্যন্ত একমত। তারা স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে এ ধরনের মাধ্যমের সমর্থক। এসব মাধ্যম আল্লাহ্ পাকের সেসব পয়গম্বর যাঁরা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হুকুম-আহকাম ও তথ্যাদি পৌছিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

الله يصطفى من الملئكة رسلا ومن الناس -

(আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর পয়গাম পৌছে দেবার জন্যেই ফেরেশতা ও মানুষের ভেতর থেকে মনোনয়ন দিয়ে থাকেন। সূরা হজ্জ ঃ ৭৫)। যারা এই মাধ্যম অস্বীকার করে, তারা সমস্ত ধর্মের ও জাতি-গোষ্ঠীর মতে কাফির। আর মাধ্যমের অর্থ যদি এই হয় যে, মুনাফা, লাভ, ক্ষয়ক্ষতি প্রতিরোধ ও

অবসানের জন্য এমন একটি মাধ্যমের প্রয়োজন অর্থাৎ এমন এক ব্যক্তিত্ব অপরিহার্য, যিনি রিযক, দরকারী সাহায্য, পথহারা লোকদের পথ দেখাতে আল্লাহ্ ও তদীয় বান্দাদের মধ্যে মাধ্যম হবেন, লোকে তার নিকট যে সমস্ত জিনিস চাইবে এবং তিনি আল্লাহ্কে বলে কয়ে সেসব জিনিস তাদেরকে দেবেন, লোকে তারই নিকট বুকভরা আশা করবে, তাহলে জেনে রেখ, এটাই হল পয়লা নম্বরের শির্ক যার ভিত্তিতে আল্লাহ্ তা'আলা পৌত্তলিক মুশরিকদেরকে কাফির অভিহিত করেছেন। কেননা তারা আল্লাহ্ ভিন্ন অন্যদেরকে অভিভাবক, বন্ধু ও সুপারিশকারী ধরে রেখেছিল যাদের মাধ্যমে তারা মুনাফা অর্জন করত এবং ক্ষতিকর বস্তুর হাত থেকে পরিত্রাণ পেত।

জনসাধারণ, অজ্ঞ মানুষ এবং সাধারণের মতই বহু বিশিষ্ট লোক এত দূর পর্যন্ত বাড়াবাড়ি করেছিল, কেবল হযরত আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ) ও জনাব রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামই নন বরং সাধারণ আওলিয়া-ই-কিরাম ও সালিহীনকে নিজেদের ও আল্লাহ্র মাঝে মাধ্যম বানিয়ে রেখেছিল এবং দু'আ ও সাহায্য প্রার্থনা, আশা ও ভরসা (তাওয়াক্কুল) সবকিছুর সম্পর্ক তাঁদেরই সঙ্গে কায়েম রেখেছিল। ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) তাদের সম্পর্কে এই পার্থক্য করেছেন। তিনি বলেন ঃ

> আম্বিয়া 'আলায়হিমু'স-সালাম ভিন্ন 'ইলমে দীনের যে সমস্ত ইমাম ও নেতা রয়েছেন, তাঁদের সম্পর্কেও এটাই বিস্তারিত বিবরণ যে, যে ব্যক্তি তাদেরকে রসূল (সা) এবং উম্মতের ভেতর মাধ্যম মানে এই অর্থ ও দৃষ্টিকোণ থেকে যে, তারা রসূল (সা)-এর হুকুম -আহকাম ও মসলা-মাসাইলের প্রচারক ও শিক্ষক এবং উম্মার মুরুব্বী, অনুসরণীয়। ব্যক্তিত্ব ও কর্মের আদর্শ নমুনা তাহলে তা ঠিকই আছে। এ সমস্ত ইমাম ও 'উলামায়ে কিরাম যদি কোন মসলা-মাসাইলের ব্যাপারে ঐকমত্যে উপনীত হন তবে তাদের এই ঐকমত্য অকাট্য দলীল হিসাবে বিবেচিত হবে। কেননা এরা সকলেই গোমরাহীর উপর একমত হতে পারেন না। আর যদি কোন মসলার ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়, তাহলে এক্ষেত্রে সে আল্লাহ্ ও রসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। কেননা তাঁদের ভেতর কেউই একক বা ব্যক্তিগতভাবে সম্পূর্ণ নির্দোষ কিংবা নিষ্পাপ নন। তাঁদের ভেতরের প্রত্যেকের কালামের গবেষণা ও বিচার-বিশ্লেষণের কিছু অংশ নেওয়া যেতে পারে এবং কিছুটা অংশ পরিত্যাগ করা যেতে পারে। কেবল রসূলুল্লাহ্ সাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের মর্যাদামণ্ডিত সত্তাই পরিপূর্ণরূপে নির্দোষ এবং তাঁর কোন হুকুম ও নির্দেশনাই পরিত্যাজ্য নয়।

১. আল-ওয়াসিতা, ৪৬পৃ.।

আর কোন লোক যদি একথা মনে করে যে, এই সব বুযুর্গানে দীন, 'উলামা ও আইম্মায়ে কিরাম আল্লাহ্ এবং তাঁর সৃষ্টিকুলের ভেতর ঠিক তেমনি মাধ্যম, যেমন কোন সম্রাট কিংবা রাজা-বাদশাহ ও তার প্রজাকুলের মাঝে সচিব ও দ্বাররক্ষীরা হয়ে থাকে, এরাই আল্লাহ্ পর্যন্ত তাঁর সৃষ্টিকুলের প্রয়োজনসমূহ পৌঁছিয়ে থাকেন এবং তাদের মাধ্যমে আল্লাহ্ পাক তাঁর বান্দাদেরকে হেদায়েত ও রিযিক (জীবিকা) প্রদান করেন, সৃষ্টিকুল তাদের নিকট প্রার্থনা জানায় এবং তারা আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা জানায় ঠিক তেমনি, যেমনি করে সচিব ও দ্বাররক্ষী বাদশাহ্র নিকট প্রজাদের প্রয়োজনের কথা পেশ করে তা পূরণ করে থাকে। লোকে বাদশাহ্র নিকট সরাসরি নিজেদের আবেদন নিবেদন পেশ করে না, একে তারা বেআদবী মনে করে। তারা সচিবদের নিকট আবেদন পেশ করে। কেননা তাদের নিকট আবেদন পেশ করা অধিকতর ফলপ্রসূ হয়ে থাকে। আর তা এজন্য যে, তারাই বাদশাহ্র নিকট সান্নিধ্যে অবস্থান করেন, প্রার্থীরা করে না। যারা এ জাতীয় এবম্বিধ মাধ্যমের সমর্থক এবং এই অর্থে বুযুর্গানে দীন, 'উলামায়ে কিরাম ও নেককার লোকদেরকে মাধ্যম মানে, তারা কাফির ও মুশরিক। তাদেরকে এ থেকে তওবাহ করানো ওয়াজিব। যদি তওবাহ করে তবে তো ভাল, অন্যথায় তাদেরকে হত্যা করতে হবে। এরা প্রকৃতপক্ষে সাদৃশ্যবাদের হাতে বন্দী; কেননা তারা সৃষ্ট জীবকে স্রষ্টার সদৃশ জ্ঞান করে রেখেছে এবং আল্লাহ্র সমকক্ষ ও নজীর ঠাওরিয়ে নিয়েছে।[১]

মাশহাদসমূহ নিকৃষ্ট বিদ'আত

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) সেই সমস্ত মাশহাদ ও যিয়ারতগাহ্র ভীষণ বিরোধী ছিলেন যা গোটা মুসলিম বিশ্বে শির্ক ও বিদ'আত, অন্যায়-অনাচার ও পাপাচার এবং নানাবিধ নিষিদ্ধ ও গর্হিত কর্মের আখড়ায় পরিণত হয়ে গিয়েছিল। যেগুলো মুসলিম বিশ্বে এক বিরাট ফেতনার রূপ পরিগ্রহ করেছিল। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, এগুলো শরীয়তের প্রকাশ্য বিরোধী এবং বিগত যুগের ঘৃণিত বিদ'আত। الرد على البكرى গ্রন্থে তিনি বলেন ঃ

এই সব মসজিদ, যেগুলো কবরের ওপর নির্মাণ করা হয়েছে, মাশহাদ নামে অভিহিত। এ এমন একটি বিদ'আত, যা লোকে ইসলামে সৃষ্টি করেছে আর এগুলোর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে গমনকে লোকে রেওয়াজে পরিণত করেছে, ইসলামী শরীয়তে যার কোন ভিত্তি নেই। ইসলামের প্রথম তিন শতাব্দীতে, যে শতাব্দীর কল্যাণময়তা ও মর্যাদার সাক্ষ্য দিয়েছেন স্বয়ং আঁ-হযরত (সা),

১. আল-ওয়াসিতা, ৪৮ পৃ.।

এর কোন অস্তিত্ব ছিল না, বরং বিশুদ্ধ হাদীসে হুযূর আকরাম (সা) থেকে প্রমাণিত যে, তিনি এ সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করেছেন, লোকদেরকে এ কাজ করতে নিষেধ করেছেন। বুখারীর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ

لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياءهم مساجدا -

আল্লাহ্ ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদেরকে অভিশপ্ত করুন। তারা তাদের নবীদের কবরগুলোকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছে। হযরত 'আয়েশা (রা) বলেন ঃ লোকেরা কবর মুবারককে মসজিদে পরিণত করবে এই আশংকা না থাকলে তা খোলা ময়দানে করা হত। কেননা কবরকে সিজদাস্থলে পরিণত করাকে আঁ-হযরত (সা) অপছন্দ করতেন। ইনতিকালের পাঁচ দিন পূর্বে তিনি যা বলেছিলেন, তাও সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ

ان كان من قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد - الا فلا تتخذوا القبور مساجد فانى انهاكم عن ذالك -

তোমাদের পূর্বে যারা গুযরে গেছেন তারা কবরকে মসজিদে পরিণত করত। মনে রেখ, তোমরা কবরকে মসজিদ বানাবে না। আমি তোমাদের তা করতে নিষেধ করছি।

আরও এগিয়ে গিয়ে তিনি বলেন ঃ

মুসলমানরা 'তুস্তার' জয় করলে সেখানে হযরত দানিয়াল (আ)-এর কবর পান। শহরবাসীরা কবরের পাশে দাঁড়িয়ে বৃষ্টির জন্য দু'আ করত এবং পানি চাইত। হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা) হযরত ওমর (রা)-কে এ বিষয় সম্পর্কে অবহিত করেন। উত্তরে তিনি হযরত আবূ মুসা আশ'আরী (রা)-কে লিখেন যে, দিনের বেলা ১৩টি কবর খনন করুন এবং রাত্রিকালে খোদিত কবরগুলোর যে কোন একটিতে তাঁকে (হযরত দানিয়ালকে) দাফন করুন যাতে লোকে কোনরূপ ফেতনার শিকার না হয় এবং তাঁর নিকট বৃষ্টি না চায় (কিংবা বৃষ্টির জন্য ধর্ণা না দেয়)। মূলত এটিই ছিল সাহাবায়ে কিরামের তরীকা। এজন্যই সাহাবায়ে কিরাম (রা) ও তাবি'ঈদের যুগে ইসলামী ভূখণ্ডে একটি মসজিদও এমন পাওয়া যেত না যা কোন কবরের ওপর নির্মাণ করা হয়েছে এবং কোথাও কোন মাশহাদও ছিল না যিয়ারত করবার মত ঃ না হেজাযে, না য়ামানে, না সিরিয়ায়, না মিসর, ইরাক কিংবা খোরাসানে।

অপর এক গ্রন্থে তিনি লেখেন ঃ

> কবর অভিমুখে বিশেষ উদ্দেশ্যে সফর এবং তাকে উপাসনালয়, মসজিদ ও মেলার জায়গায় পরিণতকারী লোকের সন্ধান সাহাবায়ে কিরাম (রা), তাবিঈন এবং তাব'তাবিঈনের যুগে পাওয়া যেত না। ইসলামে এমন কোন কবরের অস্তিত্বও ছিল না, ছিল না কোন মাশহাদ যে কবর বা মাশহাদ বিশেষ উদ্দেশ্যে সফর করতে হবে। এ প্রথা ইসলামের তিন শতাব্দীর পরের সৃষ্টি। আর বিদ'আতের বৈশিষ্ট্যই এই যে, এতে যে পরিমাণ রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরোধিতা হয়, ঠিক ততটা বিলম্বে তার প্রাদুর্ভাব ঘটে। শুরুতে সেসব বিদ'আতের প্রকাশ ঘটে যার বিরোধিতা এতটা স্পষ্ট ও খোলাখুলিভাবে হয় না।[১]

বাতেনী ও রাফেযী সম্প্রদায় মাশহাদ-এর আবিষ্কারক

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র সুচিন্তিত অভিমত হল এই যে, এসব মাশহাদ ও মাযারে অনুষ্ঠিত ও মাযার মাশহাদকেন্দ্রিক বিদ'আত ও এর দাওয়াত শুরু করেছিল বাতেনী ও রাফেযী সম্প্রদায় এবং তারা এতদসম্পর্কিত মনগড়া ও কাল্পনিক হাদীস রচনা করে। কেননা তাদের প্রকৃত আকর্ষণ ছিল তো ইমাদের মাযার ও মাশহাদ-এর সাথে। তিনি বলেন ঃ

> সর্বপ্রথম যারা ঐ সব মাশহাদ যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফরের ফযীলত বর্ণনায় হাদীস তৈরী করেছিল, তারা হল রাফেযীসহ অপরাপর বিদ'আতী সম্প্রদায়, যাদের নিয়ম হচ্ছে এই যে, তারা মসজিদগুলো বিরান ও জনশূন্য করে এবং মাশহাদগুলোর যেখানে শিরক, মিথ্যা ও একটি নয়া দীনের উদ্ভব ঘটে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ও জনসমাগম ঘটায় এবং এসবের প্রতি অতিশয় সম্মান ও ভক্তি প্রদর্শন করে। অথচ কুরআন ও সুন্নাহ্র বিভিন্ন স্থানে মাশহাদ ও মাযারের পরিবর্তে মসজিদের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

قل امر ربى بالقسط واقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له ـ

> বল, আমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন ন্যায়বিচারের। প্রত্যেক সালাতে তোমাদের লক্ষ্য স্থির রাখবে এবং তাঁরই আনুগত্যে বিশুদ্ধ চিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁকে ডাকবে। [সূরা আ'রাফ ঃ ২৯]

---

১. الردعلي البكرى পৃ. ২৮১।

২. الرد على الا خنائى ১০২ পৃ.।

وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا ـ

এবং এই যে, মসজিদগুলো আল্লাহ্‌রই জন্য। সুতরাং আল্লাহ্‌র সাথে তোমরা অন্য কাউকে ডেকো না। [সূরা জিন্ন ঃ ১৮]

انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر ـ

তারাই তো আল্লাহ্‌র মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে, যারা ঈমান আনে আল্লাহ্‌ ও পরকালে। [সূরা তওবাহ ঃ ১৮]

ولاتباشروهن رانتم عكفرن فى المساجد ـ

আর তোমরা মসজিদে ই'তিকাফরত অবস্থায় তাদের (স্ত্রীদের) সাথে সংগত হয়ো না। [সূরা বাকারা ঃ ১৮৭]

ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى فى خرابها ـ

আর তার অপেক্ষা বড় জালিম আর কে হতে পারে যে আল্লাহ্‌র মসজিদসমূহে তাঁর নাম স্মরণ করতে বাধা দেয় এবং সে সবের বিনাশ সাধনে প্রয়াসী হয়? [সূরা বাকারা ঃ ১১৪]

অধিকন্তু সহীহ হাদীস দ্বারা এটা প্রমাণিত যে, তিনি বলতেন ঃ

ان من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد فانى انها كم عن ذالك ـ

তোমাদের পূর্বে যেসব জাতি-গোষ্ঠী ছিল (ইয়াহূদী ও খ্রিস্টান) তারা কবরগুলোকে মসজিদে পরিণত করত। কিন্তু খবরদার! তোমরা কবরগুলোকে মসজিদ বানাবে না। আমি তোমাদেরকে তা করতে নিষেধ করছি।[১]

অধিকাংশ মাশহাদ ও মাযারই জাল

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র গবেষণাপ্রসূত অভিমত হ'ল, এই সব মাশহাদ ও প্রসিদ্ধ যিয়ারতগাহগুলোর অধিকাংশই নকল ও জাল। তিনি এই সিলসিলায় কত সুন্দর লিখেছেন যে, যেহেতু মাশহাদ ও মাযারসমূহ চিনবার ও জানবার উপর শরীয়তের কোন বাধ্যবাধকতা নেই এবং এ সেই দীনেরও অন্তর্গত নয়, যে দীনের হেফাজত ও সংরক্ষণের যামানত স্বয়ং আল্লাহ্‌ তা'আলা গ্রহণ করেছেন। এজন্য এসব মাশহাদ ও মাযারের অধিকাংশই জাল ও প্রতারণাপূর্ণ এবং বহু মাযার ও মাশহাদের আদৌ কোন ভিত্তি নেই। বহু লোকই এ সবের যথার্থতার ব্যাপারে বিভ্রান্তির শিকার। তিনি বলেন ঃ

---

১. الرد على الا خنائى ৪৯ পৃ.।

وكثير من المشاهد كذب وكثير منها مشكوك فيه وسبب ذالك ان معرفة المشاهد ليست من الدين الذى تكفل الله بحفظه لعدم حاجتهم الى معرفة ذلك ـ

> মাশহাদগুলোর অনেকগুলিই জাল ও মিথ্যা এবং অনেকগুলিই সংশয়পূর্ণ। এক্ষেত্রে লোকে এত বিভ্রান্তির শিকার কেন? উত্তরে বলা যায় ঃ প্রকৃত রহস্য এই যে, মাশহাদের পরিচয় লাভ করা এই দীনের অন্তর্গত বিষয় নয় যার সংরক্ষণ ও হেফাজতের যিম্মাদারী স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা গ্রহণ করেছেন। কেননা উম্মার এতদসম্পর্কে জ্ঞাত হবার ও গবেষণা চালাবার প্রয়োজন নেই এবং এর ওপর দীনের কোন কাজও থেমে নেই।[১]

মাশহাদ ও মাযার উদ্দেশ্য সিদ্ধির সহায়ক হবার কাহিনী

এই ধারাক্রমে একটি বড় রকমের ফেতনা বিস্তার লাভ করছিল যে, এসব মাশহাদ ও মাযারে বড় বড় রোগী আরোগ্য লাভ করে এবং এখানে দু'আ কবূল হয়। লোকে এ ব্যাপারে তাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের বর্ণনা দিত। ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)- কে আল্লাহ্ তা'আলা দীনের ক্ষেত্রে যে দৃঢ়তা এবং ঈমান ও য়াকীনের যে মকাম দান করেছিলেন তারই ভিত্তিতে তিনি সে সব গল্প-গুজব ও গালভরা দাবীতে প্রভাবিত হবার লোক ছিলেন না এবং দীনের অকাট্য সত্য ও কুরআন-সুন্নাহ্‌র 'নস'সমূহ ঐ সব বর্ণিত ও কথিত গল্প-কাহিনীর ভিত্তিতে পরিত্যাগ করতে পারতেন না। তিনি স্বীয় আল্লাহ্ প্রদত্ত অন্তর্দৃষ্টি ও ধর্মীয় অনুধাবন শক্তির সাহায্য নেন এবং প্রমাণ করেন যে, এসব কল্প-কাহিনী ও ভিত্তিহীন। এই সিলসিলায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জীব-জানোয়ারের আরোগ্য লাভের ঘটনা বর্ণনা করা হত। ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) এর পেছনে নিহিত যে কারণের কথা বর্ণনা করেছেন, তা খুবই আশ্চর্য ধরনের, ব্যতিক্রমী ও শিক্ষণীয়। তিনি এক স্থানে লিখেছেন ঃ

> কায়রোয় একদল লোক উবায়দী (ফাতিমী নামে খ্যাত)-দের সম্পর্কে এই 'আকীদা পোষণ করত যে, তারা বুযুর্গ ওলীদের অন্তর্গত ছিলেন। আমি যখন তাদেরকে বললাম যে, (ওলী হওয়া তো দূরের কথা) তারা তো মুনাফিক ও ধর্মদ্রোহী (যিন্দীক) এবং তাঁদের ভেতর ধর্মদ্রোহিতার ব্যাপারে যারা সবচেয়ে

---

১. অধিকাংশ মাশহাদ ও মাযার জাল হওয়া সম্পর্কে ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) যা লিখেছেন ইতিহাসে ও গবেষণায় তা সুপ্রমাণিত। উদাহরণত, কায়রোয় সায়্যিদুনা হুসায়ন (রা)-এর পবিত্র মস্তক, সায়্যিদা যয়নব (রা), সায়্যিদা সকীনা, নাজাফে হযরত আলী (রা), দামিশকে নবী করীম (সা)-এর সহধর্মিণীগণের এবং ভারতবর্ষের কোন কোন মাযার বিশেষত, লাহোরে হযরত আলী হুজবীরী ওরফে দাতা গঞ্জে বখ্‌শ-এর মাযার রয়েছে বলে যে জনশ্রুতি রয়েছে তা ইতিহাসের নিরিখে সংশয় ও সন্দেহের উর্ধ্বে নয়।

কম ও হাল্কা ভূমিকা পালন করেছে তারাও একজন রাফেযীর চেয়ে কম নন, তখন তারা খুবই বিস্মিত হ'ল। তারা বলতে লাগল যে, আমরা তো পেট ব্যথায় আক্রান্ত ঘোড়া তাদের মাশহাদ ও মাযারে নিয়ে যাই এবং সেখানে যাবার পর ঘোড়াগুলো ভাল হয়ে যায়। আমি তাদেরকে বললাম যে, এটা তো তাদের কুফরীর পক্ষে সর্বাপেক্ষা বড় দলীল। এরপর আমি কয়েকজন সহিসকে ডাকলাম এবং তাদেরকে বললাম যে, সিরিয়া ও মিসরে যখন তোমাদের ঘোড়ার পেটে ব্যথা দেখা দেয় তখন সেগুলো কোথায় নিয়ে যাও? তারা বলল ঃ আমরা সিরিয়ায় থাকাকালে ইসমাঈলী এলাকায় অবস্থিত কবরস্থানে নিয়ে যাই। যেমন 'আলীকা, মুনকিয়া প্রভৃতি কবরস্থানে আর মিসরে খ্রিস্টানদের একটি খানকায় নিয়ে যাই আর নিয়ে যাই উবায়দীদের কবরস্থানে। আমি বললাম ঃ তোমরা কি মুসলমান বুযুর্গদের কবরস্থানেও নিয়ে যাও? যেমন হযরত লায়ছ ইবন সা'দ, ইমাম শাফি'ঈ, ইবনুল কাসিম প্রমুখ বুযুর্গের কবরে? তারা 'না' সূচক জওয়াব দিল। আমি এসব ভক্তদেরকে বললাম ঃ নাও, শোন! এরা ঐসব ঘোড়াকে কাফির ও মুনাফিকদের কবরের পার্শ্বে নিয়ে যায় এবং সেগুলোর রোগমুক্তি ঘটে। এর কারণ এই যে, ঐ সকল লোকের কবরে আযাব হচ্ছে। সহীহ্ হাদীসে বলা হয়েছে যে, চতুষ্পদ ও অপরাপর জীব-জানোয়ার কবরবাসী মুর্দাদের আওয়াজ শুনতে পায়। এসব ঘোড়া যখন এ ধরনের আওয়াজ শোনে ঘাবড়ে যায়। এই ঘাবড়ানি ও ভয়-সন্ত্রস্ততার কারণে তাদের পেট পানি হয়ে যায় এবং তারা পায়খানা করে ফেলে। কেননা ভয়-সন্ত্রস্ততার কারণে অধিকাংশ সময় শরীরের বাধন ঢিলা হয়ে যায়। একথা শুনে তারা খুব বিস্মিত হল। আমি অধিকাংশ সময় লোকদেরকে একথাই বলতাম এবং আমি জানতাম না যে, আর কেউ একথা লিখেছে কিনা। পরে জেনেছি যে, কতক আলিমও এই কারণই বর্ণনা করেছেন।[১]

মুশরিকদের জন্য শয়তানের প্রতিকৃতি

স্বয়ং বুযুর্গদের ও আওলিয়ায়ে কিরামের কবরের ব্যাপারে উদ্দেশ্য সিদ্ধি ও সফলতা লাভের যে সব ঘটনা ও কাহিনী বর্ণনা করা হয়ে থাকে, অধিকন্তু মাযারে শায়িত (صاحب مزار) ব্যক্তির যিয়ারত, তার সাথে পারস্পরিক কথোপকথন ইত্যাদি ঘটনার কথা বলা হয়ে থাকে, ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) এর অন্য কারণ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ

কেউ কেউ তাদের শায়খ (পীর)-এর দোহাই দেয় এবং বলে যে, তারা তাঁকে (পীরকে) দেখেছে এবং কোন কোন সময় তাঁরা তাদের কোন কোন কাজও করে দিয়েছে। এ থেকে তাদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, হয়তো

---

১. الرد على البكرى ৩১১ পৃ।

শায়খ বা পীর নিজেই এসেছেন অথবা ইনি কোন ফেরেশতা ছিলেন যিনি তার পীর বা শায়খ-এর আকৃতিতে আবির্ভূত হয়েছেন এবং এটি তাঁর কারামত। এ থেকে তার শিরকী আকীদা আরও বদ্ধমূল হয় এবং তা সকল সীমা ছাড়িয়ে বাড়াবাড়ির পর্যায়ে গিয়ে পৌছে। তার জানা নেই যে, এ ধরনের কথা ও কায়-কারবার শয়তান মূর্তিপূজারীদের সাথেও করে থাকে। শয়তান ঐ সব মূর্তিপূজকদের সামনে অনেক সময় আবির্ভূত হয় এবং কিছু কিছু গায়েবী বা অদৃশ্য জগতের কথা বলে এবং তাদের কোন কোন উদ্দেশ্যও সিদ্ধি করে দেয়। কিন্তু (মনে রাখতে হবে যে,) এ সবই শেষ যুগে উদ্ভূত বিষয়; ইসলামের আদি তথা সাহাবায়ে কিরামের যুগে এসবের আদৌ কোন অস্তিত্ব ছিল না।

অপর এক জায়গায় লিখছেন ঃ

শয়তান অধিকাংশ সময় সেসব লোকের আকৃতিতে আবির্ভূত হয় যাদের দোহাই দেওয়া হয়। তরীকতের বহু পীরের ভক্ত ও অনুরক্ত এসব ঘটনার কথা আমাকে জানিয়েছেন এবং বিরাট সংখ্যক একদল লোক আমাকে বলেছেন যে, তারা কিছু কিছু জীবিত মানুষ এবং কোন মুর্দার নিকট যখন ফরিয়াদ পেশ করেছেন তখন তারা এ জাতীয় ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন। অতএব একথা আজ দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, শয়তান তার সাধ্যমত মানুষকে পথভ্রষ্ট ও গোমরাহ করবার চেষ্টা চালায়। যদি সে ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ হয় তাহলে শয়তান তাকে প্রকাশ্য শিরক এবং নির্ভেজাল কুফরীর মাঝে নিক্ষেপ করে। তাকে নির্দেশ দেয় আল্লাহ্‌র যিকর না করতে, শয়তানকে সিজদা করতে, তার উদ্দেশ্যে পশু কুরবানী দিতে কিংবা উৎসর্গ করতে। তাকে মৃত জন্তু ভক্ষণের নির্দেশ দেওয়া হয়, নির্দেশ দেয় রক্ত পান করতে এবং নগ্ন বেহায়পনায় উৎসাহিত করে। এ সমস্ত সেসব শহরেই অধিক পরিমাণে সংঘটিত হয় যেখানে কেবল কুফরী বিরাজমান অথবা ইসলাম থাকলেও দুর্বল অবস্থায় বিদ্যমান (কিংবা ইসলামের প্রভাব ক্ষীণ)। অধিকন্তু সেসব শহরেই শয়তানী কর্মকাণ্ড বেশী চলে যেখানকার লোকদের ঈমান দুর্বল। অনন্তর মিসর ও সিরিয়ায় এমনটিই দেখা গেছে। তাতারীদের ভেতর ইসলাম গ্রহণের পূর্বে এ ধরনের ঘটনার আধিক্য লক্ষ্য করা যেত। এরপর যতই তাদের ভেতর ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটেছে, ইসলামের হাকীকত সম্পর্কে তারা জ্ঞান লাভ করেছে ঠিক ততটাই শয়তানের আছর দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়েছে।[১]

---

১. সূরা ইখলাসের তফসীর।

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) লিখেছেন যে, স্রেফ নেককার বুযুর্গদের বেলায়ই এ জাতীয় ব্যাপার সংঘটিত হয় না বরং নক্ষত্র পূজারীদেরকেও এ ধরনের অবস্থার মুখোমুখি হতে হয় এবং তারা এ ধরনের অনুভূতি ও বিজয় লাভ করে থাকে। তিনি বলেন ঃ

> যেসব লোক নক্ষত্রের নিকট দু'আ করে, তাদের ওপর এমন অবস্থার অবতারণা হয় যাকে নক্ষত্রপুঞ্জের আধ্যাত্মিকতা বলা হয়। অথচ তা আধ্যাত্মিকতা নয়, বরং তা শয়তান যা তার শির্ক-এর কারণে তাকে পথভ্রষ্ট করতে অবতরণ করে থাকে, যেমনটি কোন কোন সময় শয়তান পুতুল ও মূর্তির ভেতর ঠাঁই নেয়, কখনো ও কোন সময় মানুষের সাথে কথা বলে এবং কতক মুহূর্তে পূজারী ও পুরোহিতদের দর্শনও দিয়ে থাকে, মাঝে মধ্যে অন্যদেরকেও দর্শন দেয়।[১]

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র সংস্কার কর্ম ও তার প্রভাব

হি. সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দী (যে শতাব্দী মানব সম্পদ বৃদ্ধি এবং মানব উৎপাদনের আলোচনা কিতাবের শুরুতেই অতিক্রান্ত হয়েছে) যদিও বুযুর্গ শ্রেষ্ঠ 'উলামায়ে কিরাম ও মাশাইখ-এ 'ইজাম দ্বারা তা পরিপূর্ণ ছিল এবং নিবন্ধ রচনা ও গ্রন্থ প্রণয়ন, ওয়াজ-নসীহত ও পথ-প্রদর্শন এবং দাওয়াত ও তবলীগের কাজ পূর্ণোদ্যমে চলছিল এবং এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই যে, বিজ্ঞ 'উলামায়ে কিরাম এবং কুরআন-সুন্নাহ্র বাহকগণ এই প্রকাশ্য শির্ক ও নিন্দিত জাহিলিয়াতকে কোনক্রমেই সহ্য করেন নি এবং লেখনীর মাধ্যমে অবশ্যই এর বিরোধিতা করে থাকবেন। কিন্তু এমনতরো মহান 'উলামা যাঁরা এই অবস্থার বিরুদ্ধে জিহাদী পতাকা উত্তোলন করেন এবং নিজেদের মূল্যবান জ্ঞান-সাধনা ও এক্ষেত্রের কর্মব্যস্ততা সত্ত্বেও এই বিরাট ফেতনার মুকাবিলার জন্য ময়দানে নামেন এবং সাধারণ গণমানুষকে সম্বোধন করেন এবং এই প্রকাশ্য ও সুস্পষ্ট শির্ক-এর প্রত্যাখ্যান ও বিরোধিতাকে নিজেদের জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে পরিণত করেন, হয় ছিলেন না অথবা ইতিহাসের দৃশ্যপটে অনুপস্থিত ছিলেন কিংবা তাঁদের মাঝে অত্যন্ত বিশিষ্ট ও উন্নত ব্যক্তিত্ব কেউ ছিলেন না এবং তাঁরা এই বিষয়ের উপর এমন কোন মর্যাদাপূর্ণ জ্ঞান-ভাণ্ডার স্মৃতি হিসাবে রেখেও যান নি যা তাঁদের ব্যক্তিত্ব ও সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ডের স্মৃতিকে জীবন্ত করে রাখবে। বস্তুত এই বিশ্বব্যাপী ফেতনার মুকাবিলা, তৌহিদী আকীদার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং সংস্কার ও পুনরুজ্জীবনের জন্য শায়খু'ল ইসলাম ইবনে তায়মিয়ার মত শক্তিশালী ও উন্নত ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন ছিল। অধিকন্তু সেই সব শির্কমূলক 'আকীদা ও প্রথা-পদ্ধতির বিস্তারিত পর্যালোচনা ও খতিয়ান নেওয়া এবং

---

১. কিতাবু'ন-নুবূওয়াত; ২৭৪ পৃ.।

যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতে ও শক্তভাবে প্রত্যাখ্যান করাও আবশ্যক ছিল যেসব আকীদা ও প্রথা-পদ্ধতি মুসলিম সমাজ জীবনকে ছেয়ে ফেলতে উদ্যত হয়েছিল। তওহীদের মেযাজই এই যে, তা জটিল ব্যাখ্যা এবং সাধারণ জনগণের পক্ষপাতিত্ব তথা প্রশ্রয়ের সাথে চলতে পারে না। তার জন্য আম্বিয়া আলায়হিমু'স-সালাম-এর খোলামেলা বক্তব্য এবং চূড়ান্ত ও অস্পষ্টতামুক্ত সম্বোধন পদ্ধতির প্রয়োজন ছিল যা পূর্ণত্ব, সত্য-মিথ্যার পার্থক্য নিরুপণকারীর মর্যাদায় অভিষিক্ত হতে পারত। ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) তাঁর যুগে আম্বিয়া আলায়হিমু'স-সালামের প্রতিনিধিত্বের অপরিহার্য দায়িত্ব আঞ্জাম দেন এবং فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين (অতএব তুমি নির্দেশ মাফিক দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ চালিয়ে যাও এবং মুশরিকদেরকে উপেক্ষা কর)-এর ওপর আমল করেন, যার ফল দাঁড়াল এই যে, ঐসব আকীদা-বিশ্বাস ও প্রথা-পদ্ধতির ভেতর যেসব মূর্খতা ও জাহিলিয়াত অমুসলিমদের সাথে মেলামেশা ও সাহচর্য এবং পথভ্রষ্ট ফের্কা ও স্বার্থবাজ লোকদের প্রভাবে সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল তাতে এক ব্যাপক ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়। ইসলামের তৌহিদী 'আকীদা-বিশ্বাস যা ছিল আম্বিয়া আলায়হিমু'স-সালামের প্রেরণের সর্বাপেক্ষা বড় উদ্দেশ্য এবং তাঁদের দাওয়াতের কেন্দ্রবিন্দু, তা পুনরায় পরিচ্ছন্ন হয়ে আরও উজ্জ্বলরূপে সামনে আসতে সক্ষম হয়।

ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حى عن بينة -

ইমাম ইবনে তায়মিয়ার এই একটি মাত্র কৃতিত্বপূর্ণ কর্মই যদি অবশিষ্ট থাকত, তিনি আর কিছু যদি নাও করতেন তবুও মুজাদ্দিদ হিসাবে তাঁর স্থান এবং তাঁর দাওয়াত ও অটুট সংকল্পের প্রমাণের জন্য তা হত যথেষ্ট।

তাঁর রচিত গ্রন্থের প্রভাবে তাঁর পরেও সময়-সময় ইসলামের দা'ওয়াত ও পুনর্জাগরণের ইতিহাসে এমন সব বিপ্লবী ব্যক্তিত্ব জন্ম নিতে থাকেন যাঁরা স্ব স্ব যুগের শিরকী 'আকীদা-বিশ্বাস, প্রথা-পদ্ধতি ও ঘৃণ্য জাহিলিয়াতের বিরুদ্ধে জিহাদী পতাকা উত্তোলন করেন এবং الا لله الدين الخالص (মনে রেখ, নির্ভেজাল দীন একমাত্র আল্লাহ্‌রই জন্য)-এর আওয়াজ এত সজোরে উচ্চারণ করেন যার ফলে মুসলিম বিশ্বের পাহাড়-প্রান্তর ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে।

সপ্তম অধ্যায়

দর্শন, যুক্তিবাদ ও কালামশাস্ত্রের সমালোচনা ঃ কুরআন সুন্নাহ্‌র দাওয়াতী পদ্ধতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ

বুদ্ধিবৃত্তিক সংস্কারের ক্ষেত্রে শায়খুল ইসলাম হাফিজ ইবনে তায়মিয়া (র)-র আরেকটি বিরাট অবদান হ'ল, দর্শন, যুক্তিবাদ ও কালামশাস্ত্রের বিশদ সমালোচনার গুরু দায়িত্ব তিনি আঞ্জাম দিয়েছেন এবং অকাট্য যুক্তি-প্রমাণের আলোকে কুরআন-সুন্নাহ্‌র দাওয়াতী পদ্ধতির শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরেছেন। ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র এ অবদানের গুরুত্ব অনুধাবন করতে হলে আমাদেরকে তলিয়ে দেখতে হবে মুসলিম জাহানের ভাব, চিন্তা ও মন-মানসের ওপর দর্শন ও যুক্তিবাদের তখন কি অপ্রতিহত প্রভাব ছিল এবং কেমন বৈরী পরিবেশ ও পরস্থিতিতে এ দুঃসাহসিক কাজে তাঁকে হাত দিতে হয়েছিল।

মুসলিম জাহানে গ্রীক দর্শন ও যুক্তিবাদ

খলীফা মনসুরের আমলেই[১] দর্শন ও যুক্তিশাস্ত্রের গ্রীক গ্রন্থাগার অনুবাদের বিশাল কর্মযজ্ঞ শুরু হয়ে গিয়েছিল। মু'তাযিলা সম্প্রদায় 'গরম খাবারের' মতই অনূদিত গ্রীক গ্রন্থগুলো লুফে নিল এবং বুদ্ধি-চর্চার নামে গোগ্রাসে সেগুলো গিলতে লাগল। ফলে তখন থেকেই তাদের রচনাবলীতে গ্রীকদের দার্শনিক পরিভাষার অনুপ্রবেশ শুরু হয়। তবে (আরবদের হাতে) গ্রীক শাস্ত্রের প্রকৃত উৎকর্ষ ঘটে খলীফা মামূনের হাতে। কেননা এ অনুবাদ-যজ্ঞের উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক মামূন নিজেও ছিলেন গ্রীক শাস্ত্রের একজন উঁচুদরের সমঝদার।

---

১. আনুমানিক ১৩৬ হি.

ঐতিহাসিক সা'ঈদ উন্দুলুসীর মতে, খলীফা মামূনের অনুরোধেই রোম সম্রাট কর্তৃক প্লেটো ও এ্যারিস্টটলসহ শীর্ষস্থানীয় গ্রীক দার্শনিকদের রচনা-সম্ভার 'উপঢৌকন'রূপে বাগদাদে প্রেরিত হয়। পরে মামূন সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় সেগুলোর সযত্ন অনুবাদ প্রকাশের মাধ্যমে বিদগ্ধ সমাজকে গ্রীক শাস্ত্র-চর্চায় উৎসাহিত করেন। ফলে গ্রীক-শাস্ত্র ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং দর্শন শাস্ত্রের বিজয় যাত্রা শুরু হয়। মামূনের উদার পৃষ্ঠপোষকতার বদৌলতে মুসলিম জাহানের প্রতিশ্রুতিশীল তরুণ সম্প্রদায় ও বুদ্ধিজীবী সমাজ গ্রীক শাস্ত্রে 'সর্বোচ্চ জ্ঞান' অর্জনের প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠেন। এরা প্রত্যেকে নিজ নিজ অমূল্য 'রচনাকর্ম' খলিফা মামূনের গুণগ্রাহী দরবারে পেশ করতেন আর তিনি উদার হাতে তাদের মাঝে বড় বড় পদ ও পদক বিতরণ করতেন। গ্রীক শাস্ত্রে পৃষ্ঠপোষকতার ক্ষেত্রে আব্বাসী সালতানাত এভাবেই মহান রোম সাম্রাজ্যের সমকক্ষতার দাবীদার হয়ে ওঠে।[১]

মামূনের পরেও গ্রীক গ্রন্থাগারের অনুবাদ কর্মযজ্ঞ অবাহত ছিল এবং ইতিহাসের তথ্য মতে চতুর্থ হিজরী শতকের ভেতরেই এর একটা বিরাট অংশ আরবীতে ভাষান্তরিত হয়ে গিয়েছিল।

ভাষান্তরিত এই 'গ্রীক গ্রন্থাগারে' প্লেটোসহ শীর্ষস্থানীয় সকল গ্রীক দার্শনিকের রচনাবলীই অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু মুসলিম জাহানের একাডেমিক অংগনে এ্যারিস্টটলের রচনাবলী সর্বাধিক সমাদর ও জনপ্রিয়তা লাভ করে। সম্ভবত অনুবাদ কর্মীদের ব্যক্তিগত ঝোঁক ও পসন্দের কারণেই এটা ঘটেছিল। কেননা তাদের কিছু সংখ্যক ছিলেন ঈসাপুর ও হাররান অঞ্চলের। আর অধিকাংশই ছিলেন নাস্তুরী ও য়া'কুবী সম্প্রদায়ভুক্ত খ্রিষ্টান দার্শনিক। তাছাড়া এ্যারিস্টটল নিকটতম সময়ের দার্শনিক ছিলেন এবং তাঁর রচনাবলীতে পূর্বসূরী দার্শনিকদের মতামত ও চিন্তাধারা অধিক পরিপাটি ও বিন্যস্ত আকারে পরিবেশিত হয়েছিল। ফলে ধীরে ধীরে এ্যারিস্টটলই মুসলিম জাহানে গ্রীক দর্শনের একক প্রতিনিধির আসন অলংকৃত করে বসেন এবং দর্শন ও বুদ্ধিবৃত্তির প্রতীকরূপে অখণ্ড স্বীকৃতি আদায় করে নেন। মুসলিম জাহানের জন্য এটা ছিল চরম দুভার্গ্যের বিষয়। কেননা দার্শনিকদের কাতারে এ্যারিস্টটলই এমন ব্যক্তি বিভিন্ন কারণে[২] যিনি আসমানী ভাবধারা এবং ধর্মীয় চিন্তা-চেতনার সাথে সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলেন, ছিলেন বস্তুবাদী চিন্তা-চেতনার উৎসাহী প্রবক্তা।

---

১. তাবাকাতুল উমাম, পৃ. ৪৭।

২. ইমাম ইবনে তায়মিয়ার দর্শন সমালোচনা প্রসংগে কিছু কিছু কারণের বিশদ আলোচনা আসছে।

গ্রীক দর্শনের অন্ধ অনুকরণ

গোড়ার দিকে মুসলিম দার্শনিকেরা এ্যারিস্টটলীয় দর্শন ও যুক্তিবাদকে কোনরকম বিচার-বিশ্লেষণ ছাড়া চোখ বুজে মেনে নিতে রাজি ছিলেন না; বরং স্বাধীন ও মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে তাঁর দর্শন ও যুক্তিবাদের চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণে এগিয়ে এসেছিলেন এবং যা কিছু তাঁদের বিচারে ভুল ও ত্রুটিপূর্ণ মনে হয়েছে নির্দ্বিধায় সেগুলো তাঁরা প্রকাশ করেছেন। আলিমদের অনেকেই তখন এ উদ্দেশ্যে শক্ত হাতে কলম ধরেছিলেন এবং বলতে গেলে মু'তাযিলাপন্থী আলিমদের ভূমিকাই ছিলো এক্ষেত্রে অগ্রণী। এ প্রসংগে নাযযাম ও আবু আলী জিব্বাঈর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তৃতীয় শতকে হাসান বিন মূসা নওবাখতী তাঁর "কিতাবু'ল-আরা ওয়াদ্দিয়ানাত" গ্রন্থে এ্যারিস্টটলীয় যুক্তিবাদের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় খণ্ডন করেছেন। চতুর্থ শতকে ইমাম আবু বকর বাকিল্লানী তাঁর 'দাকায়েক' গ্রন্থে দর্শনশাস্ত্রের বিভিন্ন ভ্রান্তি তুলে ধরার সাথে সাথে গ্রীক যুক্তিবাদের তুলনায় আরব যুক্তিশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন। পঞ্চম শতকে (আল-মিলাল ওয়া'ন-নিহাল প্রণেতা) 'আল্লামা 'আবদুল করীম শাহরাস্তানী পিথাগোরাসীয় ও এ্যারিস্টটলীয় দর্শনের বিরুদ্ধে একটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন এবং যুক্তিশাস্ত্রের স্বীকৃত নীতিমালার আলোকেই তাঁদের উপস্থাপিত যুক্তি-প্রমাণ খণ্ডন করেন। একই শতকের শেষ ভাগে অভ্যুদয় ঘটে মহাত্মা ইমাম গাযালী (র)-এর 'তাহাফাতু'ল-ফালাসিফা'র মত যুগান্তকারী গ্রন্থের যাঁর ক্ষুরধার লেখনী কাঁপিয়ে দিয়েছিল গ্রীক দর্শনের মজবুত দুর্গের বুনিয়াদ। এক'শ বছর পর্যন্ত প্রায় বেসামাল অবস্থা ছিল দর্শনের রথী-মহারথীদের।[১] ষষ্ঠ শতকের 'আল্লামা আবুল বারাকাত বাগদাদী এ ক্ষেত্রে আরো ব্যাপক অবদান রাখেন 'আল-মু'তাবার' গ্রন্থে। অকাট্য যুক্তি-প্রমাণের আলোকে এ্যারিস্টটলের অধিকাংশ মতামতকে তিনি ভুল প্রমাণিত করেন। এই শতকে ইমাম রাযী (র) কালামশাস্ত্রবিদ ও আশায়েরাপন্থীদের প্রতিনিধিরূপে গ্রীক দর্শনের বস্তুনিষ্ঠ ও যুক্তিনির্ভর সমালোচনায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

তবে মুসলিম জাহানে গ্রীক দর্শনের মুখপাত্ররূপে পরিচিত বুদ্ধিজীবীরা এ্যারিস্টটলের যাদুকরী ব্যক্তিত্বের দ্বারা এমনই প্রভাবিত ছিলেন যে, তাঁরা তাঁকে যাবতীয় ভুল ও সমালোচনার ঊর্ধ্বে মনে করতেন। সময়ের ধারায় এ প্রভাব ও অনুরাগ বেড়েই চলেছিল এবং দর্শন পূজারীদের মনের মন্দিরে তিনি 'দেবত্বে'র মর্যাদায় অভিষিক্ত হতে চলেছিলেন। এক্ষেত্রে প্রত্যেক উত্তরসূরিকে পূর্বসূরীর চেয়ে এক ধাপ অগ্রসর মনে হতো। দার্শনিক আবূ নসর আল-ফারাবী (মৃ. ৩৩৯ হি. ৯৫০ খৃ.) প্লেটো ও এ্যারিস্টটল সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

১ বিস্তারিত আলোচনা প্রথম খণ্ডে দেখুন।

وكان هذان الحكيمان هما مبدعان للفلسفة منشأن لاوائلها واصولها ومتممان لاواخرها وفروعها، وعليهما المعول فى قليلها وكثيرها ـ

এ উভয় দার্শনিকই হলেন দর্শনশাস্ত্রের স্থপতি, দর্শনের প্রাথমিক ও মৌলিক নীতিমালা উদ্ভাবনকারী এবং আলোচনা ও সিদ্ধান্তমালা বিন্যস্তকারী। মোটকথা, দর্শনশাস্ত্রের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল বিষয়ে তাঁদের কথাই শেষ কথা।[১]

এ্যারিস্টটল-প্রেমে দার্শনিক ইবনে সিনা (মৃ. ৪২৮ হি.) আল-ফারাবীকেও হার মানিয়েছেন। 'মানতিকু'শ-শিফা' গ্রন্থে এ্যারিস্টটলের উদ্দেশে তিনি তাঁর শ্রদ্ধা পেশ করে বলেছেন ঃ এত দীর্ঘ যুগ অতিক্রান্ত হওয়ার পরও তাঁর মতবাদ ও গবেষণায় নতুন কিছু সংযোজন করা সম্ভব হয়নি।[২]

দর্শন জগতে ইবনে সীনা-উত্তর যুগে দার্শনিক ইবনে রুশদের (মৃত. ৫৯৫ হি.) চেয়ে উজ্জ্বল কোন প্রতিভার নাম আমাদের জানা নেই। সেই তিনিও এ্যারিস্টটল প্রেমের ধারাবাহিকতায় ইবনে সীনা থেকে দু'কদম এগিয়ে ছিলেন। দর্শন আলোচনায় তাসাওউফের পরিভাষা প্রয়োগ অসংগত না হলে বলা যেতো, এ্যারিস্টটলের অস্তিত্বের মাঝে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে 'ফানা ফি'শ-শায়খ'-এর দুর্লভ মর্যাদা তিনি লাভ করেছিলেন। ইবনে রুশদের জীবনীকারের ভাষায় ঃ

اماتمجيد ابن رشد لارسطو فلا حد له فيكاد يولهه ، وقد وضع له اوصافا تجعله فوق درجات الكمال الانسانى عقلا وفضلا ـ

ولوكان ابن رشد يقول بتعدد الالهة لجعل ارسطورب الارباب ـ

এ্যারিস্টটলের প্রতি ইবনে রুশদের প্রেম ও ভক্তি এমনই মাত্রাহীন ছিল যে, পারলে তিনি তাঁর পূজোই করতেন। এমন এমন গুণ ও অভিধা তিনি তাঁর ব্যক্তিত্বে আরোপ করেছেন যা জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ক্ষেত্রে তাঁকে মানবীয় পূর্ণতার উর্ধ্বে তুলে ধরে। ইবনে রুশ্দ বহু ঈশ্বরে বিশ্বাসী হলে নিঃসন্দেহে এ্যারিস্টটলকে তিনি ঈশ্বরের ঈশ্বর বলে ঘোষণা দিতেন।[৩]

সপ্তম শতকের দার্শনিক সমাজে নাসিরুদ্দীন তূসী-র (মৃ. ৬৭২) বিশাল ব্যক্তিত্ব যথার্থ কারণেই এমনই অখণ্ড শ্রদ্ধা ও সমীহ লাভ করেছিল যে, দর্শন শাস্ত্রের একাডেমিক অংগনে 'মুহাক্কিক তূসী' নামেই তিনি পরিচিতি লাভ করেন।

---

১. আল-জামউ বায়না রায়ি'ল-হাকীমায়ন।

২. ইসলাম ও গ্রীক দর্শন প্রবন্ধ, শিবলী নো'মানী রচিত। আন্-নাদওয়াহ প্রথম বর্ষ, মানতিকু'শ-শিফা গ্রন্থের উদ্ধৃতিসহ।

৩. তারীখু ফালাসিফাতি'ল-ইসলাম ফি'ল-মাশরিক ওয়া'ল-মাগরিব; লুতফী জুম'আকৃত, পৃ. ১৫৫।

এটা মুসলিম জাহানের সেই নাযুকতম সময়ের কথা যখন তাতারী হামলার মুখে ইসলামী খিলাফতের প্রাণকেন্দ্র বাগদাদের পতনের কারণে গোটা উম্মাহ্ বিপর্যস্ত ও বিধ্বস্ত অবস্থায় উপনীত হয়েছিল এবং এক ভয়ংকর বুদ্ধিবৃত্তিক অবক্ষয়ের চোরাবালিতে তলিয়ে যাচ্ছিল। সে সময় হালাকু খানের বিশেষ প্রিয়পাত্র মুহাক্কিক তূসীই ছিলেন গ্রীক জ্ঞান ও দর্শনের ধারক, বাহক ও রক্ষক। তাঁর কৃতী ছাত্রদের হাতেই গোড়াপত্তন হয়েছিলো ইরানের দর্শন ও যুক্তিবাদ প্রধান শিক্ষা ব্যবস্থার[১] এবং তাদের সুযোগ্য নেতৃত্বেই পরিচালিত হয়ে আসছিল পঠন-পাঠন এবং রচনা ও গবেষণার সকল কর্মকাণ্ড। নাসিরুদ্দীন তূসী ছিলেন সেই চিন্তাধারার অনুসারী যারা এ্যারিস্টটলকে 'আদি প্রজ্ঞা'র মর্যাদা দিয়েছিলেন এবং তাঁর গবেষণা ও মতামতকেই শেষ কথা বলে বিশ্বাস করে বসেছিলেন। তাই ইমাম রাযীর মুকাবিলায় এ্যারিস্টলের পক্ষ নিয়ে কোমর বেঁধে তিনি মাঠে নামলেন। ফলে ঝিমিয়ে পড়া এ্যরিস্টটলীয় দর্শন ও যুক্তিবাদে নতুন প্রাণের সঞ্চার হল।

দর্শন ও যুক্তিবাদের বুদ্ধিবৃত্তিক মূল্যায়নে ইবনে তায়মিয়ার অবদান

নাসিরুদ্দীন তূসীর মৃত্যুর দশ বছর পর শায়খুল ইসলাম আল্লামা ইবনে তায়মিয়া (র) জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনের যখন শুরু তখন নাসিরুদ্দীন তূসী ও তাঁর ছাত্রদের বদৌলতে গ্রীক দর্শন ও যুক্তিবাদ তথা এ্যারিস্টটলীয় দর্শন ও যুক্তিবাদেরই জয় জয়কার ছিল সর্বত্র এবং এ ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জনই ছিল তখনকার সমাজে মেধা ও শ্রেষ্ঠত্বের চূড়ান্ত মাপকাঠি। সুতরাং দর্শন ও যুক্তিবাদের সমালোচনায় মুখ খোলার দুঃসাহস ছিল না কারো। হাদীস ও ফিকাহবিদরা এ ময়দানের 'শাহসওয়ার' ছিলেন না। তাই দর্শন ও যুক্তিবাদের বিরুদ্ধে তাঁরা খুব কড়া ভাষায় ফতওয়া জারি করতে পারতেন বটে, কিন্তু তাতে এ বুদ্ধিবৃত্তিক ফেতনার সর্বনাশা সয়লাব রোধ হতো না। কেননা চিন্তা ও বুদ্ধির জগতে দর্শন ও যুক্তিবাদ স্বীয় আসন পাকাপোক্ত করে নিয়েছিল অনেক আগেই এবং দর্শন ও যুক্তিবাদীদের মন-মগজে সংশয়বাদ শিকড় গেড়ে বসেছিল বেশ গভীরভাবেই। এমন কি ক্ষেত্র বিশেষে সকল বস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকার করার প্রবণতাও বিদ্যমান ছিল। পক্ষান্তরে দর্শন ও যুক্তিবাদের সাথে যে মহলটির প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল না তারা হয়ে পড়েছিল ভীতি ও হীনমন্যতার অসহায় শিকার। এ সর্বনাশা ফেতনার সফল মুকাবিলা করার জন্য প্রয়োজন ছিল এমন সাহসী পুরুষের যিনি নির্ভীক সমালোচনা ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে

১. তূসীর ছাত্রদের মাঝে কুতুবুদ্দীন সিরাজী ও কুতবুদ্দীন রাযীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পরবর্তী যুগের অধ্যয়ন-অধ্যাপনার কর্ণধার আল্লামা সাইয়িদ শরীফ ছিলেন কুতবুদ্দীন রাযীর ছাত্র। তাঁর শিক্ষা দর্শনই ভারতবর্ষে প্রসার লাভ করে। আজকের প্রচলিত দরসে নিযামী সে শিক্ষা ব্যবস্থারই উন্নত অথবা বিকৃত রূপ।

দর্শন ও যুক্তিবাদের তত্ত্বগত ভুল ও দুর্বলতাগুলো তুলে ধরতে পারবেন পূর্ণ আত্মপ্রত্যয়ের সাথে। বলাই বাহুল্য, সময়ের সে মহাপ্রয়োজনই পূরণ করেছিলেন শায়খুল ইসলাম 'আল্লামা ইবনে তায়মিয়া (র)। বলতে গেলে দর্শন ও যুক্তিবাদের মুক্ত সমালোচনা ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিচার-বিশ্লেষণই ছিল তাঁর জীবনের প্রধান মিশন। এভাবে ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) এমন এক পূজনীয় ব্যক্তিত্বের (এ্যারিস্টটলের) বিরুদ্ধে তর্কযুদ্ধ ও বুদ্ধিবৃত্তিক সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, মুসলিম জাহানের দার্শনিকবৃন্দ যাকে অতিমানবীয় সত্তারূপে বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলেন এবং যাঁর চিন্তাধারার বিন্দুমাত্র সমালোচনাও ছিল অমার্জনীয় অপরাধ।

ইবনে তায়মিয়া (র)-র সমালোচনা, মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণের ধরন ও প্রকৃতি এবং দৃষ্টিকোণ ও ভিত্তি কি ছিল? এ প্রশ্নের উত্তর তাঁর রচনাসম্ভার থেকে সংগ্রহ করাই অধিক যুক্তিযুক্ত হবে। তাই নিচে বিভিন্ন শিরোনামে তাঁর রচনাবলীর সংক্ষিপ্তসার ও উদ্ধৃতি পেশ করা হচ্ছে। আশা করি এভাবে ইমাম সাহেবের চিন্তাধারা ও গবেষণা পদ্ধতি আমাদের সামনে পরিস্ফুট হয়ে উঠবে।

গণিত ও প্রকৃতি বিজ্ঞানে গ্রীক অবদানের স্বীকৃতি

গ্রীক দার্শনিকদের, বিশেষ করে এ্যারিস্টটলের গবেষণাকর্ম ও রচনাসম্ভার সম্পর্কে ইমাম ইবনে তায়মিয়ার মতামত ও মন্তব্য খুবই ভারসাম্যপূর্ণ ও বস্তুনিষ্ঠ। প্রথমেই তিনি গণিত, প্রকৃতি বিজ্ঞান ও অতিপ্রাকৃত জ্ঞানের মাঝে সুস্পষ্ট পার্থক্য রেখা টেনেছেন। অতঃপর পূর্বসূরী ইমাম গাযালী (র)-র মত তিনিও গণিত ও প্রকৃতি বিজ্ঞানের অধিকাংশ সিদ্ধান্তের বিশুদ্ধতা মেনে নিয়ে এ ক্ষেত্রে গ্রীক পণ্ডিতদের অসাধারণ মেধা ও সাফল্যের স্বীকৃতি দিয়েছেন অকুণ্ঠ চিত্তে। তাঁর ভাষায় ঃ

نعم لهم فى الطبعيات كلام غالبه جيد وهوكلام كثيرواسع ولهم عقول عرفوا بها ذلك وهم قد يقصدون الحق لايظهر عليهم العناد -

প্রকৃতি বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে তারা যে সুদীর্ঘ ও বিস্তৃত আলোচনা করেছেন সেগুলোর অধিকাংশই গ্রহণযোগ্য। অবশ্য তা বোঝবার মত মেধাও তাঁদের ছিল, আর এও ঠিক, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁরা অবিমৃষ্যকারিতা মুক্ত ও সত্যসন্ধানী ছিলেন।[১]

---

১. আর-রাদ্দুআলা'ল-বাকরী, পৃ. ২৪৩।

অন্যত্র তিনি পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন, গণিত, প্রকৃতি বিজ্ঞান ইত্যাদিই হলো গ্রীক পণ্ডিত ও বিজ্ঞানীদের মূল বিষয় এবং তাঁদের চিন্তা ও গবেষণার সঠিক ক্ষেত্র। তাঁর ভাষায় ঃ

لكن لهم معرفة جيدة بالامور الطبعية، وهذا بحر علمهم وله تفرغوا وفيه ضيعوا زمانهم -

প্রকৃতি বিজ্ঞানে তাঁদের জানাশোনা পর্যাপ্ত ছিল। মুলত এটাই ছিল তাঁদের বিশেষজ্ঞতার ক্ষেত্র এবং নিজেদের মেধা ও সময়ের প্রায় সবটুকু একাজেই তাঁরা শেষ করেছেন।[১]

গ্রীক গণিত বিজ্ঞান সম্পর্কে নিজের মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি বলেনঃ

فهذه الامور وامثالها مما يتكلم فيه الحساب امر معقول مما يشترك فيه ذووا العقول ، ومامن احد من الناس الايعرف منه شيئا فانه ضرورى فى العمل ولهذا يمثلون به فى قولهم الواحد نصف الاثنين ولاريب ان قضاياه كلية واجبة القبول لاتنتقض البتة -

গণিতশাস্ত্রবিশারদের আলোচনা ও সিদ্ধান্তসমূহ এমনই স্বতঃসিদ্ধ যে, জ্ঞানী মাত্রই সেগুলো সম্পর্কে একমত এবং সকল মানুষেরই সে সম্পর্কে কিছু না কিছু জ্ঞান রয়েছে। কেননা তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক সর্বক্ষেত্রেই এর প্রয়োজনীয়তা বিদ্যমান। এক যে দুয়ের অর্ধেক সে সম্পর্কে কারই বা দ্বিমত থাকতে পারে? এ ধরনের মূলতত্ত্বগুলো নিঃসন্দেহে অবশ্য গ্রহণীয় ও অখণ্ডনীয়।[২]

বিরোধের মূল ক্ষেত্র অতিপ্রাকৃত দর্শন

মূলত ইলাহিয়্যাত তথা আল্লাহতত্ত্ব ও অতিপ্রাকৃত দর্শনই হলো গ্রীক দার্শনিকদের সাথে ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র বিরোধের ক্ষেত্র। অত্যন্ত জোরালো ভাষায় বার বার তিনি বলেছেন, ইলাহিয়্যাত ও অতিপ্রাকৃত জ্ঞানের জগতে গ্রীক দর্শন একেবারে অন্তসারশূন্য এবং গ্রীক দার্শনিকরা শিশুর মতই অজ্ঞ। তাঁর আত্মপ্রত্যয়পূর্ণ দাবী হলো, এটা যেহেতু গ্রীক দার্শনিকদের কর্ম ও গবেষণার ক্ষেত্র নয়, সেহেতু এ বিষয়ে অনধিকার চর্চা করে নিজেদেরকে তাঁরা হাস্যাস্পদই করে তুলেছেন শুধু। তাঁর ভাষায় ঃ

১. তাফসীর সুরাতি'ল-ইখলাস, পৃষ্ঠা ৫৭।
২. আর-রাদ্দু 'আলা'ল-মানতিকিয়্যীন, পৃষ্ঠা ১৩৪।

للمتفلسفة فى الطبعيات خوض وتفصيل تميزوا به بخلاف الالهيات ، فانهم من اجهل الناس بها وابعدهم عن معرفة الحق فيها، وكلام ارسطو معلمهم فيهاقليل كثير الخطاء -

দর্শনশাস্ত্র নিয়ে যারা সময় কাটান প্রকৃতি বিজ্ঞানে তাঁদের বিশেষ জ্ঞান রয়েছে বটে, তবে ইলাহিয়্যাত সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতা ও মূর্খতার কোন শেষ নেই। এ সম্পর্কে তাদের গুরু এ্যারিস্টটল অল্প-সল্প যা বলেছেন তাতে ভুলের সংখ্যা প্রচুর।[১]

প্রকৃতি বিজ্ঞানে গ্রীক দার্শনিকদের ব্যুৎপত্তি এবং অতিপ্রাকৃত বিজ্ঞানে তাঁদের অল্প বিদ্যা ভয়ংকরী অবস্থা সম্পর্কে অন্যত্র তিনি লিখেছেন ঃ

وامامعرفة الله تعالى فحظهم منها مبخوس جدا، واماملائكته وكتبه ورسله فلا يعرفون ذلك البتة ولم يتكلموافيه لا ينفى ولاباثبات وانما تكلموا فى ذلك متأخروهم الداخلون فى الملل -

আল্লাহ্‌র পরিচয় লাভে এরা বড় বঞ্চিত ও ভাগ্যাহত। আর ফিরিশতা, কিতাব ও রসূল সম্পর্কে তো এদের বলতে গেলে কোন জ্ঞানই নেই। তাই এ সম্পর্কে ইতিবাচক বা নেতিবাচক কোন বক্তব্যই তাঁদের নেই। মূলত উত্তরসূরি দার্শনিকরাই এ সম্পর্কে কিছু বক্তব্য রেখেছেন। কেননা তাঁরা বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ছিলেন।[২]

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র মতে, গ্রীক দর্শনের 'মূল স্তম্ভ' যাঁরা তাঁরাও এ কথা স্বীকার করেছেন যে, এতদ্‌সংক্রান্ত জ্ঞান অর্জনের সূত্র ও প্রাথমিক জ্ঞাতব্য বিষয়গুলোই তাদের জানা নেই। সুতরাং এ ক্ষেত্রে ইয়াকীন ও প্রত্যয় অর্জন তাদের পক্ষে খুবই দুষ্কর।

তিনি লিখেছেন ঃ

بل قدصرح اساطين الفلسفة بان العلوم الالهية لا سبيل فيها الى اليقين وانما يتكلم فيها بالاحرى والاخلق فليس لهم فيها الا الظن وان الظن لايغنى من الحق شيئا -

---

১. মা'আরিজু'ল-উসূল মিন মাজমু'আতির রাসাইলু'ল-কুবরা, পৃষ্ঠা ১৮৬।

১. তাফসীর সুরাতি'ল-ইখলাস, পৃষ্ঠা ৫৭।

দর্শনশাস্ত্রের দিকপালগণ স্পষ্ট স্বীকার করেছেন, ইলাহিয়্যাত ও আল্লাহতত্ত্বে ইয়াকীন ও প্রত্যয় লাভের কোন উপায় নেই। বড় জোর বলা চলে, "এ সম্পর্কে এটাই অধিক যুক্তিসংগত কথা।" সুতরাং দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণিত হলো, দার্শনিকদের কাছে আন্দাজ অনুমান ছাড়া কিছুই নেই। আর কুরআনের ভাষায়, "আন্দাজ অনুমান সত্যের বিকল্প হতে পারে না।"[১]

গ্রীক অতিপ্রাকৃত দর্শন এবং ঐশী জ্ঞানের তুলনামূলক আলোচনা

গ্রীক দার্শনিকদের ইলাহিয়াত সংক্রান্ত অনুমান নির্ভর বক্তব্যের চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণের পর ক্ষুব্ধ বিস্ময়ে ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) প্রশ্ন রেখেছেন নবী-রসূলদের ঐশী জ্ঞান ও প্রজ্ঞার মুকাবিলায় নিজেদের বাজে আন্দাজ-অনুমানগুলো পেশ করার নির্বোধ আস্পর্ধা তারা দেখায় কি করে? অত্যন্ত আবেগপূর্ণ ভাষায় তিনি লিখেছেন ঃ

> দর্শনের আদি গুরু এ্যারিস্টটলের ইলাহিয়াত সংক্রান্ত আলোচনা খুঁটিয়ে দেখলে যে কোন সচেতন পাঠক এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য হবেন, রাব্বু'ল-'আলামীনের পরিচয় সম্পর্কে অজ্ঞতার ক্ষেত্রে গ্রীক দার্শনিকদের সত্যিই কোন তুলনা নেই। তা সত্ত্বেও কিছু সংখ্যক অর্বাচীন যখন গ্রীকদের অতিপ্রাকৃত দর্শনকে রসূলদের ঐশী জ্ঞান ও শিক্ষার মুকাবিলায় টেনে আনে তখন বিস্ময়ে বেদনায় নির্বাক হয়ে যাওয়া ছাড়া কোন উপায় থাকে না। কেননা ব্যাপারটি তখন গ্রাম্য জমিদারকে শাহানশাহের সাথে তুলনা করার মত দাঁড়ায়, বরং আরো জঘন্য। কেননা শাহানশাহ যেমন গোটা সাম্রাজ্যের ব্যবস্থাপক, তেমনি জমিদার তাঁর গাঁয়ের ব্যবস্থাপক, সুতরাং উভয়ের মাঝে একটা দূরতম সাদৃশ্য অন্তত রয়েছে। অথচ নবী ও দার্শনিকদের মাঝে সেটকুও নেই। কেননা নবীরা যে 'ইল্ম ধারণ করেন সে সম্পর্কে দার্শনিকদের বিন্দুমাত্র জ্ঞান নেই, এমন কি তার ধারে কাছে ঘেঁষাও তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। সত্য বলতে কি, ইয়াহূদী ও খ্রিস্টান ধর্মনেতারাও আল্লাহ্-তত্ত্বে তাঁদের চেয়ে অধিক অবগত। এখানে আমি কিন্তু ওহীনির্ভর 'ইলমের কথা বোঝাতে চাচ্ছি না। সে 'ইল্ম আমাদের আলোচনার বিষয়ই নয়। কেননা তা শুধু নবীদেরই বৈশিষ্ট্য, অন্যদের তাতে কোন অংশ নেই। আমি 'আকল ও বুদ্ধিজাত সেই 'ইলমের কথাই বোঝাতে চাচ্ছি যার সম্পর্ক হল তাওহীদ ও রিসালাতের সাথে, (আল্লাহ্র) যাত ও সিফাত তথা সত্তা ও গুণের পরিচয়ের সাথে এবং পরকাল ও পরকালীন সৌভাগ্যের নিয়ামক 'আমলগুলোর সাথে, যেগুলোর অধিকাংশই নবীরা 'আকল ও বুদ্ধিজাত

---

১. নাকযু'ল-মানতিক, পৃষ্ঠা ১৭৮

প্রমাণাদির সাহায্যে বয়ান করেছেন। দীন ও শরীয়তের এই 'বুদ্ধিজাত' ইলম সম্পর্কেই আমাদের দার্শনিক বন্ধুরা সম্পূর্ণ বেখবর॥ 'ওহীনির্ভর' 'ইলমের তো প্রশ্নই আসে না। কেননা সেগুলো নবীদের একক বৈশিষ্ট্য। সুতরাং দর্শন ও নববী 'ইলমের তুলনামূলক আলোচনায় সে প্রসঙ্গ আমরা উত্থাপনই করব না।[১]

গ্রীক দার্শনিকদের অজ্ঞতা ও অবিমৃষ্যকারিতা

ইলাহিয়্যাত ও আল্লাহ্‌তত্ত্বে গ্রীক দার্শনিকদের জ্ঞানের দৈন্য ও বিভিন্ন গায়বী বিষয়ের অস্তিত্ব অস্বীকার করার প্রবণতা ও কারণ সম্পর্কে ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) বলেন ঃ

> নবীদের বর্ণিত গায়বী বিষয়সমূহ এবং 'আকল ও বুদ্ধিজাত' মূলতত্ত্ব (হাকীকত) সমূহ যা যাবতীয় অস্তিত্বকে বেষ্টন করার সাথে সাথে সেগুলোর নির্ভুল শ্রেণী-বিন্যাসও করে থাকে, সে সম্পর্কে দার্শনিকরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। কেননা সেগুলোর পূর্ণ অবগতি অর্জন তার পক্ষেই সম্ভব যার জ্ঞান বিদ্যমান অস্তিত্বসমূহের সকল প্রকরণকে বেষ্টন করতে সক্ষম। অথচ দার্শনিকদের জ্ঞান গণিত ও সংশ্লিষ্ট কিছু শাস্ত্রের মাঝে সীমাবদ্ধ। মূলত বিদ্যমান অস্তিত্বসমূহের খুব অল্পই তাদের জ্ঞানের পরিধিতে এসেছে। কেননা মানুষের অবলোকন ও অনুভবের অন্তর্ভুক্ত অস্তিত্বসমূহের তুলনায় অবলোকন ও অনুভব-উর্ধ্ব অস্তিত্বসমূহের সংখ্যা অনেক অনেক বেশী। এজন্যই দার্শনিকদের পরিবেশিত তথ্যাবলীর মাঝেই যাদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ এবং যারা মনে করে, তাদের জানা বিষয়ের বাইরে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই তারা নবীদের মুখে ফিরিশতা, আরশ, কুরসী, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদির আলোচনা শোনা মাত্র অবাক বনে যায় এবং নিজেদের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের আলোকে নবীদের বাণী ও বক্তব্যের এমন ব্যাখ্যা দিতে শুরু করে যার সপক্ষে তাদের হাতে কোন যুক্তি নেই। অবলোকন ও অনুভব-বহির্ভূত বিষয়গুলোর অনস্তিত্ব সম্পর্কেও তাদের কোন ইতিবাচক জ্ঞান নেই। কেননা কোন কিছুর অস্তিত্ব সম্পর্কে জ্ঞান না থাকা আর তার অস্তিত্ব না থাকা এক নয়। যা আমাদের জানা নেই তার অস্তিত্ব নেই এটা যুক্তির কথা নয়। মূলত গায়বী ও অদৃশ্য বিষয়ের অস্তিত্ব অস্বীকারকারীরা সেই চিকিৎসকের মত যিনি কিছুতেই 'জিন'-এর অস্তিত্ব স্বীকার করতে রাজি নন। কেননা চিকিৎসাশাস্ত্রে এর কোন প্রমাণ নেই। অথচ ভদ্রলোক ভেবে দেখলেন না যে, চিকিৎসাশাস্ত্রে 'জিন'-এর অস্তিত্ববিরোধী প্রমাণও তো নেই। অর্থাৎ কোন

১. আর-রাদ্দু 'আল্যাল-মানতিকিয়্যীন, ৩৯৫ পৃষ্ঠা।

শাস্ত্রে সাধারণ লোকদের তুলনায় যার জ্ঞান অধিক সে তার জ্ঞানের অহমিকায় উক্ত শাস্ত্রবহির্ভূত বিষয়গুলোকে অস্বীকার করতে শুরু করে। বস্তুত বিভিন্ন বিষয় গ্রহণ ও স্বীকার করার ক্ষেত্রে মানুষের তত বিচ্যুতি ঘটেনি। যতটা ঘটেছে অস্বীকার করার ক্ষেত্রে। কেননা যে জিনিসের হাকীকত সম্পর্কে মানুষ পূর্ণ অবগত নয় তা মিথ্যা প্রমাণিত করার এবং তার অস্তিত্ব অস্বীকার করার ঝোঁক ও প্রবণতা মানুষের আদি স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন ঃ

بل كذبوا بمالم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تأويله -

তাদের জ্ঞান যে বিষয়ের নাগাল পায়নি তা তারা অস্বীকার করে বসল, অথচ সে বিষয়ের হাকীকত এখনো তাদের কাছে পূর্ণ প্রকাশিত হয়নি।

(সূরা য়ূনুস ঃ আয়াত-৩৯)

প্রতিমা ও তারকাপূজক গ্রীস

প্রাচীন গ্রীক ইতিহাস থেকে জানা যায়, গণিতশাস্ত্র, প্রকৃতি-বিজ্ঞান ও শিল্প-সাহিত্যে অমূল্য অবদানের মাধ্যমে যে গ্রীক জাতি হাযার বছর ধরে চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষেত্রে মানব সভ্যতার নেতৃত্ব দিয়েছে তারা নিজেদের সুদীর্ঘ ইতিহাসের অধিকাংশ সময় কিন্তু তারকা ও প্রতিমা পূজায় কাটিয়েছে। ফলে তাদের চিন্তা ও বিশ্বাসের জগত ছিল হাজারো কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। আধুনিক ইতিহাস গ্রীসের প্রতিমাতত্ত্ব ও তাদের জাতীয় দেব- দেবীর অনেক অজানা তথ্য উদঘাটন করে দিয়েছে যা সন্দেহাতীতরূপেই প্রমাণ করে, প্রাচীন গ্রীসদেশের সর্বত্র দেব-দেবী ও মঠ-মন্দিরের জাল বিস্তৃত ছিল। আরবদের হাত ঘুরে যে গ্রীক দর্শন য়ূরোপে পৌছেছিল তাতে তারকা ও প্রতিমা পূজার ছাপ ও প্রভাব ছিল সুস্পষ্ট। নিজেদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও শিরকী ধ্যান-ধারণাকেই গ্রীক দার্শনিকরা দর্শনের চটকদার পরিভাষার আবরণে পরিবেশন করেছিলেন। আর গ্রীকদের ধর্মীয় ইতিহাস না জানার কারণে সেগুলোকেই মুসলিম দার্শনিকরা পরম সত্য জ্ঞানে লুফে নিলেন এবং গবেষণা ও যুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে তা সুপ্রমাণিত করার জন্য কোমর বেঁধে নেমে পড়লেন। ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র বিরল প্রজ্ঞা ও দূরদৃষ্টিই বলতে হবে যে, কয়েক শতক আগেই সকলের সামনে এ সূক্ষ্ম দিকটি তিনি তুলে ধরেছিলেন। তাঁর ভাষায় ঃ

. اما قدماء اليونان فكانوا مشركين من اعظم الناس شركا وسحرا، يعبدون الكواكب والاصنام ولهذا عظمت عناياتهم بعلم الهيئة والكواكب لاجل عبادتها وكانوا يبنون لها الهياكل -

প্রাচীন গ্রীকরা যাদু ও শির্ক বিশ্বাসে সকলকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তারকা ও প্রতিমা পূজায় তারা ডুবে ছিল। গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি ও জ্যোতির্বিদ্যা নিয়ে তাদের এত মাতামাতির রহস্য এখানেই নিহিত। এজন্য তারা রীতিমত ইবাদতখানাও তৈরি করত।[১]

অন্যত্র তিনি লিখেছেন ঃ

ولهذا كان رؤسهم المتقدمون والمتأخرون يأمرون بالشرك فالاولون يسمون الكواكب الالهة الصغرى ويعبدونها باصناف العبادات كذالك كانوا في ملة الاسلام لاينهون عن الشرك ويوجبون التوحيد بل يسوغون الشرك اويأمرون به اولايوجبون التوحيد ـ

তাদের উত্তর ও পূর্বসূরী মহারথীরা শির্কের নির্দেশ দিত। পূর্বসূরীরা গ্রহ-তারাকে ক্ষুদে খোদা নাম দিয়ে বিভিন্নভাবে সেগুলোর উপাসনা করত। মুসলমানদের মধ্যে যারা তাদের অনুসারী তাদেরও একই অবস্থা। কাউকে তারা শিরক থেকে বিরত রাখে না, তাওহীদকেও অপরিহার্য মনে করে না বরং বৈধ কিংবা জরুরী মনে করে শির্কের নির্দেশ প্রদান করে। নিদেনপক্ষে তাওহীদকে অপরিহার্য মনে করে না।[২]

পূর্ববর্তী ও পরবর্তী গ্রীক দার্শনিকদের পার্থক্য

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র সূক্ষ্মদর্শিতা ও বাস্তববোধের আরেকটি প্রমাণ হলো, পরবর্তী ও পূর্ববর্তী গ্রীক দার্শনিকদের মাঝে তিনি পার্থক্য রেখা টেনেছেন। তাঁর মতে, এ্যারিস্টটলের পূর্বসূরী দার্শনিকরা গায়বী বিষয়, ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা ও ভাবধারার সাথে অধিক পরিচিত ছিলেন। অদৃশ্য ও অজড় অস্তিত্বকে অস্বীকার করার প্রবণতা তাদের ছিল না। পক্ষান্তরে এ্যারিস্টটলের মাঝে সে প্রবণতা প্রকটভাবে আমরা দেখতে পাই। এক স্থানে তিনি লিখেছেন ঃ

এ্যারিস্টটল-ভক্ত দার্শনিকরা পূর্ববর্তীদের অনুগমন করেন নি, অথচ তারাই ছিলেন গ্রীক দর্শনের মূল স্তম্ভ। বিশ্বের নশ্বরতায় তারা যেমন বিশ্বাস করতেন, তেমনি এ বিশ্বাসও তাদের ছিল যে, দৃশ্যমান জগতের উর্ধ্বে আরেকটি জগতের অস্তিত্ব আছে। সেই উর্ধ্ব জগতের এমন কিছু বিবরণ তাঁরা দিতেন যা জান্নাত সম্পর্কে হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে। অনুরূপভাবে সক্রেটিস প্রমুখ দিকপাল দার্শনিকদের বক্তব্যে সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয়, পুনরুত্থানেও তারা বিশ্বাস করতেন।[৩]

---

১. তাফসীরু সুরাতি'ল-ইখলাস, পৃ. ৫৭। ২. নাকযু'ল-মানতিক, পৃ. ১৭৭।
৩. তাফসীরু সুরাতি'ল-ইখলাস, পৃ. ৬৭

ধর্মতত্ত্বের সাথে এ্যারিস্টটলের অপরিচয়

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) বর্ণিত এ পার্থক্যের কারণ হলো, নবী-রসূলদের পুণ্যভূমিতে প্রাচীন দার্শনিকদের যাতায়াত ছিল। ফলে ধর্মীয় তত্ত্ব ও ভাবধারার সাথে পরিচয় লাভের সুযোগ তাঁরা পেয়েছিলেন। পক্ষান্তরে এ্যারিস্টটলের জীবনে কখনো সে সুযোগ আসেনি। কতিপয় ঐতিহাসিকের বরাত দিয়ে তিনি বলেন ঃ

> দার্শনিকদের জীবন-বৃত্তান্ত যাঁরা গ্রন্থবদ্ধ করেছেন তাঁদের মতে, দর্শনশাস্ত্রের 'আদি পুরুষ' পিথাগোরাস, সক্রেটিস ও প্লেটো নবী-রসূলদের পুণ্যভূমি সিরিয়া ও অন্যান্য অঞ্চলে যাতায়াত করতেন। সেই সুবাদে লুকমান হাকীমের কাছ থেকে এবং হযরত দাউদ ও সুলায়মান (আ)-এর শিষ্যদের কাছ থেকে তাঁরা জ্ঞান আহরণ করতেন। কিন্তু এ্যারিস্টটলের জীবনে সে সকল পুণ্যভূমি সফরের সুযোগ আসেনি। ফলে পূর্বসূরীদের কাছে নবী-রসূলদের বাণী ও শিক্ষার কিছু অংশ থাকলেও তাঁর কাছে তার ছিটেফোঁটাও ছিল না, ছিল শুধু প্রতিমা-পূজকদের ধর্ম সংক্রান্ত কিছু তত্ত্ব। সেগুলোর আলোকেই তিনি অনুমাননির্ভর এক দর্শনের বুনিয়াদ রেখেছেন, যা তাঁর ভক্তরা চোখ বুজে দৈব বিধানের ন্যায় অনুসরণ করছে।[১]

দুর্ভাগ্যবশত এ্যারিস্টটলের এই অভিশপ্ত দর্শনই মুসলিম জাহানে ব্যাপক প্রসার লাভ করে এবং সমগ্র গ্রীক দর্শনের প্রতিনিধিত্বের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়। ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) লিখেছেন ঃ

ولكن هذه الفلسفة التى يسلكها الفارابى وابن سينا وابن رشد والسهروردى المقتول ونحوه فلسفة المشائين وهى المنقولة عن ارسطو الذى يسمونه المعلم الاول -

> কিন্তু আল-ফারাবী, ইবনে সীনা, ও ইবনে রুশদ প্রমুখ যে দর্শন অনুসরণ করেন মূলত তা এ্যারিস্টটল প্রবর্তিত দর্শন—দার্শনিকরা যাঁকে 'আদি গুরু' বলে থাকেন।[২]

গ্রীক দর্শনে আল্লাহ্‌র অবস্থান

এ্যারিস্টটলের দর্শনে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব নিছক কল্পনা ও চিন্তার গণ্ডীতেই আবদ্ধ। ইমাম ইবনে তায়মিয়ার ভাষায় ঃ

فاذا تصور العاقل اقوالهم حق التصور تبين له ان هذا الواحد الذى اثبتوه لا يتصور وجوده الافى الاذهان لافى الاعيان -

---

১. নাকযু'ল-মানতিক, ১১৩ পৃ. ২. আর-রাদ্দু-'আলা'ল-বাকরী, পৃ. ২০৬।

দার্শনিকদের আল্লাহ্ সম্পর্কিত মতামতগুলো কোন বিদগ্ধজন গভীরভাবে তলিয়ে দেখলে পরিষ্কার বুঝতে পারবেন, যে-একক সত্তার কথা তাঁরা বলেছেন,. তাঁর অস্তিত্ব চিন্তা ও কল্পনার রাজ্যেই শুধু সম্ভব॥ বাস্তবে তার কোন অস্তিত্ব নেই।[১]

আল্লাহ্ পাকের কর্ম ও গুণাবলী অস্বীকার করার ক্ষেত্রে দার্শনিকরা যে 'উদারতা'র পরিচয় দিয়েছেন এবং যাবতীয় সৌন্দর্য ও পূর্ণতা, কুদরত ও ক্ষমতা রহিত করার ক্ষেত্রে যে উৎসাহ দেখিয়েছেন সেদিকে ইংগিত করে ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) মন্তব্য করেছেন, আল্লাহ্র মর্যাদা ও বড়ত্বের ওপর এর চেয়ে নির্লজ্জ হামলা আর হতে পারে না। জনৈক বিদগ্ধ পণ্ডিতের মন্তব্য উদ্ধৃত করে তিনি বলেন ঃ

لقد احسن بعض الفضلاء اذقال الصفع احسن من توحيد الفلاسفة بل قصر فيما قال ـ

জনৈক বিদগ্ধ ব্যক্তি সুন্দর বলেছেন, "তাওহীদ ও একত্ববাদের দার্শনিক ধারণা হজম করার চেয়ে চপেটাঘাত সহ্য করা অনেক সহজ।" ভদ্রলোকের এ মন্তব্যও কিন্তু যথেষ্ট সংযত।[২]

মুসলিম দার্শনিকদের অন্ধ গ্রীক অনুকরণ

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র মতে, পরবর্তী মুসলিম দার্শনিকরা গ্রীক দর্শনের উচ্ছিষ্ট ভোজন ও এ্যারিস্টটলের অন্ধ অনুকরণের কারণেই বহু স্থানে মারাত্মক ভ্রান্তি ও স্ববিরোধিতার স্বীকার হয়েছেন। এইসব মুসলিম দার্শনিকদের প্রতি ইমাম সাহেবের ক্ষোভ ও ক্রোধের তাই শেষ নেই। কেননা রসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে প্রাপ্ত আল্লাহ্র মহা নেয়ামতের কোন কদর তারা করেননি এবং চোখের সামনে হিদায়াতের রৌশনি থাকা সত্ত্বেও তা থেকে উপকৃত হননি; বরং মানুষের চোখ থেকেও তা আড়াল করে রাখার অপচেষ্টায় মেতেছিলেন। তাঁর ভাষায় ঃ

ان هؤلاء المتفلسفة المتأخرين فى الا سلام من اجهل الخلق عند اهل العلم والايمان وفيهم من الضلال والتناقض مالايخفى على اذ كياء الصبيان ، لانهم لما التزموا ان لا يسلكوا الا سبيل سلفهم الضالين وان لا يقروا الا بما يبنونه على تلك القوانين

---

১. তাফসীরু সুরাতি'ল-ইখলাস-পৃ. ৩৭।

২. আর-রাদ্দ 'আলা'ল-মানতিকিয়্যীন, পৃ. ২২১।

وقد جاءهم من النور والهدى والبيان ما ملأ القلوب والالسنه والاذان صاروا بمنزلة من يريد ان يطفىء نور الشمس بالنفخ فى الهباء او يغطى ضؤها باالعباء -

ঈমান ও ইল্‌মের যারা অধিকারী তাদের চোখে পরবর্তী মুসলিম দার্শনিকরা হলো মূর্খের সেরা। কেননা তাদের ভ্রান্তি ও স্ববিরোধিতা এত সুস্পষ্ট যে, বুদ্ধিমান বালকের পক্ষেও তা বোঝা সম্ভব। আসলে তারা যেহেতু ধরেই নিয়েছেন যে, ভ্রান্ত পূর্বসূরীদের পথেই চলতে হবে এবং তাদের নীতিমালার ভিত্তি মূলের উপর তৈরী প্রাসাদেই বাস করতে হবে, সর্বোপরি হৃদয় ও কর্ণের পর্দা উন্মোচনকারী যে নূর ও হিদায়াত এসেছে তা অবশ্যই পরিহার করে চলতে হবে, তাই এরা সেই নির্বোধ ব্যক্তির মতই যে ফুঁ দিয়ে সূর্যের আলো নিভাতে চায় কিংবা চাদর দিয়ে তা আড়াল করতে চায়।[১]

নবুওয়তের মর্যাদা সম্পর্কে অজ্ঞ ইবনে সীনা

দর্শনের প্রতি অন্ধপ্রেম এবং এ্যারিস্টটলের তল্পি বহনের কারণে যে সকল মুসলিম দার্শনিক ধর্মীয় তত্ত্ব, আকীদা ও মৌলবিশ্বাসের দার্শনিক ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করেছেন এবং দর্শনের আলোকেই তা বুঝতে ও বোঝাতে চেয়েছেন, 'হুকামায়ে ইসলাম' নামে তাদের স্মরণ করা হলেও তাঁর মতে অদৃশ্য জ্ঞান ও তত্ত্বের নির্ভুল উপলব্ধি নিছক গ্রীক দর্শনের সাহায্যে এবং এ্যারিস্টটলীয় নিয়মনীতির আলোকে সম্ভব নয়। ইবনে সীনাকে মনে করা হয় ইসলামী প্রাচ্যে এ্যারিস্টটলীয় দর্শনের শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার ও মুখপাত্র। তাই ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) তাঁকেই বেছে নিয়েছিলেন তাঁর সুতীব্র সমালোচনার প্রধান লক্ষ্যস্থল রূপে। ইমাম সাহেব লিখেছেন ঃ

> ইবনে সীনা বলতে চান, "নবুওয়ত মুলত নফস ও আত্মশক্তিসমূহের একটি। আর শক্তির দিক থেকে মানুষের নফস ও আত্মার শ্রেণীর ভেতর তারতম্য অবশ্যই আছে।" বস্তুত নবুওয়তের হাকীকত ও প্রকৃতি সম্পর্কে অজ্ঞ মুর্খের পক্ষেই শুধু এমন কথা বলা সম্ভব। এটা তো সেই ব্যক্তির মতই হলো, যে শুধু কবিদের শ্রেণী সম্পর্কে অবগত হয়েই প্রমাণ করতে চায় যে, আইন বা চিকিৎসাবিদদের একটা শ্রেণীও দুনিয়াতে আছে। অর্থাৎ কবিদের বিদ্যমানতাকেই সে আইনজ্ঞ ও চিকিৎসকদের বিদ্যমানতার সপক্ষে প্রমাণরূপে দাঁড় করাতে চায়। তবু উদাহরণটা যুৎসই হলো না। কেননা চিকিৎসক ও কবির তুলনায় নবী আর অ-নবীর পার্থক্য ও দূরত্ব তো

১. আর-রাদ্দু 'আলা'ল-বাকরী, পৃ. ১১৫।

পরিমাপ করাই সম্ভব নয়। কিন্তু এই দার্শনিকরা নবুওয়তের হাকীকত ও প্রকৃতি সম্পর্কে এমনই অজ্ঞ যে, এ বিষয়টাকেও তারা গুরু দার্শনিকদের নির্ধারিত নিয়মমালার আলোকে বিশ্লেষণ করতে চাইল, অথচ নবুওয়তের হাকীকত এবং নবীদের পদমর্যাদা সম্পর্কে গুরুদের কোন ধারণাই ছিল না।[১]

অন্যত্র তিনি লিখেছেন ঃ

(এই উম্মাহর) বিভিন্ন ফেরকার মধ্যে নবুওয়তের হাকীকত ও প্রকৃতি সম্পর্কে সবচেয়ে অজ্ঞ হলো গ্রীক দর্শন পূজারী, বাতেনী ও নাস্তিক্যবাদীরা। তাদের ধারণায় নবুওয়তের বুনিয়াদ হলো এমন একটি 'সাধারণ গুণ' যা সকল মানুষের মাঝেই বিদ্যমান আছে। সেটা হলো 'স্বপ্ন'। বস্তুত এ্যারিস্টটল ও তাঁর অনুসারীদের দর্শনে নবুওয়ত সম্পর্কিত কোন আলোচনা পাওয়া যায় না। আল-ফারাবী-পন্থীদের মতে নবীর চেয়ে দার্শনিক শ্রেষ্ঠ। ইবনে সিনা অবশ্য নবুওয়তকে আরেকটু ছাড় দিয়েছেন। তাঁর মতে, নবুওয়তের বৈশিষ্ট্য তিনটি ঃ প্রথমত শিক্ষা গ্রহণ ছাড়াই নবীর শিক্ষা লাভ হয়। এর নাম তিনি দিয়েছেন 'কুওয়তে কুদসিয়াহ্' বা দৈব জ্ঞান। তবে এর হাকীকত ও প্রকৃতি 'কুওয়তে হাদসিয়াহ্' বা লব্ধ জ্ঞানেরই অনুরূপ। দ্বিতীয়ত, অন্তর্লোকে তিনি কোন জ্ঞাত বিষয়ের ধ্যান গ্রহণ করেন। ফলে মানসপটে কিছু নূরানী আকৃতি উদ্ভাসিত হয়। অতঃপর ভেতর থেকে কিছু 'বাণী' তিনি শ্রবণ করেন, ঠিক যেমন ঘুমন্ত ব্যক্তি তার মানসপটে উদ্ভাসিত আকৃতির সাথে কথোপকথনে লিপ্ত হয়, অথচ এগুলোর অস্তিত্ব শুধু তার ভেতরেই, বাইরে এর কোন অস্তিত্ব নেই। তদ্রূপ তাদের ধারণায় একজন নবী যা কিছু শ্রবণ ও অবলোকন করেন অন্যরা সে শ্রবণ ও অবলোকনের অংশীদার হয় না। কেননা এগুলো তার অন্তঃঅবলোকন। সুতরাং অন্তর্লোকেই এর অস্তিত্ব, বাইরে কোন অস্তিত্ব নেই। কারো মস্তিষ্কে অস্বাভাবিক অবস্থা সৃষ্টি হলে কিংবা পিত্ত, কফ ইত্যাদির প্রাবল্য ঘটলে তার বেলায়ও উপরিউক্ত অবস্থা দেখা দিতে পারে। তৃতীয়ত, নবী এমন এক শক্তির অধিকারী হন যার মাধ্যমে তিনি সৃষ্টিজগতের প্রকৃতিতে ব্যতিক্রম ঘটাতে পারেন। ফলে তাঁর হাতে অলৌকিক বিষয় প্রকাশ পায়। ইবনে সিনার মতে এটাই হলো নবীদের মু'জিযা। কেননা তাঁর ধারণায় বিশ্বে যা কিছু ঘটে তা আত্মিক, দৈব কিংবা প্রাকৃতিক শক্তির ফল। এই দর্শনজীবীদের ধারণায় নবীদের মনোজগতে যা কিছু ঘটে তা 'অতিক্রিয়াশীল বোধশক্তির' অবদান ছাড়া আর কিছু নয়।

---

১. আন-নুবুওয়াত, পৃ. ২২।

(নবুওয়তের এ ধারণা মগজে ধারণ করে) নবীদের বাণী ও বক্তব্যকে তারা নিজেদের মতামতের সাথে খাপ খাওয়াতে চেষ্টা করলেন। এর সহজ উপায় হিসাবে তারা শব্দ নিতেন নবীদের, কিন্তু সেগুলো ব্যাখ্যা করতেন নিজেদের বিশ্বাস ও মূলনীতির আলোকে অর্থাৎ নিজেদের বিশ্বাস ও ধারণা পরিবেশন করতেন নববী শব্দমালার আবরণে। এভাবেই তাদের রচনাবলীতে নববী শব্দপঞ্জী ও পরিভাষার ব্যাপক ব্যবহার ঘটেছে। ফলে নবী ও দার্শনিকদের উদ্দেশ্য ও উভয় উদ্দেশ্যের প্রকৃতিগত পার্থক্য সম্পর্কে যারা বে-খবর তারা মনে করে বসেন, দার্শনিকরা যা বোঝাতে চাচ্ছেন নবীদের উদ্দেশ্যও বুঝি তাই। এভাবেই বহু দল ও ফেরকা গোমরাহ হয়েছে। ইবনে সিনা ও তাঁর অনুগামীদের লেখনীতে এ বিষয়টি পরিষ্কার চোখে পড়ে।[১]

কালামশাস্ত্রের দুর্বলতা, কালামবিদদের দ্যোদুল্যমানতা

গ্রীক দার্শনিক ও তাদের অনুগামী মুসলিম দর্শনজীবীদের মাঝেই ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র সমালোচনা সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং কালামশাস্ত্রবিদদের সমালোচনায়ও তিনি সমান তৎপর ছিলেন। কেননা এই ভদ্রলোকেরা ইসলামের আত্মপক্ষ সমর্থন করেছেন সত্য, কিন্তু গায়েবী বিষয়গুলো প্রমাণ করতে গিয়ে দার্শনিকদের 'প্রমাণ পদ্ধতি ও দর্শনের সীমাবদ্ধ ও ভ্রান্তিপূর্ণ পরিভাষাই তারা ব্যবহার করেছেন, অথচ সেগুলোর স্বতন্ত্র আবেদন ও প্রভাব রয়েছে, রয়েছে আলাদা অর্থ ও তাৎপর্য। 'আন-নবুওয়াত' গ্রন্থের এক স্থানে তিনি লিখেছেন ঃ

> সৃষ্টিতত্ত্ব, স্রষ্টার অস্তিত্ব ও পুনরুত্থানের সত্যতা প্রমাণের ক্ষেত্রে কালাম শাস্ত্রবিদদের বক্তব্য 'আকল ও যুক্তির বিচারে যেমন সারগর্ভ ও সন্তোষজনক নয়, তেমনি (কুরআন-সুন্নাহর) 'নকল' ও উক্তিগত দিক থেকেও প্রামাণ্য নয়। (অর্থাৎ 'আকল ও নকল তথা 'যুক্তি' ও 'উক্তি' কোন বিচারেই তা মনোত্তীর্ণ নয়।) নিজেরাও তারা এ সত্য স্বীকার করে থাকেন। শেষ জীবনে ইমাম রাযী (র) পরিষ্কার বলেছেন ঃ দর্শন ও কালামশাস্ত্রের 'প্রমাণীকরণ পদ্ধতি' সম্পর্কে গভীর চিন্তা-ভাবনার পর আমি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি, তাতে রোগের আরোগ্য নেই এবং পিপাসা নিবারণেরও ব্যবস্থা নেই। পক্ষান্তরে কুরআন-সুন্নাহর পক্ষকেই আমি নিরাপদ ও নিকটতম পথরূপে পেয়েছি। নফী ও নেতিবাচক বর্ণনার ক্ষেত্রে নিচের আয়াত দু'টি লক্ষ্য কর।
>
> ليس كمثله شيئ -
>
> (কোন কিছুই তাঁর তুল্য নয়)

১. আন-নুবুওয়াত, পৃ. ১৬৮।

ولايحيطون به علما -

(ক্ষুদ্র জ্ঞানে তারা তাঁকে বেষ্টন করতে পারে না।)

ইছবাত ও ইতিবাচক বর্ণনার ক্ষেত্রে নীচের আয়াত ক'টি ভেবে দেখুন!

الرحمن على العرش استوى -

দয়াময় আরশে সমাসীন হলেন।

اليه يصعد الكلم الطيب -

পবিত্র বাণীসমূহ তাঁরই সমীপে আরোহণ করে।

أامنتم من فى السماءان يخسف بكم الارض -

তোমরা কি নিশ্চিত আছ যে, আকাশ অধিপতি তোমাদেরসহ ভূমিকে ধ্বসিয়ে দেবেন না।

অবশেষে তিনি বলেন, আমার মতো যে কেউ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবে তাকে এ সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে হবে। গাযালী ও ইবনে আকীল প্রায় অভিন্ন কথাই বলেছেন এবং এটাই হচ্ছে 'সত্য'।[১]

অন্যত্র তিনি লিখেছেন ঃ

মুতাকাল্লিম (কালামশাস্ত্রবিদ)-গণ স্বভাব বুদ্ধির পথ অনুসরণে যেমন ব্যর্থ হয়েছেন তেমনি নববী শরীয়তের পথ অনুসরণও তাঁদের কপালে জোটেনি। ফল দাঁড়িয়েছে, একদিকে তাঁদের স্বভাব-সারল্য লোপ পেয়েছে, অন্য দিকে শরীয়তের স্থির পথ থেকেও বিচ্যুতি ঘটেছে। বুদ্ধিজাত জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁরা 'সাফসাতাহ' ও 'নাস্তিক্যবাদে'র শিকার হয়েছেন। পক্ষান্তরে কুরআন-সুন্নাহজাত জ্ঞানের ক্ষেত্রে মাত্রাতিরিক্ত সূক্ষ্মতা ও জটিলতার আবর্তে ডুবে গেছেন।[২]

কতিপয় কালামশাস্ত্রবিদের আরেকটি মারাত্মক দুর্বলতার কথাও তিনি তুলে ধরেছেন অর্থাৎ প্রায়শ তাদের আপত্তি ও প্রশ্নগুলো হয় খুব সবল আবেদনপূর্ণ, অথচ উত্তর ও সমাধানগুলো হয় অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও আকর্ষণশূন্য। ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র মতে, মুতাকাল্লিমদেরকে ইসলামের প্রতিনিধি ও মুখপাত্র মনে করে তাদের রচনাবলীতেই নিজেদের অধ্যয়ন যারা সীমিত রেখেছেন তাদের জন্য এ 'দুর্বলতা' খুবই মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনে। তিনি বলেন ঃ

১. আন-নবুওয়াত, পৃ. ১৪৮।

২. কোন বস্তুরই অস্তিত্ব নেই, সব আমাদের স্বপ্ন, এরূপ মতবাদ।

নবুওয়ত সংক্রান্ত আলোচনায় মুতাকাল্লিমরা এমন সব প্রশ্নের অবতারণা করেন যা যেমন বেগবান তেমনি সহজে বোধগম্য। পক্ষান্তরে উত্তরগুলো হয় (তথ্য ও উপস্থাপনাগত) দুর্বলতায় নির্জীব। কিছু কিছু উদাহরণ ইতিপূর্বে আমরা পেশ করে এসেছি। ফল এই দাঁড়ায় যে, তাদের রচনাবলী থেকেই যারা 'ইলম, ঈমান ও হিদায়াতের আলো পেতে চায় তাদের আকীদা ও বিশ্বাসের ভিত কেঁপে ওঠে এবং ঈমান ও ইয়াকীনের বন্ধন শিথিল হয়ে পড়ে। কেননা তাদের ধারণায় মুতাকাল্লিমরাই হলেন ইসলামের রক্ষক, প্রতিনিধি ও কৌশলী। তাদের কাঁধেই অর্পিত হয়েছে ইসলামের যৌক্তিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক পৃষ্ঠপোষকতার সুমহান দায়িত্ব, অথচ তাদের কাছেই নবুওয়তের (সত্যতা ও প্রয়োজনীয়তার) পক্ষে সন্তোষজনক কোন যুক্তি-প্রমাণ নেই। ফলে ঈমান ও 'ইলমের পথ রুদ্ধ হয়ে পড়ে, মূর্খতা ও মুনাফেকীর দুয়ার খুলে যায়, বিশেষত তাদের জন্য এটা খুবই সর্বনাশা যাদের জানাশোনার পরিধি মুতাকাল্লিমের পরিবেশিত যুক্তি-প্রমাণেই সীমিত।[১]

দর্শন ও কালামশাস্ত্রবিদদের অভিন্ন দোষ ও দুর্বলতা

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র মতে, দর্শন ও কালামশাস্ত্রবিদরা একই ভুল করেছেন এবং এত বিরোধ সত্ত্বেও উভয় দল একই কর্মপন্থা অনুসরণ করেছেন। তাদের প্রধান দোষ ও দুর্বলতা হল, কিয়াস ও যুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে যে বিষয়ের 'ইলম' হাসিল করা সম্ভব নয় সেখানেও তারা কিয়াস ও যুক্তি প্রয়োগ করেছেন এবং 'ফিতরত ও নবুওয়াত' (স্বভাববোধ ও ঐশী জ্ঞান) উভয়ের সাথে দ্বন্দ্ব ও শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছেন। ফলে উভয় দলের চিন্তা ও গবেষণায় ভ্রান্তি প্রচুর এবং সারবত্তা কম।[২]

দীর্ঘসূত্রিতা ও কৃত্রিমতা

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র মতে, দার্শনিক ও কালামশাস্ত্রবিদদের যুক্তি ও যুক্তি-প্রয়োগ পদ্ধতি অপ্রয়োজনীয় দীর্ঘসূত্রিতা ও কৃত্রিমতা দোষে দুষ্ট। যে সকল বিষয় ও উদ্দেশ্য মুতাকাল্লিমরা দীর্ঘ ও জটিল যুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন সেগুলো আরো সহজ, সংক্ষিপ্ত ও স্বভাবোপযোগী পথ ও পন্থায় প্রমাণ করা সম্ভব, অথচ দর্শন ও কালামশাস্ত্রবিদরা তা না করে অযথা ঘুর পথ অবলম্বন করেছেন। যেমন, কাউকে জিজ্ঞাসা করা হল ঃ তোমার কান কোথায়? সে নিজের ডান হাত মাথার ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে বহু কষ্টে বাম কান পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে বলল, 'এই যে আমার কান' অথচ সহজভাবে ডান হাতে ডান কান কিংবা বাম হাতে বাম কান দেখিয়ে দিলেই হতো। প্রসংগক্রমে একটি কবিতা পংক্তি ইমাম সাহেব উদ্ধৃত করেছেন ঃ

---

১. আন-নুবুওয়াত, পৃ. ২৪০ ২. নাকযু'ল-মানতিক, পৃ. ১৬২

اقام يعمل اياما رويته وشبه الماء بعد الجهد بالماء ـ

অনেক চিন্তা-গবেষণা ও পণ্ডশ্রমের পর (সোজা পথে এসে) সে বলল, পানির পরিচয় এই যে, তা পানি।

কালামশাস্ত্রীয় যুক্তিমালা বিকল্পহীন নয়

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) মুতাকাল্লিমদের এ অন্তঃসারশূন্য দাবি মেনে নিতে মোটেই রাজি নন এ কারণে যে, আলোচ্য বিষয় ও উদ্দেশ্যগুলো প্রমাণের জন্য মুতাকাল্লিমদের 'প্রমাণীকরণ' পদ্ধতিই একমাত্র পথ, অন্য কোনভাবেই সেগুলো প্রমাণ করা সম্ভব নয়। তাঁর মতে, কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের 'প্রমাণীকরণ' পদ্ধতি ও উপাদানগুলো নির্ভুল হলেও এ ধারণা অবশ্যই ভুল যে, সেগুলো ছাড়া আর কোন প্রমাণীকরণ পদ্ধতি ও উপাদান নেই। কেননা অধ্যয়ন ও অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায়, যে বিষয়ের 'ইলম ও জ্ঞান মানুষের জন্য অধিক প্রয়োজন তার পথ ও পন্থা, উপায় ও উপকরণও সেই অনুপাতে আল্লাহ পাক সহজ ও ব্যাপক করে দেন। এজন্যই স্রষ্টার অস্তিত্ব ও একত্ব, নবুওয়তের সত্যতা ও অপরিহার্যতার প্রমাণ নিদর্শন এত অধিক এবং সেগুলো আয়ত্ত করার পথ ও পন্থাও এত প্রচুর। আসলে বেশীর ভাগ লোকেরই কালামশাস্ত্রীয় যুক্তি-প্রমাণের প্রয়োজন পড়ে না। এমন লোকেরই সেগুলোর প্রয়োজন হয় যাদের অন্য কোন বিষয়ে জ্ঞান নেই কিংবা অন্য পথ ও পন্থাগুলো যারা এড়িয়ে চলে।[১]

শ্রেণী বিশেষের উপকার

অবশ্য ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) এ কথা স্বীকার করেন, মানসিক গঠন ও প্রকৃতিগত কারণে কালাম ও যুক্তিশাস্ত্রীয় প্রমাণীকরণ পদ্ধতিই কোন কোন লোকের জন্য অধিক উপযোগী। এ ছাড়া তাদের সন্তোষ ও তৃপ্তি হয় না। তাই বলে এর অর্থ এ নয় যে, জ্ঞান ও প্রত্যয় লাভের পথ মাত্র ঐ একটিই, বরং এ হলো এক ধরনের ' বৈকল্য' যা শিক্ষা, দীক্ষা, পরিবেশ ও বিশেষ মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার ফল। তিনি বলেন ঃ

> কিছু লোকের বেলায় 'প্রমাণীকরণ' পদ্ধতি ও উপাদানগুলো যত সূক্ষ্ম, জটিল ও দীর্ঘ হয় ততই তা তৃপ্তি ও সন্তোষের কারণ হয়। কেননা সূক্ষ্ম ও জটিল চিন্তা-ভাবনার অতলে দীর্ঘ ডুব দেওয়া তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে। তাই প্রমাণ ও যুক্তির উপাদান অল্প হলে কিংবা সহজ ও বোধগম্য হলে তাদের মন তাতে আশ্বস্ত ও সন্তুষ্ট হয় না। এদের বেলায় কালাম ও যুক্তিশাস্ত্রীয় প্রমাণীকরণ পদ্ধতি প্রয়োগ করতে অবশ্য বাধা নেই। তবে

১. আর-রাদ্দু 'আলা'ল-মানতিকিয়্যীন, পৃ. ২৫৫।

এজন্য নয়, কাঙ্ক্ষিত 'জ্ঞান ও প্রত্যয়'-এর ওপর তা নির্ভরশীল; বরং এ জন্যই যে, এটাই উপরিউক্ত শ্রেণীর মানসিক অবস্থার উপযোগী। কেননা সামান্য মেধার সাধারণ লোকদের জ্ঞাত ও বোধগম্য কোন বিষয় এদের সামনে পেশ করা হলে এরা ধরেই নেয় যে, এটা গুরুত্ব পাওয়ার মত কোন কথা নয় কিংবা এর বুদ্ধিবৃত্তিক কোন মূল্য নেই। স্বভাবগত কারণেই এরা এমন জটিল ও সূক্ষ্ম যুক্তি-প্রমাণ জানতে চায় যার আনুষঙ্গিক উপাদান হবে দীর্ঘ ও প্রচুর। এদের জন্য অবশ্যই উপরিউক্ত পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে।

যুক্তি প্রয়োগের কুরআনী পদ্ধতি অধিক হৃদয়গ্রাহী ও বিশ্বাস উৎপাদক

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) তাঁর বিভিন্ন রচনায় অকাট্যভাবে প্রমাণ করে দেখিয়েছেন, দীন ও শরীয়তের গায়েবী বিষয়সমূহ প্রমাণ করার ক্ষেত্রে কুরআনের 'যুক্তি প্রয়োগ' পদ্ধতি ও বর্ণনাভংগীই বলিষ্ঠতা ও হৃদয়গ্রাহিতার দিক থেকে সর্বোত্তম ও সর্বোৎকৃষ্ট। তিনি লিখেছেন ঃ

> ঐশ্বরিক বিষয়াবলী প্রমাণের জন্য দর্শন ও কালামশাস্ত্রবিদদের উপস্থাপিত যুক্তি-প্রমাণের তুলনায় কুরআনী যুক্তিগুলোই অধিকতর পূর্ণাংগ, প্রাঞ্জল ও মর্মস্পর্শী। তদুপরি দর্শন ও কালামশাস্ত্রবিদদের বড় বড় ভুল-বিচ্যুতি থেকেও আল্লাহ্র কালাম চিরপবিত্র।[১]

অন্যত্র তিনি লিখেছেন ঃ

> আল্লাহ্র রবুবিয়াত, ইলাহিয়াত, তাওহীদ, আল্লাহ্র 'ইল্ম, কুদরত, পুনরুত্থান ইত্যাদি ঐশী বিষয় প্রমাণ করার জন্য কুরআন যে সকল যুক্তি ও কিয়াস প্রয়োগ করেছে সেগুলোই হচ্ছে সর্বোত্তম 'ইলম এবং মানুষের নফ্স ও আত্মার পূর্ণতা লাভের সর্বোৎকৃষ্ট উপায়।[২]

আল্লাহর গুণাবলী ও সত্তা সম্পর্কে কুরআন ও দর্শনের মৌলিক পার্থক্য

আল্লাহ্র যাত ও সিফাত তথা সত্তা ও গুণের বর্ণনায় কুরআন ও দর্শনের মৌলিক পার্থক্য নির্দেশ করে ইমাম ইবনে তায়মিয়া একটি সূক্ষ্ম তত্ত্ব আলোচনা করেছেন।

> আল্লাহ্র সিফাত ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে কুরআন সর্বদা বিস্তারিত বর্ণনার পথ গ্রহণ করেছে। পক্ষান্তরে নেতিবাচক ক্ষেত্রে শুধু তামছীল বা সাদৃশ্য অস্বীকার করেই ক্ষান্ত হয়েছে। যথা ঃ ليس كمثله شيء এটাই নবীদের পদ্ধতি অর্থাৎ ইতিবাচক ক্ষেত্রে 'সম্প্রসারণ' ও নেতিবাচক ক্ষেত্রে

১. আর-রাদ্দু 'আলা'ল-মানতিকিয়্যীন, পৃ. ৩২১।
২. ঐ, পৃ. ১৫০।

'সংকোচন'। পক্ষান্তরে প্রতিপক্ষের (গ্রীক দার্শনিকদের) নীতি হল, নেতিবাচক আলোচনায় তারা সর্বশক্তি ব্যয় করেন, অথচ ইতিবাচক দিকটি আলতোভাবে ছুঁয়ে যান শুধু।[১]

সমগ্র জীবনের ওপর গুণাবলী অস্বীকারের প্রভাব

সমগ্র গ্রীক গ্রন্থাগার ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণ করে। সিফাত ও গুণাবলীর না-বাচক আলোচনা গ্রীক দার্শনিকদের কাছে এত অধিক গুরুত্ব পেয়েছে যে, শাব্দিক অর্থেই আল্লাহ্ একটি নিষ্ক্রিয়, অক্ষম ও কাল্পনিক অস্তিত্বে পরিণত হয়েছেন। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ কে? কী তাঁর গুণাবলী? এ ধরনের ইতিবাচক আলোচনায় তাদের কাছে দু'চারটি অন্তঃসারশূন্য ও দুর্বোধ্য দার্শনিক পরিভাষা ছাড়া কিছুই নেই। ফল এই দাঁড়িয়েছে যে, আল্লাহ্‌র সাথে গ্রীক দর্শনপূজারীদের প্রেমময় ও প্রাণবন্ত সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারেনি কখনো। কেননা এমন সম্পর্কের জন্য আল্লাহর সিফাত ও গুণাবলীর উপস্থিতি একান্ত অপরিহার্য। অথচ দর্শন গোঁ ধরেছে সেগুলো অস্বীকার করার। পৃথিবীর গোটা বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাস প্রমাণ করে, যে সত্তার কর্ম ও গুণাবলী সম্পর্কে মানুষের কোন ধারণা নেই, তার সাথে তার হৃদয় ও আত্মার সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে না কখনো। কোন সত্তার সাথে ভয় ও প্রেম, আশা ও প্রত্যাশা এবং চাওয়া ও পাওয়ার সম্পর্কের জন্য সিফাত ও গুণাবলীর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য, অথচ গ্রীক দর্শনে তা একেবারে অনুপস্থিত। ধর্ম ও মানব চরিত্র বিষয়ক ইতিহাসবিদদের মতে এ কারণেই আল্লাহ্ ও ধর্মের সাথে গ্রীকদের সম্পর্ক ছিল নামমাত্র ও ভাসা ভাসা। তাতে কোন প্রাণ ছিল না, ছিল না গভীর উত্তাপ ও নিবিড় উষ্ণতা। ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) সত্যই বলেছেন, লক্ষ 'না'-একটি হাঁ-এর সমকক্ষ হতে পারে না। বস্তুত নিছক 'নফী' বা 'না'-এর ওপর কখনো ধর্ম ও জীবনের সুউচ্চ ইমারত গড়ে উঠতে পারে না। সম্ভবত এ কারণেই পাশ্চাত্যে গ্রীক দর্শন এবং প্রাচ্যে বৌদ্ধ ধর্ম আল্লাহ্‌র ধারণা ও বিশ্বাসের ওপর একটি আদর্শ মানব সমাজ গড়ে তুলতে মর্মান্তিকভাবে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে এ দুই দর্শন দ্বারা প্রভাবিত সমাজের একটিতে মূর্তিপূজা এবং অন্যটিতে নাস্তিকতা এত সন্তর্পণে এমন জাঁকিয়ে বসতে পেরেছে। কেননা প্রেম ও ইবাদতের স্বভাব চাহিদা ও আবেগের অধিকারী সাধারণ মানুষের মন এমন দর্শনে কিছুতেই সন্তুষ্ট ও তৃপ্ত হতে পারে না যেখানে সবটুকু মনোযোগ নিয়োজিত হয় বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা ও দর্শন-বিলাসিতায়, যে দর্শনের কোন ভূমিকা নেই হৃদয় ও আত্মাকে প্রেম ও মুহব্বত এবং ভাব ও মা'রিফতের পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে।

---

১. আন-নুবুওয়াত, পৃ. ১৫৩

সাহাবা কিরাম (রা.)-এর বৈশিষ্ট্য

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র মতে, কুরআন ও দর্শনের এ গুণগত পার্থক্যের কারণেই নবুওয়তের ছায়ায় ও নবী-সান্নিধ্যে দীক্ষাপ্রাপ্ত সাহাবায়ে কিরাম (রা.) যে 'ইল্‌ম ও মা'রিফাত হাসিল করেছিলেন ব্যাপকতায়, পূর্ণতায় ও প্রত্যয়ের গভীরতায় তা ছিল তুলনাহীন। তাকাল্লুফ ও কৃত্রিমতার নাম-গন্ধ ছিল না তাতে। সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরবর্তীকালের দর্শন ও কালামশাস্ত্র প্রভাবিত লোকদের তুলনা করে ইমাম সাহেব লিখেছেন ঃ

واصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا مع انهم اكبر الناس علما نافعا وعملا صالحا اقل الناس تكلفا يصدر عن احدهم الكلمة والكلمتان من الحكمة اومن المعارف ما يهدى الله به امة وهذا من من الله على هذه الامة وتجد غيرهم يحشون الاوراق من التكلفات والشطحات ما هومن اعظم الفضول المبتدعة والاراء المخترعة -

উত্তম ইলম ও উত্তম আমলের বিচারে সর্বোত্তম হওয়া সত্ত্বেও সাহাবা-ই কিরাম (রা) তাকাল্লুফ ও বাহ্যিকতা দোষ থেকে মুক্ত ও পবিত্র ছিলেন। একজন সাহাবীর মুখ থেকে হিকমত ও মারিফাতের এক-দু'টি শব্দ বের হতো আর তার বরকতে একেকটি জনপদের হিদায়াতের ফয়সালা হয়ে যেত। 'উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য এটা আল্লাহ্ পাকের বিরাট নিয়ামত। পক্ষান্তরে অন্য লোকেরা কৃত্রিম ও অন্তঃসারশূন্য কথা দিয়ে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ভরে ফেলে, যা অপ্রয়োজনীয় আলোচনা ও নবউদ্ভাবিত মতামতের সমষ্টি ছাড়া আর কিছু নয়।[১]

ইসলামী বিশ্বে গ্রীক যুক্তিবাদের যাদুকরী প্রভাব

যুক্তিনির্ভর ও বস্তুনিষ্ঠ বিশদ সমালোচনার মাধ্যমে গ্রীক দর্শনের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অন্তঃসারশূন্যতা প্রমাণ করার পর ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) বহু কীর্তিত গ্রীক যুক্তিবাদের সমালোচনায়ও অবতীর্ণ হয়েছেন পূর্ণ সাহসিকতা ও আত্মপ্রত্যয়ের সাথে। মুসলিম মনীষীদের ওপর মান্তিক ও যুক্তিবাদের প্রভাব দর্শনশাস্ত্রের চেয়ে বেশী বই কম ছিল না। এমন একটা ধারণা বদ্ধমূল ছিল, যুক্তিবাদ হলো আগাগোড়া বুদ্ধি দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত, নির্ভুল ও বিশুদ্ধ একটি শাস্ত্র যা সত্য-মিথ্যা নির্ধারণের একটা নির্ভরযোগ্য মাধ্যম। সাইয়েদ কুরতবীর বর্ণনা মতে, তৃতীয় শতকেই যুক্তিশাস্ত্রের গ্রন্থসমূহ ব্যাপক প্রসার লাভ করে। পঞ্চম

১. নাকযু'ল-মানতিক, পৃ. ১১৪।

শতকে ইমাম গাযালী (র)-ও যুক্তিশাস্ত্রকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন ঃ এ হচ্ছে যে কোন শাস্ত্রীয় জ্ঞান লাভের পূর্ব শর্ত, এমন কি তিনি তাঁর আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থ المستصفى-এর এক স্থানে এতদূর পর্যন্ত বলেছেন ঃ

هى مقدمة العلوم كلهاومن لا يحيط بها فلا ثقة بعلومه اصلا ـ

মানতিক হলো যাবতীয় 'ইলমের পূর্বশর্ত। এ শাস্ত্রে যার পর্যাপ্ত দখল নেই তার 'ইলমেরও কোন আস্থাযোগ্যতা নেই।[১]

অন্যত্র তিনি লিখেছেন ঃ

اما المنطقيات فاكثرها على منهج الصواب والخطاء نادر فيها وانما يخالفون اهل الحق فيها بالاصطلاحات والايرادات دون المعانى والمقاصد ، اذ غرضها تهذيب طرق الاستدلالات ذالك مما يشترك فيه النظار ـ

যুক্তিশাস্ত্রীয় নিয়ম ও সূত্রসমূহের অধিকাংশই নিখুঁত ও নির্ভুল। খুঁত ও ত্রুটি তাতে খুবই বিরল। গ্রীক যুক্তিবাদীদের সাথে হক্কানী 'আলিমদের বিরোধ মূলত পারিভাষিক ও গৌণ, মৌলিক ও উদ্দেশ্যগত কোন বিরোধ নেই। কেননা এ শাস্ত্রের উদ্দেশ্য হলো প্রমাণ ও যুক্তি প্রয়োগের কর্মকাণ্ডকে 'ত্রুটিমুক্তকরণ'। আর এ বিষয়ে সকল চিন্তানায়কই একমত।[২]

সপ্তম শতকের সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক ইবনে রুশদের মানতিক প্রীতি এমন মাত্রাতিরিক্ত ছিল যে, তাঁর ধারণায় এটা হলো মানবীয় সৌভাগ্যের উৎস ও সত্যের মাপকাঠি। এ মাধ্যমকে উপেক্ষা করে হাকীকত ও 'সত্যের' নাগাল পাওয়া সম্ভব নয়। ইবনে রুশদের জীবনীকারের ভাষায় ঃ

كان متهوسا بمنطق ارسطو وقال عنه انه مصدر السعادة للناس وان سعادة الانسان تقاس بعلمه بالمنطق والمنطق اداة تسهل الطريق الشاقة فى الوصول الى الحقيقة التى لا يصل اليها العامة بل بعض الخاصة بفضل المنطق ـ

এ্যারিস্টটলীয় যুক্তিবাদের তিনি অন্ধ প্রেমিক ছিলেন। তাঁর মতে, মানতিক ও যুক্তিবাদ হলো মানবীয় সৌভাগ্যের উৎস। কোন মানুষের সৌভাগ্যের পরিমাণ নির্ধারণ করতে হলে দেখতে হবে, যুক্তিশাস্ত্র সম্পর্কে কি পরিমাণ

১. আল-মুস্‌তাস্‌ফা, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১০।
২. ঐ, পৃ. ৩।

জ্ঞান তার আছে। এ এমন এক মাধ্যম ও উপকরণ যা 'সত্যে' উপনীত হওয়ার দুরূহ পথকে সহজ করে দেয়। আর সত্যের নাগাল পাওয়া সাধারণ 'লোকের তো বটেই, অনেক বিশিষ্ট লোকের ভাগ্যেও জোটে না।[১]

মুসলিম মনীষীরা গ্রীক যুক্তিশাস্ত্র কৃতার্থ চিত্তে গ্রহণ করেছিলেন এবং শাস্ত্রের প্রতিটি মূলনীতি, নিয়ম ও সূত্র দ্বারা দারুণভাবে প্রভাবিত ছিলেন। দর্শনশাস্ত্রের সমালোচনা ও কাটা-ছেঁড়ার কাজ মাঝে মাঝে বিরতি দিয়ে হলেও কিছু না কিছু চলে আসছিল। কিন্তু আমাদের জানা মতে স্বতন্ত্রভাবে গ্রীক যুক্তিবাদের বুদ্ধিবৃত্তিক সমালোচনা ও বিচার-বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা কেউ বড় একটা উপলব্ধি করেন নি। ফলে এ বিষয়ে তথ্যসমৃদ্ধ ও বিশদ আলোচনাপূর্ণ কোন গ্রন্থের খোঁজ পাওয়া যায় না।

যুক্তিজাত জ্ঞানের মানদণ্ড

ইবনে তায়মিয়া (র)-ই প্রথম ব্যক্তি যিনি যুক্তিশাস্ত্রকে স্বতন্ত্র বিষয় বস্তু রূপে গ্রহণ করেন এবং স্বাধীন ও সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে মুজতাহিদসুলভ সমালোচনা ও বিচার-বিশ্লেষণের দুরূহ দায়িত্ব আঞ্জাম দেন। এ বিষয়ে তাঁর সংক্ষিপ্ত রচনাকর্ম হলো نقض المنطق এবং পূর্ণাংগ ও বিশদ রচনাকর্ম হলো الرد على المنطقيين। শেষোক্ত গ্রন্থে তিনি একাডেমিক ও শাস্ত্রীয় পর্যায়ে মানতিকের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিশদ আলোচনা[২] করে দেখিয়েছেন, মুসলিম মনীষীরা শাস্ত্রটিকে যতটা গুরুত্ব দিয়েছেন এবং যতটা নির্ভুল ও দৃঢ়মূল ধরে নিয়েছেন ততটা এর প্রাপ্য নয়। ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) এ কথা মেনে নিতে মোটেই রাজি নন, যুক্তিবিদ্যাই হচ্ছে আকল ও বুদ্ধিজাত 'ইলমসমূহের বিশুদ্ধতার মাপকাঠি এবং নির্ভুল যুক্তি প্রয়োগ, সিদ্ধান্ত আহরণ ও নিশ্চিত জ্ঞান অর্জনের একমাত্র পথ। তিনি বলেন ঃ

যুক্তিবিদ্যাকে এরা আকল ও বুদ্ধিজাত জ্ঞানের মানদণ্ড মনে করে। তাদের মতে ছন্দবিদ্যা যেমন কাব্য বিষয়ের মাপকাঠি, ব্যাকরণশাস্ত্র যেমন ভাষাগত বিশুদ্ধতার রক্ষাকবচ এবং জ্যোতির্বিদ্যার যন্ত্রপাতি যেমন নির্ভুল সময় নির্ধারণের মাধ্যম, তেমনি যুক্তিশাস্ত্রের নিয়ম ও সূত্রসমূহ যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমেই চিন্তাশক্তিকে চিন্তাগত ভ্রান্তি থেকে রক্ষা করা সম্ভব।

---

১. তাবীজ ফালাসাফাতি'ল-ইসলাম, কৃত মুহাম্মদ লুতফী জুম'আ, পৃ. ১২০-১২১।

২. সম্প্রতি বইটি মাতবা' কায়্যিমা থেকে ছেপে এসেছে। এর ভূমিকা লিখেছেন মাওলানা সায়্যিদ সুলায়মান নদভী। বইটির কলেবর ৫৪৫ পৃষ্ঠা. শাস্ত্রবিশারদদের বইটি অবশ্যই পড়া দরকার।

এ দাবী বাস্তবানুগ নয়। কেননা আল্লাহ্ পাক আদম সন্তানের স্বভাবে যে বোধশক্তি গচ্ছিত রেখেছেন তার সাহায্যেই সে বুদ্ধিজাত 'ইলম ও জ্ঞান হাসিল করতে পারে। মানুষের তৈরী মানদণ্ডের ওপর তা নির্ভরশীল হতে পারে না। আরবী ভাষায় বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য 'অনুকরণ' ছাড়া উপায় নেই। কেননা এটা একটা জাতির নিজস্ব অভ্যাসের বিষয় যা সম্পূর্ণ শ্রবণ নির্ভর। সুতরাং সে নিয়ম-কানুনগুলো জানার একমাত্র মাধ্যম হলো 'ইসতিকরা' (সার্বিক অনুসন্ধান)। কিন্তু আকল ও বুদ্ধিজাত 'ইলমের ক্ষেত্রে কারো তাকলীদ বা অন্ধ অনুগমন চলে না। অনুরূপভাবে মাপ, ওজন, সংখ্যা কৃষ্টি ইত্যাদির ক্ষেত্রে মানদণ্ডের ইত্যাদির প্রয়োজন। গ্রীকশাস্ত্র উদ্ভাবনের পূর্বেও দুনিয়ার বিভিন্ন জাতি 'বস্তু'-সমূহের 'হাকীকত বা মূল সত্য' সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করত। এমন কি আলোচ্য শাস্ত্র উদ্ভাবনের পরও অধিকাংশ জাতি নিজস্ব পদ্ধতিতেই তা করে আসছে এবং দুনিয়ার বিভিন্ন জাতির অধিকাংশ জ্ঞানজীবীই 'মূল সত্য' সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্য এ্যারিস্টটল প্রণীত 'নিয়ম ও সূত্র' শেখার প্রয়োজন বোধ করেন না। নিজেদের অবস্থা তলিয়ে দেখলে এরাও নিশ্চিত বুঝতে পারবেন, উক্ত মানব-প্রণীত শাস্ত্র ছাড়াই এরা হাকীকতসমূহের জ্ঞান অর্জন করে আসছে।[১]

যুক্তিশাস্ত্রীয় সংজ্ঞাসমূহের খুঁত ও ত্রুটি

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) যুক্তিবাদীদের এ, দাবীও মানতে রাজি নন, বিভিন্ন বিষয় ও বস্তুর যুক্তিশাস্ত্র প্রদত্ত সংজ্ঞা ও পরিচয়সমূহ শাস্ত্রীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এমন নিখুঁত ও সর্বাংগীন যে, সে সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপনের কোন অবকাশই নেই। ইমাম সাহেবের ভাষায় ঃ

وصاروا يعظمون امر الحدود يدعون انهم هم المحققون لذالك وان ما يذكره غيرهم من الحدود انما هى لفظية لا تفيد تعريف الماهية والحقيقة بخلاف حدودهم ويسلكون الطرق الصعبة الطويلة والعبارات المتكلفة الهائلة وليس لذلك فائدة الا تضيع الزمان واتعاب الاذهان وكثرة الهذيان ودعوى التحقيق بالكذب والبهتان وشغل النفوس بما لا ينفعها ، بل قد يضلها عما لابدلها منه واثبات الجهل الذى هو اصل النفاق فى القلوب وان ادعوا انه اصل المعرفة والتحقيق .

১. আর-রাদ্দু 'আলা'ল-মানতিকিয়্যীন, পৃ. ২৭-২৮।

যুক্তিবাদীরা যুক্তিশাস্ত্রীয় সংজ্ঞাসমূহের মহিমা কীর্তনে বড় তৎপর। নিজেদের তারা শাস্ত্রজ্ঞ বলে জাহির করে। তাদের দাবী হলো, যুক্তিবাদ বহির্ভূত 'আলিমদের সংজ্ঞাসমূহ নিছক শব্দসর্বস্ব। ফলে তা যুক্তিবাদীদের সংজ্ঞাসমূহের ন্যায় হাকীকত ও মাহিয়াতের (মূল সত্য ও সত্তার) জ্ঞান দান করে না। বস্তুত যুক্তিবাদীরা বড় দীর্ঘ ও দুর্গম পথে চলতে এবং কৃত্রিম ও ভয়ানক বাক্য বিস্তার করতে বেশ অভ্যস্ত। কিন্তু তাতে অযথা কাজে সময়ের অপচয়, মস্তিষ্কের ক্লান্তি ও প্রলাপোক্তির মাধ্যমে পাণ্ডিত্যের মিথ্যা দম্ভ প্রকাশ ছাড়া আর কোন সার্থকতা নেই; বরং সেগুলো বিভ্রান্তি ও মূর্খতা বিস্তারের মাধ্যমে হৃদয়ে মুনাফিকীর জন্ম দেয়, যদিও তাদের দাবী মতে এগুলো মা'রিফত ও সত্য উদ্‌ঘাটনের বুনিয়াদ।[1]

খাজনার চেয়ে বাজনা বেশী

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) প্রমাণ করেছেন, গ্রীক যুক্তিবিদ্যা মানুষকে দিয়ে পাহাড় কেটে 'তিনকা' বের করে আনার পণ্ডশ্রমই শুধু করায়। নাকযু'ল-মানতিক গ্রন্থে তিনি লিখেছেন ঃ

এটা সুস্পষ্ট, বাস্তব জ্ঞানহীন চরমপন্থীরাই শুধু যুক্তিশাস্ত্রের অপরিহার্যতার দাবীদার হতে পারে। খোদ যুক্তিবাদীরাও তো অন্যান্য শাস্ত্র চর্চার ক্ষেত্রে যুক্তিবাদের নিয়ম ও সূত্রগুলো রক্ষা করেন না, বরং দীর্ঘসূত্রিতা, অর্থহীনতা, ত্রুটিপূর্ণতা, সংক্ষিপ্ততা ও দুর্বোধ্যতার কারণে তা এড়িয়ে যান। যুক্তিশাস্ত্রের কয়েকটি বিষয় তো রীতিমত পাহাড় কেটে তিনকা বের করে আনার শামিল।[2]

ভাষায় ও চিন্তায় যুক্তিবাদের প্রভাব

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র মতে যুক্তিবাদের একটি বড় ক্ষতি হল এই যে, তাতে স্বভাবের সজীবতা, চিন্তার স্বচ্ছতা ও ভাষার স্বতঃস্ফূর্ততা আশংকাজনকভাবে বাধাগ্রস্ত হয়। তাই অতিমাত্রায় যুক্তিবাদীদের চিন্তা ও রচনায় এক ধরনের দুর্বোধ্যতা, জটিলতা ও বক্রতা পরিলক্ষিত হয়। পরবর্তী যুগে রচিত শাস্ত্রীয় 'মূল গ্রন্থ' ও পাঠ্যপুস্তকগুলো এ দাবীর সত্যতার সুস্পষ্ট প্রমাণ। ইমাম সাহেবের ভাষায় ঃ

وما زال نظار المسلمين يعيبون طريق اهل المنطق ويبينون ما فيها من العى واللكنة وقصور العقل وعجز المنطق ويبينون انها الى افساد المنطق العقلى واللسانى اقرب منها الى تقويم ذالك -

---

১. আর-রাদ্দু 'আলা'ল-মানতিকিয়্যীন, পৃ. ৩১।

২. নাকযু'ল-মানতিক, পৃ. ১৫৫।

গোড়া থেকেই মুসলিম মনীষীরা যুক্তিবাদীদের কর্মধারার প্রতিবাদে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে আসছেন, তাদের রচনা ও রসনা স্বতঃস্ফূর্ততা হারিয়ে জড়তাগ্রস্ত এবং চিন্তাশক্তি স্বাভাবিক গতি হারিয়ে রুদ্ধ হয়ে পড়ে। মোটকথা, যুক্তিবাদ চিন্তা ও ভাষার উৎকর্ষ সাধন ও শক্তি জোগানের চেয়ে তাকে ক্ষতিগ্রস্তই করে বেশী।[১]

অন্যত্র তিনি লিখেছেন ঃ

اذاتسعت العقول وتصوراتها اتسعت عباراتها واذاضاقت العقول والتصورات بقى صاحبها كانه محبوس العقل واللسان ، كما يصيب اهل المنطق اليوناني ، تجده من اضيق الناس علما وبيانا واعجزهم تصورا وتعبيرا ، ولهذا من كان منهم ذكيا اذا تصرف فى العلوم وسلك مسلك اهل المنطق طول وضيق وتكلف وتعسف وغايته بيان البين وايضاح الواضح من العى وقد يوقعه ذالك فى انواع من السفسطة التى عافى الله بها من يسلك طريقه -

বুদ্ধি ও চিন্তাধারায় ব্যাপ্তি ঘটলে ভাষা ও রচনায়ও সে ব্যাপ্তির ছাপ পড়ে। পক্ষান্তরে বুদ্ধি ও চিন্তাধারায় সংকীর্ণতা দেখা দিলে মনে হবে ভাষা ও চিন্তাগত দিক থেকেও যেন সে রুদ্ধ হয়ে পড়েছে, গ্রীক যুক্তিশাস্ত্র-প্রেমিকদের বেলায় সাধারণত যেমন হয়ে থাকে। তুমি নিজেই দেখতে পাবে, জ্ঞান ও ভাষা এবং চিন্তা ও প্রকাশের দিক থেকে তারাই সর্বাধিক দুর্বল ও সংকীর্ণতাগ্রস্ত। এজন্যই তাদের হুশিয়ার লোকেরাও অন্যান্য শাস্ত্র চর্চার ক্ষেত্রে যুক্তিবাদের পাল্লায় পড়ে দীর্ঘসূত্রিতা, দুর্বোধ্যতা ও জটিলতার দোষে দুষ্ট হয়ে পড়েন। বড় জোর জ্ঞাত বিষয়কে পুনরায় বর্ণনা করা এবং স্পষ্ট বিষয়কে অধিকতর স্পষ্ট করার কৃতিত্বটুকু তারা পেতে পারেন। যুক্তিবাদের অপপ্রভাবে তাদের চিন্তা ও মেধা এবং ভাষা ও রচনা তালাবদ্ধ হয়ে পড়ে। কখনো-বা সংশয়বাদ ও বস্তুর 'সত্য' অস্বীকার করার বাতিকগ্রস্ত হয়ে পড়ে। যুক্তিবাদীদের পথ যারা এড়িয়ে চলে তারাই শুধু এ বাতিক থেকে বেঁচে থাকতে পারে।[২]

১. আর-রাদ্দু 'আলা'ল-মানতিকিয়্যীন, ১৯৪ পৃ.।

১. আর-রাদ্দু 'আলা'ল-মানতিকিয়্যীন, ১৬৭ পৃ.।

কিছু ব্যতিক্রম

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র দৃষ্টিপথে এমন কিছু ব্যক্তিত্বও রয়েছেন গ্রীক শাস্ত্র-চর্চায় শীর্ষ মর্যাদা লাভ করা সত্ত্বেও যাঁরা প্রাঞ্জল, সাবলীল ও প্রাণবন্ত রচনার কারণে উচ্চ স্তরের সাহিত্যিক স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছেন। যেমন, দর্শন ও যুক্তিবাদের দিকপাল ইবনে সীনার কাসীদাগুলোকে উচ্চাঙ্গ আরবীর উত্তম নমুনা মনে করা হয়, এমন কি তাঁর অন্যান্য রচনাতেও আরবী ভাষার সুষমা ও অলংকার সৌন্দর্যের অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছে, যা গ্রীক শাস্ত্রসেবীদের রচনাবলীতে বড় একটা নজরে পড়ে না। ইবনে তায়মিয়া (র)-র মতে, এটা মূলত ইসলামী সাহিত্যের সাথে নিবিড় সম্পর্ক এবং ইসলামী শাস্ত্রসমূহের সাথে ঘনিষ্ঠ সংযোগ রক্ষার বরকত ও সুফল। ইবনে সীনার বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবন ও ঘটনাবলী এ ধারণার সত্যতাই প্রমাণ করে। ইবনে তায়মিয়া (র)-র ভাষায় ঃ

ومن وجد فى بعض كلامه فصاحة وبلا غة كما يوجد فى بعض كلام ابن سينا وغيره فلما استفاده من المسلمين من عقولهم والسبتنهم والا فلو مشى على طريقة سلفه واعرض عما تعلمه من المسلمين لكان عقله ولسانه يشيه عقولهم والسنتهم -

ইবনে সীনা প্রমুখ দার্শনিকদের রচনাবলীতে যে অলংকার ও সৌকর্য পরিলক্ষিত হয় সেটা মূলত মুসলিম মনীষা ও সাহিত্য থেকে রসদ সংগ্রহেরই সুফল। তিনিও যদি পূর্বসূরীদের পথ ধরে চলতেন এবং মুসলিম মনীষীদের কাছ থেকে কিছুই না শিখতেন তাহলে তাঁর চিন্তা ও সাহিত্যও পূর্বসূরীদের মতই সংকীর্ণ ও জরাগ্রস্ত হয়ে পড়ত।[১]

মানতিক সম্পর্কে সামগ্রিক মন্তব্য

বিস্তৃত সমালোচনা ও পর্যালোচনার পর যুক্তিবাদ সম্পর্কে ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র সামগ্রিক মন্তব্য তাঁর নিজের ভাষায়-ই শুনুন ঃ

فحقه النافع فطرى لا يحتاج اليه وما يحتاج اليه ليس فيه منفعة الا معرفة اصطلاحهم وطريقهم وخطأهم -

যুক্তিবাদের যতটুকু অংশ বিশুদ্ধ ও উপকারী তা স্বভাবজাত। সুতরাং বিশুদ্ধ স্বভাবের অধিকারী ব্যক্তির তা শেখার প্রয়োজন নেই। পক্ষান্তরে প্রয়োজনীয় অংশটুকুর সুফলও শুধু এই যে, শাস্ত্রকারদের পরিভাষা, তাদের প্রমাণীকরণ পদ্ধতি কিংবা তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে অবগতি লাভ ঘটে।[২]

---

১. আর-রাদ্দু 'আলা'ল-মানতিকয়্যীন, ১৯৯ পৃ.।
২. প্রাগুক্ত, ২০১ পৃ.।

অন্যত্র তিনি লিখেছেন ঃ

انی کنت دائما اعلم ان المنطق الیونانی لا یحتاج الیه الذکی ولاینتفع به البلید ۔

সব সময়ই আমার বিশ্বাস ছিল, ধীমানদের জন্য গ্রীক যুক্তিবিদ্যার কোন প্রয়োজন নেই। পক্ষান্তরে বুদ্ধিবঞ্চিত ব্যক্তিরা তা থেকে কোন উপকার লাভ করতে পারবে না।[১]

যুক্তিবিদ্যার প্রাপ্য স্থান ও মর্যাদা

গ্রীক যুক্তিবাদ সম্পর্কে ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র সমালোচনায় কিছুটা অতিরঞ্জন ও প্রান্তিকতার ছাপ আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু পঞ্চম শতকের পর থেকে গোটা মুসলিম জাহানে গ্রীক যুক্তিবাদ যে যাদুকরী প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং চিন্তা ও মস্তিষ্ক যুক্তিবাদরূপী দেবতার সামনে যেভাবে প্রণত হয়ে পড়েছিল তাতে বড় ধরনের ফাটল ধরানোর জন্য এমন মারমুখী সমালোচনারই প্রয়োজন ছিল। আমাদের শিক্ষাঙ্গন ও মাদ্‌রাসা মহলে যুক্তিবাদের প্রতি কেন অনুরাগ ও সংবেদনশীলতা বিদ্যমান ছিল তা বুঝতে হলে আমাদের মনে রাখতে হবে, যাবতীয় জ্ঞান, প্রজ্ঞা, স্বভাব, মেধা ও প্রতিভা সত্ত্বেও যুক্তিবিদ্যায় সনদ নেই এমন ব্যক্তিকে মূর্খ ও নির্বোধ মনে করা হতো। দর্শন ও যুক্তিবাদ সুদীর্ঘ কাল ধরে ভারতবর্ষে মেধা ও প্রজ্ঞার শাস্ত্ররূপে পরিচিত ছিল। এ ধরনের অতিরঞ্জন ও অতিভক্তির প্রতিক্রিয়াও অত্যন্ত তীব্র হওয়া ছিল খুবই স্বাভাবিক। কেননা তীব্র প্রতিক্রিয়ার পথ ধরেই একটি ভারসাম্যপূর্ণ মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গির উন্মেষ ঘটতে পারে এবং সেটাই ছিল ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র উদ্দেশ্য। তাই এত কড়া সমালোচনার পরও আমরা তাঁকে বলতে শুনি, চিন্তার ব্যায়াম ও বুদ্ধি-চর্চার মাধ্যমে যুক্তিবিদ্যা মানুষের মেধা ও বোধকে ধারালো করতে যথেষ্ট সাহায্য করে। এতে কোন সন্দেহ নেই এবং শাস্ত্রটাকে এ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ রাখা হলে ক্ষোভ কিংবা আপত্তিরও কোন অবকাশ নেই। ইমাম সাহেবের ভাষায় ঃ

وایضا فان النظر فی العلوم الدقیقة یفتق الذهن ویدربه به ویقویه علی العلم فیصیر مثل کثرة الرمی بالنشاب ورکوب الخیل تعین علی قوة الرمی والرکوب وان لم یکن ذالك وقت قتال ، وهذا مقصد حسن ۔

এটা ঠিক যে, জটিল শাস্ত্রসমূহের অধ্যয়ন মেধাকে বিকশিত ও পরিপক্ব করে এবং জ্ঞান আহরণে শক্তি যোগায়। যেমন তীরন্দাযী ও অশ্ব চালনার

১. ঐ:

অনুশীলনের ফলে নিশানা পাকা হয় এবং অশ্বারোহণ সহজ হয়। আর যুদ্ধকালীন ছাড়াও মানুষ এগুলো অভ্যাস করে। এটা অবশ্যই মহৎ উদ্দেশ্য।[১]

কিন্তু অতি উৎসাহীরা এ শাস্ত্রকে যেভাবে মাধ্যমের পরিবর্তে উদ্দেশ্যের আসনে বসিয়েছে এবং 'ইলমের সহায়ক থেকে মূল ইলমের মর্যাদায় আসীন করেছে তাতে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ও ইনসাফপ্রিয় যে কোন ব্যক্তি দ্বিমত পোষণ করতে বাধ্য হবে।

দীন ও ইলাহ্ সংক্রান্ত তত্ত্ব ও 'সত্য' বর্ণনায় যুক্তিবাদের দৈন্য

দর্শন ও যুক্তিবাদ সম্পর্কে গোড়া থেকেই একটি অতিরঞ্জিত মনোভাব কাজ করছে। অর্থাৎ বুদ্ধিজাত 'ইলমের ন্যায় দীন ও ইলাহ্ সংক্রান্ত 'ইলমের ক্ষেত্রেও শাস্ত্রদ্বয়ের নিয়ম ও সূত্রগুলোকেও চূড়ান্ত মানদণ্ডের মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে। মুসলিম মনীষীদের এ বুদ্ধিবৃত্তিক পদস্খলন ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র নজর এড়ায় নি। বেশ জোরালো ভাষায় এ আত্মঘাতী মনোভাবের প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি বলছেন ঃ যুক্তিবাদকে বিচারকের মর্যাদা দাও, আপত্তি নেই। কিন্তু একটা নির্দিষ্ট গণ্ডীতে তাকে অবশ্যই আবদ্ধ রাখতে হবে। দীনী তত্ত্ব ও সত্যকেও উক্ত মানদণ্ডে যাচাই করার অর্থ হলো লোহা ও পাথর মাপার দাঁড়িপাল্লা দিয়ে সোনা-চাঁদি মাপার নির্বুদ্ধিতা প্রদর্শন। নাকযু'ল-মানতিক গ্রন্থে তিনি লিখেছেন ঃ

> এটাতো স্বীকৃত সত্য যে, কাঠ, সীসা ও পাথর মাপার দাঁড়িপাল্লা দিয়ে সোনা চাঁদি মাপা সম্ভব নয়। অর্থ ব্যবস্থায় সোনা-চাঁদির যে মূল্য ও গুরুত্ব, সকল জাগতিক 'ইলমের তুলনায় নবীদের বর্ণিত গায়েবী তত্ত্ব ও সত্যের মূল্য ও গুরুত্ব তার চেয়ে বহু গুণ বেশী। তোমাদের উদ্ভাবিত যুক্তিবাদ সেগুলোর সত্যাসত্য নির্ধারণের মাপকাঠি হতে পারে না। কেননা এ দাঁড়িপাল্লায় অজ্ঞতা ও অবিচার উভয় দোষ বিদ্যমান অর্থাৎ দীনী ও গায়েবী বিষয়গুলোর ওজন তথা মর্যাদা ও প্রকৃতি সম্পর্কে যুক্তিবাদীরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। সুতরাং সেগুলোর হাকীকত বর্ণনা করার যোগ্যতা তাদের নেই। অন্য দিকে সত্য প্রমাণিত হওয়ার পরও তা স্বীকার করে নিতে তারা অভ্যস্ত নয়। সুতরাং তারা অবিচারক, অথচ এ এমন এক সত্য, মানুষের কাছে যার কোন বিকল্প নেই এবং মানব জাতির সৌভাগ্য ও সফলতা যার ওপর নির্ভরশীল।[১]

১. আর-রাদ্দু 'আলা'ল-মানতিকিয়্যীন, পৃ ২৫৫

১. নাকযু'ল-মানতিক, পৃ. ১৬৪।

নবম শতকের স্বভাব-শুদ্ধ 'আলিম ও সমালোচক 'আল্লামা ইবনে খালদুনের একটি উদ্ধৃতি এখানে পেশ করা আশা করি অসংগত হবে না। কেননা তার উদ্ধৃতিতেও একই ভাব ও বক্তব্য বিধৃত হয়েছে। এ থেকে প্রমাণিত হয়, স্বভাবশুদ্ধতার কারণেই দুনিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ও বিভিন্ন সময়ের মানুষও অভিন্ন সত্যে উপনীত হতে পারে এবং তাদের চিন্তা-চেতনায় পূর্ণ সাদৃশ্য সৃষ্টি হতে পারে। দেখুন না, ইমাম ইবনে তায়মিয়ার মত 'আল্লামা ইবনে খালদুনও 'আকল ও বুদ্ধির সীমাবদ্ধতা ও দীনী ও গায়েবী তত্ত্ব ও সত্য অনুধাবনে আকলের অক্ষমতার কথা কেমন সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন তাঁর এক লেখায় ঃ

> 'আকল একটি নির্ভুল নিক্তি। সুতরাং তার সিদ্ধান্তগুলো সুনিশ্চিত সত্য। ভুলের কোন অবকাশ নেই তাতে। কিন্তু এ নিক্তিগুলো তুমি যদি তাওহীদ, আখেরাত, নবুওত এবং আল্লাহ্ ও তাঁর সিফাতসহ আকল ও বুদ্ধি-উর্ধ্ব তত্ত্ব ও সত্যগুলো মাপতে চাও তাহলে হবে তা পণ্ডশ্রম। যেমন, সোনা মাপার নিক্তি দেখে কারো সেটা ভারি পছন্দ হলো আর অমনি তার মগজে সেটা দিয়ে পাথর মাপার আগ্রহ চাপল। আগ্রহের আতিশয্যে একবারও সে ভাবল না ব্যাপারটা কত অসম্ভব! এতে কিন্তু নিক্তির বিশুদ্ধতায় কোন হেরফের হয় না। কেননা সব কিছুরই সামর্থ্যের একটা সীমা আছে। তদ্রূপ 'আকলের কর্মক্ষমতারও একটা সীমা আছে যা সে কোন অবস্থাতেই অতিক্রম করে যেতে পারে না। আল্লাহ্‌র যাত ও সিফাত তথা গুণ ও সত্তাকে 'আকল বেষ্টন করতে পারে না। কেননা আকল হচ্ছে আল্লাহ্‌র বিশাল সৃষ্টি জগতের একটি ক্ষুদ্র কণামাত্র।[১]

যুক্তিবাদের বিশদ শাস্ত্রীয় সমালোচনা এবং ইবনে তায়মিয়া (র)-র ইজতিহাদ ও সংযোজন

যুক্তিবাদের বিরুদ্ধে কিছু মৌলিক আপত্তি উত্থাপন ও সংক্ষিপ্ত সমালোচনা করেই ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) ক্ষান্ত হননি বরং একজন মুজতাহিদের দৃষ্টিতে গোটা শাস্ত্রের আগাগোড়া বিচার-বিশ্লেষণ ও বিশদ সমালোচনা-পর্যালোচনার ঐতিহাসিক দায়িত্বও তিনি আঞ্জাম দিয়েছেন অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে। শাস্ত্রের বহু স্বীকৃত উসূল ও সূত্রের ভ্রান্তি প্রমাণকল্পে তিনি নিরেট শাস্ত্রীয় দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত যুক্তিনির্ভর ও সারগর্ভ আলোচনা করেছেন এবং বিভিন্ন সংজ্ঞার খুঁত ও দুর্বলতা তুলে ধরে নিখুঁত ও সর্বাংগীন বিকল্প সংজ্ঞা পেশ করেছেন। সেই সাথে বহু কাযিয়া ও তার বিন্যাস সম্পর্কে দ্বিমত প্রকাশ করেছেন। সর্বোপরি এ্যারিস্টটলীয় যুক্তিবাদের মূল ভিত্তি কিয়াস (যুক্তিভিত্তিক

---

১. মুকাদ্দিমা ইবনে খালদূন, ৪৭৩ পৃষ্ঠা।

সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রণালী)-এর তুলনায় ইসতিকরা তথা সার্বিক অনুসন্ধানভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রণালীর শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করে তিনি বলেছেন, জ্ঞান ও প্রত্যয় লাভের এটা হচ্ছে সহজ, স্বাভাবিক ও নিরাপদ পন্থা। দর্শন ও যুক্তিশাস্ত্রে নতুন সৃষ্টি ও সংযোজন তখন অসম্ভব মনে করা হতো। কিন্তু উভয় শাস্ত্রে বেশ কিছু নতুন ধারণা ও মতবাদ সংযোজনের মাধ্যমে ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) প্রমাণ করেছেন, মানবরচিত শাস্ত্রে শেষ কথা বলে কিছু নেই। মাওলানা সায়্যিদ সুলায়মান নদভী মরহুম 'আর-রাদ্দু 'আলা'ল-মানতিকিয়্যীন' গ্রন্থের ভূমিকায় ইমাম সাহেবের এ অনন্য কীর্তি আলোচনা প্রসংগে লিখেছেন ঃ

> গভীর মনোযোগ ও অনুসন্ধিৎসা নিয়ে বইটি পড়লে দর্শন ও যুক্তিশাস্ত্র সংক্রান্ত এমন কিছু আলোচনা আপনি পাবেন ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র নিজস্ব উদ্ভাবন ও আধুনিক পাশ্চাত্য দার্শনিকদের গবেষণা ও মতবাদের সাথে যেগুলো পূর্ণ সংগতিপূর্ণ। যেমন, মুসলিম যুক্তিবাদীরা এ্যারিস্টটলের অনুকরণে বরাবর দাবী করে এসেছেন, كليات (বিধি ও সূত্রসমষ্টি)-ই হলো জ্ঞান ও প্রত্যয় লাভের বুনিয়াদ। استقراء (অনুসন্ধান প্রণালী) নয়। ফলে কোন কোন ইংরেজ লেখক সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজ যুক্তিবাদী মিল (?)-কেই 'ইসতিক্‌রা' প্রণালীর আধুনিক যুক্তিবিদ্যার ভিত্তি স্থাপনকারী বলে দাবী করেছেন, অথচ মিল-এর জন্মের কয়েক শ' বছর আগেই ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) ইসতিকরা-এর পক্ষে জোরালো যুক্তি পেশ করে গেছেন।

বুদ্ধিজাত জ্ঞানের ক্ষেত্রে অনুকরণ বৈধ নয়

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) অনুভব করলেন, তাঁর বিরোধিতা ও সমালোচনার জবাবে প্রতিপক্ষ হয়ত বলবে, কয়েক প্রজন্মের শ্রেষ্ঠ মেধা ও প্রতিভার সম্মিলিত ও নিরবচ্ছিন্ন সাধনা ও পরিশ্রমের ফলে সুপ্রাচীন গ্রীক শাস্ত্র ক্রমান্বয়ে আজ উৎকর্ষ ও পূর্ণতার এমন পর্যায়ে এসে পৌছেছে, ভুল-ত্রুটির আশংকা তাতে নেই বললেই চলে। সুতরাং পরবর্তীদের আপত্তি ও সমালোচনার অর্থ বুদ্ধিবৃত্তিক দুঃসাহস ও সময়ের অপচয় ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) এ ধরনের হীনমন্যতাকে প্রশ্রয় দিতে রাজি নন। সুস্পষ্ট ভাষায় তাই তিনি বলে দিয়েছেন, যেহেতু গ্রীকশাস্ত্র নিছক বুদ্ধিজাত শাস্ত্র এবং যেহেতু ব্যাপক অধ্যয়ন ও চিন্তা-গবেষণাই এগুলোর ভিত্তি, সেহেতু অন্ধ অনুকরণের কোন অবকাশ এখানে নেই। খোদ শাস্ত্রকাররাও তাদের শাস্ত্রকে ওহী বা অন্য কোন ঐশী সূত্রযোগে লোকপ্রাপ্ত বলে দাবী করেন নি। তাদের মতেও আকল ও বুদ্ধিই হচ্ছে আলোচ্য শাস্ত্রসমূহের উৎস। সুতরাং দেশ-কাল নির্বিশেষে সকল চিন্তা-নায়কেরই অধিকার আছে সমালোচনার কষ্টি পাথরে

সেগুলোর ভুল-শুদ্ধ পরখ করে দেখার এবং পূর্ববর্তীদের কোন সিদ্ধান্ত বুদ্ধিবিরোধী মনে হলে নির্দ্বিধায় তা প্রত্যাখ্যান করার। الرد على المنطقيين।-এর এক স্থানে তিনি কতিপয় দিকপাল যুক্তিবাদীর নিম্নোক্ত মন্তব্য উল্লেখ করেছেন ঃ

> এ এমনই পরীক্ষিত শাস্ত্র যা হাযার বছর ধরে শ্রেষ্ঠ মেধা ও প্রতিভার সযত্ন অনুশীলন ও পরিশীলনে গড়ে উঠেছে এবং প্রতি যুগের জ্ঞানী-গুণীরা তা গ্রহণ করে এসেছেন।

অতঃপর এ মন্তব্যের গ্রহণযোগ্যতা নাকচ করে দিয়ে ইমাম সাহেব লিখেছেন ঃ

هب ان الامر كذالك ، فهذه العلوم عقلية محضة ليس فيها يجوز ان تصحح بالنقل تقليد لقائل وانما تعلم بمجرد العقل فلا بل ولايتكلم فيها الابالمعقول المجردفاذادل المعقول الصريح على بطلان الباطل منها لم يجز رده، فان اهلها لم يدعوا انها ما خوذة عمن يجب تصديقه بل عن عقل محض فيجب التحاكم فيهاالى موجب العقل الصريح -

> তাদের দাবী না হয় মেনে নেয়া গেল। কিন্তু শাস্ত্রগুলো যে নিছক বুদ্ধিজাত তাতে তো কারো দ্বিমত নেই। তাহলে এ সকল ক্ষেত্রে বুদ্ধি প্রয়োগের পরিবর্তে অনুকরণের বৈধতা কোথায়? সুতরাং কারো উদ্ধৃতি ও মতামতের সাহায্যে নয়, বরং বুদ্ধি ও যুক্তির আলোকেই আলোচনা চলবে এবং সত্য-মিথ্যার মীমাংসা হবে অর্থাৎ সুস্পষ্ট কোন যুক্তি শাস্ত্রীয় সূত্র-সিদ্ধান্তকে যদি ভ্রান্ত প্রমাণিত করে তাহলে কোন অজুহাতেই বুদ্ধির দাবীকে অগ্রাহ্য করা যাবে না। কেননা খোদ যুক্তিবাদীরাও দাবী করেন নি যে, অপরিহার্য আনুগত্যের অধিকারী কোন ব্যক্তির মাধ্যমে এ শাস্ত্র প্রাপ্ত। তারাও স্বীকার করেন, বুদ্ধিই হচ্ছে আলোচ্য শাস্ত্রের উৎস। সুতরাং মুক্তবুদ্ধির যাবতীয় সিদ্ধান্ত দ্বিধাহীন চিত্তে মেনে নেয়াই হবে জরুরী।[১]

মুসলিম জাহানে বুদ্ধিজাত জ্ঞান-চর্চায় স্থবিরতা ও ইবনে তায়মিয়ার কর্মের গুরুত্ব

ইবনে তায়মিয়া (র) ঠিকই বলেছেন, বুদ্ধিজাত শাস্ত্রকে বাধ্যতামুলক-ভাবেই বুদ্ধির গণ্ডীতে অবস্থান করতে হবে, উদ্ধৃতিনির্ভর হওয়া চলবে না [illegible]তুতেই। কিন্তু ইসলামী জাহানের শিক্ষা ও বুদ্ধিবৃত্তির অঙ্গনে এমনই অবক্ষয় ও

---

১. আ[illegible] 'আলা'ল-মানতিকিয়্যীন, পৃষ্ঠা ২০৮

স্থবিরতা দেখা দিল যে, মুসলিম মেধা সৃষ্টিধর্মী কাজ ছেড়ে দিয়ে উচ্ছিষ্ট ভোজনে মেতে উঠল। দর্শন ও যুক্তিবাদীদের অবস্থাও ভিন্ন ছিল না। পূর্বসূরীদের রচনা ও গবেষণা কর্মের ব্যাখ্যা ও ভাষ্য দানই তাদের দৃষ্টিতে ছিল শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব। ফলে বুদ্ধিনির্ভর শাস্ত্র পরিণত হলো উদ্ধৃতিনির্ভর শাস্ত্রে। পূর্বসূরীদের ভাব ও বক্তব্য সবচে' কম শব্দে পরিবেশন করতে পারাই ছিল উত্তরসুরিদের জ্ঞানের শেষ দৌড়। মোটকথা, প্রাচ্যের সেই চরম অবক্ষয়ের যুগে দর্শন ও যুক্তিশাস্ত্রে ইজতিহাদ ও নব সংযোজন তথা সৃষ্টিধর্মী অবদানের দ্বার রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ইউরোপের অবস্থা ছিল ভিন্ন। ইবনে সীনা, ইবনে রুশদ প্রমুখ মুসলিম মনীষাদের মাধ্যমে গ্রীক দর্শন ও যুক্তিশাস্ত্রের ঐশ্বর্য-ভাণ্ডার লাভ করার পর কিছুদিন তারা তা নিয়েই সন্তুষ্ট ছিল। কিন্তু যথাসময়ে স্বাধীন পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণা কর্মে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল। ফলে গ্রীক দর্শন ও যুক্তিশাস্ত্রের চেহারাই পাল্টে গেল। কিয়াস (যুক্তি প্রণালী)-এর পরিবর্তে ইস্তিকরা (অনুসন্ধানভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রণালী)-এর ওপর যুক্তিবিদ্যার বুনিয়াদ রাখা হলো। সর্বোপরি জীবন যুদ্ধের সাথে প্রায় সম্পর্কহীন অতিপ্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও ঈশ্বরতত্ত্বের চেয়ে প্রকৃতি বিজ্ঞানই সর্বাধিক গুরুত্ব পেল। এই চিন্তা-বিপ্লব শুধু কেবল ইউরোপকে নয়, গোটা মানব সভ্যতাকেই বিপুলভাবে প্রভাবিত করল। পক্ষান্তরে আমাদের প্রাচীনপন্থী বুদ্ধিজীবী মহল ও বিদ্যাপীঠগুলো প্রাচ্যের গ্রীক শাস্ত্রসেবীদের রচিত ব্যাখ্যা ও টীকা গ্রন্থসমূহ এমনভাবে আঁকড়ে থাকল যে, চিন্তা-গবেষণার জগতে সেটাই যেন শেষ কথা! এমন পরিবেশে গ্রীক দর্শন ও যুক্তিশাস্ত্রে ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র ইজতিহাদ, স্বাধীন সমালোচনা ও বুদ্ধিবৃত্তিক পর্যালোচনা ইতিহাসের গতিপথে নিঃসন্দেহে একটি মাইল ফলকের মর্যাদা লাভ করেছে এবং ইজতিহাদ ও গবেষণার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে।

অষ্টম অধ্যায়

বাতিল ধর্ম ফেরকাগুলোর আকীদা-বিশ্বাসের মুকাবিলা

প্রায় সকল বাতিল মাযহাব ও ফেরকার বিরুদ্ধেই ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) খড়্গহস্ত ছিলেন। তাদের ভ্রান্ত 'আকীদা ও মতবাদের বিরুদ্ধে বুদ্ধিবৃত্তিক জিহাদ ও মসিযুদ্ধেই কেটেছে তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ। বস্তুত তাঁর রচনা-সমগ্রের খুব কম অংশই এমন পাওয়া যাবে যাতে কালামশাস্ত্রীয় আলোচনা ও তার্কিক পর্যালোচনা নেই। তবে এখানে আমরা খ্রিস্ট ধর্ম ও শিয়া মতবাদের বিরুদ্ধে ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র কলম যুদ্ধের কথাই শুধু আলোচনা করতে চাই। কেননা এ উভয় ধর্ম ও মতবাদের বিরুদ্ধে তিনি স্বতন্ত্র দু'টি আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থ[১] রেখে গেছেন। তদুপরি উভয়ের মাঝে একটি সূক্ষ্ম যোগসূত্রও বিদ্যমান রয়েছে অর্থাৎ উভয় দলই অতিরঞ্জিত প্রেমের মহড়া দিতে গিয়ে নিজেদের গোমরাহী ডেকে এনেছে। সেদিকে ইঙ্গিত করেই রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী (রা)-কে সম্বোধন করে বলেছিলেন ঃ

يهلك فيك اثنان محب غال ومبغض -

দু'টি দল তোমাকে কেন্দ্র করে হালাক হবে। একদল হবে তোমার প্রতি অতিমাত্রায় প্রেম প্রদর্শনকারী আর অন্যদল হবে বিদ্বেষ পোষণকারী।

সর্বোপরি ইবনে তায়মিয়া (র)-র যুগে এ দু'টি ধর্ম ও মতবাদই শুধু জীবন্ত ও শক্তিশালী আন্দোলনরূপে সক্রিয় ছিল। সম্ভবত এ কারণেই ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) উভয়ের বিরুদ্ধে স্বতন্ত্রভাবে কলম ধরেছিলেন।

---

১. প্রথম গ্রন্থটি হলো الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح এতে খ্রিষ্ট ধর্মের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা হয়েছে। আর দ্বিতীয়টি হলো منهاج السنة النبوية فى نقض كلام الشيعة والقدرية এটি মূল শিয়া মতবাদ খণ্ডনের উদ্দেশ্যে রচিত।

খ্রিস্ট ধর্ম খণ্ডন

মুসলিম জাহানে খ্রিস্টবাদের নতুন আন্দোলন

মুসলিম উম্মাহর রাজনৈতিক অধঃপতনের সুযোগে বিভিন্ন অঞ্চলের বাতিল ধর্ম ও মতবাদগুলো নতুন করে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। এর মধ্যে বৃহত্তম সংখ্যালঘু ধর্ম হিসাবে খ্রিস্টবাদই সবচেয়ে বেশী সাহস ও কর্মতৎপরতা প্রদর্শন করল। মিসর ও সিরিয়াসহ বিভিন্ন মুসলিম অঞ্চলে খ্রিস্টানরা বিপুল সংখ্যায় বিদ্যমান ছিল। সেই সাথে তাদের রাষ্ট্র শক্তি ছিল সিরিয়ার সীমান্ত সংলগ্ন। হিজরী পঞ্চম শতকের শেষ ভাগে সিরিয়া ও ফিলিস্তীন অঞ্চলে ইতিহাসখ্যাত ক্রুসেড নামে ইউরোপীয়দের সশস্ত্র হামলার এসব যুদ্ধে সিরিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল মুসলমানদের হাতছাড়া হয়ে গেল। ফলে সুদীর্ঘ নব্বই বছর ধরে বায়তুল মুকাদ্দাসের ওপর খ্রিস্টান শক্তির দখল ও খবরদারী কায়েম ছিল। হিত্তীন যুদ্ধে খ্রিস্টান বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে বায়তুল মুকাদ্দাস পুনরুদ্ধার করলেও সিরিয়ার উপকূলে একটি খ্রিস্টান সীমান্ত রাজ্য বহাল তবিয়তে বিদ্যমান ছিল। সিরিয়াকে তারা পুনরায় খ্রিস্টবাদ ও ক্রুসেডের ছায়াতলে ফিরিয়ে আনার খা'ব দেখতে শুরু করেছিল। তাতারী হামলা একদিকে মুসলিম শক্তিকে আধমরা করে ফেলেছিল। অন্যদিকে খ্রিস্টবাদীদের মরা দেহে নতুন প্রাণ সঞ্চার করেছিল। ফলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে নতুন উদ্যমে তারা জেগে উঠল। এ সিরিজের প্রথম খণ্ডে আমরা বলে এসেছি, ৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে তাতারীদের দামিশ্‌ক বিজয়ের মুহূর্তে খ্রিস্টান অধিবাসীরা হানাদার বাহিনীকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বাগত জানিয়েছিল। মুল্যবান উপহার-উপঢৌকন নিয়ে তাদের বরণ করেছিল, এমন কি ক্রুসেড মাথায় নিয়ে মিছিল করে সদম্ভ শ্লোগান দিয়েছিল ঃ প্রভু যিশুর ধর্ম বিজয়ী হলো।[১]

الجواب الصحيح - গ্রন্থ প্রণয়ন

খ্রিস্টান পাদ্রীরা মুসলিম আলিমদের সাথে ধর্মালোচনা কালে খ্রিস্টবাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণকল্পে বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করত। আর মুসলিম আলিমগণ সেগুলোর জবাব দেয়ার সাথে সাথে খ্রিস্ট ধর্মের ভুল-বিচ্যুতিগুলো তুলে ধরতেন। এই ধারাবাহিকতার এক পর্যায়ে সাইপ্রাসের খ্রিস্টান পাদ্রীদের লেখা একটি বিতর্ক গ্রন্থ সিরিয়ায় এসে পৌছল। তাতে যুক্তি ও উদ্ধৃতি উভয়ের সাহায্যে খ্রিস্ট ধর্মের 'আকীদা-বিশ্বাসগুলোর সারবত্তা প্রমাণের অপচেষ্টা চালানো হয়েছিল, এমন কি সীমাহীন ধৃষ্টতার সাথে এ দাবীও করা, হয়েছিল যে, মুহাম্মদ (সা) আরবের নবী, বিশ্বের নবী নন; আরব জাতির জন্যই তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন। সুতরাং খ্রিস্টান

---

১. বিস্তারিত জানতে হলে পড়ুন সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড।

তথা অন্য জাতির জন্য তাঁর ওপর ঈমান আনা জরুরী নয়। দামেশকের ধর্মীয় ও সুধী মহলে সম্ভবত বইটি বেশ গুরুত্ব লাভ করেছিল। খ্রিস্টান পাদ্রীদের এ অমার্জনীয় ধৃষ্টতার সমুচিত জবাব দেওয়ার জন্য এমন এক ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন ছিল, দর্শন, কালাম ও সকল বাতিল মতবাদ সম্পর্কে গভীর প্রজ্ঞা ও পাণ্ডিত্যের সাথে সাথে বাইবেল ও খ্রিস্টবাদের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসও যাঁর নখদর্পণে রয়েছে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-ই ছিলেন যোগ্যতম ব্যক্তি। সবার অনুরোধে তাই তিনি কলম ধরলেন এবং الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح নামে চার খণ্ডের বিশাল কলেবরের এমন আলোড়ন সৃষ্টিকারী জওয়াব লিখলেন যা যথার্থভাবেই আলোচ্য বিষয়ে এক সমৃদ্ধ বিশ্বকোষের মর্যাদা লাভ করেছে এবং ইমাম সাহেবের রচনাসমগ্রেও বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে।[১]

বস্তুত ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র এ মূল্যবান গবেষণা গ্রন্থ বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে তাঁর চিন্তার স্বচ্ছতা, দৃষ্টির গভীরতা এবং জ্ঞান ও অধ্যয়নের ব্যাপকতার এক উজ্জ্বল প্রমাণ। ইমাম সাহেব তাঁর লেখায় ইসলামের পক্ষ সমর্থন ও সাফাই পেশ করেই ক্ষান্ত হননি, বরং খ্রিস্ট ধর্মের ভিত্তিমূলেও কার্যকর হামলা চালিয়েছেন। নবুওয়তে মুহাম্মদীর সত্যতা ও সার্বজনীনতা প্রমাণের জন্য কালামশাস্ত্র ও বিতর্কবিদ্যার প্রাচীন ও গতানুগতিক যুক্তি-প্রমাণের পরিবর্তে এমন অভিনব যুক্তি-প্রমাণ তিনি পেশ করেছেন যা অধিক হৃদয়গ্রাহী ও ঈমান-উদ্দীপক। কোন সত্যসন্ধানী মানুষের পক্ষেই অতঃপর ইসলামের সত্যতা স্বীকার না করে উপায় নেই। সর্বোপরি খ্রিস্ট ধর্মের ইতিহাস ও কালামশাস্ত্র, খ্রিস্ট ধর্ম-পণ্ডিতদের জটিল ও দুর্বোধ্য বক্তব্য এবং শেষ নবীর সুসংবাদ ও ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের এত বড় ভাণ্ডার তিনি গড়ে তুলেছেন যে, বিরাট একটা গ্রন্থাগার চষে ফেলা ছাড়া তা সংগ্রহ করা কিছুতেই সম্ভব নয়। সুপ্রসিদ্ধ মিসরীয় পণ্ডিত শায়খ মুহাম্মদ আবু যুহরা যথার্থ মন্তব্য করেছেন ঃ

وان هذا الكتاب اهدأ ما كتبه ابن تيمية فى الجدال وهو وحده جدير بان يكتب ابن تيمية فى سجل العلماء العاملين والائمة المجاهدين والمفكرين الخالدين -

---

১. ১৩৯৫ পৃষ্ঠার এই বইটি ১৩২২ হিজরী, মুতাবিক ১৯০৫ খৃ. শায়খ ফরজুল্লাহ বাকী কুরদী ও শায়খ মোস্তফা দামেশ্ক-এর তত্ত্বাবধানে মিসর থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র বিতর্ক বিষয়ক গ্রন্থসমূহের মধ্যে এটিই হচ্ছে সবচে' নম্র ও প্রশান্ত গ্রন্থ। আর এই একটিমাত্র গ্রন্থই কর্মবীর 'আলিম, মুজাহিদ, ইমাম ও অমর চিন্তানায়কদের পুণ্য তালিকার শীর্ষে তাঁর স্থান লাভের জন্য যথেষ্ট।[১]

এখন আমরা বিভিন্ন উদ্ধৃতির সাহায্যে আলোচ্য গ্রন্থের এমন সার-সংক্ষেপ পেশ করব যাতে ইমাম সাহেবের চিন্তা ও গবেষণার সারমর্ম পাঠক হৃদয়ংগম করতে পারেন।

খ্রিস্ট ধর্মে রোমীয় প্রতিমা পূজার অনুপ্রবেশ

যে সকল মুসলিম লেখক গবেষক খ্রিস্ট ধর্মের বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন তাঁদের অধিকাংশ খোদ খ্রিস্ট ধর্মের ইতিহাস সম্পর্কেই ছিলেন বেখবর। ফলে খ্রিস্ট ধর্মকে তাঁরা মৌলিকভাবে 'ঈসা (আ)-এর ওপর অবতীর্ণ আসমানী ধর্ম বলে ভুল করে বসেছিলেন। এভাবে খ্রিস্ট ধর্ম তাদের চোখে এমন মর্যাদা লাভ করেছিল যা তার মোটেই প্রাপ্য ছিল না। পক্ষান্তরে খ্রিস্ট ধর্মের ইতিহাস, ক্রমবিকাশ ও বিবর্তনের ওপর ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র গভীর দৃষ্টি থাকার কারণে এ সত্য তাঁর অজানা ছিল না যে, খ্রিস্ট ধর্ম হযরত 'ঈসা (আ)-এর শিক্ষা ও গ্রীক-রোমকদের শিরকী 'আকীদা- বিশ্বাস ও প্রতিমা-তত্ত্বের জগাখিচুড়ি ছাড়া আর কিছু নয়। এই স্বচ্ছ ইতিহাস জ্ঞানের কারণেই সমসাময়িক খ্রিস্ট ধর্মের বিরুদ্ধে অন্য সমালোচকদের তুলনায় এমন নির্ভীক সাহসিকতার সাথে কলম ধরা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। তিনি লিখেছেন ঃ

> রোমক ও গ্রীক জাতি প্রতিমাপূজক মুশরিক ছিল। উর্ধ্ব জাগতিক ও অধঃজাগতিক প্রতিমা-প্রতিকৃতির তারা পূজা করত। হযরত 'ঈসা (আ) তাদের কাছে আল্লাহ্র বাণী পৌছানোর দায়িত্ব দিয়ে শিষ্যদেরকে সেসব দেশে পাঠালেন। শিষ্যদের অনেকে 'ঈসা (আ)-এর জীবদ্দশাতেই নির্দেশিত এলাকায় চলে গিয়েছিলেন। আবার কেউ কেউ গিয়েছিলেন উর্ধ্বাকাশে তাঁর অন্তর্ধানের পর। প্রেরিত শিষ্যরা মূর্তিপূজকদেরকে আল্লাহ্র পথে ডাকলেন। সে ডাকে সাড়া দিয়ে কিছু কিছু লোক আল্লাহ্র ধর্ম গ্রহণ করল এবং বেশ কিছুদিন সত্যের পথে অবিচল থাকল। পরে শয়তান তাদের কারো কারো অন্তরে হযরত 'ঈসা (আ)-এর দীনকে বিকৃত করার মন্ত্রণা দিল। এদের হাতেই হযরত 'ঈসা (আ)-এর শিক্ষা মুশরিকদের 'আকীদা-বিশ্বাসের সংমিশ্রণে এক নতুন ধর্মের গোড়া পত্তন হলো।[২]

---

১. আল-জওয়াব, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৮।

১. ইবনে তায়মিয়া, পৃ. ৫৯৯।

অন্যত্র লিখেছেন ঃ

> নবীদের তাওহীদবাদী ধর্ম ও মুশরিকদের প্রতিমাবাদী ধর্ম। এ দু'টি (সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী) ধর্মের মিশ্রণে খ্রিস্ট ধর্মের অনুসারীরা তৃতীয় একটি ধর্মের গোড়া পত্তন করল। এ নতুন ধর্মের কিছু অংশ হলো নবীদের থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা আর বাকী অংশ হলো মুশরিকদের কাছ থেকে সংক্রামিত 'আকীদা ও বিশ্বাস। এভাবে তাদের হাতেই قانيم। বা 'ত্রি-সত্তা' শব্দটির সৃষ্টি হয়। নবীদের বাণী ও বক্তব্যে এ উদ্ভট ধারণার চিহ্নমাত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। অনুরূপভাবে তারা আকৃতি ও কায়াবিশিষ্ট প্রতিমার স্থলে নিরাকার ও কায়াহীন প্রতিমা সৃষ্টি করে নিল। সেই সাথে চাঁদ, সূর্য ও তারকামুখী হয়ে নামায পড়া এবং বসন্তকালীন রোযা রাখার প্রচলন ঘটাল, যাতে শরীয়তের সাথে প্রকৃতির একটা যোগসূত্র সৃষ্টি হয়।

বর্তমান খ্রিস্টধর্ম কনস্টান্টাইনের আমলে গড়া

আরো এক ধাপ এগিয়ে ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) দাবী করেন, খ্রিস্ট ধর্মের প্রথম যুগে পলের হাতেই এ ধর্মটির প্রাথমিক পরিবর্তন ও বিকৃতি ঘটেছিল। দ্বিতীয় বড় ধরনের পরিবর্তন ও বিকৃতি ঘটেছে চতুর্থ শতকের সুপ্রসিদ্ধ রোমক সম্রাট কনস্টান্টাইনের আমলে। তিনি ছিলেন প্রথম খ্রিস্টান রাষ্ট্রশক্তির স্থপতি। ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) লিখেছেন ঃ

> পোপ ও ধর্মনেতাদের হাতে খ্রিস্ট ধর্মের 'আকীদা-বিশ্বাস ও বিধান প্রণয়নের কাজ চলতে থাকে। ক্রমে সম্রাট কনস্টান্টাইনের আমলে তিন শত আঠার জন প্রতিনিধির সম্মেলনে খ্রিস্ট ধর্মের সেই ঐতিহাসিক 'আইনপত্র' রচিত হয় এবং বিভিন্ন ফেরকা ও উপদল তা অনুমোদন করে। কিন্তু আরয়ূসীসহ কিছু সংখ্যক বিরোধী ধর্মনেতা দলীল রচয়িতাদের অভিশম্পাত করে বেরিয়ে আসেন। উক্ত আইনপত্রে এমন সব বিধান স্থান পেয়েছিল যার সাথে আসমানী কিতাবের কোন সম্পর্কই নেই বরং সেগুলো আগাগোড়া সকল আসমানী কিতাব ও জ্ঞান-বুদ্ধির সুস্পষ্ট বিরোধী।

অন্যত্র তিনি লিখেছেন ঃ

> এই ধর্মীয় সমঝোতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে তারা হযরত 'ঈসা (আ)-সহ সকল নবী ও রসূলের পথ ও পন্থা থেকে সরে এসে সম্পূর্ণ নতুন এক 'আকীদা ও বিশ্বাস গড়ে তুলেছিল। নবীদের বাণী ও বক্তব্যে সেগুলোর কোন হদিস পাওয়া যায় না। আসমানী কিতাবের কোথাও আল্লাহ্‌র (তিন বা অধিক) রূপ ও বিভূতির কোন উল্লেখ নেই। আল্লাহ্‌র কথিত 'গুণত্রয়ের'ও কোন

অস্তিত্ব নেই। তদ্রূপ আল্লাহ্‌র কোন রূপ ও বিভূতিকে পিতা, পুত্র বা পবিত্রাত্মা নামে অভিহিত করারও কোন প্রমাণ নেই, প্রমাণ নেই এমন ধারণারও যে, খোদার এক পুত্র আছেন যিনি খোদা এবং খোদা থেকে সৃষ্ট, যিনি পিতার মূল সত্তা থেকে অভিন্ন এবং খোদা যেমন স্রষ্টা তেমনি একজন স্রষ্টা। অনুরূপ শিরক ও কুফরীভিত্তিক অন্যান্য 'আকীদা ও বিশ্বাসও কোন নবী থেকে বর্ণিত নয়।[১]

ইঞ্জীল বা সুসমাচারসমূহের স্বরূপ

মুসলিম পণ্ডিতদের আরেকটি ভুল হল, ইঞ্জীলকে তারা কুরআন ও অন্যান্য আসমানী কিতাবের সমপর্যায়ে ধরে আলোচনায় নেমেছেন। বলা বাহুল্য, পাদ্রীদের অপপ্রচার ও নতুন নিয়মের ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞতাই হলো এ ধরনের মৌলিক বিভ্রান্তির উৎস। ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) কিন্তু ইঞ্জীলকে তার প্রাপ্য মর্যাদাই দিয়েছেন। তাঁর মতে, ইঞ্জীলের সুসমাচার চতুষ্টয়ের ধর্মীয় মর্যাদা সীরাত ও হাদীস গ্রন্থগুলোর চেয়ে কোন অংশেই বেশী নয়। তিনি বলেন ঃ

> উপরিউক্ত সুসমাচার চতুষ্টয়ের বর্ণনাকারীরা হযরত 'ঈসা (আ)-এর বাণী ও বক্তব্য, শিক্ষা ও কর্ম এবং বিভিন্ন মু'জিযা ও অলৌকিক ঘটনা সংকলন করেছেন মাত্র, এমন কি তাদের স্বীকৃতি মতে হযরত 'ঈসা (আ) সম্পর্কে তাদের দেখা ও শোনার সবটুকুও তারা গ্রন্থবদ্ধ করেনি। সুতরাং আমাদের নবীজীর বাণী ও কর্মের বর্ণনাসম্বলিত হাদীস ও সীরাত গ্রন্থ যেমন কুরআনের সমতুল্য নয়, তেমনি সুসমাচার সংকলকদের সংকলনসমূহও আসমানী কিতাবের সমতুল্য নয় বরং সুসমাচারগুলো বড় জোর সীরাত ও হাদীস গ্রন্থগুলোর অনুরূপ মর্যাদাই শুধু দাবী করতে পারে।[২]

অন্যত্র তিনি লিখেছেন ঃ

খ্রিস্টানদের হাতে ইঞ্জীল নামে এখন যে কিতাব আছে তা তাদের স্বীকারোক্তি মতেই হযরত 'ঈসা (আ)-এর লেখা নয়, এমন কি তাঁর আদেশেও লেখা হয়নি, বরং ঊর্ধ্বাকাশে অন্তর্ধানের পর তাঁর প্রত্যক্ষ শিষ্য মথি ও যোহন এবং পরোক্ষ শিষ্য মার্ক ও লুক লিখেছেন। তদুপরি এত অধিক সংখ্যক লোক সেগুলো ধারণ ও সংরক্ষণ করেনি যাতে (বর্ণনার সূত্রগত দিক থেকে) তা সন্দেহাতীত বলে ধরা যেতে পারে। এছাড়া সংকলকগণ নিজেরাই স্বীকার

১. আল-জওয়াব, খণ্ড. ৩. পৃষ্ঠা ১৩৪।

১. আল-জওয়াব. খণ্ড ২. পৃ. ১০।

করেছেন, হযরত 'ঈসা (আ)-এর বাণী ও জীবন-বৃত্তান্তের তারা সবটুকু নয়, বরং আংশিক সংকলন করেছেন মাত্র। দুই, তিন বা চার জনের বর্ণনায় ভুল হওয়ার যথেষ্ট আশংকা আছে, বিশেষত খোদ হযরত 'ঈসা (আ) সংক্রান্ত তথ্যের ক্ষেত্রেও তারা ভুল করেছেন, এমন কি কে ক্রসবিদ্ধ হয়েছেন তাও আজ স্পষ্ট নয়।[১]

ইঞ্জীলের মত তাওরাতের সত্যতা সম্পর্কেও প্রশ্ন তুলে তিনি লিখেছেন ঃ

> তাওরাতের সংকলন ও বর্ণনাতেও সূত্র-বিচ্ছিন্নতা ঘটেছে। কেননা ইয়াহূদীদের বর্ণনা মুতাবিক বায়তুল মুকাদ্দাস ধ্বংসের পর নির্বাসিত বনী ইসরাইলীদের মধ্যে আযর নামক এক ব্যক্তি তাওরাত লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তিনি নবী ছিলেন কিনা সে সম্পর্কে ইয়াহূদীদের দ্বিমত রয়েছে। তবে তাদের দাবী মতে উক্ত অনুলিপিকে অন্য একটি প্রাচীন অনুলিপির সাথে মিলিয়ে দেখা হয়েছিল। কারো মতে মরক্কোতে পাওয়া একটি অনুলিপি আনিয়ে তার সাথে মিলিয়ে দেখা হয়েছিল। এর মাধ্যমে যে সত্যটি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে তা এই যে, (বর্ণনার সূত্রগত দিক থেকে) তাওরাতের (বিষয় ও) শব্দসমূহ সন্দেহাতীত নয় এবং ক্ষেত্র বিশেষ ভুলের আশংকাও উড়িয়ে দেবার মত নয়। কেননা দু'চারজন লোক যে কিতাব সংকলন করেন, মিলিয়ে দেখেন এবং সংরক্ষণ করেন তাতে ভুল হওয়াই স্বাভাবিক।[২]

তাই ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র সিদ্ধান্ত হলো ঃ

> হযরত 'ঈসা (আ) থেকে ইঞ্জীলের শব্দসমূহের নিরবচ্ছিন্ন ও সন্দেহাতীত কোন সূত্র-পরম্পরা খ্রিস্টানদের হাতে নেই। তদ্রূপ খ্রিস্ট ধর্মের বর্তমান 'আকীদা-বিশ্বাসগুলোও নিরবচ্ছিন্ন ও সন্দেহাতীত সূত্র দ্বারা প্রমাণিত নয়। ইয়াহূদীদের অবস্থাও অভিন্ন। তাদের কাছেও তাওরাতের শব্দ ও নবীদের ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের কোন নিরবচ্ছিন্ন ও সন্দেহাতীত সূত্র নেই যেমনটি রয়েছে কুরআন ও আহকামে শরীয়তের ক্ষেত্রে মুসলমানদের হাতে। বিশিষ্ট ও সাধারণ সকলেরই তা জানা আছে।[৩]

কুরআন, ইঞ্জীল ও তাওরাতের মাঝে পার্থক্য করে ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) বলেন ঃ

---

১. আল-জওয়াব, খ. ২, পৃ. ১০।

২. আল-জওয়াব,

৩. প্রাগুক্ত, খ. ১, ৩৭২।

কুরআনুল করীমের শব্দ ও অর্থ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম থেকে নিরবচ্ছিন্ন ও সন্দেহাতীত সূত্র-পরম্পরায় চলে আসছে। সুন্নাহর ক্ষেত্রেও রয়েছেও অনুরূপ নিরবচ্ছিন্ন ও সন্দেহাতীত সূত্র-পরম্পরা। সেই সাথে মুসলমানদের নিকট রয়েছে তাদের প্রিয় নবীর ঘটনাবহুল জীবন-বৃত্তান্ত যার সত্যতা বিভিন্ন সূত্রে সুপ্রমাণিত। যথা ঃ উম্মাহর সর্বসম্মত স্বীকৃতি, সেগুলোর ওপর আমলের ধারাবাহিকতা ইত্যাদি। কুরআন মুসলমানদের সিনায় সংরক্ষিত আছে এবং এই সংরক্ষণ ব্যবস্থা কোন লিখিত অনুলিপির ওপর নির্ভরশীল নয়। সুতরাং আল্লাহ্ না করুন, কুরআনের সকল অনুলিপি বিলুপ্ত হয়ে গেলেও কুরআন সংরক্ষণে তার বিন্দুমাত্র প্রভাব পড়বে না। পক্ষান্তরে বাইবেলের অনুলিপিগুলো বিলুপ্ত হলে তাদের কাছে বিকল্প কোন সংরক্ষণ ব্যবস্থা নেই। কেননা তাদের কাছে শব্দসমূহের নিরবচ্ছিন্ন কোন সূত্র-পরম্পরা নেই। দু'একজন বাইবেল-হাফেজ, তাদের ওপর নির্ভর করার কোন উপায় নেই। এজন্যই নবুওয়ত যুগের পর থেকে তাদের কিতাবে (শব্দ ও অর্থগত দিক থেকে) বরাবর পরিবর্তন ও বিকৃতি চলে আসছে। আর এজন্যই মুসলমানদের ন্যায় সূত্র-পরম্পরা রক্ষা করার প্রচলন তারা করেনি। সূত্র-বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য মুসলমানরা গড়ে তুলেছেন রিজাল-শাস্ত্রের বিশাল ভাণ্ডার, যার কোন অস্তিত্ব নেই তাদের ইতিহাসে।[১]

ইঞ্জীলের পরিবর্তন ও বিকৃতি

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা হলো, ইঞ্জীল ও তাওরাতের শব্দগত পরিবর্তন সংক্রান্ত দাবীর তিনি সমর্থক নন। কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। প্রকৃত ব্যাপার এই, শব্দগত পরিবর্তনের দাবী সমর্থন করা সত্ত্বেও অর্থগত বিকৃতির ওপরই তিনি অধিক জোর দিয়েছেন। এ কৌশল অবলম্বনের কারণ বর্ণনা করে আল-জওয়াব গ্রন্থে তিনি নিজেই বলেছেন, ইয়াহূদী ও খ্রিস্টান পণ্ডিতেরাও যেহেতু অর্থগত পরিবর্তন ও বিকৃতি স্বীকার করে নিয়েছেন, সেহেতু এটাকে ভিত্তি করেই তাদের বিরুদ্ধে আমাদের বিতর্কে নামা উচিত। তাঁর ভাষায় ঃ

واذاعرف ان جميع الطوائف من المسلمين واليهود والنصارى يشهدون انه قد وقع فى هذه الكتب تحريف وتبديل فى معا نيها وتفاسيرها وشرائعها فهذا القدر كاف

১. আল-জওয়াব, খ. ১, পৃ. ৩৭৬।

মুসলিম, ইয়াহূদী ও খ্রিস্টান সকলেই যখন ইঞ্জীল ও তাওরাতের অর্থ, ব্যাখ্যা ও বিধানগত বিকৃতির সত্যতা মনে নিয়েছে তখন এতটুকুতেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখা যথেষ্ট।[১]

অন্যত্র তিনি লিখেছেন ঃ

ولكن علماء المسلمين وعلماء اهل الكتب متفقون على وقوع التحريف فى المعانى والتفسير ـ

কিন্তু ইঞ্জীল ও তাওরাতের অর্থ ও ব্যাখ্যাগত বিকৃতি বিষয়ে মুসলিম ও কিতাবী সকল 'আলিমই একমত।[২]

তবে তাওরাত ও ইঞ্জীলের শব্দগত বিকৃতির ক্ষেত্রে ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) এ দাবী মানতে রাজী নন যে, আসমানী কিতাবগুলো আগাগোড়া এমন বিকৃত হয়ে গেছে যাতে মূল আসমানী শব্দগুলোর কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। তিনি বলেন ঃ মুসলিম 'আলিমদের কেউ আমার জানা মতে এ দাবী করেন নি যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের নবুওয়ত লাভের পর আসমানী কিতাবসমূহের শব্দগুলো সকল ভাষাতেই পরিবর্তন করে ফেলা হয়েছে। সুতরাং মুসলিম 'আলিমদের নামে এ ধরনের উক্তি চালু করা সংগত নয়।[৩]

তবে এ দাবী তিনি অবশ্যই সমর্থন করেন যে, আসমানী কিতাবের বহু স্থানে মূল শব্দগুলো বদলে দিয়ে আংশিক শব্দগত বিকৃতি ঘটানো হয়েছে। এটাকে মুসলিম 'আলিমদের সাধারণ মতামতরূপে আখ্যায়িত করে ইমাম সাহেব লিখেছেন ঃ

فجمهور المسلمين يمنعون هذا ويقولون ان بعض الفاظها بدل كما قد بدل كثير من معانيها ـ

মুসলিম 'আলিমরা এ দাবী অস্বীকার করেছেন (ইঞ্জীল ও তাওরাতের সকল শব্দ-সমষ্টির সত্যতা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম সমর্থন করেছেন)। তাঁদের মতে, বহুক্ষেত্রে যেমন অর্থ ও ব্যাখ্যাগত বিকৃতি ঘটেছে তেমনি কিছু কিছু ক্ষেত্রে শব্দগত বিকৃতিও ঘটেছে।[৪]

والصواب الذى عليه الجمهور انه بدل بعض الفاظها ـ

---

১. আল-জওয়াব, ১ম খ., পৃ. ৩৭৬।
২. আল-জওয়াব, ১ম খ., পৃ. ৩৮০।
৩. আল-জওয়াব, ১ম খ. পৃ. ৩৭৩।
৪. আল-জওয়াব, ১ম খ., পৃ. ৩৭৩।

জমহূর বা সাধারণ মুসলিম 'আলিমদের সিদ্ধান্তই সঠিক। অর্থাৎ উক্ত কিতাবসমূহের কিছু কিছু শব্দে অবশ্যই পরিবর্তন করা হয়েছে।[১]

নবীদের শব্দ ওরা হৃদয়ংগম করতে পারেনি

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র মতে, খ্রিস্টানদের বিভ্রান্তি তথা ত্রিত্ববাদসহ যাবতীয় শিরকী 'আকীদা-বিশ্বাসের প্রধান কারণ এই যে, নবীদের মুখ নিঃসৃত বহু শব্দেরই ভাব ও অর্থ তারা হৃদয়ংগম করতে পারেনি। ফলে তাদের হাতে সে সকল শব্দের অর্থ-বিকৃতি ঘটেছে। তিনি বলেন ঃ এদিক থেকে ইয়াহূদীদের অবস্থা কিছুটা হলেও ভাল। হঠকারিতা, অহংকার ও সত্য প্রত্যাখ্যানের বেলায় তারা খ্রিস্টানদের তুলনায় এক কাঠি এগিয়ে আছে সত্য, কিন্তু নবীদের ভাষা ও শব্দ ব্যবহারের সাথে তারা অতটা অপরিচিত নয়।[২]

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) জোর তাকীদ দিয়ে বারবার বলেছেন যে, সঠিক ভাব ও অর্থ হৃদয়ংগমের মাধ্যমে আসমানী কিতাব থেকে নির্ভেজাল শিক্ষা ও বিধান আহরণ করতে হলে নবীদের শব্দ ও পরিভাষা জানা খুবই জরুরী।

তাঁর ভাষায় ঃ

ان معرفة اللغه التى خاطبنا بها الا نبياء وحمل كلامهم عليها امر واجب متعين ومن سلك غير هذا المسلك فقد حرف كلامهم عن مواضعه وكذب عليهم وافترى -

> নবীরা যে ভাষায় আমাদের সম্বোধন করেছেন তা হৃদয়ংগম করা এবং যে শব্দ যে অর্থে ব্যবহার করেছেন তা অক্ষুণ্ণ রাখা সুনির্দিষ্ট ভাবেই অপরিহার্য। এ পথ ছেড়ে অন্য পথে যারা চলবে এবং নবীদের শব্দসমূহকে তার প্রয়োগ ক্ষেত্র থেকে বিচ্যুত করবে তারা অবশ্যই নবীদের নামে অপবাদ রটানোর অপরাধে অপরাধী হবে।[৩]

মূলত নবীদের শব্দ ও পরিভাষা হৃদয়ংগমে ব্যর্থতার পরিণতিতেই খ্রিস্ট ধর্মে পুত্র ও পবিত্রাত্মার ভুল অর্থের পথ ধরে ত্রিত্ববাদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

শব্দের সঠিক অর্থ নির্ণয়

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) লিখেছেন ঃ

> কিতাবীদের বর্ণনামতে 'পিতা ও পুত্র' শব্দ দু'টি নবীরা ব্যবহার করেছেন। (আমাদের মতে) তাঁদের কাছে পিতার অর্থ ছিল রব ও প্রতিপালক এবং পুত্রের অর্থ ছিল প্রিয় ও পসন্দনীয়। কেননা কোন সূত্রেই একথা বর্ণিত হয়নি

---

১. আল-জওয়াব, ২য় খ., পৃ. ৪।

২. আল-জওয়াব, ২য় খ., পৃ. ১০৯।

৩. ঐ, ৩য় খণ্ড, ১৮১ পৃ.।

যে, নবীরা আল্লাহ্‌র বিশেষ কোন রূপ বা বিভূতি অর্থে পুত্র শব্দটি ব্যবহার করেছেন কিংবা এ কথা বলেছেন যে, আল্লাহ্ স্বয়ং তাঁর একটি রূপ বা বিভূতিকে জন্ম দিয়েছেন এবং জন্ম সূত্রে তাঁর কোন-পুত্র রয়েছে। সুতরাং "পিতা, পুত্র ও পবিত্রাত্মার নামে মানুষের বায়'আত (বাপ্তিস্ম) গ্রহণ করো।" এ ধরনের কোন বাণী 'ঈসা (আ) থেকে বর্ণিত হয়ে থাকলেও আল্লাহ্‌র অনাদি কোন রূপ ও বিভূতি দ্বারা পুত্র শব্দের ব্যাখ্যা করা হযরত 'ঈসা (আ)-এর নামে অপবাদ আরোপ ছাড়া কিছু নয়। কেননা তাঁর ভাষায় পুত্র শব্দের এ অর্থ ছিল না। তদ্রূপ 'রূহুল-কুদস্' ও পবিত্রাত্মা শব্দটি নবীদের পরিভাষায় আল্লাহ্‌র প্রাণবাচক কোন রূপ বা বিভূতি অর্থে কখনো ব্যবহৃত হয়নি। তাঁদের পরিভাষায়, পবিত্রাত্মা হচ্ছেন সেই 'স্বর্গীয় সত্তা' যা আল্লাহ্ তাঁর নির্বাচিত বান্দা তথা নবীদের উপর নাযিল করতেন এবং তার মাধ্যমে তাঁদের মদদ করতেন।[১]

খ্রিস্টানদের সরাসরি সম্বোধন করে অন্যত্র তিনি লিখেছেন ঃ

তোমাদের গোমরাহীর কারণ এই যে, নবীদের কথার সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট অর্থ উপেক্ষা করে এমন সব দুর্বোধ্য ব্যাখ্যা তোমরা দিয়েছ যা তাঁদের কথা থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনভাবেই প্রকাশ পায় না। সুনির্দিষ্ট অর্থের পরিবর্তে দুর্বোধ্য অর্থ গ্রহণ করে বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী ব্যাখ্যার পিছনে তোমরা পড়েছ। তা না করে নবীদের কথার সরল অর্থই যদি তোমরা আঁকড়ে ধরতে তাহলে এমনভাবে বিভ্রান্ত হতে না। কেননা নবীদের বক্তব্যে 'পুত্র' শব্দটি যতখানে এসেছে খোদার রূপ বা বিভূতি অর্থে কোথাও ব্যবহৃত হয়নি; বরং আল্লাহ্‌র প্রিয় ও পসন্দনীয় ব্যক্তি অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। তদ্রুপ পবিত্রাত্মা শব্দটিও বিশেষ রূপ বা বিভূতি অর্থে ব্যবহৃত হয়নি, ওয়াহী ও ফিরিশতা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অথচ এ সরল ও স্বাভাবিক অর্থ বাদ দিয়ে এমন অর্থ তোমরা গ্রহণ করেছ যা শব্দ থেকে কোনক্রমেই প্রকাশ পায় না।[২]

ব্যাপক ও সাধারণ ক্ষেত্রে 'পুত্র ও পবিত্রাত্মা' শব্দ দু'টির ব্যবহার

অতঃপর ইমাম সাহেব বাইবেল ও তাওরাতের বিভিন্ন শ্লোক উদ্ধৃত করে প্রমাণ করেছেন যে, পুত্র ও পবিত্রাত্মা শব্দ দু'টি হযরত 'ঈসা (আ)-এর জন্য বিশিষ্ট নয়; বরং অন্যদের জন্যও তা দেদার ব্যবহৃত হয়েছে। তিনি লিখেছেন ঃ

---

১. আল-জওয়াব, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৮১-১৮২।

২. আল-জওয়াব, ৩ খ., পৃ. ১৫৫।

এমনকি তোমাদের ধর্মগ্রন্থের 'পুত্র ও পবিত্রাত্মা' শব্দ হযরত 'ঈসা (আ) ছাড়া অন্যদের জন্যও ব্যবহৃত হয়েছে। শিষ্যদের সূত্রে তোমরা নিজেরাই তো বর্ণনা করো যে, হযরত 'ঈসা তাদের বলেছেন, আল্লাহ্ আমার ও তোমাদের পিতা এবং আমার ও তোমাদের উপাস্য। তোমাদের কথা মতেই শিষ্যরা আরো বলেছেন যে, পবিত্রাত্মা তাদের মাঝেও প্রবিষ্ট হয়। তোমাদের হাতে তাওরাতের যে অনুলিপি আছে তাতে পরিষ্কার ভাষায় বলা হয়েছে যে, "সদাপ্রভূ মূসাকে বললেন, ফেরাউনের কাছে যাও এবং তাকে বল ঃ প্রতিপালক বলেছেন, ইস্রায়েল আমার পুত্র, আমার প্রথমজাত। আমার 'ইবাদত করার জন্য আমার পুত্রকে ছেড়ে দাও। নইলে আমি তোমার পুত্রকে, তোমার প্রথম জাতকে হত্যা করব। ফেরাউন সে নির্দেশ অমান্য করায় সদাপ্রভূ সিংহাসনে উপবিষ্ট ফেরাউনের প্রথম জাত পুত্র এবং ফেরাউনের স্বজাতির সমস্ত প্রথম জাত পুত্রকে হত্যা করলেন। এমন কি তাদের পশুকুলের প্রথম জাতগুলোকেও হত্যা করলেন।" দেখ, তাওরাতে সকল ইসরাঈলীকে আল্লাহ্‌র পুত্র ও প্রথমজাত বলা হয়েছে এবং মিসরীয়দের পুত্রদেরকেও ফেরাউনের পুত্র বলা হয়েছে। শুধু কি তাই, পশুকুলের প্রথম জাত শাবকগুলোকেও পশুর মালিকদের পুত্র বলা হয়েছে।[১] অনুরূপভাবে গীত-সংহিতায় আছে, "তুমি আমার পুত্র, তুমি আমার কাছে প্রার্থনা করো, আমি তোমাকে দান করব।"

বাইবেলে হযরত ঈসা (আ) বলেছেন, "আমি আমার ও তোমাদের পিতা এবং আমার ও তোমাদের উপাস্যের নিকট যাচ্ছি।" তিনি আরো বলেছেন ঃ প্রার্থনা কালে তোমরা বলো, হে আমাদের স্বর্গস্থিত পিতা! অমুক অমুক দানে আমাদের ধন্য কর। তদ্রূপ পবিত্রাত্মা প্রবিষ্ট হওয়ার বিষয়টি হযরত 'ঈসা (আ) ছাড়া অন্যদের ক্ষেত্রেও উল্লিখিত হয়েছে।[২]

মোটকথা, অকাট্য যুক্তি-প্রমাণের আলোকে তিনি দেখিয়েছেন যে, যে সকল শব্দযোগে খ্রিস্টধর্মে হযরত 'ঈসার পুত্রত্ব, প্রবিষ্টতা ও ঈশ্বরত্ব সহ বিভিন্ন 'আকীদা-বিশ্বাসের অনুপ্রবেশ ঘটেছে সেগুলো ইঞ্জীল-তাওরাতের বহু স্থানে 'ঈসা (আ) ছাড়া অন্যদের জন্যও ব্যবহৃত হয়েছে। তাই এটা প্রমাণিত সত্য যে, শব্দগুলোর অর্থ রূপক। অতঃপর ইমাম সাহেব সিদ্ধান্ত টেনে লিখেছেন ঃ

মোটকথা, তাওরাত, ইঞ্জীল ও যবূরসহ কোন আসমানী কিতাবে কিংবা কোন নবীর ভবিষ্যদ্বাণীতেই এমন কোন কথা নেই যাতে হযরত 'ঈসা (আ)

১. বাইবেলের বর্তমান বাংলা অনুবাদে অবশ্য কিঞ্চিত পরিবর্তন করা হয়েছে। অনুবাদক।
২. আল-জওয়াব, ৩ খ., পৃ. ১৮৫-১৮৬।

সম্পর্কে বিশেষভাবে প্রমাণিত হতে পারে যে, আল্লাহ্‌র সত্তায় একীভূত ও প্রবিষ্ট হওয়ার গুণ তাঁর ছিল। তাঁর বৈশিষ্ট্য অতটুকুই যা আল-কুরআনে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه -

বস্তুত পূর্ববর্তী সকল আসমানী সহীফা এবং নবীদের যাবতীয় ভবিষ্যদ্বাণী আলোচ্য আয়াতের বক্তব্যের সাথে পূর্ণ সংগতিপূর্ণ এবং পরস্পরের সমর্থক। যে সকল শব্দ দ্বারা খ্রিস্টানরা হযরত ‘ঈসা (আ)-এর ঈশ্বরত্ব প্রমাণ করে থাকে এবং আম্বিয়া ‘আলায়হিমু’স-সালামের উক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করতে চায় সেগুলো হযরত ঈসা (আ) ছাড়া অন্যদের সম্পর্কেও ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং সে সবের সাহায্যে তাঁর ঈশ্বরত্ব প্রমাণ করা ভিত্তিহীন। ‘পুত্র ও প্রভু’ শব্দ দু’টি যেমন হযরত ‘ঈসা (আ)-র মত অন্যদের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়েছে তেমনি পবিত্রাত্মার প্রতিষ্ঠা, ঈশ্বরের প্রকাশ ও প্রবিষ্টতার কথা হযরত ‘ঈসা (আ)-র মত অন্যদের ক্ষেত্রেও বলা হয়েছে। অথচ সেই সুবাদে তারা কেউ তো ঈশ্বর হতে পারলেন না।[১]

খ্রিস্টান ধর্মবেত্তারা মাঝে মধ্যে শ্লোক-নির্ভর আলোচনা থেকে সরে এসে রূপ ও বিভূতিত্রয় এবং প্রবিষ্ট ও একীভূত হওয়া সম্পর্কে যুক্তিকেন্দ্রিক আলোচনার অবতারণা করেন এবং গোটা বিষয়টাকে সূফীবাদী ও দার্শনিক রূপ দান করেন। তাই ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-ও দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিটি বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। আর দর্শন যেহেতু তাঁর প্রিয়তম বিষয় এবং কালামশাস্ত্র, আকায়েদ ও ‘আদি সত্তার একত্ব’ ইত্যাদি জটিল দার্শনিক আলোচনায় বারবার তাঁকে প্রবৃত্ত হতে হয়েছে, তাই এখানেও তিনি হাত খুলে লিখেছেন এবং অকাট্য যুক্তি-প্রমাণের অবতারণা করে দেখিয়েছেন যে, ত্রিত্ববাদ ‘আকল ও যুক্তির সম্পূর্ণ বিরোধী স্বকপোলকল্পিত এক আকীদা ও দর্শন যার সাথে সত্যের দূরতম সম্পর্কও নেই।[২]

আকল ও যুক্তিবিরোধী কথা

‘আকল ও যুক্তির আলোকে বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে ত্রিত্ববাদের দুর্বোধ্যতা, অন্তসারশূন্যতা ও অযৌক্তিকতা তুলে ধরা হলে খ্রিস্টান ধর্মবেত্তারা ঘুরে ফিরে আবার বাইবেলীয় শ্লোকের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং বলতে শুরু করেন যে, কি করা যাবে, আসমানী কিতাবে এভাবেই বর্ণিত হয়েছে। ‘আকীদা

১. আল-জওয়াব, ২ খ., পৃ. ১৮৯-১৯০।
২. আল-জওয়াব, ৩য় খ., পৃ. ১১৯, ১৯০-১৯১, ২১৫।

ও বিশ্বাসগত এই বিষয়গুলো 'আকল ও যুক্তি-উর্ধ্ব সত্য। সুতরাং ঈমান ও নিরংকুশ আনুগত্যই এ সকল ক্ষেত্রে অপরিহার্য। বুদ্ধি ও যুক্তির মাধ্যমে তা বুঝতে বা বোঝাতে চাওয়া অনুচিত। ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) প্রথমে তো আসমানী কিতাবে ত্রিত্ববাদের অস্তিত্বই স্বীকার করতে রাজী নন। তাঁর মতে বরং ত্রিত্ববাদ বিরোধী শিক্ষাই তাতে বিদ্যমান। তদুপরি জোর দিয়ে তিনি বলেছেন যে, সম্পূর্ণ আলাদা দু'টি বিষয়কে এখানে ঘুলিয়ে ফেলা হচ্ছে। কেননা কতগুলো বিষয় হলো 'আকল ও যুক্তির বিচারে অসম্ভব। পক্ষান্তরে কতকগুলো বিষয় এমন আছে যার হাকীকত অনুধাবন করা মানবীয় 'আকল-বুদ্ধির পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং সেগুলোর পক্ষে বা বিপক্ষে 'আকল-বুদ্ধির নিজস্ব কোন সিদ্ধান্ত নেই। তিনি বলেন, নবীদের বাণী ও শিক্ষায় দ্বিতীয় বিষয়গুলোই শুধু পাওয়া যায়। অর্থাৎ 'আকল ও বুদ্ধি-উর্ধ্ব বিষয় সেখানে অবশ্যই আছে, তবে 'আকল ও বুদ্ধি পরিপন্থী কোন বিষয় নেই, থাকতে পারে না। বলা বাহুল্য যে, বুদ্ধি বিরোধী ও বুদ্ধি-উর্ধ্ব বিষয়ের মাঝে দুস্তর ব্যবধান রয়েছে। ইমাম সাহেবের ভাষায়–

لايميزون بين ما يحيله العقل ويبطله ويعلم انه ممتنع وبين ما يعجز عنه العقل فلا يعرفه ولا يعلم فيه بنفى ولا اثبات وان الرسل اخبرت بالنوع الثانى ولا يجوز ان تخبر با لنوع الاول فلم يفرقوابين محالات العقول ومحارات العقول وقد ضاهوا فى ذلك من قبلهم من المشركين الذين جعلوا لله ولداوشريكا ـ

'আকল ও বুদ্ধির যে বিষয়গুলোকে সুনিশ্চিতভাবে অসম্ভব ও বাতিল সাব্যস্ত করে, আর যে বিষয়গুলো সম্পর্কে বুঝে শুনে হাঁ-বাচক কিংবা না-বাচক সিদ্ধান্ত নিতে 'আকল ও বুদ্ধির অক্ষমতা প্রকাশ করে এই উভয়ের মাঝে দুস্তর ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও খ্রিস্টান পণ্ডিতরা তা মানতে রাজী নন। বস্তুত দ্বিতীয় বিষয়গুলো সম্পর্কেই শুধু নবীরা ওয়াহীযোগে সংবাদ দিয়েছেন। পক্ষান্তরে প্রথম বিষয়গুলোর অস্তিত্ব তাঁদের বাণী ও বক্তব্য অসম্ভব ও অকল্পনীয়। আসলে তারা বুদ্ধি বিরোধী ও বুদ্ধি-উর্ধ্ব বিষয়ের মাঝে তফাৎ খুঁজে পাননি। এ ক্ষেত্রে তারা আল্লাহ্র জন্য সন্তান ও অংশীদারিত্ব প্রমাণকারী মুশরিকদের কাতারভুক্ত হয়ে পড়েছেন।[১]

ইমাম সাহেব অত্যন্ত জোরালো ভাষায় দাবী করেছেন যে, সত্যধর্ম কখনো সুস্থ 'আকল ও বিচার-বুদ্ধির বিরোধী হতে পারে না। এ কথার ভুরি-ভুরি প্রমাণ রয়েছে আসমানী কিতাবগুলিতে। তিনি বলেন, এখানে দুটি দল হোঁচট খেয়েছে। একদল 'আকল ও বুদ্ধির এমন লাগামহীন ব্যবহার শুরু করল যে, 'আকল ও

১. আল-জওয়াব, খ. ২, পৃ. ৮৯।

বুদ্ধির গণ্ডিবহির্ভূত বিষয়গুলোকেও তারা সেই মানদণ্ডে যাচাই করতে লাগল। এমন কি স্থূল সত্য এবং নবীদের সুস্পষ্ট বক্তব্যকে পর্যন্ত তারা উপেক্ষা করে গেল। বলা বাহুল্য যে, 'আকল ও বুদ্ধির প্রতি এটা সুবিচার ছিল না মোটেই। পক্ষান্তরে অন্যদল বুদ্ধিজাত সুস্পষ্ট বিষয়গুলোকেও প্রত্যাখ্যান করল এবং কল্পনাপ্রসূত 'শ্রবণজাত' ও 'স্থূল' প্রমাণসমূহ আঁকড়ে পড়ে থাকল। বলা বাহুল্য যে, এটাও ছিল চরম সীমা লংঘন। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, দু'টি সত্য সর্বদা পরস্পর সমর্থক ও সহগামী হয়, পরস্পরবিরোধী হয় না কখনো। পক্ষান্তরে বাতিল ও অসত্য স্বভাবতই স্ববিরোধী এবং পরস্পরবিরোধী হয়। নবী-বিরোধীদের সম্পর্কে আল্লাহ ইরশাদ করেন,

والسماء ذات الحبك انكم لفى قول مختلف يؤفك عنه من افك ـ

শপথ বহু পথ বিশিষ্ট আকাশের! তোমরা তো পরস্পর-বিরোধী কথায় লিপ্ত। যে ব্যক্তি সত্যভ্রষ্ট সেই তা (কুরআন) পরিত্যাগ করে। সূরা যারিয়াতঃ ৭-৮-৯ আয়াত;

বস্তুত সুস্থ 'আকল ও বিচার-বুদ্ধি দ্বারা প্রমাণিত সত্য কোন ঐশীবাণী কিংবা নির্ভুল স্থূল অনুভবের বিরোধী হতে পারে না। তদ্রূপ বিশুদ্ধ ও প্রমাণোত্তীর্ণ ঐশী-বাণী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সত্য 'আকল কিংবা স্থূল অনুভবের প্রতিকূল হতে পারে না। অনুরূপভাবে নির্ভুল অনুভবের শক্তি দ্বারা প্রমাণিত সত্যও 'আকল ও নকল কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হতে পারে না।[১]

ইসলাম ও খ্রিস্টবাদের মাঝে এখানেই পার্থক্য। ইসলামে 'আকল ও নকল তথা যুক্তি ও উক্তির মাঝে রয়েছে পূর্ণ সংগতি। এখানে যুক্তি ও বুদ্ধি-উর্ধ্ব অদৃশ্য সত্যসমূহ অবশ্যই রয়েছে। কিন্তু তা যুক্তির পরিপন্থী নয় মোটেও।

পক্ষান্তরে খৃস্টবাদের বহু বিধান ও বিশ্বাসই যে যুক্তি পরিপন্থী, খ্রিস্টান ধর্মবেত্তারাও তা স্বীকার করে থাকেন। তবে তারা বলেন যে, এগুলো হচ্ছে বুদ্ধি উর্ধ্ব স্তরের বিষয়। চোখ বুজে সেগুলো মেনে নেওয়াই আমাদের কর্ম।

তাওহীদ ও হযরত 'ঈসার মানবত্বে বিশ্বাসী খ্রিস্টান দল

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা এই যে, যে সকল খ্রিস্টান পাদ্রী ও ধর্মনেতা আল্লাহ্‌র তাওহীদ ও একত্বে এবং হযরত 'ঈসা (আ)-র রিসালাত ও মানবত্বে বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু বিভিন্ন কারণে খ্রিস্টান জগতে বিশেষ জনপ্রিয়তা পাননি, আলোচ্য গ্রন্থে তিনি তাঁদের পরিচয় ও বক্তব্য তুলে ধরেছেন। সেই সাথে খ্রিস্ট ধর্মের দল-উপদলগুলোর বিস্তারিত তালিকা

১. আল-জওয়াব, খ. ২, পৃ. ৩১২, খ. ৩, পৃ. ৩।

দিয়ে তাদের 'আকীদা ও বিশ্বাসের বিশদ ব্যাখ্যা ও পর্যালোচনাও পেশ করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে ইমাম তায়মিয়া (র) নও-মুসলিম মনীষী হাসান বিন আয়্যুব-এর সেই সুদীর্ঘ প্রবন্ধটিও গ্রন্থবদ্ধ করেছেন যাতে প্রবন্ধকার তার ইসলাম গ্রহণের কারণসমূহ তুলে ধরে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন। প্রবন্ধটি অত্যন্ত তথ্যবহুল ও সারগর্ভ।

তাওরাত ও অন্যান্য আসমানী কিতাবে শেষ নবীর সুসংবাদ

উপরিউক্ত আলোচনা শেষে ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের শুভাগমন ও নবুওয়ত সম্পর্কিত আসমানী কিতাবের সুসংবাদ ও ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর দিকে নজর দিয়েছেন এবং ব্যাপকতা ও সার্বিকতার উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের খুঁটিনাটি সকল বাণী, তথ্য ও উপকরণ একত্র করেছেন যা অন্য কোন কিতাবে পাওয়া দুষ্কর। প্রতিটি সুসংবাদ ও ভবিষ্যদ্বাণীর ব্যাখ্যা চুলচেরা বিশ্লেষণের মাধ্যমে এটাও তিনি প্রমাণ করেছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের ক্ষেত্রেই শুধু এগুলো প্রযোজ্য।

যেমন যোহন লিখিত সুসমাচারে হযরত 'ঈসা (আ)-এর নিম্নোক্ত বাণী বর্ণিত হয়েছে ঃ

'জগতের অধিপতি আসছেন। তখন আমার কিছুই থাকবে না।' ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) একথা দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামই হলেন হযরত 'ঈসা (আ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর একমাত্র লক্ষ্য। তিনি বলেন ঃ

> কেননা এটা সর্বস্বীকৃত ও সন্দেহাতীত সত্য যে, হযরত 'ঈসা (আ)-এর পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামই একমাত্র মানব যাঁর জাগতিক ও আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্য গোটা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মানুষের দেহ ও হৃদয় তাঁর অনুগত ছিল। জীবদ্দশায় ও পরবর্তীতে, যুগে যুগে, পূর্ব-পশ্চিম সর্বত্র মানুষের বাহ্যিক ও আত্মিক সর্বপ্রকার আনুগত্য তিনি লাভ করেছেন। জীবদ্দশায় বাদশাহদের বাহ্যিক আনুগত্য করা হলেও মৃত্যুর পর তাদের প্রতি কারোরই আনুগত্য থাকে না। কেননা যে আনুগত্যের সাথে আখেরাতের পাওয়া না-পাওয়ার সম্পর্ক নেই সে আনুগত্যের ব্যাপারে পৃথিবীর কোন ধর্মের অনুসারীর আকর্ষণ নেই। কিন্তু নবীদের আনুগত্যের বৈশিষ্ট্য এই যে, তার সাথে রয়েছে আখিরাতের শাস্তি ও পুরস্কার এবং আশা ও ভীতির সম্পর্ক।

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম পূর্ববর্তী নবীদের দীন ও নবুওয়তের সত্যতার ঘোষণা দান করেছেন এবং তাঁদের নাম ও মর্যাদা তুলে ধরেছেন। বস্তুত তাঁর দাওয়াত ও মেহনতের কল্যাণেই বড় বড় জাতি হযরত মূসা ও 'ঈসা (আ)সহ সকল নবীর উপর ঈমান এনেছে। তাঁর মাধ্যম ছাড়া এটা কিছুতেই সম্ভব হতো না। কেননা যে ক'জন নবীর নামের সাথে কিতাবীদের পরিচয় ছিল তাঁদের নবুওয়ত ও মর্যাদার ব্যাপারে তারা একমত ছিল না। হযরত দাউদ ও সুলায়মান (আ)-সহ বিভিন্ন নবীর প্রতি বিভিন্ন দল দোষারোপ করত। আর হযরত হূদ, সালিহ, শু'আয়ব (আ) ও অন্যান্য নবীর তো নাম পর্যন্ত তাদের জানা ছিল না।[১]

নবুওয়তের দলীল ও মু'জিযাসমূহ

অতঃপর ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের মু'জিযা সম্পর্কে সুবিস্তৃত ও সারগর্ভ আলোচনা করেছেন এবং স্বভাব মাফিক এত অধিক তথ্য-উপকরণ একত্র করেছেন যা এক সাথে অন্য কোথাও পাওয়া সহজ নয়।[২] আলোচনার শুরুতে ইমাম সাহেব মু'জিযার সংজ্ঞা ও প্রকৃতি এবং মু'জিযার সত্যতা প্রমাণের উপায় সম্পর্কে কালামশাস্ত্রীয় বহু মৌলিক ও সূক্ষ্ম তথ্য তুলে ধরেছেন।

ইমাম সাহেবের আলোচনা কিন্তু শুধু সীরাত ও কালাম শাস্ত্র গ্রন্থের মশহূর মু'জিযাগুলোকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়নি; বরং সংশ্লিষ্ট আলোচনার বৃত্তকে সম্প্রসারিত করে রাসূলের গোটা জীবন ও চরিত্রকেই তিনি মু'জিযারূপে পেশ করেছেন এবং সীরাত ও শামায়েলের খুবই আকর্ষণীয় সার-সংক্ষেপ তুলে ধরেছেন। বস্তুত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের পবিত্র জীবন ও চরিত্রই হচ্ছে নবুওয়তের মুহাম্মদীর সর্বশ্রেষ্ঠ দলীল ও মু'জিযা। প্রচলিত ধারার পরিবর্তে মু'জিযার গণ্ডিকে ব্যাপ্ত ও সম্প্রসারিত করে তিনি লিখেছেন ঃ

> রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সীরাত, চরিত্র, বাণী ও কর্ম তথা জীবনের প্রতিটি আচরণ ও উচ্চারণ একেকটি জীবন্ত মু'জিযা। তাঁর উপর অবতীর্ণ শরীয়তও একটি স্বতন্ত্র মু'জিযা। তদ্রূপ উম্মতের সমষ্টিগত

---

১. দেখুন আল-জওয়াব, খ. ৪, পৃ. ১৬, পৃ. ৮৬-৯৫, পৃ. ৭৮-৮৬।

২. আল-জওয়াব, খ. ৪, পৃ. ৬৬, ২২৪।

'ইল্‌ম ও প্রজ্ঞা এবং জীবন ও চারিত্র্যের শুচিতা ও পবিত্রতাও তাঁর নবূওয়াতের একটি মু'জিযা। এমন কি উম্মতের নেককার লোকদের কারামতসমূহও তাঁর নবুওয়তের মু'জিযা বলে গণ্য হবে।[১]

মু'জিযারূপে উম্মতে মুহাম্মদীর উত্থান ও ইসলামী বিপ্লব

পবিত্র নবী জীবনের এক মনোজ্ঞ সার-সংক্ষেপ পেশ করার পর যা পড়লে হৃদয়ের গভীরে এ বিশ্বাস অবশ্যই বদ্ধমূল হয় যে, নিঃসন্দেহে তিনি আল্লাহ্‌র প্রেরিত সত্য রাসূল। ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) লিখেছেন ঃ

> ইসলামের দা'ওয়াত গোটা আরবভূমিতে ছড়িয়ে পড়ল। এর পূর্বে প্রতিমা পূজা, গণক ও জ্যোতিষীদের কথায় বিশ্বাস, স্রষ্টাকে অস্বীকার, সৃষ্টির দাসত্ব, হিংসা, হানাহানি ও রক্তপাত ইত্যাদি হাজারো শির্‌ক, অনাচার ও পাপাচারে সারা আরব নিমজ্জিত ছিল। আখেরাত তথা মৃত্যু পরবর্তী অনন্ত জীবনের কোন ধারণা ছিল না মানুষের। মুর্খতার আঁধারে নিমজ্জিত এ জাতিই নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের নূরানী শিক্ষার বরকতে হয়ে গেল পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, সর্বশ্রেষ্ঠ ধার্মিক, চরিত্রবান। খৃস্টানরা সিরিয়াতে সাহাবা-ই কিরামকে দেখে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠল, "স্বীকার করতেই হয় যে, হযরত 'ঈসার শিষ্যরা এঁদের চেয়ে উত্তম ছিলেন না।" এঁরা হলেন নববী 'ইল্‌ম ও 'আমলের উজ্জলতম প্রতীক যা গোটা পৃথিবীতে আলো ও দীপ্তি ছড়িয়েছে। এদের মুকাবিলায় অন্যান্য জাতির কীর্তিমান পুরুষদের দেখো; যে কোন চক্ষুষ্মান ব্যক্তি উভয়ের মাঝে আসমান-যমীন তফাত অনুভব করতে পারবেন।[২]
>
> সকল গুণ-গরিমায় তাঁর উম্মত অন্যান্য উম্মতের তুলনায় শীর্ষতম স্থানের অধিকারী। দুনিয়ার অন্যান্য জাতির জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সাথে এ উম্মতের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার তুলনা করা হলে নিঃসন্দেহে এ উম্মতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হবে। তদ্রূপ 'ইবাদত ও ধার্মিকতা এবং আল্লাহ-প্রেম ও আনুগত্যের ক্ষেত্রে এ উম্মতের সাথে অন্যান্য উম্মতের তুলনা করা হলে সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, এ উম্মতই শ্রেষ্ঠ ধার্মিক, শ্রেষ্ঠ প্রেমিক। অনুরূপভাবে আল্লাহ্‌র রাস্তায় ত্যাগ ও কুরবানী, বীরত্ব ও সাহসিকতা এবং বিপদে ধৈর্য ও সবর ইত্যাদির ক্ষেত্রে তুলনা করা হলেও এ উম্মতের পাল্লাই হবে ভারি। বদান্যতা ও উদারতা, নিঃস্বার্থপরতা ও আত্মত্যাগ তথা চারিত্রিক মাহাত্ম্য ও নৈতিক পবিত্রতার সকল ক্ষেত্রেই এ উম্মতই শ্রেষ্ঠ, এ উম্মতই অনন্য। বলা বাহুল্য যে, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্

---

১. আল-জওয়াব, খ. ৪, পৃ. ৮৬-৯৫, পৃ. ৮৭-৮৬।

১. আল-জওয়াব, ৪ খ., পৃ. ১৮১।

সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের সুমহান সান্নিধ্য ও সংস্পর্শ থেকেই এগুলো তারা লাভ করেছিল। কেননা তাঁর পূর্বে অন্য কোন কিতাব ও নবীর তারা অনুসারী ছিল না। ফলে আলো ও নূরের অন্য কোন উৎস থেকে তারা বিন্দুমাত্র আলো লাভ করেনি। তাঁর নবুওয়তের 'মিশকাত' ও দীপাধার থেকেই তারা আলো পেয়ে ছিল। পক্ষান্তরে হযরত 'ঈসা (আ) এসেছিলেন পূর্ববর্তী তাওরাতী শরীয়তের সম্পূরকরূপে। সুতরাং হযরত 'ঈসা (আ)-এর অনুসারীদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা এবং গুণ ও গরিমার কিছু অংশ এসেছে তাওরাত ও যবূর থেকে, কিছু অংশ এসেছে হযরত 'ঈসা (আ) ও অন্যান্য নবীর শিক্ষা থেকে, আর বাদবাকীটুকু এসেছে 'হাওয়ারী' শিষ্যদের পরবর্তী যুগের দার্শনিকদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা থেকে। পক্ষান্তরে এই উম্মতের জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের পূর্বে কোন কিতাব ও নবীর অস্তিত্ব ছিল না; বরং তাঁদের অধিকাংশইতো হযরত মূসা, 'ঈসা ও দাউদ (আ)-এর ওপর এবং তাদের কিতাবসমূহের ওপর ঈমান-ই এনেছে তাঁর মাধ্যমে। নবুওয়তে মুহাম্মদীই তাদের নির্দেশ দিয়েছে সকল নবী ও কিতাবের ওপর ঈমান আনার এবং নবীদের মঝে পার্থক্য না করার।[১]

শরীয়তে মুহাম্মদীর অলৌকিকতা

শরীয়তে মুহাম্মদীর পূর্ণাঙ্গতা ও সর্বাংগীনতার আলোচনা প্রসংগে ইমাম সাহেব লিখেছেন ঃ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের শরীয়তই হলো পূর্ণাঙ্গ শরীয়ত। কেননা 'আকল ও বুদ্ধির বিচারে যা উত্তম ও নির্ভুল এ শরীয়তে তার সবগুলোই বিদ্যমান। তদ্রূপ 'আকল ও বুদ্ধির বিচারে যা ঘৃণিত ও বর্জনীয় এ শরীয়াতের তার সবগুলোই বর্জিত। এমন কোন নির্দেশ আমাদের রসূল (সা) দিয়ে যাননি যে সম্পর্কে আজ বলা যেতে পারে যে, এ নির্দেশ না দিলেই ভাল হতো। এমন কোন নিষেধও তিনি জারি করে যাননি যে সম্পর্কে আজ বলা যেতে পারে যে, এ নিষেধাজ্ঞা না হলেই ভালো হতো। যাবতীয় উত্তম ও পবিত্র জিনিস তিনি হালাল করে গেছেন, অথচ (স্থান, কাল ও পাত্রগত কারণে) পূর্ববর্তী শরীয়তে কিছু হালাল জিনিসও হারাম ছিল। তদ্রূপ যাবতীয় ঘৃণিত ও নাপাক জিনিস তিনি হারাম করে গেছেন, অথচ পূর্ববর্তী শরীয়তে সেগুলোর কিছু কিছু হালাল ছিল। দুনিয়ার সকল জাতি ও ধর্মের উত্তম ও সুন্দর জিনিসগুলো মুহাম্মদী শরীয়তে বিদ্যমান রয়েছে। আল্লাহ্, ফিরিশতা ও আখেরাত সম্পর্কে তাওরাত, ইঞ্জীল ও যবূরের

---

২. আল-জওয়াব, খ. ৪. পৃ. ৮২।

বিবরণগুলো পূর্ণাঙ্গ ও সর্বাংগীনরূপে কুরআন ও সুন্নাহ্য় পুনঃবিবৃত হয়েছে। তদুপরি এমন কিছু বিষয়ের বিবরণও তাতে এসেছে যা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে ছিল না। দয়া, মায়া, ন্যায়বিচার ও উত্তম কর্মের সুফল সংক্রান্ত বিবরণ আরো মর্মস্পর্শী ও হৃদয়গ্রাহী আঙ্গিকে এবং আরো সংযোজিত হয়ে শরীয়তে মুহাম্মদীতে এসেছে। ইসলামের 'ইবাদত ব্যবস্থার সাথে অন্যান্য জাতির ইবাদত ব্যবস্থার তুলনা করলে 'আকল ও প্রজ্ঞার অধিকারী সকলকেই এ সত্য স্বীকার করতে হবে যে, ইসলামী 'ইবাদত ব্যবস্থাই শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা। শাস্তি নীতিসহ শরীয়তের যাবতীয় আহকাম ও বিধানের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।[১]

প্রসংগক্রমে ইবাদত সম্পর্কে অন্যান্য জাতি ও ধর্মের দৃষ্টিভঙ্গী আলোচনার পর ইসলামী ইবাদতের উদ্দেশ্য, তাৎপর্য, কল্যাণ ও সুফল সম্পর্কেও তিনি অত্যন্ত সারগর্ভ ও প্রজ্ঞাপূর্ণ আলোচনা পেশ করেছেন[২] এবং প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামই ছিলেন ন্যায় ও সত্যের এবং জ্ঞান ও গুণের আদর্শ মানব। তাঁর পবিত্র সান্নিধ্যপ্রাপ্ত সাহাবা-ই কিরাম ও খোলাফায়ে রাশেদীন নিজেদের ব্যক্তি জীবনে, শাসন ক্ষেত্রে, খেলাফত পরিচালনায় এবং মানুষের সাথে আচার-আচরণে ইনসাফ ও সততার এবং ন্যায় ও ধার্মিকতার এমন সব উজ্জল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন যার বিন্দুমাত্র নজীর দুনিয়ার অন্য কোন জাতির ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যাবে না।[৩]

নবুওয়তে বিশ্বাসী মাত্রেরই মুহাম্মদী নবুওয়তের স্বীকৃতি প্রদান অপরিহার্য

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) অত্যন্ত যুক্তিসমৃদ্ধ ভাষায় দাবী করেছেন যে, নবুওয়তের হাকীকত ও প্রকৃতি এবং এর প্রয়োজনীয়তা ও অপরিহার্যতা সম্পর্কে সচেতন ব্যক্তির পক্ষে—তা যে নবীর অনুসারীই তিনি হোন—মুহাম্মদী নবুওয়তকে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। কেননা যে সকল প্রমাণ ও নিদর্শনের সাহায্যে পূর্ববর্তী নবুওয়তসমূহের সত্যতা প্রমাণ করা হয় সেগুলোর সাহায্যে নবুওয়তে মুহাম্মদীর সত্যতা আরো সহজেই প্রমাণ করা সম্ভব। যেমন, পূর্ববর্তী নবুওয়তসমূহের সত্যতা প্রমাণের জন্য মু'জিযা পেশ করা হলে আমরা বলব, পূর্ববর্তী নবীদের মু'জিযার তুলনায় রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লামের মু'জিযাসমূহ অধিক মহিমান্বিত ও নূরপূর্ণ। তদুপরি সেগুলো এমন নিরবচ্ছিন্ন ও সন্দেহাতীত বর্ণনাসূত্র দ্বারা প্রমাণিত যা পূর্ববর্তীদের মু'জিযার ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। তদ্রূপ তাঁর ওপর অবতীর্ণ কুরআন অন্যান্য আসমানী কিতাবের চেয়ে পূর্ণাঙ্গ এবং

১. আল-জওয়াব, ৪ খ., পৃ. ৮২-৮২।
১. আল-জওয়াব, পৃ. ১০৪-১১০।
২. আল-জওয়াব, খণ্ড ৪, পৃ. ১১৯।

তাঁর উম্মত পূর্ববর্তী উম্মতের তুলনায় অধিকতর বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী এবং মুহাম্মদী শরীয়তের আহকাম ও বিধানসমূহ অধিক উপযোগী ও কল্যাণপ্রসূ। প্রকৃতপক্ষে নবুওয়তে মুহাম্মদী অস্বীকার করা সকল নবীর নবুওয়ত অস্বীকার করারই নামান্তর। কেননা তখন পূর্ববর্তী কোন নবুওয়তের সত্যতা প্রমাণ করাই দুঃসাধ্য হয়ে পড়বে।

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) বলেন, নবুওয়তে মুহাম্মদী সত্যতা অস্বীকার করে অন্যান্য নবীর নবুওয়ত প্রমাণ করতে চাওয়ার অর্থ হলো কোন শাস্ত্রের দ্বিতীয় সারির শাস্ত্রবিদদের পাণ্ডিত্য ও প্রজ্ঞা মেনে নিয়ে উক্ত শাস্ত্রের স্থপতি ও আদিগুরুর শাস্ত্রজ্ঞান ও শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করে বসা। এ প্রসঙ্গে ইমাম সাহেব কয়েকটি আকর্ষণীয় উদাহরণ টেনে বলেন ঃ

> এর অর্থ এই যে, কেউ বলল, (ইমাম আবূ হানীফার ছাত্র এবং হানাফী ফিকহের বিন্যাস ও গ্রন্থনাকারী) যুফার ও ইবনুল কাসিম, মুযানী উচুঁ দরের ফকীহ হলেও আবূ হানীফা, শাফিঈ ও মালিকের কোন ফিকাহ জ্ঞান ছিল না, কিংবা আখ্‌ফাশ, ইবনুল আনবারী ও মুবাররাদ বিশিষ্ট আরবী ব্যাকরণবিদ ছিলেন, তবে খলীল, সীবাওয়ায়হ ও ফাররা ব্যাকরণের কিছুই জানতেন না। কিংবা মলকি ও মাসীহী প্রমুখ চিকিৎসা গ্রন্থ প্রণেতাদের তুলনায় বুকরাত ও জালিনুস চিকিৎসা শাস্ত্রের উল্লেখযোগ্য কোন ব্যক্তিত্ব নন। কিংবা দাউদ, সুলায়মান, য়ামলিখা, আকুস, দানিয়েল তো পয়গম্বর ছিলেন, কিন্তু মুহাম্মদ ইবন'আবদুল্লাহ নবী ছিলেন না; সেক্ষেত্রে শেষের স্ববিরোধী দাবীটি আগের গুলোর চেয়েও হাস্যকর হবে। সুতরাং হযরত মূসা ও 'ঈসা (আ)-কে আল্লাহ্‌র রাসূল এবং তাওরাত ও ইঞ্জীলকে আসমানী কিতাব স্বীকার করে নিয়ে যে নরাধম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের নবুওয়তকে অস্বীকার করবে এবং আল-কুরআনের অমর্যাদা করবে, তাকে বদ্ধ উন্মাদ ছাড়া আর কিছু বলার উপায় থাকবে না। আল-কুরআন ও অন্যান্য আসমানী কিতাব যিনি অধ্যয়ন করেন, মুহাম্মদী নবুওয়তের প্রমাণ ও নিদর্শনসমূহ এবং পূর্ববর্তী নবুওয়তগুলোর প্রমাণ ও নিদর্শনসমূহ যার সামনে রয়েছে, সর্বোপরি মুহাম্মদী শরীয়ত ও অন্যান্য শরীয়তের মাঝে তুলনা করার মত বিচার শক্তি যার রয়েছে এ বক্তব্যের সাথে তিনি অবশ্যই একমত হবেন।[১]

শরীয়তে মুহাম্মদীর সার্বজনীনতা

'আল-জওয়াবের' শুরুতে ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) খ্রিস্টানদের বহুল আলোচিত যে দাবীটি উল্লেখ করেছেন সে সম্পর্কেও কিছু বলা উচিত মনে হয়। খ্রিস্টানদের দাবী এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম মরু

১. আল-জওয়াব, খ. ১, পৃ. ১৮১।

আরবের জন্যই ছিলেন। সুতরাং খ্রিস্টান জগত তাঁর নবুওয়ত মানতে বাধ্য নয়। বর্তমান আরব খ্রিস্টানদের মাঝেও এ ধারণা দেখা যায়। এমন কি কিছুদিন যাবৎ ভারতবর্ষেও কোন কোন মহল থেকে প্রচার চালানো হচ্ছে যে, পরকালীন মুক্তির জন্য পূর্ববর্তী যে কোন ধর্মের পূর্ণাংগ অনুসরণই যথেষ্ট; একজন নিষ্ঠাবান য়াহূদী, খৃস্টান বা অমুসলিমের জন্য নবুওয়তে মুহাম্মদীর উপর ঈমান আনা জরুরী নয়। বস্তুত এ ভ্রান্ত আকীদা ইসলামী দাওয়াতের বিশ্ব ব্যাপকতা এবং নবুওয়তে মুহাম্মদীর সার্বজনীন রূপের ওপর চূড়ান্ত আঘাতের শামিল। এ ধারণা সত্য হলে চিরদিনের জন্য ইসলাম প্রচারের দ্বার রুদ্ধ হয়ে যাবে এবং পৃথিবীর কোণে কোণে ইসলামের আলো ছড়িয়ে দেয়ার জন্য এ পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহ যে ত্যাগ ও কোরবানী পেশ করেছে তা সম্পূর্ণ অর্থহীন প্রতিপন্ন হবে। খ্রিস্টানদের এ শয়তানী চক্রান্তের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) পূর্ণ সচেতন ছিলেন। তাই এর দাঁতভাঙা জওয়াব দিতে গিয়ে তিনি তাঁর সবটুকু লেখনী শক্তি এতে ঢেলে দিয়েছিলেন। ফলে এই একটি মাত্র প্রসঙ্গ 'আল-জওয়াব' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড ২৮ পৃষ্ঠ থেকে ২৩০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। বুদ্ধিবৃত্তিক ও যৌক্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে এবং তথ্য ও উপাদানগত বিচারে এটাই একমাত্র পূর্ণাংগ ও সারগর্ভ আলোচনা যা একজন বিদগ্ধ 'আলিম ও মুতাকাল্লিমের কলম আমাদেরকে উপহার দিয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকল আয়াত ও সহী হাদীস এমন সুন্দরভাবে তিনি পরিবেশন করেছেন যে, অতঃপর মুহূর্তের জন্যও এ হাস্যকর ধারণার অবকাশ থাকে না যে, নবুওয়তে মুহাম্মদী আরব উপদ্বীপেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং নবুওয়তে মুহাম্মদীর উপর ঈমান না এনেও মুক্তির কোন উপায় হতে পারে। একস্থানে তিনি লিখেছেন ঃ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

كان النبى يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة -

পূর্ববর্তী নবীরা নিজ নিজ গোষ্ঠীর জন্য প্রেরিত হতেন আর আমি প্রেরিত হয়েছি গোটা মানবজাতির জন্য।

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

قل يايها الناس انى رسول الله اليكم جميعا الذى له ملك السموات والارض -

হে লোক সকল! আমি তোমাদের সকলের জন্য প্রেরিত সেই আল্লাহ্র পক্ষ হতে যাঁর নিরংকুশ আধিপত্য আসমান যমীনে বিস্তৃত।

আরো ইরশাদ হয়েছে ঃ

وماارسلناك الاكافة للناس بشيرا ونذيرا -

গোটা মানবতার জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপেই আপনাকে আমি প্রেরণ করেছি।

কুরআনুল করীমে যে সকল আয়াতে ইয়াহূদী, খ্রিস্টান, মুশরিক, পৌত্তলিক তথা জিন-ইনসানকে যতবার দাওয়াত দেয়া হয়েছে তার সংখ্যা গণনাও এক কষ্টকর কাজ। বস্তুত এটা এক সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ইসলামী 'আকীদা যার জন্য স্বতন্ত্র প্রমাণ পেশ করার কোন প্রয়োজন নেই। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ 'আল্লায়হি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত ও তাবলীগের ঘটনাবলী এবং বিভিন্ন দেশ ও দেশনেতার নামে দূত ও পত্র প্রেরণের ইতিহাস আমাদের সামনে রয়েছে, রয়েছে ইয়াহূদী, খ্রিস্টান ও অগ্নিপূজকদের বিরুদ্ধে লাগাতার জিহাদের সুদীর্ঘ ইতিহাস। সর্বোপরি রয়েছে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন যা কিতাবীদের প্রতি ঈমানের আহ্বানসম্বলিত আয়াতে আয়াতে ভরপুর। এরপর কেমন করে এ কথা বলা চলে যে, আরব ছাড়া অন্য কোন জাতির প্রতি প্রেরিত রাসূল হওয়ার দাবী রাসূল নিজেও করেন নি?[১]

অন্যত্র তিনি লিখেছেন ঃ

আরো কয়েকগুণ দলীল ও যুক্তি-প্রমাণ আমরা পেশ করতে পারি যা দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণ করে যে, খ্রিস্টানসহ সকল আহলে কিতাবের প্রতি নবীরূপে প্রেরিত হওয়ার ঘোষণা স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম দিয়েছেন। তিনি তাদের দাওয়াত দিয়েছেন এবং দাওয়াত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন। সর্বোপরি উম্মতকেও দাওয়াত দিয়েছেন ও জিহাদের এ ধারা অব্যাহত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। নবীর তিরোধানের পর সনদবিহীন ও ভিত্তিহীনভাবে উম্মত এ কাজ নিজে থেকে শুরু করেনি যেমন করেছে হযরত 'ঈসার পর তাঁর নামধারী অনুসারীরা। কেননা নবীজীর ওফাতের পর তাঁর শরীয়তে বিন্দুমাত্র সংযোজন, সংশোধন ও পরিবর্তনের অধিকার কারো নেই। মুসলমানদের 'আকীদা এই যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল যা হালাল বা হারাম করেছেন তাই শুধু হালাল বা হারাম হতে পারে এবং আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র রাসূল যা অনুমোদন করেছেন তাই শুধু শরীয়তের মর্যাদা পেতে পারে।[২]

শী'আ মতবাদ খণ্ডন

আহলে সুন্নতের 'আকীদা-বিশ্বাস এবং খোলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবায়ে কেরামের পবিত্রতা ও মর্যাদা রক্ষার উদ্দেশ্যে শী'আবাদের বিরুদ্ধে ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) বিভিন্ন সময় শক্ত হাতে কলম ধরেছেন। তবে শী'আবাদের বিরুদ্ধে منهاج السنة النبوية فى نقض كلام الشيعة والعترية নামে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থও তিনি লিখেছিলেন। আলোচ্য গ্রন্থ রচনার প্রেক্ষাপট এই যে, শী'আ

১. আল-জওয়াব, খ. ১, পৃ. ১১৫-১১৬। ২. আল-জওয়াব পৃ. ১১৭-১৮।

মতবাদ ও ইমামত সংক্রান্ত 'আকীদা খণ্ডনের উদ্দেশ্য সমসাময়িক শী'আ 'আলিম ইবনু'ল-মুতাহ্হির منهاج الكرامة فى معرفة الامامة নামে বিরাট কলেবরের একটি বই লিখেছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, কিতাবটি মূলত তিনি লিখেছিলেন তাঁর ভক্তিভাজন তাতারী সম্রাট ওয়ালিজা খোদাবান্দা খানের উদ্দেশ্যে যিনি তাঁর তাবলীগ ও মেহনতের সুবাদে শী'আবাদ গ্রহণ করেছিলেন। হাতে হাতে কিতাবটি সিরিয়াতে এসে পৌছল এবং ইবনে তায়মিয়া (র)-র নজরেও পড়ল। শী'আদের বড় গর্ব ছিল যে, আহলে সুন্নতের কোন 'আলিমের পক্ষেই এ কিতাবের জওয়াব দেয়া সম্ভব নয়। হযরত আলী (রা) এবং আহলে বায়তের ইমামত ও ইসমত (নিষ্পাপতা), প্রথম তিন খলীফার খেলাফতের অবৈধতা এবং সাধারণভাবে সকল সাহাবার চরিত্র হনন এই ছিল কিতাবের প্রধান আলোচ্য বিষয়। হযরত আলী (রা) সহ বার ইমামের ইমামত ও 'ইসমতের তথাকথিত 'আকীদাকে কুরআনের বিভিন্ন আয়াত এবং হাদীসের বিভিন্ন রেওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণ করার এতে অপচেষ্টা চালানো হয়েছিল। এমনকি তিন খলীফাসহ সকল সাহাবার চরিত্র হননের ক্ষেত্রে ইতিহাস গ্রন্থের পাশাপাশি কুরআন হাদীসের আয়াত ও রেওয়ায়াত ব্যবহারের ধৃষ্টতাও এতে দেখানো হয়েছিল। সত্যি বলতে কি, গ্রন্থকার তাঁর মেধা, প্রজ্ঞা, যুক্তিপ্রয়োগ ক্ষমতা এবং গভীর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের মহড়া দিতে বিন্দুমাত্র কসুর করেন নি। তাঁর ধারণায় এ গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে শী'আবাদের পক্ষ থেকে আহ্লে সুন্নতের 'আলিম সমাজকে ' শেষ কথা' বলে দেওয়া হয়েছে। সাধারণ উত্তরসূরী শী'আদের মত গ্রন্থকারও উসূল ও আকীদার ক্ষেত্রে মু'তাযিলাপন্থী ছিলেন। তাই যাত ও সিফাত তথা আল্লাহ্র গুণ ও সত্তা এবং আহ্লে সুন্নতের 'আকীদা ও মৌল বিশ্বাস সম্পর্কেও তিনি বিশদ আলোচনা করেছেন এবং তাতে দর্শন ও কালামশাস্ত্রের সূক্ষ্ম ও জটিল বিষয়ের অবতারণা করেছেন। এ ছাড়া 'আকায়েদ, তাফসীর, হাদীস ও ইতিহাসসহ বিভিন্ন শাস্ত্রীয় আলোচনায় ও জটিল তত্ত্ব-কথায় বইটি ছিল ভরপুর। সুতরাং একজন সর্বজ্ঞান-বিশারদ পণ্ডিত ব্যক্তির পক্ষেই এ কিতাবের সমুচিত জওয়াব লেখা সম্ভব ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে শী'আ গ্রন্থকাররা জাল হাদীস বর্ণনার ব্যাপারে বেশ সিদ্ধহস্ত ছিলেন। অন্যদিকে হাদীস শাস্ত্রের এত বিস্তৃতি ঘটেছিল এবং হাদীস সংকলনের এমন বিরাট ভাণ্ডার গড়ে উঠেছিল যে, সমালোচনা বিজ্ঞান এবং রিজাল-শাস্ত্রের নীতিমালার আলোকে হাদীসের চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণের কাজ খুবই জটিল ও দুরূহ হয়ে পড়েছিল। সুতরাং এ খিদমত আঞ্জাম দেয়া এমন ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব ছিল, হাদীস ও রিজাল শাস্ত্রের গোটা ভাণ্ডার যার নখদর্পণে রয়েছে এবং সূত্র, বর্ণনা ও বরাতের ক্ষেত্রে যাকে প্রতারিত করা সম্ভব নয় কিছুতেই। সেই সাথে ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কেও থাকতে হবে তাঁর সুগভীর জ্ঞান যাতে প্রথম দৃষ্টিতেই গ্রন্থকারের ঐতিহাসিক বিচ্যুতি ও মিথ্যাচার

তাঁর কাছে ধরা পড়ে যায় এবং কোন জাল বর্ণনাই তাঁর কাছে ছাড় না পায়। এটা স্বীকৃত সত্য যে, ইতিহাসের সুবিশাল ভাণ্ডার থেকে উপাদান সংগ্রহ করে যে কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তিকেই কলংকিত করে দেখানো সহজ। কিন্তু তার পক্ষ থেকে সাফাই পেশ করা খুবই কঠিন। তদুপরি সাহাবা চরিত্রে কলংক লেপন হচ্ছে শী'আদের প্রিয়তম বিষয় এবং মেধা ও প্রতিভা প্রয়োগের উর্বরতম ক্ষেত্র।

বলা বাহুল্য যে, ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-ই ছিলেন সেই যোগ্যতম ব্যক্তি। কেননা তিনি ছিলেন সে যমানার আমীরু'ল-মু'মিনীন ফি'ল-হাদীস। হাদীস ও রিজাল শাস্ত্রের গোটা গ্রন্থাগার তাঁর সামনে ছিলো উন্মুক্ত। আর তাঁর সম্পর্কে বিদগ্ধজনদের মন্তব্য হলো ঃ যে হাদীস সম্পর্কে ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) 'জানিনা' বলেন, আদতে সেটা হাদীসই নয়। সুতরাং আহলে সুন্নাতের পক্ষ থেকে আলোচ্য কিতাবের সমুচিত জবাব লেখার জন্য ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-কে জোর অনুরোধ জানানো হলো। দীন ও 'ইলমের বড় সৌভাগ্য যে, সাহাবা চরিত্র হননের এ ভয়ংকর ফিতনা প্রতিরোধে গোটা উম্মাহর পক্ষ থেকে কলম হাতে ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) এগিয়ে এলেন এবং আলোচ্য শী'আ গ্রন্থের রচনালগ্নেই এমন দাঁতভাঙা জওয়াব লিখলেন যা তাঁর পরবর্তীকালের কোন 'আলিমের পক্ষে বলতে গেলে দুঃসাধ্যই হতো। এখন যে কেউ এ বিষয়ে কলম ধরবেন তাকে মূলত ইবনে তায়মিয়া র)-র ভাণ্ডার থেকেই রসদ সংগ্রহ করতে হবে।

'মিনহাজু'স-সুন্নাহ'[১] নামে ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র এ জওয়াবী গ্রন্থ তাঁর রচনা-সমগ্রে এক বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী। ইবনে তায়মিয়ার বিদগ্ধ জ্ঞান, প্রজ্ঞাপূর্ণ দূরদৃষ্টি, জাগ্রত মেধা এবং অধ্যয়নের ব্যাপ্তি ও পরিপক্কতা সম্পর্কে জানতে হলে এ বইটি অবশ্যই পড়ে দেখতে হবে। ইবনুল-মুতাহহিরের 'মিনহাজুল কারামা' থেকে উদ্ধৃতি পেশ করে যখন তিনি জবাবী কলম ধরেন আর তাঁর ধর্মীয় মর্যাদাবোধ উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে, জ্ঞান সমুদ্রে উত্তাল তরঙ্গ জাগে এবং হাদীস, তাফসীর ও ইতিহাস সংক্রান্ত তথ্য উপাদানের ঢল নামে, তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবেই প্রতিপক্ষকে বলতে ইচ্ছা করে ঃ

يايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لايشعرون - (النمل ١٨)

হে পিপীলিকা দল! গর্তে ঢুকে পড়, সুলায়মান ও তার বাহিনী নিজেদের অজান্তেই হয়ত তোমাদের পিষে ফেলবে। [সূরা নমল, আয়াত-১৮]

---

১. চার খণ্ডের এই বইটির মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২১৪। ১৩২২ হিজরীতে শেখ মুস্তফা আল-বাবরী তত্ত্বাবধানে মিসরের আমীরিয়া প্রকাশনা থেকে ছাপা হয়েছে। আল্লামা যাহবী আল-মুনতাকা নামে বইটির সংক্ষেপ করেছেন। অতি সম্প্রতি শেখ মুহাম্মদ লতীফের উদার পৃষ্ঠপোষকতায় এবং মুহিববুদ্দীন আল-খতীবের তত্ত্বাবধানে মিসর থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

গ্রন্থ রচনার অন্তর্গত কারণ

মিনহাজু'স-সুন্নাহ গ্রন্থের রচনা কর্মে ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র হাত দেওয়ার মূল কারণ হলো, মিনহাজু'ল-কারামার লেখক ইবনু'ল-মুতাহ্হির খুলাফায়ে রাশেদীনসহ প্রথম সারির বিশিষ্ট সাহাবা-ই কিরামের বিরুদ্ধে নগ্ন ভাষায় বিষোদগার করেছেন এবং তাঁদেরকে নিকৃষ্টতম মানুষ প্রমাণ করার অপচেষ্টা চালিয়েছেন। অথচ আহলে সুন্নাতের ইমাম ইবনে তায়মিয়ার মতে ঈমান ও ধার্মিকতায় এবং চরিত্র ও নৈতিকতায় নবীদের পর তাঁরাই হলেন শ্রেষ্ঠতম মানব। তাঁদের বিরুদ্ধে মুখ খোলার অর্থ হলো ইসলামের ভিত্তিমূলে আঘাত হানা, নবুওয়তে মুহাম্মদীকে অসফল প্রমাণিত করা এবং কুফর ও ধর্মত্যাগের মহা ফেতনার দরজা খুলে দেওয়া। এক স্থানে তিনি লিখেছেন ঃ

> এ পাষণ্ড যদি সেই মহামানবদের চরিত্রে হামলা না চালাত যাঁরা হলেন আহলুল্লাহ্দের পথিকৃত, মানবজাতির পথ-প্রদর্শক এবং নবীদের পর আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, হামলাও এমন নির্দয় ও জঘন্য যা কাফির ও মুনাফিকদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে এবং ঈমানদারদের অন্তরে সন্দেহ ও দুর্বলতা সৃষ্টি করে দীন ও ইসলামের সর্বনাশ সাধনের শামিল, তা না হলে সমালোচনার মাধ্যমে এ ব্যক্তির স্বরূপ তুলে ধরার কোন গরজ আমাদের থাকত না। আল্লাহ্ পাক তার ও তার সমমনাদের উপযুক্ত বদলা বিধান করুন।

শী'আদের কথামতে ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানরাই উত্তম

সাহাবাদের চরিত্র হনন এবং তাঁদের হেয় প্রতিপন্ন করার ঘৃণ্য শীআ মানসিকতার আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন ঃ

> উম্মতে মুহাম্মদী হলো শ্রেষ্ঠ উম্মত। তাদের মাঝে প্রথম যুগের মুসলমানগণ হলেন শ্রেষ্ঠতম। উত্তম ইলম ও উত্তম 'আমলের ক্ষেত্রে তাঁরা ছিলেন সবার ওপরে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, কুচক্রীরা সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র অঙ্কন করেছে। তাদের বিবরণ থেকে মনে হয়, এই পুণ্যাত্মাদের যেমন হক ও সত্যের জ্ঞান ছিল না, তেমনি হকের অনুগতও তাঁরা ছিলেন না; বরং তাঁদের অধিকাংশই জেনেশুনে হকের বিরোধিতা করতেন এবং জালিমদের সাথে হাত মেলাতেন। কেননা সত্যের নাগাল পাওয়ার মত 'চিন্তাশক্তি' তাঁদের ছিল না। চিন্তা শক্তিকে যাঁরা কাজে লাগায় না, দুনিয়ার মোহ এবং প্রবৃত্তির ফাঁদে পড়া ছাড়া তাঁদের আর কি হবে! তাদের দাবী মতে, সাহাবাদের কেউ কেউ খাহেশের কারণেই খিলাফতের দাবীদার হয়েছিলেন। তাদের এ সকল

কথার অনিবার্য অর্থ এই দাঁড়ায় যে, নবীর ওফাতের পর গোটা উম্মত গোমরাহীতে ডুবে গিয়েছিলো। কেউ হিদায়াতের পথে ছিলো না। সুতরাং স্বীকার করতেই হবে যে, ইয়াহূদী ও খ্রিস্টান জাতি (ইয়াহূদী ও খ্রিস্ট ধর্মের বিকৃতি সত্ত্বেও) সাহাবাদের চেয়ে উত্তম ছিলেন। কেননা কুরআন শরীফে আছে ঃ

ومن قوم موسى امة يهدون بالحق وبه يعدلون -(اعراف)

মূসার কওমে এমন এক জামাআত রয়েছে, যারা সত্যের পথ বাতলে দেয় এবং সে মুতাবিক ইনসাফ করে। সূরা আ'রাফ;

রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ইয়াহূদী ও খ্রিস্টান জাতি সত্তরের অধিক ফিরকা হবে, তার মধ্যে একটি দলই শুধু নাজাত পাবে। কিন্তু শীআদের কথা মেনে নিলে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পর হক ও ইনসাফের ওপর অবিচল একটি দলও বিদ্যমান ছিল না। আর সর্বোত্তম যুগের এই অবস্থা হলে পরবর্তীদের তো কোন প্রশ্নই আসে না। সুতরাং স্বীকার করতেই হবে যে, ধর্ম বিকৃতির অপরাধ সত্ত্বেও ইয়াহূদী ও খ্রিস্টান জাতি এই উম্মতের চেয়ে উত্তম। অথচ এই উম্মতের প্রশংসা করেই আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

كنتم خير امة اخرجت للناس -

তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানুষের হিদায়াতের জন্য তোমরা উত্থিত।[১]

উম্মতের শ্রেষ্ঠরা শীআদের চোখে নিকৃষ্ট

অন্যত্র তিনি লিখেছেন ঃ

নবী-রসূলদের পর শ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী এই জামাআতকে যাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের সনদ দিয়েছে খোদ আল-কুরআন–শী'আপন্থীরা উম্মতের নিকৃষ্টতম জামা'আত প্রমাণ করে ছেড়েছে। তাঁদের সুমহান চরিত্রে জঘন্যতম অপবাদ আরোপ করা হয়েছে। এমন কি তাঁদের সুকর্মগুলোকেও কুকর্মরূপে তুলে ধরা হয়েছে। পক্ষান্তরে প্রবৃত্তির পূজারীর নামধারী মুসলমানদেরকে যাদের চেয়ে বড় মূর্খ, অত্যাচারী, মিথ্যাচারী, পাপাচারী এবং ঈমানের নূর ও হাকীকত থেকে বঞ্চিত আর কেউ নেই–উম্মতের উত্তম ও শ্রেষ্ঠ জামা'আতরূপে তুলে ধরা হয়েছে। এভাবে গোটা উম্মাহকে কাফির বা গোমরাহ আখ্যায়িত করে নিজেদের ক্ষুদ্র দলটিকেই শুধু সত্যপন্থী বলে দাবী করা হচ্ছে।

---

১. ঐ, খণ্ড ১, পৃ. ১৫২।

একটি উদাহরণ

তারা সেই ব্যক্তির মতো যাকে বিরাট বকরী-পালের মালিকের পক্ষ থেকে বলা হলো ঃ 'এ-পালের সবচেয়ে তাজা বকরীটি কুরবানীর জন্য আমাকে বেছে দাও।' কিন্তু সে সবচেয়ে দুর্বল ও কংকালসার বকরীটি বেছে বের করল যাতে না আছে গোশ্‌ত, না আছে চর্বি। উপরন্তু সেটাকেই সে পালের সেরা বকরী বলে দাবী করে বলল, এটাকেই কুরবানী করা উচিৎ। পালে আর যা দেখছো এগুলো বকরীই নয়, শুয়োর। কুরবানী করা দূরের কথা এগুলো মেরে ফেলাই উচিত।

ইমাম শা'বীর মন্তব্য

ইমাম শা'বী (র)-র মন্তব্য উদ্ধৃত করে ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) লিখেছেন যে, ইয়াহূদী-খ্রিস্টানরা তাদের নবীদের ফযীলত ও মর্যাদা সম্পর্কে রাফিযীদের চেয়ে বেশী সচেতন। ইয়াহূদীদেরকে জিজ্ঞেস করা হলো ঃ তোমাদের মাঝে সর্বোত্তম কারা? তারা বললো, হযরত মূসার শিষ্যরা। অনুরূপভাবে খ্রিস্টানদেরকে জিজ্ঞেস করা হলে তারা বলল, হযরত 'ঈসার শিষ্যরা। পক্ষান্তরে রাফিযীদের প্রশ্ন করা হলো, তোমাদের মাঝে নিকৃষ্টতম কারা? তারা বলল, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের সাহাবারা। তখন ভদ্রলোকদেরকে সাহাবাদের জন্য মাগ্‌ফিরাত প্রার্থনার অনুরোধ করা হলো। কিন্তু তারা তাদের প্রতি মুখ খারাপ করল।[১]

প্রথম সারির মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষ আর কাফিরদের সাথে সখ্যতা

রাফিযীদের স্বভাব এই যে, মুসলমানদের পরিবর্তে ইয়াহূদী, খ্রিস্টান ও মুশরিকদের সাথেই তারা হাত মিলিয়ে থাকে। তাদের সাথে সখ্যতা গড়ে তুলতেই তারা অধিক আগ্রহী। বলুন তো, শীর্ষস্থানীয় আনসার ও মুহাজিরদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী এবং কাফির ও মুনাফিকদের সাথে সখ্যতা স্থাপনকারীদের চেয়ে অধিক গোমরাহ্ আর কে হতে পারে?[২]

অতঃপর কাফিরদের সাথে শী'আদের সখ্যতা ও দহরম-মহরমের ঘটনাবলী উল্লেখ করে ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) লিখেছেন ঃ

কাফিরদের সাথেই তাদের অধিকাংশের অন্তরঙ্গতা। মুসলমানদের চেয়ে তাদের সাথেই তাদের অধিক ঘনিষ্ঠতা। তাই পূর্বদিক থেকে যখন তাতারী হামলার সয়লাব এল এবং খুরাসান, ইরাক, সিরিয়া ইত্যাদি অঞ্চলে খুনের

১. ঐ, খণ্ড ১, পৃ. ৬।
২. ঐ, খণ্ড ২, পৃ. ৮৩।

দরিয়া বয়ে গেল তখন শী'আ রাফিযীরা ছিল তাদের দোসর ও সাহায্যকারী। তদ্রূপ হলবের শী'আরাও মুসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রুদের মদদ যোগানোর কাজে ছিল বেশ তৎপর। সিরিয়াতেও খ্রিস্টান হানাদারদের রাফিযীরা মদদ যুগিয়েছে। তোমরা দেখে নিও, ইরাক কিংবা অন্য কোথাও ইয়াহূদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে এই শী'আ রাফিযীরাই হবে তাদের বিশ্বস্ত মিত্র। মোট কথা, মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফির, মুশরিক, ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদের মদদ যোগানোর জন্য সব সময় এরা এক পায়ে খাড়া।[১]

ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িক মানসিকতা

'মিন্‌হাজু'ল-কারামা' গ্রন্থে এক স্থানে খাজা নাসিরুদ্দীন তুসীর নাম নিতে গিয়ে ভক্তি গদগদ ভাষায় ইবনু'ল-মুতাহহির লিখেছেন ঃ

شيخنا الامام الاعظم خواجة نصير الملة والحق والدين محمد بن الحسن الطوس قدى الله روحه -

গ্রন্থকারের এ অর্থপূর্ণ ভক্তি প্রদর্শন ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র ঈমানী জযবার আগুনে যেন তেল ছিটিয়ে দিল।

আব্বাসী খলীফার হত্যাকাণ্ড এবং বাগদাদের গণহত্যায় তুসীর ঘৃণ্য ভূমিকা এবং তার নাস্তিক্যবাদী 'আকীদা ও চিন্তাধারার বিশদ বিবরণ তুলে ধরে সীমাহীন ক্ষোভের সাথে তিনি লিখেছেন ঃ

> কী আশ্চর্য! এ লোক হযরত আবূ বকর, ওমর, 'উছমান (রা) সহ শীর্ষস্থানীয় সাহাবা এবং পরবর্তী যুগের ইমাম, 'আলিম ও মুজতাহিদদের শানে চরম ধৃষ্টতা প্রদর্শন করছে। নির্দ্বিধায় তাঁদের পূত-পবিত্র চরিত্রে জঘন্য কলংক লেপন করছে। এমনকি মুখ বাঁকা না করে তাঁদের নামটা পর্যন্ত সে নিতে রাযী নয়। অথচ ইসলামের এক প্রকাশ্য দুশমনের নামে সে বিতরণ করছে شيخنا الامام الاعظم -এর মত রাশভারি খেতাব! তার জন্যই কিনা কামনা করছে রহমত। অথচ এই তুসীর 'আকীদা ও চিন্তাধারা সম্পর্কে কুফরীর ফতোয়া সে নিজেই জারী করেছে। এমন 'এক চোখ অন্ধ' যারা তাদের লক্ষ্য করেই বুঝি আল-কুরআন ইরশাদ করেছে ঃ

الم ترالى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا اهؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا . اولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجدله نصيرا

---

১. ঐ. খণ্ড ২, পৃ. ৮৪।

তুমি তাদের দেখনি, যাদের দেওয়া হয়েছিল কিতাবের কিছু অংশ; তবুও তারা মূর্তি ও তাগুতে ঈমান রাখে, আর কাফিরদের সম্পর্কে বলে যে, এরা মুসলমানদের চেয়ে অধিক হিদায়াতপ্রাপ্ত। এদের ওপরই তো আল্লাহ্‌র লা'নত নাযিল হয়, আর আল্লাহ্‌র লা'নত যাদের ওপর তাদের বাঁচানেওয়ালা কেউ নেই।[১] [নিসা ঃ আয়াত-৫১-৫২]

শী'আদের আজব ভেলকি

শী'আদের একটি সুপরিচিত মুদ্রাদোষ সম্পর্কে ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) লিখেছেন যে, নবীদের সাথে নসব ও রক্তসূত্রে সম্পর্কিত (ঊর্ধ্বতন ও অধস্তন) পুরুষদের অর্থাৎ তাঁদের পিতা-মাতা ও সন্তান-সন্ততির প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা প্রদর্শন করলেও তাঁদের জীবন-সঙ্গিনী ও স্ত্রীদের শানে তারা চরম ধৃষ্টতা প্রদর্শনপূর্বক লাগামহীন অপবাদ আরোপ করে থাকে। এটা মূলত তাদের ঘৃণ্য প্রবৃত্তি ও জঘন্য সাম্প্রদায়িক মানসিকতারই বহিঃপ্রকাশ। তাই হযরত ফাতিমা (রা) এবং হাসান-হুসায়ন ভ্রাতৃদ্বয়কে সম্মান করলেও উম্মু'ল-মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা)-র শানে এরা চরম গোস্তাখী করে এবং তাঁর চরিত্রে কলংক লেপন করে।[২] আরো মজার ব্যাপার এই যে, মুহাম্মদ ইবন আবূ বকর (রা)-এর প্রতি এরা ভক্তিতে গদগদ, অথচ তাঁর পিতা হযরত আবূ বকর (রা) সম্পর্কে মুখে গালির খৈ ফোটে। ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) লিখেছেন ঃ

মুহাম্মদ ইবন আবূ বকরের প্রতি এরা মাত্রাহীন ভক্তি দেখায়। অবশ্য হযরত উছমান (র)-এর বিরুদ্ধে গোলযোগ সৃষ্টিতে শরীক সকলের প্রতিই এদের এ ভক্তি উচ্ছ্বাস। তদ্রূপ গৃহযুদ্ধে হযরত আলী (রা)-র পক্ষ সমর্থক সকলেই তাদের ভূয়সী প্রশংসা পেয়েছে। এমনকি মুহাম্মদ ইবন আবূ বকরকে তারা পিতা আবূ বকর (রা)-এর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে দেয়। আরো মজার ব্যাপার এই যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের পর উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যিনি, তাঁর নামে তারা অভিসম্পাত দেয় মুখ ভরে। অথচ যার ভাগ্যে নবী সান্নিধ্য কিংবা অন্য কোন গৌরব জোটেনি কখনো তার প্রশংসা করে মনভরে। নবী-নসবের প্রতি ভক্তি প্রদর্শনে এ ধরনের অদ্ভুত সব স্ববিরোধিতা রয়েছে তাদের।[৩]

সাহাবা-বিদ্বেষ মনের মলিনতার প্রমাণ

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) লিখেছেন ঃ

---

১. ঐ, পৃ. ৯৯-১০০।
১. মিনহাজু'স-সুন্নাহ্, খণ্ড ২, পৃ. ১৯৩।
২. ঐ. পৃ. ২০০-২০০১।

নবীদের পরে যাঁরা শ্রেষ্ঠ মু'মিন এবং আল্লাহ্‌র পথের অগ্রপথিক তাঁদের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ পোষণ করা হৃদয়ের মারাত্মক পচন ও ব্যাধিরই প্রমাণ। তাই মালে গনীমতে তাঁরাই শুধু হিস্‌সা পাবে যাঁদের অন্তরে আনসার ও মুহাজির তথা অগ্রসারির মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষ নেই, আছে নিখাদ ভালবাসা ও সুগভীর শ্রদ্ধা, যারা তাঁদের জন্য মহান প্রতিপালকের দরবারে দু'আ করে, মাগফিরাত প্রার্থনা করে ঃ

والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفرلنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم -

এবং তাদের জন্যও যারা পূর্ববর্তী (মুহাজির)-দের পরে এসেছে, তারা প্রার্থনা করে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এবং আমাদের পূর্বে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে ক্ষমা করে দিন। ঈমানদারদের প্রতি আমাদের অন্তরে যেন বিদ্বেষ না থাকে (সে তাওফীক দান করুন)। হে আমাদের প্রতিপালক! নিঃসন্দেহে আপনি মেহেরবান, করুণার আঁধার।

[সূরা হাশর ঃ আয়াত-১০]

দুই সাহাবা-প্রধানের প্রতি বিদ্বেষ

হযরত আবূ বকর (রা) ও ওমর (রা)-এর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ এবং তাঁদের মহান চরিত্রে কলংক লেপন কেবল দু'ধরনের ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব। প্রথমত, ইসলাম-বিদ্বেষী মুনাফিক যাদের মূল উদ্দেশ্যই হলো দুই মহান সাহাবার চরিত্র হননের ছিদ্রপথে রসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর দীনকে অপবাদ দেওয়া। রাফিযীদের আদি গুরু এই দলের অন্তর্ভূক্ত ছিল। বাতেনী ফিরকার দলনায়কদেরও একই অবস্থা ছিল। দ্বিতীয়ত, সেই মূর্খের দল যারা চরম মূর্খতা ও প্রবৃত্তি সেবার কারণে অন্ধত্বের শিকার হয়েছে। এটা সাধারণ শী'আদের অবস্থা অর্থাৎ যাদের অন্তরে ঈমান বিদ্যমান রয়েছে।

রিসালতের প্রতি অপবাদ

মুসলমান মাত্রই সন্দেহাতীতভাবে জানে যে, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের সাথে হযরত আবূ বকর, ওমর ও উছমান (রা)-এই তিন সাহাবা প্রধানের বিশেষ সুসম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। তিনজনই তাঁর বিশেষ নৈকট্যপ্রাপ্ত ছিলেন। এমন কি তাঁর সাথে তাঁদের আত্মীয়তার সম্পর্কও ছিল। প্রথম দু'জনের কন্যা তাঁর পুণ্যবতী স্ত্রীদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। পক্ষান্তরে অপরজন ছিলেন একে একে তাঁর দুই কন্যার ভাগ্যবান স্বামী। কোথাও

এমন কোন প্রমাণ নেই যে, তিনি তাঁদের নিন্দা করেছেন কিংবা অভিসম্পাত দিয়েছেন; বরং সুপ্রমাণিত সত্য এই যে, সর্বান্তকরণে তাঁদের তিনি ভালোবাসতেন এবং তাঁদের সততা, ধার্মিকতা, আন্তরিকতা ও নিঃশর্ত আত্মনিবেদনের প্রশংসা করতেন। এমতাবস্থায় হয় আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, নবীর জীবদ্দশায় ও পরে তিন সাহাবা-প্রধান বাহ্যিক ও আন্তরিক উভয় দিক থেকেই সৎ ও বিশ্বস্ত ছিলেন এবং ঈমান ও আমলে খাঁটি ছিলেন, নতুবা নবীর জীবদ্দশায় ও পরে ঈমান ও আমলে তাঁরা কপট ছিলেন। এই কপটতা সত্ত্বেও রাসূল (সা) কেন তাঁদেরকে এমন স্নেহ ও নৈকট্য দান করেছিলেন? এর দু'টি ব্যাখ্যা হতে পারে। তাঁদের মনের কপটতা তাঁর অগোচরে ছিল কিংবা জেনে-শুনেও তোষামোদের কৌশল তিনি অবলম্বন করেছিলেন। উভয় ক্ষেত্রেই নবী চরিত্র কলংকিত হবে। এমনকি তাঁর নবূওয়তের সত্যতাও হবে প্রশ্নের সম্মুখীন। অবস্থাটি হবে কবির ভাষায় ঃ

فان كنت لاتدرى فتلك مصيبة

وان كنت تدرى فالمصيبة اعظم -

'জানা ছিলো না, যদি বল তাহলেও বিপদ; আর যদি বল যে, তুমি জানতে তাহলে তো মহাবিপদ।'

পক্ষান্তরে যদি বলা হয় যে, নবীর জীবদ্দশায় তাঁরা সত্যে অবিচল ছিলেন, পরে তাঁদের বিচ্যুতি ঘটেছিল তাহলে স্বীকার করতে হবে যে, সাহাবাদের বিশেষত অগ্রসারির সাহাবাদের ঈমান ও আমল এবং জীবন ও চরিত্র গঠনে আল্লাহ্‌র রাসূল সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিলেন। যে নবীকে ওহীযোগে অতীত ও আগামী ইতিহাসের 'ইল্‌ম দান করা হয়েছিল, কী আশ্চর্য! তিনি তাঁর বিশিষ্টতম সাহাবাদের ভবিষ্যত ধর্মচ্যুতির কথাটাই জানতে পারলেন না! উম্মতকে এ সম্পর্কে সতর্ক করে যাওয়াই তাঁর দায়িত্ব ছিল যেন অজ্ঞতাবশত তাদেরকে খলীফা মনোনীত করে উম্মত বিভ্রান্ত না হয়। যে নবীকে সকল ধর্মের ওপর তাঁর ধর্ম বিজয়ী হবে এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, তাঁর বিশিষ্টতম সাহাবারা কিভাবে মুরতাদ হতে পারেন! এসব কথা বলে রাফেযীরা আসলে রসূল (সা)-এর মহান ব্যক্তিত্বকেই ক্ষত-বিক্ষত করতে চেয়েছে। সুকৌশলে মানুষের অন্তরে তাঁরা এ ধারণা দিতে চেয়েছে যে, রসূল আদর্শ চরিত্রের ছিলেন না বলেই তার সাথীরা কপট ও দুশ্চরিত্র ছিল। তিনি আদর্শ চরিত্রের হলে তাঁর সাথীরাও সৎ ও চরিত্রবান হ'ত। এ কারণেই অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন 'আলিমদের সুচিন্তিত মন্তব্য হলো, "রাফেযী মতবাদ মূলত নাস্তিক্যবাদীদের ষড়যন্ত্রের ফসল মাত্র।"[১]

১. ঐ. খণ্ড ৪. পৃ. ১২৩।

সাহাবাদের মর্যাদা সন্দেহাতীতরূপে সত্য

সাহাবাদের 'আদালত তথা বিশ্বস্ততা ও ন্যায়নিষ্ঠাকে ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) ইসলামের এক গুরুত্বপূর্ণ বুনিয়াদ মনে করেন। তাঁদের সততা ও সত্যবাদিতা এবং ধার্মিকতা ও ন্যায়নিষ্ঠা সম্পর্কে তাঁর অখণ্ড বিশ্বাস ও অবিচল আস্থা রয়েছে। অন্তরের অন্তঃস্থল থেকেই তিনি বিশ্বাস করেন যে, সাহাবারা হলেন ইসলামের সুমহান শিক্ষার আদর্শ দৃষ্টান্ত এবং নবীর প্রজ্ঞাপূর্ণ তরবিয়াত ও নূরানী সোহবতের বাস্তব নমুনা। তাঁর মতে, সন্দেহাতীত বর্ণনা সূত্রে এবং আল-কুরআনের সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন আয়াত দ্বারা সাহাবায়ে-কিরামের ফযীলত ও মর্যাদা সুপ্রমাণিত। সুতরাং ইতিহাস গ্রন্থের সাদামাটা বর্ণনা কিংবা অনির্ভরযোগ্য কোন হাদীস দ্বারা এই সত্যকে প্রশ্নের সম্মুখীন করা যায় না। তিনি লিখেছেন ঃ

> কুরআন-সুন্নাহর দ্বারা দ্ব্যর্থহীনভাবে সাহাবায়ে -কিরামের ফযীলত তথা শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব প্রমাণিত হওয়ার পর প্রক্ষিপ্ত বা দুর্বল সূত্রে বর্ণিত রেওয়ায়েত দ্বারা তা ক্ষুণ্ন করা যায় না। কেননা সন্দেহ কখনোই নিশ্চিত জ্ঞানের বিকল্প হতে পারে না। কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা' ও কিয়াসযোগে এ নিশ্চিত সত্যে আমরা উপনীত হতে পেরেছি, নবীদে পর সাহাবারাই ছিলেন উম্মাহর শ্রেষ্ঠ জামা'আত। এ সুনিশ্চিত জ্ঞান সন্দেহাকীর্ণ কোন বক্তব্যে কিছুতেই খর্ব হতে পারে না। পরন্তু সে বক্তব্যগুলোর শিকড়হীনতা প্রমাণিত হয়ে গেলে আর তো কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।[১]

সাহাবারা নিষ্পাপ ছিলেন না

"রসূলের মত সাহাবারাও নিষ্পাপ ছিলেন, সুতরাং সামান্যতম বিচ্যুতিও তাঁদের জীবনে ঘটা সম্ভব নয়" ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) এ মতে বিশ্বাসী ছিলেন না। কিন্তু এ বিশ্বাস তাঁর অবশ্যই ছিল যে, ন্যায়-নিষ্ঠা, আল্লাহ্-ভীতি, সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততার বিচারে তাঁরাই ছিলেন উম্মাহ্র শ্রেষ্ঠ অংশ। তাঁদের কারো জীবনে সাময়িক কোন বিচ্যুতি ঘটে থাকলেও সে তুলনায় নেক ও পুণ্যের এবং ত্যাগ ও কুরবানীর পরিমাণ এত বেশী এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে সন্তুষ্ট করার উদ্যোগ ও আয়োজন এত বিপুল ছিল যে, কথিত দু'চারটি ত্রুটির কাফ্ফারা তাঁদের অনেক আগেই আদায় হয়ে গেছে। মোটকথা, তাঁদের নেক ও পুণ্যের পাল্লা 'ত্রুটির' তুলনায় অনেক ভারি। ইমাম সাহেব বলেন ঃ

> আগেও আমরা বলেছি যে, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের পর কাউকে আমরা নিষ্পাপ মনে করি না। তাই ইজতিহাদী ভুলের কথা অস্বীকার করার প্রশ্নই আসে না। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

---

১. ঐ, খণ্ড ৩, পৃ. ২০৯।

والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون ، لهم ما يشاؤون عند ربهم . ذلك جزاء المحسنين ، ليكفر الله عنهم اسوا الذى عملوا ويجزيهم اجرهم باحسن الذى كانوا يعملون - (الزمره ٣٥/٣٣)

যিনি সত্যের বাণী বহন করে এনেছেন আর সেই সত্যকে যাঁরা স্বীকার করেছেন, তারাই হলেন মুত্তাকী ও ধর্মনিষ্ঠ। তাঁদের কাম্য বস্তুগুলো আপন প্রতিপালকের নিকট তারা মজুদ পাবে। নেক বান্দাদের এই হলো বিনিময় যেন আল্লাহ্ তাদের ত্রুটিসমূহ মুছে দিতে পারেন এবং তাদের নেকী ও পুণ্যের বিনিময় দিতে পারেন। [সূরা যুমার ঃ আয়াত-৩৩-৩৫]

অন্যত্র এরশাদ করেছেন ঃ

اولئك الذين نتقبل عنهم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم فى اصحاب الجنة . وعد الصدق الذى كانوا يوعدون -

এদেরইতো নেক আমলসমূহ আমি কবূল করে থাকি এবং জান্নাতীভুক্ত করে ত্রুটিসমূহ ক্ষমা করে থাকি। আর তা করা হয় তাদের সাথে সাথে কৃত সত্য প্রতিশ্রুতি মুতাবিক।[১] [সূরা আহ্কাফ ঃ আয়াত-১৬]

ইতিহাসে সাহাবায়ে-কিরামের নজীর নেই

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) বলেন, অবশ্যম্ভাবী মানবীয় দুর্বলতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও সামগ্রিকভাবে নবীদের পরে কোন মানবগোষ্ঠী এমন নেই যাদের জীবন ও চরিত্র সাহাবা-কিরামের চেয়ে উত্তম হতে পারে। তাঁদের কারো জীবনে ছোটখাঁটো দু-একটি বিচ্যুতি ঘটে থাকলেও তা বড় একটি সাদা কাপড়ে দু'একটি হাল্কা কালো দাগের মতই তুচ্ছ। কিন্তু ছিদ্রান্বেষণকারীদের চোখে কাপড়ের কালো দাগটাই যদি বড় হয়ে ধরা পড়ে এবং গোটা কাপড়ের শুভ্রতা নজর এড়িয়ে যায় তাহলে সেটা তাদের দৃষ্টির সংকীর্ণতারই কারণে বলতে হবে। অন্যান্য মানবগোষ্ঠীর অবস্থা তো এই যে, মাঝে মধ্যে দু'একটি শুভ্র বিন্দু ছাড়া গোটা আমলনামাটাই তাদের মসীবর্ণ।

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) তাই লিখেছেন ঃ

সাহাবায়ে-কিরাম (রা) হলেন উম্মাহ্র সর্বোত্তম জামা'আত। হক ও হিদায়াতের পথে অবিচল থাকা এবং বিরোধ ও ফিতনা থেকে দূরে থাকার ক্ষেত্রে কেউ তাঁদের সমকক্ষ হতে পারেনি। তাঁদের পাক-পবিত্র জীবনে

১. ঐ, খণ্ড ৩, পৃ. ২৩৮।

মানবীয় দুর্বলতার দু'একটি ঘটনা যদিও-বা চোখে পড়ে, সেগুলোকে অন্যদের জীবন ও চরিত্রের সাথে তুলনা করতে গেলে উল্লেখ করার মতো বিষয়ই নয়; বরং দোষ তাদের যাদের চোখে সাদা কাপড়ের ছোট্ট কালো দাগটা ধরা পড়ে অথচ গোটা কাপড়ের শুভ্রতা নজর এড়িয়ে যায়। মূর্খতা ও অবিচার ছাড়া এটা আর কি? এই মহামানবদের অন্য কোন মানবগোষ্ঠীর সাথে তুলনা করা হলে তখন পাহাড় বুলন্দ হয়ে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব আত্মপ্রকাশ করবে। তা সত্ত্বেও কেউ যদি নিজের কল্পনায় আদর্শ মানবের এমন কোনরূপ মানদণ্ড নির্ধারণ করে নেয় যা আল্লাহ্‌র মোটেই ইচ্ছে নয়, তাহলে তা ধর্তব্যেরই বিষয় নয়। কেউ যদি আদর্শ ইমামের এমন ধারণা পোষণ করে যে, তাঁর ও নিষ্পাপ সত্তার মাঝে কার্যত কোন তফাত নেই, তারপর দাবী করে যে, 'আলিম, শায়খ, আমীর কিংবা বাদশাহকে সেই কাল্পনিক নিষ্পাপ ইমামের মানদণ্ডে অবশ্যই উত্তীর্ণ হতে হবে, যত অধিক জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারীই তিনি হোন না কেন এবং দীন ধার্মিকতার গুণ-গরিমার যে শীর্ষ সোপানেই তিনি অবস্থান করুন, উত্তম ও কল্যাণকর কাজের যত তাওফীকই আল্লাহ্ তাকে দিয়ে থাকুন, উপরিউক্ত মানদণ্ডে তাকে উত্তীর্ণ হতেই হবে। জ্ঞান ও প্রজ্ঞা তাঁর এমন পূর্ণ হতে হবে যে, কোন বিষয়ই তাঁর অগোচর হবে না এবং কোন চিন্তা ও পদক্ষেপে তাঁর ভুল হবেই না, মানবীয় দোষ ও দুর্বলতা থেকেও তাকে মুক্ত ও পবিত্র হতে হবে, মনে তার কামনা-বাসনা থাকবে না, ক্রোধ ও উত্তাপ থাকবে না, ইত্যাদি তাহলে অবশ্যই সে উন্মাদের সুচিকিৎসা আমাদের হাতে নেই। অনেকে তো ইমামদের জন্য এমন মানদণ্ডও কল্পনা করে বসে থাকে যা নবীদের ক্ষেত্রেও করা হয় না।[১]

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) বারবার জোর দিয়ে বলেছেন ঃ মানবতার গোটা ইতিহাস যিনি জানেন, জানেন বিভিন্ন জাতি, গোষ্ঠী ও সমাজের ইতিবৃত্ত, সর্বোপরি যিনি লাভ করেছেন বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর জীবন ও চরিত্রের বাস্তব অভিজ্ঞতা, তাঁকে একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, বিভেদ ও ফিতনার প্রা ˉ ঘৃণা পোষণ এবং হক ও সত্যের পথ অনুসরণের ক্ষেত্রে সাহাবা কিরামের চেয়ে ঐক্যবদ্ধ ও সংঘবদ্ধ, প্রবৃত্তি ও পাশবিকতা এবং পার্থিব লালসা থেকে দূরে থাকার ক্ষেত্রে তাঁদের চেয়ে পবিত্র কোন জাতি ও সমাজ মানব সভ্যতার সুদীর্ঘ ইতিহাসে নেই। ইমাম সাহেব লিখেছেন ঃ

فمن استقرأ اخبار العلم فى جميع الفرق تبين له انه لم يكن قط طائفة اعظم اتفاقا على الهدى والرشد وابعد الفتنة والتفرق والاختلاف من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم

১. ঐ, খণ্ড ৩, পৃ. ২৪২।

خير الخلق بشهادة الله لهم بذلك اذيقول تعالى كنتم خير امة اخرجت للناس تا مرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ـ

পৃথিবীর জাতিবর্গের ইতিহাস ও ঘটনাবলী মনোনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করলে পরিষ্কার বোঝা যাবে যে, হিদায়াত ও সরল পথে ঐক্যবদ্ধ থাকা এবং ফিতনা ও বিভেদ থেকে দূরে থাকার ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কিরামের চেয়ে উত্তম ও উজ্জ্বল কোন মানবগোষ্ঠীর আবির্ভাব পৃথিবীর ইতিহাসে আর ঘটেনি। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে তাঁদের উৎকর্ষের সনদ দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে ঃ তোমরা সেই শ্রেষ্ঠ জামা'আত মানুষের কল্যাণের উদ্দেশ্যে যারা উত্থিত, সৎ কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজের নিষেধ হলো তোমাদের স্বভাব আর তোমরা আল্লাহতে বিশ্বাসী।

উম্মাহর সকল কল্যাণের উৎস সাহাবায়ে কিরাম

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) সত্যই বলেছেন যে, মুসলিম উম্মাহর কাছে 'ইল্‌ম ও 'আমল এবং কল্যাণ ও বরকতের যে সম্পদ-ভাণ্ডার রয়েছে এবং (শত প্রতিকূলতার মাঝেও) ইসলামের যতটুকু শান-শওকত ও প্রচার-প্রসার পরিলক্ষিত হচ্ছে, এমনকি গোটা সভ্যতার প্রতি যতটা আগ্রহ এবং কল্যাণ ও সুকৃতির প্রতি যতটা অনুরাগ অনুভূত হচ্ছে- তা মূলত সাহাবায়ে-কিরামের সুমহান ত্যাগ ও কুরবানী, ইসলাম ও আন্তরিকতা, হিম্মত ও সাহসিকতা এবং তাঁদের খুন-পসিনারই বরকতময় ফসল মাত্র। অত্যন্ত আবেগময় ভাষায় ইমাম সাহেব তাই লিখেছেন ঃ

واما الخلفاء والصحابة فكل خير فيه المسلمون الى يوم القيامة من الايمان والاسلام والقران والعلم والمعارف والعبادات ودخول الجنة والنجاة من النار ـ وانتصارهم على الكفار وعلو كلمة الله فانما هو ببر كة ما فعله الصحابة الذين بلغوا الدين وجاهدوا فى سبيل الله وكل مؤمن امن بالله فللصحابة رضى الله عنهم عليه فضل الى يوم القيامة وكل خير فيه الشيعة وغيرهم فهو ببركة الصحابة وخير الصحابة تبع لخير الخلفاء الراشدين فهم كانوا اقوم بكل خير فى الدين والدنيا من سائر الصحابة ـ

ঈমান ও ইসলাম, 'ইলম ও কুরআন, 'ইবাদত ও মা'রিফাত, জান্নাত প্রাপ্তি ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি, মুসলমানদের বিজয় ও প্রাধান্য, এক কথায় কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের যাবতীয় কল্যাণ ও নি'আমতের উৎস হচ্ছে সাহাবায়ে-কিরামের সীমাহীন ত্যাগ ও কুরবানী। তাঁদের মেহনত ও মুজাহাদা ছিল শুধু আল্লাহ্‌রই জন্য যাঁরা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করেছেন। ফলে কিয়ামত পর্যন্ত ঈমানের দৌলত লাভকারী সকল মু'মিন সাহাবা কিরামের অপরিশোধ্য ঋণ পাশে আবদ্ধ হতে বাধ্য। এমন্ কি কারো কাছে কল্যাণকর কিছু থাকলে সেগুলোও সাহাবা-কিরাম থেকে উৎসারিত। কল্যাণ ও বরকতের ঝর্নাধারার উৎসমুখ হচ্ছেন খোলাফায়ে রাশেদীন। কেননা দীন ও দুনিয়ার যাবতীয় কল্যাণের পথে তাঁরাই ছিলেন অগ্রপথিক।

সিদ্দীকী খিলাফত নবূওয়তের সত্যতার প্রমাণ

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) আরেকটি বড় কাজের কথা লিখেছেন। তাঁর মতে, হযরত আবূ বকর (রা)-এর খিলাফত মূলত নবুওয়তে মুহাম্মদীর পূর্ণতা ও সত্যতারই এক অকাট্য দলীল। ওফাতুন্নবীর পর হযরত আবূ বকর (রা)-এর স্থলাভিষেক দ্ব্যর্থহীনভাবেই প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্‌র রসূল (সা) সত্যই আল্লাহ্‌র রসূল (সা) ছিলেন। তাঁর মেযাজ ছিল নবুওয়তের মেযাজ, সিয়াসত ও রাজনীতির মেযাজ নয়। দুনিয়ার রাজা-বাদশাহদের মেযাজ ও প্রকৃতির সাথে এর কোন তুলনা হতে পারে না, যারা সাধারণত পুত্র ও পরিবারের সদস্যদেরই স্থলাভিষিক্ত করে থাকেন। তাঁর মাঝে যদি রাজ্যলোভ ও পরিবার-প্রীতির কণামাত্রও বিদ্যমান থাকত তাহলে হযরত আলী (রা) ও আব্বাস (রা)সহ হাশিম পরিবারের বহু যোগ্য সদস্যের যে কোন একজনকে স্থলাভিষিক্ত করার মাধ্যমে খান্দানী সালতানাতের বুনিয়াদ রেখে যাওয়া যেত এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যে ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তিনি লাভ করেছিলেন তা হাশিম পরিবারের অনুকূলে চির সংরক্ষিত করে রাখা যেত। ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) লিখেছেন ঃ

একথাও ভেবে দেখার মত যে, হযরত আবূ বকর (রা) ও ওমর (রা)-এর খিলাফত মুহাম্মদী নবূওয়ত ও রিসালতের পূর্ণতা ও সত্যতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এর দ্বারা পরিষ্কার প্রমাণিত হয় যে, তিনি সত্য রাসূল ছিলেন, দুনিয়াদার বাদশাহ ছিলেন না। কেননা পরিবারকে প্রাধান্য দিয়ে নিকটজনদের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করাই হয় সেই লক্ষণ। এভাবে নিজেদের হাতেই তারা রাজ্য ও শাসনক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখে। আশ-পাশের শাসক ও নৃপতিদের তো আমরা এ নীতিই অবলম্বন করতে দেখে আসছি। বুওয়াইহ ও সালজুক বংশসহ সিরিয়া, য়ামন,

পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলের শাসক নৃপতিরা নিজ নিজ পরিবারের নিকটজনদের হাতেই শাসন ক্ষমতা অর্পণ করে যেতেন। মুশরিক ও খ্রিস্টান বাদশাহদের নীতিও ছিল তাই। ফিরিঙ্গী সম্রাট ও চেঙ্গীয় পরিবারের বাদশাহরা রাজ্য ও রাজত্ব রাজপরিবারেই কুক্ষিগত করে রাখার চেষ্টা করেন। প্রায়শ তাঁদের মুখে এ ধরনের কথা শোনা যায় যে, অমুক ব্যক্তি রাজপরিবারভুক্ত কিংবা তা নয়। অমুকের দেহে নীল রক্ত আছে কিংবা নেই। এমতাবস্থায় পিতৃব্য পুত্র আলী (রা), আকীল (রা), রাবী'আ (রা) ইবনুল হারিছ ইবন আবদুল মুত্তালিব (রা), আবু সুফিয়ান ইবনুল হারিছ ইবন আবদুল মুত্তালিব (রা) প্রমুখের পরিবর্তে হযরত আবু বকর ও ওমর (রা)-কে খিলাফত প্রদান একথাই প্রমাণ করে যে, কোন রাজকীয় আইন বা ঐতিহ্যের তিনি অনুগত ছিলেন না। এছাড়া 'আবদে মনাফ পরিবারে ছিলেন হযরত উছমান ইবন আফ্ফান (রা), খালিদ ইবন সাঈদ ইবন আস (রা), আবান ইবন সা'ঈদ ইবন আস (রা) প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি। আবদে মনাফ পরিবার ছিল কুরায়শের অন্যতম শাখা এবং বংশসূত্রে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকটতর। তাঁর এ আচরণ একথারই অকাট্য প্রমাণ যে, তিনি আল্লাহ্র বান্দা এবং আল্লাহ্র রসূল ছিলেন, বাদশাহ ছিলেন না। কেননা খিলাফতের জন্য বংশ-নৈকট্য কিংবা পারিবারিক আভিজাত্য নয় বরং ঈমান ও তাকওয়া এবং 'ইলম ও 'আমলই ছিল তাঁর দৃষ্টিতে যোগ্যতার একমাত্র মানদণ্ড। তাই শুধু বংশ-নৈকট্য ও পারিবারিক ঐতিহ্যের কারণে কাউকে তিনি অগ্রাধিকার দেননি। এ ঘটনা থেকে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া গেল যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের পর তাঁর উম্মত আল্লাহ্র 'ইবাদত ও আনুগত্যে অবিচল থাকবে, তাঁর হুকুম ও বিধান মেনেই তারা জীবন যাপন করবে। গোত্রীয়, পারিবারিক কিংবা ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষ তাদের উদ্দেশ্য হবে না, এমনকি কোন কোন নবীকে যে সালতানাত ও রাজত্ব দান করা হয়েছিল তাও তাঁরা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবে। কেননা আল্লাহ তাঁর প্রিয় হাবীবকে এই বলে ইখতিয়ার দিয়েছিলেন যে, আপনি বান্দা ও রসূল হওয়া অথবা রসূল ও বাদশাহ হওয়া এই দুইয়ের একটি গ্রহণ করুন। তিনি রসূল ও বান্দা হওয়াটাই পসন্দ করেছিলেন। হযরত আবূ বকর (রা) ও ওমর (রা)-এর মনোনয়ন প্রকৃতপক্ষে এই নববী দৃষ্টিভঙ্গিরই পূর্ণতম প্রতিফলন ছিল। কেননা পরিবারভুক্ত কাউকে তিনি স্থলাভিষিক্ত করে গেলে মানুষের এ কথা বলার সুযোগ হতো যে, তিনি উত্তরাধিকারীদের জন্য সম্পদ সঞ্চয় করে গেছেন।[১]

---

১. ঐ, খ. ৪, পৃ. ১২৬।

জাহিলিয়াতের বংশ-পূজা

হযরত আলী (রা)-র অছি হওয়া এবং তাঁর বর্তমানে অন্য কারোর খিলাফত অবৈধ হওয়ার ধারণা যারা পোষণ করে, নিঃসন্দেহে তারা জাহিলিয়াতের বংশ পূজার মারাত্মক ব্যাধির শিকার। জাহিলী যুগে একথা কল্পনা করাও সম্ভব ছিল না যে, বংশ- কৌলিন্য ও আত্মীয়তা সূত্রে নয় বরং গুণ ও যোগ্যতার মাপকাঠিতেই শুধু পদ ও মর্যাদা লাভ করা যায়। ইসলামের পূর্বে আরব, ইরান ও হিন্দুস্তান সহ পৃথিবীর সব দেশের, সব জাতির মাঝেই এই চিন্তা ও মানসিকতা বিদ্যমান ছিল। খিলাফতে হযরত আলী (রা)-র অগ্রাধিকারের দাবীদাররা মূলত নিজেদের রীতি, ঐতিহ্য এবং নিজস্ব জাতীয় চিন্তা ও মানসিকতার দ্বারাই প্রভাবিত। নবীদের রুচি-প্রকৃতি ও দৃষ্টিভঙ্গি তারা উপলব্ধি করতে পারেনি। এটাই স্বাভাবিক। কেননা সাধ ও সাধ্যের ক্ষুদ্র গণ্ডীতেই মানুষের চিন্তা আবর্তিত হয়ে থাকে।

ইমাম সাহেব লিখেছেন ঃ

> চিন্তায় ও কথায় রাফিযীরা জাহিলিয়াতের মুশরিকদেরই প্রতিচ্ছবি যেন। বংশ ও পূর্বপুরুষদের ব্যাপারে তাদের গোঁড়ামী সীমাহীন। খান্দান ও পরিবারই হল তাদের কাছে সখ্যতা ও মিতালীর ভিত্তি। ঈমান ও তাকওয়ার বিচারে ক্ষতিকর নয় এমন সব বিষয়কেও তারা মানুষের জন্য আপত্তিকর মনে করে। এটা জাহিলী চিন্তাধারারই প্রতিফলন।[১]

শী'আভক্তি হুসায়ন বংশধরের জন্য অগ্নিপরীক্ষা

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র মতে, শী'আরা আসলে আহলে বায়ত ও নবী পরিবারের ' বোকা বন্ধু'। তাদের অতিরঞ্জিত ভক্তি ও মিথ্যা বর্ণনা আহলে বায়তের সুনামের পরিবর্তে বদনামই করেছে বেশী। তাঁর ভাষায় ঃ

> শী'আদের অযাচিত ভক্তি-শ্রদ্ধা আসলে আহলে বায়তের জন্য বিপদ ও পরীক্ষা। কেননা প্রশংসার ছলে তারা যা বলে সেগুলো মোটেই প্রশংসার বিষয় নয়। তাঁদের নামে এমন সব ভিত্তিহীন কথা তারা দাবী ও প্রচার করে যে, আহলে সুন্নাতের কিতাবসমূহে তাঁদের প্রকৃত ফযীলত ও মর্যাদা বর্ণিত না হলে শী'আদের তথাকথিত ভক্তি প্রশংসায় তাঁদের কলংকের সীমা থাকত না।[২]

---

১. ঐ, খ ৪, পৃ. ২৮৭।

২. ঐ, খ ২, পৃ. ১২৫।

অন্যত্র তিনি লিখেছেন ঃ

প্রশংসা ও কুৎসার পার্থক্যই শী'আদের জানা নেই, জানা নেই প্রশংসা ও মহিমা প্রমাণ করার পথ ও পন্থা।[১]

গোঁড়ামির পরিণতি

হযরত আলী (র)-ও আহলে বায়তের 'ইমামত' প্রমাণ করার জন্য 'মিনহাজু'ল -কারামাহ' গ্রন্থকার প্রচুর আয়াত ও হাদীস পেশ করেছেন। আয়াত ও হাদীসের এ ধরনের মর্মান্তিক অপপ্রয়োগ থেকে বোঝা যায়, গোঁড়ামী ও অন্ধপ্রেম মানুষকে বিভ্রান্তির কোন অতলে নিক্ষেপ করতে পারে। মজার ব্যাপার এই যে, অধিকাংশ আয়াত কিংবা বলা চলে প্রায় সবগুলো আয়াতই আহলে বায়তের সাথে সম্পর্কিত কিংবা বিশিষ্ট নয়। পক্ষান্তরে বর্ণিত হাদীসগুলোর অধিকাংশই জাল কিংবা দুর্বল। ইমাম ইবনে তায়মিয়ার ভাষায় ঃ

الروايات المسيبة التى لا زمام لها ولا خطام ـ

অর্থাৎ এমন সব হাদীস যার মাথামুণ্ডু কিছুই নেই। এক্ষেত্রে শী'আদের আস্পর্ধা এত সীমা ছাড়া যে, বহু হাদীস তারা বুখারী, মুসলিম ও মুসনাদে আহমদের বরাত দিয়ে উল্লেখ করেছে, অথচ সেখানে সেগুলোর চিহ্ন মাত্র নেই। কোন কোন হাদীস সম্পর্কে ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র মন্তব্য হলো, ইসলামী জাহানে হাদীসের যতগুলো সংকলন এ পর্যন্ত প্রকাশ পেয়েছে তার কোনটিতেই সেগুলোর অস্তিত্ব প্রমাণ করা যাবে না। কুরআন ও সুন্নাহ্ সম্পর্কিত জ্ঞানের দৈন্যের কারণে এমনকি সাদামাটা পরিভাষাগুলোও তারা বুঝে উঠতে পারে না। কখনো আবার বুঝে শুনেও ভুল ব্যাখ্যা চালিয়ে দেয়।

আয়াত পেশ করার ক্ষেত্রে 'মিনহাজু'ল কারামাহ'র লেখক এমন সব মজার কাণ্ড ঘটিয়েছেন এবং এমন সব হাস্যকর ও বেমক্কা তাফসীর করেছেন যে, বাজারে চালু একটা চুটকির কথাই তাতে স্মরণ হয় ঃ "ক্ষুধার্তকে জিজ্ঞেস করো দুইয়ে দুইয়ে কত, দেখবে চটজলদি সে জওয়াব দেবে, কেন চার রুটি?" লেখক ভদ্রলোক চল্লিশটি আয়াত পেশ করে দাবী করেছেন যে, এগুলো হযরত আলী (রা) সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। যেমন, এক হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন ঃ 'গাদীরে খুম'-এ খুতবা প্রদানের পর

اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا ـ

---

১. ঐ, খ ২, পৃ. ১২৬।

আয়াতটি[১] যখন অবতীর্ণ হয় তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন ঃ

الله اكبر على اكمال الدين واتمام النعمة ورضا الرب برسالتى وبالولاية لعلى من بعدى -

সকল বড়ত্ব আল্লাহ্র। কেননা তিনি দীনের পূর্ণাঙ্গতা এবং নি'আমতের পূর্ণতা দান করেছেন। অতঃপর আমার রিসালত এবং আমার পরে আলীর বিলায়াত-এর প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন।

কথিত 'হাদীস' সম্পর্কে ইমাম ইবনে তায়মিয়ার নির্দ্বিধ মন্তব্য এই যে, হাদীসটি জাল হওয়ার ব্যাপারে কোন হাদীস শাস্ত্রকারেরই দ্বিমত নেই। আর তাই নির্ভরযোগ্য কোন সংকলনে সেটি স্থান পায়নি। তদুপরি তাফসীর ও ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকেও হাদীসটি গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা সিহাহ্ সিত্তাসহ সকল মুসনাদ ও তাফসীর গ্রন্থের আলোকে এটা প্রমাণিত সত্য যে, উল্লিখিত আয়াতটি বিদায় হজ্জের নয় তারিখে আরাফায় অবস্থানকালে নাযিল হয়েছিল। জনৈক ইয়াহূদী হযরত ওমর (রা)-কে বলেছিল, 'আপনাদের কুরআনে এমন এক আয়াত রয়েছে যা আমাদের উপর নাযিল হলে সেদিনটিকে আমরা 'উৎসব দিবস' ঘোষণা করতাম।' হযরত ওমর (রা) আয়াতটি জানতে চাইলে সে - اليوم اكملت لكم। আয়াতটির কথা বলল। তখন হযরত ওমর (রা) বললেন, আমার বেশ মনে আছে, কবে এবং কোথায় আয়াতটি নাযিল হয়েছে। এটা আরাফা দিবসে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের ওকূফ ও অবস্থানকালে নাযিল হয়েছে। ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) বলেন, অন্যান্য সূত্রেও একথা সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত। মুসলমানদের সকল কিতাবেই এর উল্লেখও রয়েছে। মোটকথা, এটা 'য়াওমে খুম'-এর নয় দিন পূর্বে নয়ই যিলহজ্জ রোজ শুক্রবারের ঘটনা। সুতরাং গাদীরে খুমের ঘটনায় আয়াতটি নাযিল হওয়ার দাবী কোনক্রমেই মেনে নেওয়া যায় না। লেখক ভদ্রলোকের বর্ণিত হাদীসের নিম্নোক্ত বাক্যটিও লক্ষ্যণীয় ঃ

اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله -

হে আল্লাহ্! আলীকে যে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তাকে তুমি বন্ধুরূপে গ্রহণ করো এবং আলীর সাথে যে শত্রুতা করে তুমিও তাকে শত্রুরূপে চিহ্নিত

---

১. আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে আমি পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার নি'আমত পূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের জন্য ধর্মরূপে ইসলামকেই আমি মনোনীত করে দিলাম।

করো এবং আলীকে যে সাহায্য করে তুমিও তাকে সাহায্য করো এবং আলীকে যে ত্যাগ করে তুমিও তাকে ত্যাগ করো।

এখন প্রশ্ন হলো, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের চেয়ে অধিক মকবুল দু'আ আর কার হতে পারে? এ হাদীস বিশুদ্ধ হলে এবং আল্লাহ্র রাসূল এ ধরনের দু'আ করে থাকলে তার ফল প্রকাশ পাওয়া ছিল অবশ্যম্ভাবী। অথচ ইতিহাস থেকে বিপরীত কথাই প্রমাণিত হচ্ছে।

ইবনু'ল মুতাহহির -এর মতে, مرج الجرين يلتقين ، بينهما برزخ لا يبغيان আয়াতের بحرين দ্বারা আলী ও ফাতিমাকে বোঝানো হয়েছে। আর برزخ لايبغيان হলেন স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম। পক্ষান্তরে يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان দ্বারা হাসান ও হুসায়ন ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কিন্তু ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) লেখকের মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে লিখেছেন ঃ

ان هذا وامثاله بقوله من لا يعقل مايقول وهذا بالهذيان اشبه منه بتفسير القران وهو من تفسير الملاحدة والقرامطة الباطنية للقران بل هو شرمن كثير منهم ـ

এ ধরনের কথা সে-ই বলতে পারে যে নিজের কথার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারে না। এগুলোকে তাফসীর না বলে প্রলাপ বলাই বরং সঙ্গত। বস্তুত এ ধরনের তাফসীর নাস্তিক্যবাদী কারামেতা ও বাতিনী ফিরকার লোকেরাই করে থাকে। এগুলো বরং আরো জঘন্য।

অতঃপর ইমাম সাহেব লেখকের এ উদ্ভট তাফসীর খণ্ডনের উদ্দেশ্যে ছয়টি অকাট্য যুক্তি পেশ করেছেন।

১. এটা সূরা আর-রাহমান এর আয়াত। আর সকল তাফসীরকারের মতেই এটা মক্কী সূরা। অথচ হাসান ভ্রাতৃদ্বয়ের জন্ম হয়েছে মদীনা শরীফে আলোচ্য সূরা অবতরণের কয়েক বছর পরে।

২. সূরাতু'ল-ফুরকানের নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা আলোচ্য আয়াতের তাফসীর পরিষ্কার হয়ে যায় ঃ

وهوالذى مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج ـ ٢

---

১. দুই সমুদ্রকে তিনি মিশিয়ে দিয়েছেন, সমুদ্র দু'টি একত্রিত হয়েছে। উভয়ের মাঝে রয়েছে পর্দা, ফলে উভয়ে নির্দিষ্ট সীমা লংঘন করতে পারে না।

২. তিনিই আল্লাহ্, যিনি দুই নদীকে একত্রে মিশিয়ে দিয়েছেন। একটি হলো মিঠা ও সুস্বাদু, অপরটি হলো নোনা ও বিস্বাদ।

البحرين। দ্বারা আলী ও ফাতিমাকে বোঝানো হয়ে থাকলে উভয়ের এক জনকে অবধারিতভাবে ملح اجاج বা নোনা ও বিস্বাদ বলতেই হবে যা মোটেই সুখকর বিষয় নয়।

৩. برزخ দ্বারা রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামকে বোঝানো হয়ে থাকলে তিনি অন্তরায় ও প্রতিবন্ধক প্রমাণিত হবেন। আর সেটা প্রশংসার নয়, নিন্দার বিষয়।[১]

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র কিতাবের আলোচ্য অংশ এ ধরনের অসংখ্য চিন্তাকর্ষক আলোচনায় ভরপুর। তাফসীর, হাদীস, ফিকহ্ ও ইতিহাসের আলোকে শী'আ গ্রন্থকারের প্রতিটি প্রলাপের এমন সারগর্ভ ও তীর্যক জওয়াব তিনি দিয়েছেন যা তাঁর বিস্ময়কর মেধা ও প্রতিভা, 'ইল্‌ম ও প্রজ্ঞা এবং যুক্তি উপস্থাপন কৌশল ও বিতর্ক প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করে। শী'আ গ্রন্থকারের যাবতীয় যুক্তি-প্রমাণ সম্পর্কে সামগ্রিক মন্তব্য করতে গিয়ে ইমাম সাহেব লিখেছেন যে, হযরত আলী (রা) -র মর্যাদা ও ফযীলত এবং মর্তবা ও বিলায়াত এমন বিশুদ্ধ ও স্বীকৃত দলীল-প্রমাণ দ্বারা সুপ্রমাণিত যে, অতঃপর এ ধরনের মিথ্যাচার ও বিকৃত তথ্য ও জাল হাদীস পরিবেশনের কোনই প্রয়োজন পড়ে না।[২]

আলোচ্য কিতাবের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ অংশে ইমাম সাহেব সাহাবীদের সমালোচনার দাঁতভাঙা জওয়াব দিয়েছেন। লেখক ইবনু'ল-মুতাহহির সাধারণভাবে সাহাবায়ে-কিরাম এবং বিশেষভাবে প্রধান সাহাবাদ্বয়, আরো বিশেষভাবে হযতর আবূ বকর (রা)-এর চরিত্রে জঘন্য কলংক লেপন করেছেন এবং কুরআন, হাদীস, ইতিহাস ও সীরাত গ্রন্থের বরাত টেনে তাঁদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন গুরুতর অভিযোগ প্রমাণ করার অপচেষ্টা চালিয়েছেন। কথিত অপবাদ ও অভিযোগগুলোর ওপর চোখ বুলালেই আপনি বুঝবেন যে, শত্রুতা ও বিদ্বেষের সর্বগ্রাসী সয়লাব একজন শিক্ষিত ও পণ্ডিত ব্যক্তিকে পর্যন্ত কোথা থেকে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে। .খানে আমরা দু'টি মাত্র নমুনা পেশ করছি ঃ

কুরআনের যে আ".ত মুসলিম উম্মাহর মাঝে আবূ বকর (রা)-এর শ্রেষ্ঠত্ব ও সর্বোচ্চ কথা ঘোষণা করেছে, সেটি হলো ঃ

الاتنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذيقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا ـ

১. ঐ, খ ৪, পৃ. ৬৭-৬৮।

২. ঐ খ. ৪, পৃ. ১৮৬।

তোমরা রসূলের সাহায্য না করলে কি হবে, আল্লাহ্ই তো তাকে সে সময় সাহায্য করেছেন যখন কাফিররা তাকে বের করে দিয়েছিল। আর তিনি ছিলেন দু'জনের দ্বিতীয়জন, যখন উভয়ে গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন আর তিনি তাঁর সাথীকে লক্ষ্য করে বলছিলেন, অস্থির হয়ো না। আল্লাহ্ তো আমাদের সাথে রয়েছেন। [সূরা তাওবাহ]

কিন্তু শী'আ ইবনুল-মুতাহহিরের মতে, এ আয়াতে হযরত আবূ বকর (রা)-এর মর্যাদা ও ফযীলতের কোন কিছু নেই। কেননা হযরত আবূ বকরকে সফর সঙ্গী করার কারণ এও হতে পারে যে, তিনি যেন তাঁর অনুপস্থিতিতে গুপ্তচর বৃত্তির সুযোগ না পান। সুতরাং আলোচ্য ঘটনা থেকে তাঁর প্রতি রসূলের অনাস্থাই প্রমাণিত হচ্ছে। তদুপরি আয়াতের لاتحزن শব্দ থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত আবূ বকর ভীতু ও অস্থির প্রকৃতির ছিলেন। তাঁর মনে আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস ও আসমানী ফয়সালা সম্পর্কে আশ্বাসবোধ ছিল না। তৃতীয়ত, কুরআন শরীফে যেখানেই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সাকীনা ও প্রশান্তি নাযিলের কথা বলা হয়েছে সেখানে মু'মিনদেরও অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। অথচ আলোচ্য আয়াতে হযরত আবূ বকরকে বাদ দিয়ে রাসূলের কথাই শুধু বলা হয়েছে। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, হযরত আবূ বকরের প্রতি সাকীনা ও প্রশান্তি নাযিল করা হয়নি।

জওয়াবে ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) প্রথমে দেখিয়েছেন যে, আলোচ্য আয়াতে হযরত আবূ বকর (র)-এর কী অতুলনীয় মর্যাদা ও ফযীলত এবং কী অনন্য গুণ ও মহত্ত্বের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে এবং হিজরতের নাযুক মুহূর্তে রাসূলের সাথীত্বের গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য কি! অতঃপর তিনি গ্রন্থকারের প্রতিটি প্রলাপোক্তির দাঁতভাঙা জওয়াব দিয়েছেন। ইমাম সাহেব বলেন, গ্রন্থকারের মতে হযরত আবূ বকরকে সাথে নেওয়ার কারণ এই যে, তিনি যেন হিজরতের বিষয়টি শত্রুদের কাছে ফাঁস করে দেওয়ার সুযোগ না পান। সুতরাং বোঝা গেল আবূ বকর খুবই অবিশ্বস্ত ছিলেন এবং তাঁর প্রতি রাসূলের মোটেই আস্থা ছিল না। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন হলো ঃ পৃথিবীর নির্বোধতম ব্যক্তিও কি এমন মানুষ ও ঝুঁকিপূর্ণ সফরে এমন অবিশ্বস্ত ব্যক্তিকে সফরসঙ্গীরূপে নির্বাচন করতে পারে? ইমাম সাহেবের ভাষায় ঃ

فقبح الله من نسب رسوله الذى هو اكمل الخلق عقلا وعلما وخبرة الى مثل هذه الجهالة والغباوة ـ

এমন ব্যক্তির মুখে আল্লাহ্ চুন কালি দিন, যে তাঁর রাসূল (সা)-কে যিনি 'ইল্ম ও প্রজ্ঞায়, 'আকল ও বুদ্ধিতে এবং অভিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতায় জগতের শ্রেষ্ঠ—এমন বোকা মনে করে।[১]

১. ঐ, খ ৪, পৃ. ২৫৫।

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) আরো লিখেছেন ঃ

আমার জানা মতে, খুরবান্দা নামক যে তাতারী বাদশাহ্‌র জন্য ভদ্রলোক এ 'কিতাব' লিখেছেন তার সামনে এ প্রসঙ্গে উত্থাপিত হলে এমন মন্তব্যই তিনি করেছেন যা একজন হুশিয়ার লোকের করা উচিত। অথচ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের মহান ব্যক্তিত্ব তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, পবিত্র।

তিনি বলেছেন ঃ এটা কোন বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে না।

দ্বিতীয় অপবাদের জওয়াবে ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) লিখেছেন যে, ভয় ও উৎকণ্ঠা মানুষের স্বভাব ও ফিতরতের অন্তর্ভুক্ত। এমনকি নবী-রাসূল ও আহলে বায়তের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গও এ স্বভাব ও ফিতরত থেকে মুক্ত নন। অতঃপর কুরআন হাদীসের আলোকে একথার সত্যতা প্রমাণ করে ইমাম সাহেব লিখেছেন যে, হযরত আবূ বকর (রা)-এর উৎকণ্ঠা ও ভয় নিজের জন্য মোটেই ছিল না, ছিল প্রাণ-প্রিয় রাসূলের জন্য। ইবনে মুতাহহিরের দ্বিতীয় দলীলের জওয়াবে ইমাম সাহেব বলেন, গ্রন্থকার কৌশলে পাঠককে এ ধারণা দিতে চেয়েছেন যে, কুরআন শরীফে সাকীনা সংক্রান্ত আয়াতের সংখ্যা প্রচুর এবং সর্বত্র রাসূলের সাথে মু'মিনদের উল্লেখ রয়েছে, অথচ একটি মাত্র আয়াতেই এমন হয়েছে।[১] আয়াতটি হল ঃ

ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ، ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها ـ

হুনায়ন দিবসের কথা স্মরণ করো, যখন সংখ্যাধিক্য তোমাদের গর্বিত করে তুলেছিল। কিন্তু তা তোমাদের কোন কাজেই আসল না; বরং এই প্রশস্ত পৃথিবী তোমাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গেল এবং তোমরা পলায়নপর হলে। অতঃপর আল্লাহ্ তাঁর পক্ষ থেকে স্বীয় রসূল ও মু'মিনদের উপর 'সাকীনা' নাযিল করলেন এবং এমন সৈন্যদল পাঠালেন যাদের তোমরা দেখতে পাওনি।

---

১. আরেকটি আয়াতে রয়েছে ঃ

اذجعل الذين كفروا فى قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فانزل الله سكينته على المؤ منين (الفتح)

এখানে বিশেষভাবে মু'মিনদের কথা বলার প্রয়োজন ছিল। কেননা পূর্বে ثم وليتم مدبرين (অতঃপর তোমরা পলায়নপর হলে) বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে কুরআন শরীফে একাধিক স্থানে 'সাকীনা' নাযিলের কথা শুধু মু'মিনদের প্রসঙ্গেই বলা হয়েছে। অতঃপর ইমাম সাহেব এর কারণ ও তাৎপর্য বিশদভাবে আলোচনা করেছেন।[১]

এ ধরনের গোঁড়ামির দ্বিতীয় নমুনা হলো, হাদীস ও সীরাত গ্রন্থের বর্ণনা মতে বদর যুদ্ধের সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম 'ঝুপড়িতে' অবস্থান করছিলেন, হযরত আবূ বকরও সাথে ছিলেন আর সেই সুযোগে গ্রন্থকার এক ফ্যাকড়া বের করে ফেললেন। তিনি বললেন, রসূল জানতেন যে, হযরত আবূ বকরকে যুদ্ধে পাঠালে যুদ্ধের ছকই হয়ত পাল্টে যাবে। কেননা আগেও কয়েকটি 'গায্ওয়া'তে তিনি পিঠ দেখিয়ে সেরেছেন। এখানে এসে ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র 'ইল্ম ও ঈমানের শান্ত দরিয়ায় যেন ঝড় উঠল। তিনি লিখলেনঃ এ ধরনের ডাহা মিথ্যা ভাষণ প্রমাণ করে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের যুদ্ধ ও গায্ওয়া সম্পর্কে 'বর্ণজ্ঞান'টুকুও এ ভদ্রলোকের নেই। না থাকাটাই স্বাভাবিক। কেননা রসূলের জীবন-চরিত সম্পর্কে জানার কোন আগ্রহই শী'আদের নেই। নইলে ভদ্রলোক অবশ্যই জানতে পেতেন যে, গাযওয়ায়ে বদরেই শুধু মুশরিকদের সাথে মুসলমানদের লড়াই হয়েছিল এবং এ যুদ্ধেই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম সর্বপ্রথম সশরীরে উপস্থিত ছিলেন। সীরাত, হাদীস, গাযওয়া ও ইতিহাস শাস্ত্রের সকল ইমাম এ ব্যাপারে একমত যে, বদরই হলো প্রথম গাযওয়া যাতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম লড়াই করেছিলেন। এর আগের কোন গাযওয়া বা সারিয়াতে লড়াই ও সংঘর্ষ হয়নি। একটি মাত্র সারিয়াতে কিঞ্চিত সংঘর্ষ হলেও হযরত আবূ বকর (রা) তাতে শরীকই ছিলেন না। তাহলে একথা বলা কিভাবে ঠিক হবে যে, এর আগে কয়েকবার তিনি যুদ্ধ থেকে পিঠ দেখিয়ে সেরেছেন। দ্বিতীয় কথা, আমাদের হাতে তো কোন যুদ্ধ থেকে হযরত আবূ বকর (রা)-এর পলায়নের প্রমাণ নেই। সুতরাং দাবী যিনি করছেন তাকেই প্রমাণ করতে হবে কোন্ যুদ্ধ থেকে তিনি পলায়ন করেছেন। তৃতীয় কথা, না'উযুবিল্লাহ! হযরত আবূ বকর (রা) সত্যি সত্যি এত ভীরু হয়ে থাকলে 'সেনাপতির' ঝুপড়িতে তাঁকে স্থান দেওয়া দূরের কথা যুদ্ধক্ষেত্রে আনাও প্রজ্ঞার পরিচায়ক হতে পারে না।[২]

১. ঐ, খণ্ড ৪, পৃ. ২৭৩-৭৭।

২. দেখুন পৃষ্ঠা ২৮২-২৮৬।

হযরত আলী (রা) সম্পর্কে শী'আদের স্ববিরোধিতা

ইমাম ইবনে তায়মিয়ার মতে, খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা (আ)-কে একদিকে আল্লাহ ও আল্লাহ্‌র পুত্রের মর্যাদা দিয়েছে, অন্যদিকে ক্রুশ বিদ্ধ হওয়ার কল্পিত ঘটনায় তাঁকে এমন অসহায় ও দুর্বল প্রতিপন্ন করেছে যে, শত্রুদের অপমান ও লাঞ্ছনা এবং বিদ্রূপ ও পরিহাস নীরবে হজম করা ছাড়া তাঁর যেন কোন গত্যন্তর ছিল না। তেমনি শী'আ বন্ধুরা একদিকে তো হযরত আলী (রা)-র এমন গুণাবলী ও শক্তি-সাহসের কথা প্রচার করে যাতে মনে হয় তাঁর মর্যাদা স্বয়ং রসূলের চেয়েও বুঝি এক কাঠি বাড়া, যেন তাঁকে ছাড়া ইসলামের প্রসার ও বিজয়ই ছিল অসম্ভব। আলী (রা)-র শেরপাঞ্জা ও যুলফিকারের বদৌলতেই ইসলামের হেলালী ঝাণ্ডা বুলন্দ এবং শিরক ও বাতিলের ঝাণ্ডা ভূলুণ্ঠিত হয়েছে। অথচ পূর্ববর্তী তিন খিলাফতকালে তাঁকে এমন অসহায় ও মজবুর দেখানো হয়েছে যে, একের পর এক তাঁর বিবেক ও বিশ্বাসের বিরোধী কাজগুলি সংঘটিত হচ্ছিল, পদে পদে আহলে বায়তের ওপর অপমান, লাঞ্ছনা, নির্যাতন ও নিপীড়ন নেমে আসছিল অথচ শেরে খোদা অসহায় দর্শকের মত তা কেবল দেখছিলেন। অন্যায়ের মুখেও তিনি ছিলেন নির্বিকার, নির্যাতনের মুখেও নীরব। একটি বারের জন্যও শোনা যায়নি তাঁর হায়দরী হাঁক, খাপমুক্ত হয়নি তাঁর যুলফিকার। এ বৈপরীত্য ও স্ববিরোধিতার কী জওয়াব হতে পারে? ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) লিখেছেন ঃ

> শী'আ পন্থীরা স্ববিরোধী বক্তব্যই প্রদান করে থাকে। হযরত আলীকে তারা শ্রেষ্ঠ সাহসী ও বীরযোদ্ধা বলে দাবী করে। আল্লাহ্‌র রসূলের দীনকে যেন তিনিই কায়েম করেছেন এবং আল্লাহ্‌র রসূল সর্বতোভাবে তাঁর উপরই ছিলেন নির্ভরশীল। শী'আরা এতদূরও বলে থাকে যে, দীন কায়েমের ক্ষেত্রে হযরত আলী আল্লাহ্‌র শরীক ছিলেন। অথচ ইসলামের বিজয় অর্জিত হওয়ার পর তাঁর অক্ষমতা ও দুর্বলতা, অসহায়ত্ব ও অস্থিরতা এবং তাকিয়া ও ছলনা-নির্ভরতার কল্পিত ঘটনা থেকে মনে হয় যেন তাঁর চেয়ে কমযোর, অসহায়, নীতি ও বিবেক বর্জিত মানুষ আর দ্বিতীয়টি ছিল না। অথচ সন্দেহাতীত সত্য এই যে, ইসলাম কবূল করার পর হক ও সত্যের তিনি ছিলেন অধিক অনুগামী। আশ্চর্য! দীন কায়েমের ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র শরীক ছিলেন, কাফির মুশরিকদের যিনি পর্যুদস্ত করে ছাড়লেন এবং তাদেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করলেন, সেই শক্তি ও সাহস তিনি তাদের বিরুদ্ধে কেন দেখালেন না যারা নাকি তাঁরই চোখের ওপর ইসলামের

গোড়া কাটতে শুরু করেছিল; অথচ সংখ্যায় ও শক্তিতে তারা কাফিরদের তুলনায় দুর্বলই ছিল। পরন্ত এই বিরোধীরা তো আর যাই হোক—হক ও সত্যের কিছুটা কাছাকাছিই ছিল।[১]

ইমামত প্রসঙ্গ

শী'আদের ইমামতের 'আকীদা প্রসঙ্গেও ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) বিশদ আলোচনা করেছেন। দীনের রোকন হিসাবে ইমামতের যে সংজ্ঞা ও পরিচয় তারা পেশ করেছে, তিনি কঠোর ভাষায় তা প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং তাদের যুক্তি ও উক্তি-নির্ভর যাবতীয় দলীল-প্রমাণ খণ্ডন করেছেন। সেই সাথে 'ইমামে গায়েব'-এর 'আকীদা সম্পর্কে সুতীব্র কটাক্ষ করে যুক্তি দেখিয়েছেন যে, ফিতনা ও বিভেদ, ফাসাদ ও গোলযোগ এবং অলসতা ও কর্মবিমুখতা ছাড়া এ 'আকীদার আর কোন ফসল নেই।[২]

কুরআন-সুন্নাহর প্রতি শী'আদের নিস্পৃহতা

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) লিখেছেন যে, কুরআন হেফজ করা এবং এর অর্থ ও তাফসীর সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করার প্রতি শী'আদের বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। তদ্রূপ সহীহ্, য'ঈফ ও মওযু' হাদীসের পরিচয় লাভ, হাদীসের সঠিক ভাব ও অর্থ উদ্ধার এবং সাহাবা-কিরামের বাণী ও বক্তব্য সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নেই, কিছু সংখ্যক আহলে বায়তের বর্ণিত স্বল্প সংখ্যক হাদীস ও বাণী-ই হলো তাদের বিদ্যার দৌড়। এসবের মধ্যে আবার যথারীতি সত্য-মিথ্যার মিশ্রণ তো রয়েছেই।[৩]

জুমু'আ জামা'আত ও মসজিদ বিমুখতা

ইমামদের সম্পর্কে শীআদের অতিরঞ্জন ও সীমালংঘন সম্পর্কে ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) লিখেছেন যে, ইমামদের তারা প্রায় খোদার আসনে বসিয়ে আল্লাহ্র 'ইবাদতের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছে। অথচ নবী-রসূল ও তাঁদের অনুসারী ইমামগণ লা-শরীক আল্লাহ্র 'ইবাদতেরই নির্দেশ দিয়ে গেছেন। মসজিদে কখনো সালাত আদায় করলেও তা করে একা একা। সালাত ও জামা'আত কায়েমের বড় একটা গরজ নেই তাদের। ইমামদের সমাধিক্ষেত্রগুলো

---

১. ঐ, খণ্ড ৪, পৃ. ৫৬।

২. ঐ, খণ্ড, ৩, পৃ. ২৪৯-২৫০।

৩. মিনহাজুস-সুন্নাহ, ৪০ পৃ.।

তাদের কাছে মসজিদের চেয়েও পবিত্র ও বরকতপূর্ণ। তাই মসজিদের পরিবর্তে সেখানেই তারা ই'তিকাফ করে এবং হাজীদের আল্লাহ্‌র ঘর যিয়ারতের মত সেগুলোর যিয়ারতের নিয়তে তারা দূর-দূরান্তর সফর করে থাকে।

পরবর্তী শী'আরা মু'তাযিলাবাদে বিশ্বাসী

বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রে শী'আরা সাধারণত মু'তাযিলাদের অনুসারী। পক্ষান্তরে কিছু লোক গ্রীক দার্শনিকদের ভক্ত। তাদের মাঝে অতিমাত্রায় দর্শন প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। শী'আ 'আলিমদের কেউ কেউ যুগপৎ দর্শন, মু'তাযিলী ও রাফিযী চিন্তাধারায় প্রভাবিত। মিনহাজু'ল-কারামাহ গ্রন্থকার তাদেরই একজন। তাঁর কিতাবের 'আকাইদ ও 'ইলমু'ল-কালাম সংক্রান্ত আলোচনাগুলোতে দর্শন ও মু'তাযিলী চিন্তাধারার ছাপ সুস্পষ্ট। ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-ও পাল্টা দর্শন ও কালামশাস্ত্রীয় যুক্তিতর্ক ও জটিল আলোচনার অবতারণা করে সেগুলোর প্রামাণ্য ও বিস্তারিত জওয়াব দিয়েছেন এবং যেহেতু 'উক্তি ও উদ্ধৃতি'-নির্ভর 'ইলমের মত 'আকল ও যুক্তি-নির্ভর 'ইলমের সমুদ্রেরও তিনি এক পাকা ডুবুরী, সেহেতু বেশ হাত খুলেই তিনি লিখতে সক্ষম হয়েছেন। গ্রন্থকারের প্রতিটি কথার দাঁতভাঙা জওয়াব দেওয়ার পর আফসোসের সাথে তিনি বলেছেন যে, 'আকল ও যুক্তিনির্ভর 'ইলমের ক্ষেত্রে শী'আদের জানাশোনার স্তর একেবারেই হাল্কা। এমনকি তাদের বিদগ্ধ 'আলিমদেরও মনে হয় এ শাস্ত্রের পাঠশালায় অবোধ নির্বোধ শিশু।[১]

অতীত ইতিহাস

বিভিন্ন স্থানে ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) লিখেছেন যে, ইতিহাসের সকল অধ্যায়ে শী'আরা কাফির ও মুশরিকদের শক্তি যুগিয়েছে এবং ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর সাথে গাদ্দারী করে ইসলামী সালতানাতের ক্ষতি সাধন করেছে। তাই কতকটা বাধ্য হয়েই যেন তাকে এ নির্মম সিদ্ধান্ত টানতে হয়েছে।

মোটকথা, ইসলামের নামে তাদের গোটা ইতিহাসই মসিলিপ্ত।[২]

ভারসাম্যপূর্ণ মধ্য পন্থায় আহলে সুন্নত

ইবনে তায়মিয়া (র)-র মতে, ইসলামী ফিরকা ও উপদলসমূহের মধ্যে আহলে সুন্নতই শুধু অতিরঞ্জন ও শিথিলতা পরিহার করে ভারসাম্যপূর্ণ পথ ও মধ্যপন্থা গ্রহণ করেছে। তাঁর মতে, আহলে বায়তের প্রতি মুহব্বত পোষণ এবং সাহাবা-কিরামের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মাঝে কোন বিরোধ নেই। আহলে সুন্নত অত্যন্ত সার্থকভাবে এ উভয় নি'আমতকে নিজেদের মধ্যে ধারণ করে এসেছে এবং এটাই হলো প্রকৃত ইসলাম। তিনি লিখেছেন ঃ

---

১. ঐ, খ. ১, পৃ.

২. ঐ, খ. ৪, পৃ. ১১১।

আহলে সুন্নত সকল মু'মিনের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রদর্শন পূর্বক 'ইল্‌ম ও প্রজ্ঞা এবং ন্যায় ও ইনসাফের আলোকেই আলোচনা ও বক্তব্য পেশ করে থাকে। তাদের পথ মুর্খ ও নির্বোধদের পথ নয়, নয় প্রবৃত্তি পূজারী ও শয়তানের সেবাদাসদের পথ। খারিজী ও রাফিযী উভয় পথ ও মতই তাদের নিকট সমানভাবে বর্জনীয়। পূর্ববর্তী সকলের প্রতিই রয়েছে তাদের সমান শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা এবং আস্থা ও বিশ্বাস। সাহাবায়ে-কিরামের ফযীলত ও মর্যাদা এবং তাঁদের গুণ ও মহত্ত সম্পর্কে তারা অত্যন্ত সচেতন। সাথে সাথে আহলে বায়তের ইহসান ও অবদানের ঋণ স্বীকার করাকেও তারা অত্যন্ত জরুরী মনে করে। শরীয়তের দৃষ্টিতে তাঁদের প্রাপ্য মর্যাদাটুকু দিতে তারা একান্ত বদ্ধপরিকর।[১]

১. ঐ, খ. ১, পৃ. ১৬৫।

নবম অধ্যায়

শরীয়তী 'ইলমসমূহের পুনরুজ্জীবন

ইমাম ইবনে তায়মিয়ার সময়কাল

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র যুগে শরীয়ত সংক্রান্ত শাস্ত্রসমূহের অসাধারণ বিস্তৃতি ঘটেছিল। বিশেষত তাফসীর, হাদীস, ফিকহ্ ও ফিকহ্ বিজ্ঞান ইত্যাদি প্রতিটি বিষয়ে এত বিরাট 'গ্রন্থাগার' তৈরী হয়ে গিয়েছিল যে, শুধু একটি বিষয়ে ব্যুৎপত্তি ও বৈদগ্ধ অর্জন করা, এমনকি শাস্ত্রীয় গ্রন্থাগার সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা লাভ করাও তখনকার মাঝারি পর্যায়ের একজন 'আলিমের পক্ষে দুর্লভ 'একাডেমিক কৃতিত্ব' মনে করা হতো। তবে তাঁর যুগে এমন 'আলিম ও অধ্যাপকের সংখ্যাও প্রচুর ছিল যাঁরা সব ক'টি শাস্ত্রের গ্রন্থাগার আগাগোড়া অধ্যয়নের সুযোগ লাভ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে আবার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক 'আলিম এমনও ছিলেন যাঁরা নিজেদের দুর্লভ স্মৃতিশক্তি, আত্মনিমগ্নতা, ব্যাপক অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার কল্যাণে গোটা কুতুবখানা নিজেদের সিনায় সংরক্ষণ করে নিয়েছিলেন এবং বিতর্ক, আলোচনা-সমালোচনা ও অধ্যাপনার সময় ইচ্ছেমত সেগুলোর ব্যবহার ও প্রয়োগ করতে সক্ষম হতেন। এ প্রসঙ্গে আল্লামা কামালুদ্দীন ইবনু'য-যামালকানী, আল্লামা তকীউদ্দীন, আলী ইবনে সুবকী, শামসুদ্দীন আয-যাহবী, আবুল হাজ্জাজ আল-মিযযী প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যায়। طبقات الشافعية الكبرى থেকে সেই সময়ের বৈদগ্ধ, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞাগত বৈচিত্র্য সম্পর্কে কিছুটা অনুমান করা যেতে পারে। সে সময় দু'একজন 'আলিম এমনও ছিলেন যাঁদেরকে শাব্দিক অর্থেই ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের জীবন্ত বিশ্বকোষ হিসাবে গণ্য করা যেত। তবে একথাও সত্য যে, শাস্ত্রীয় বিস্তৃতি সত্ত্বেও চিন্তা ও প্রজ্ঞার ক্ষেত্রে সে তুলনায় গভীরতা সঞ্চারিত হয় নি। দীর্ঘদিন থেকেই এমন 'আলিম ও চিন্তানায়কের সুতীব্র অভাব অনুভূত হচ্ছিল

যাঁরা ইসলামী গ্রন্থাগারের উপর সমালোচনা ও পর্যালোচনার দৃষ্টি দিতে পারেন এবং পূর্বসুরীদের মতামত ও চিন্তাধারা বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে নিজস্ব মতামত ও গবেষণা সংযোজন করতে পারেন। পূর্বসূরীরা যে মহামূল্যবান 'ইলমী মীরাছ ও একাডেমিক উত্তরাধিকার রেখে গিয়েছিলেন, উত্তরসুরীদের অধিকাংশই তখন সেগুলো আয়ত্ত করা এবং ব্যাখ্যা ও সংক্ষিপ্তসার পেশ করার মাঝেই নিজেদের কর্মকাণ্ড সীমিত রেখেছিলেন। নতুন গবেষণা ও সংযোজনের ধারা বন্ধ ছিল বেশ কিছুদিন থেকেই। ইজতিহাদ ও সৃজনমুখী রচনাকর্মের তখন দারুণ অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছিল। সে যুগের 'গৌরবময়' রচনাকর্মগুলোর বৈশিষ্ট্য শুধু এই যে, বিক্ষিপ্ত তথ্যসমূহকে তাতে সুবিন্যস্ত আকারে গ্রন্থবদ্ধ করা হয়েছিল অথবা পূর্ববর্তী কোন মূল ফিকহ্ গ্রন্থের উত্তম ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছিল।

ইবনে তায়মিয়ার রচনাকর্মের বৈশিষ্ট্য

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) তাঁর আল্লাহ-প্রদত্ত প্রখর মেধা ও স্মৃতি শক্তি কাজে লাগিয়ে গোটা ইসলামী গ্রন্থাগার আত্মস্থ করে নিয়েছিলেন এবং নিজস্ব রচনাকর্মে সেগুলোর সুন্দর ও উপযোগী প্রয়োগও ঘটিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর অতৃপ্ত মেধা ও প্রজ্ঞা এবং সৃজনশীল চিন্তা ও প্রতিভা, সর্বোপরি জলপ্রপাতের মত উচ্ছল গতিময় লেখনীশক্তি শুধু ব্যাখ্যা, টীকা ও সংক্ষেপীকরণের গতানুগতিক কর্মকাণ্ডে সন্তুষ্ট ছিল না। কর্মের এক সুবিস্তৃত জগত যেন হাতছানি দিয়ে তাঁকে ডাকছিল। কুরআন-সুন্নাহর সুগভীর জ্ঞান, শরীয়তের ভাব ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে পূর্ণ সচেতনতা এবং ফিকহ্ ও ইজতিহাদের অঙ্গনে পাণ্ডিত্য ও বৈদগ্ধের ছাপ তাঁর প্রতিটি লেখা ও রচনায় ছিল সুস্পষ্ট। যে বিষয়েই তিনি কলম ধরতেন সাম্প্রতিক চিন্তা ও তথ্য সংযোজনের মাধ্যমে তাতেই নতুন প্রাণ সঞ্চার করতেন। তাঁর কোন রচনাকর্মই নতুন একাডেমিক তথ্য ও তত্ত্ব, নতুন ইজতিহাদ ও সংযোজন এবং মৌলিক আলোচনা ও সমালোচনার অমূল্য সম্পদ থেকে বঞ্চিত নয়; বরং তাতে রয়েছে কুরআন-সুন্নাহর অধ্যয়ন ও উপলব্ধি অর্জনের নতুন নতুন দিক-নির্দেশনা, নব নব দিগন্তের ইশারা। ইমাম সাহেবের দু'টি বিরাট ও মূল্যবান গ্রন্থ الجواب الصحيح، منهاج السنة-এর বিস্তারিত পর্যালোচনা এবং বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্তসার ইতিপূর্বে আমরা পেশ করে এসেছি। তাঁর অন্যান্য রচনাকর্মেও রয়েছে মুজতাহিদসুলভ প্রজ্ঞা, সৃজনশীল মেধা এবং বিরল সমালোচনা শক্তির স্বাক্ষর, যা যুগে যুগে মুসলিম জাহানের সৃজনশীল মেধা ও প্রতিভাগুলোকে নতুন চিন্তার খোরাক যোগায় এবং বিদগ্ধজনদের সামনে নতুন তথ্য ও উপাদান, অভিনব গবেষণা ও ইজতিহাদের সওগাত তুলে ধরে। এ প্রসঙ্গে الرد على.

النبوات ، اقتضاء الصراط المستقيم ، منطقيين প্রভৃতি[১] গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা যায়। মানুষকে চিন্তা ও গবেষণার পথে উদ্বুদ্ধ করা এবং তাদের সামনে নতুন নতুন বুদ্ধিবৃত্তিক ও শিক্ষণীয় ক্ষেত্র তুলে ধরা, চিন্তা ও গবেষণার জন্য নতুন নতুন বিষয়বস্তু উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে উল্লিখিত বইগুলো স্ব-স্ব গণ্ডিতে অত্যন্ত সার্থক ও ফলপ্রসূ রচনা।

তাফসীর

তাফসীর শাস্ত্রকে ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) তাঁর রচনা ও গবেষণা জীবনের বিশেষ বিষয়রূপে গ্রহণ করেছিলেন। এ শাস্ত্রে তাঁর অনুরাগ এত প্রবল ছিল যে, প্রায় সব লেখাতেই তাফসীর বিষয়ক উপাদান ও উপকরণ প্রচুর পরিমাণে স্থান পেয়েছে। নিজস্ব মতামতের সমর্থনে প্রয়োজনীয় তাফসীর ও ব্যাখ্যাসম্বলিত আয়াত পেশ করা ছিল তাঁর প্রিয় স্বভাব। বিষয় প্রসঙ্গে কোন আয়াত সামনে এলে প্রয়োজনীয় তাফসীর ও ব্যাখ্যা না করে এগিয়ে যাওয়া তাঁর পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হতো না। তাঁর ছাত্রদের বর্ণনা মতে ত্রিশ খণ্ডেরও বেশী এক সুবিশাল তাফসীর গ্রন্থ তিনি লিখেছিলেন। বলা বাহুল্য যে, উক্ত তাফসীরের পাণ্ডুলিপি হস্তগত হলে তাফসীর জগতের এক অমুল্য রত্ন ও নির্ভরযোগ্য ভাণ্ডাররূপে তা গণ্য হত। জ্ঞান ও চিন্তার গভীরতা, বোধ ও রুচির পরিচ্ছন্নতা, রিওয়ায়াত ও বর্ণনার ক্ষেত্রে পরিপক্কতা, জ্ঞান ও পরিবেশ সম্পর্কে পূর্ণ সচেতনতা, কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে জীবন সমস্যার নির্ভুল সমাধান প্রদানের সহজাত ক্ষমতা, দীন ও শরীয়তের প্রশ্নে আপোষহীন মনোভাব এবং আমর বি'ল-মা'রূফ ও নাহী 'আনি'ল-মুনকারের যে টগবগে আবেগ ও দাওয়াতী জযবা আল্লাহ পাক তাঁকে দান করেছিলেন সে দিকে লক্ষ্য করে বলা যায় যে, তাঁর কলমে লেখা তাফসীর গ্রন্থই সম্ভবত সর্বোত্তম ও সর্বাঙ্গীন তাফসীরের মর্যাদার অধিকারী হতে পারত। উপরিউক্ত বিস্তৃত ও ধারাবাহিক তাফসীর গ্রন্থটি বিলুপ্ত হয়ে গেলেও বিভিন্ন সূরার খণ্ডিত তাফসীর ছাপার অক্ষরে ইতিমধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। সেগুলো থেকেও তাফসীর শাস্ত্রে তাঁর সুবিশাল ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে কিঞ্চিৎ ধারণা লাভ করা যায়। এ পর্যন্ত প্রকাশিত খণ্ডিত তাফসীরগুলো হলো ঃ (১) তাফসীরু সূরাতি'ল-ইখলাস, (২) তাফসীরু মু'আওয়াযাতায়ন, (৩) তাফসীরু সূরাতি'ন-নূর। এ ছাড়া তাঁর রচনা সমগ্র থেকে তাফসীর বিষয়ক অংশগুলো

---

১. শেষোক্ত কিতাবটির বিষয়বস্তু যদিও অমুসলিমদের আচার-অনুষ্ঠান, রীতি ও বৈশিষ্ট্য বর্জন সংক্রান্ত আলোচনা, তথাপি ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) তাতেও যথারীতি মূল্যবান ও অনবদ্য আলোচনার অবতারণা করেছেন। ফলে তা ইমাম সাহেবের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থসমূহের অন্যতম বিবেচিত হয়েছে। গ্রন্থটির একটি সংস্করণ কায়রো থেকে বেশ জাঁকজমকের সাথে প্রকাশিত হয়েছে। উর্দূ সংস্করণও অতিশীঘ্র প্রকাশিত হচ্ছে।

স্বতন্ত্র গ্রন্থাগারে পকাশ করা হয়েছে।[১] কুরআন-প্রেম ও তাফসীর নিমগ্নতা ইমাম সাহেবের জীবনের এমন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিক ছিল যে, তাঁর জানাযায় ঘোষণা হয়েছিল এভাবে ঃ কুরআনের মুখপাত্রের জানাযা (الصلواة على ترجمان القران) উসূলে তাফসীর সম্পর্কেও তাঁর একটি চটি বই রয়েছে এবং আমাদের জানা মতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সেটাই হচ্ছে প্রথম রচিত পুস্তিকা।

হাদীস

হাদীস ও হাদীস ব্যাখ্যা-শাস্ত্রে ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র স্বতন্ত্র কোন রচনাকর্ম নেই। কেননা সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে এ শাস্ত্র এমন ব্যাপ্তি ও পূর্ণতা লাভ করেছিল যে, নতুন রচনাকর্মের বিশেষ প্রয়োজনও ছিল না। তবে তাঁর রচনা-সমগ্রে উসূলে হাদীস, রিজাল শাস্ত্র, হাদীস সমালোচনা ও হাদীসতত্ত্বের যে বিপুল উপাদান পাওয়া যায় সেগুলো স্বতন্ত্র গ্রন্থের রূপ পেলে মানে ও কলেবরে নিঃসন্দেহে তা এক অমূল্য ভাণ্ডারের মর্যাদা লাভ করবে। বিশেষত জাল হাদীস সম্পর্কে যেরূপ নির্দ্বিধ ও যুক্তিনিষ্ঠ মতামত তিনি পেশ করেছেন তা অন্য কোথাও পাওয়া দুষ্কর। এ প্রসঙ্গে 'মিন্‌হাজু'স-সুন্নায়' যে পরিমাণ উপাদানে তিনি ংগ্রহ করেছেন এবং বহু সংখ্যক প্রচলিত হাদীস সম্পর্কে যে সারগর্ভ বক্তব্য রেখেছেন তা অত্যন্ত কার্যকর, দুর্লভ ও মূল্যবান।

উসূল-ই-ফিকহ

ফিক্‌হ্ বিজ্ঞানে (উসূলে-ই-ফিক্‌হ্) ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও ইজতিহাদী প্রজ্ঞা ছিল সে যুগের আলিমদের জন্য ঈর্ষণীয় বিষয়। ফিকহ্ বিজ্ঞানসংক্রান্ত তাঁর সব রচনাতেই পরিদৃষ্ট হয়। বিশেষত اقتضاء الصراط المستقيم গ্রন্থ এবং ফতওয়া সংকলনে এতদসংক্রান্ত আলোচনার বিরাট ভাণ্ডার রয়েছে। এ ছাড়া رسالة القياس এবং منهاج الوصول الى علم الاصول নামক স্বতন্ত্র দুটি বইও তাঁর স্মৃতি হয়ে আছে।

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র রচনাবলীর পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, তাঁর লেখার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ কিংবা অর্ধেক অংশ জুড়ে আছে 'আকাইদ ও কালামশাস্ত্র-সংক্রান্ত আলোচনা। বিভিন্ন শহরের নামে নামকরণকৃত[২] তাঁর পুস্তিকাগুলোতে তাঁর কালাম ও 'আকাইদ সংক্রান্ত চিন্তাধারা ও যুক্তিপ্রয়োগ ক্ষমতা, ধর্মীয় আপোষহীনতা, সুগভীর জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও মেধার যথার্থ পরিচয় পাওয়া যাবে।

---

১. সম্প্রতি এটা 'তাফসীরু ইবনে তায়মিয়া' নামে মাতবা'আ কায়্যিমাহ, বোম্বে থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

২. যে শহর থেকে কোন বিষয়ে ফতওয়া চেয়ে পাঠানো হতো সাধারণত সে শহরের নামেই উক্ত 'ফতওয়ার নামকরণের রেওয়াজ ছিল। যেমন শরাহ ইসবাহানিয়া, রিসালা, হামাবিয়া, তাদমুরিয়া, ওয়াসিতিয়া, কীলানিয়া, বাগদাদিয়া, আযহারিয়া ইত্যাদি।

ফিকহ্ ও ইসলামী আইন শাস্ত্র

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র আমলে প্রত্যেক ফিকহ্ এতটা বিন্যস্ত ও গ্রন্থবদ্ধ রূপ পরিগ্রহ করেছিল যে, তাতে নতুন সংযোজনের চেষ্টা ছিল এক দুরূহ ব্যাপার। তা সত্ত্বেও অসংখ্য আহকাম ও মাসায়েলের ক্ষেত্রে কুরআন, সুন্নাহ্, ইজমা, কিয়াস ও ফিকহ্শাস্ত্রের মুল নীতিমালার আলোকে তিনি নিজস্ব ইজতিহাদ প্রয়োগ করেছেন এবং ফিকহ্শাস্ত্রের আহকাম ও সিদ্ধান্তমালা যে বিশুদ্ধ হাদীস থেকে গৃহীত তা দেখানোর চেষ্টা করেছেন। সেই সাথে হাদীস ও ফিকহ্-শাস্ত্রের (কল্পিত) বিরোধ দূর করে উভয়ের মাঝে সমন্বয় ও সাদৃশ্য তুলে ধরার সার্থক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। প্রত্যেক মাযহাবের বিচারক ও মুফতীগণ স্ব-স্ব যুগের উদ্ভূত সমস্যাবলীর সমাধান এবং যুগের দাবী ও চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে চিন্তা, গবেষণা ও ইজতিহাদের আশ্রয় নিয়েছেন। ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)ও উদ্ভূত সমস্যা ও যুগচাহিদার প্রেক্ষিতে নিজস্ব ইজতিহাদ প্রয়োগ করেছেন এবং ফতওয়া ও সিদ্ধান্তমালার এক বিশাল ভাণ্ডার রেখে গেছেন যা فتاوى ابن تيمية নামে চার খণ্ডের বিরাট কলেবরে প্রকাশিত হয়েছে।[1] ফিকহী আহকাম ও মাসায়েল ছাড়াও উক্ত সংকলনে রয়েছে বিভিন্ন তাত্ত্বিক প্রশ্ন ও মৌলিক আলোচনার এক বিরাট ও মূল্যবান ভাণ্ডার।

পরবর্তী যুগে ইমাম ইবনে তায়মিয়ার প্রভাব

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) যে মহান বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মযজ্ঞ আঞ্জাম দিয়েছেন তাতে যেমন ছিল ব্যাপকতা ও গভীরতা, তেমনি ছিল উক্তি ও যুক্তি উভয় জ্ঞানের চমৎকার সমন্বয়। তবে তাঁর সবচেয়ে বড় অবদান এই যে, শরীয়তী শাস্ত্রসমূহের সংস্কারের খিদমতও তিনি আঞ্জাম দিয়েছেন এবং ইসলামী চিন্তা ও গবেষণা জগতে দৃশ্যমান বশ্যতা ও অবক্ষয় দূর করেছেন, 'ইলমের নতুন নতুন পথ রচনা করেছেন, চিন্তা ও গবেষণার নব নব দিগন্ত উন্মোচন করেছেন। এমন মূল্যবান রচনা-সম্ভার তিনি রেখে গেছেন যা চিন্তায় প্রসারতা আনতে সক্ষম এবং যা মনে উৎসাহ-উদ্দীপনা জাগ্রত করে এবং কর্মে উচ্ছল গতি সৃষ্টি করে। তাঁর রচনা-

১. উক্ত ফতওয়া সংকলন মিসর থেকে ১৩২৬ হিজরীতে শেখ ফারাজুল্লাহ যাকী কুরদীর তত্ত্বাবধানে ছাপা হয়েছে। চার খণ্ডের মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৫৮৬। চতুর্থ খণ্ডের শেষে الاختيارات العلمية নামে একটা অধ্যায় যোগ করা হয়েছে। এতে বিভিন্ন বিষয়ে ইমাম ইবনে তায়মিয়ার ব্যতিক্রমী সিদ্ধান্তসমূহ একত্র করা হয়েছে। ফতওয়া সংকলনের পঞ্চম খণ্ডে রয়েছে কালাম ও 'আকাইদ শাস্ত্র সংক্রান্ত বিভিন্ন আলোচনা। সউদী সরকার فتاوى ابن تيمية নামে ত্রিশ খণ্ডের যে বিশাল সংকলন ছেপেছেন তাকে ফিকহশাস্ত্রের এক পূর্ণাঙ্গ বিশ্বকোষ বলা যেতে পারে।

সম্ভারের কল্যাণকর প্রভাবেই যুগে যুগে বিরাট ব্যক্তিত্বের অধিকারী লেখক, চিন্তাবিদ, সংস্কারক, নিষ্ঠাবান অসংখ্য দাওয়াতী কর্মী জন্ম নিয়েছেন। আট শতকের পর থেকে বুদ্ধিবৃত্তিক ও সংস্কার আন্দোলনের ক্ষেত্রে সেই ধারাবাহিকতা পরিলক্ষিত হচ্ছে নিঃসন্দেহে ইমাম ইবনে তায়মিয়ার তাতে উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে এবং একথা স্বীকার করতেই হবে যে, ইসলামী চিন্তার জগতে এবং 'ইল্‌ম ও শরীয়তের অংগনে শীর্ষস্থানীয় যুগশ্রেষ্ঠদের কাতারে শামিল হওয়ার যোগ্যতা তাঁর রয়েছে। বিশেষত হিজরী বার শতকের পর থেকে ইসলামী দুনিয়ার বিভিন্ন দিগন্তে যে সকল চিন্তা-চেতনা, বুদ্ধি-বৃত্তিক ও সংস্কার আন্দোলন জন্ম লাভ করেছে, সেগুলোর বড় উৎস ও চালিকা শক্তিই হলো ইমাম ইবনে তায়মিয়ার রচনা-সম্ভার।

দশম অধ্যায়

ইসলামী চিন্তাধারার পুনরুজ্জীবন ঃ আকাইদের উৎস কুরআন ও সুন্নাহ্

'আকীদা ও বিশ্বাসের নির্ভুল উৎস

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র একটি মৌলিক সংস্কারমূলক অবদান এই যে, বিলুপ্তপ্রায় ইসলামী চিন্তাধারার তিনি পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছেন এবং সম্ভবত এটাই তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। অন্যান্য চিন্তাধারার তুলনায় ইসলামী চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য এই যে, আসমানী ওহী এবং নবুওয়তে মুহাম্মদী হলো এর ভিত্তি–কিয়াস ও যুক্তি, অভিজ্ঞতা ও অনুমান এবং মানবীয় বুদ্ধি ও গবেষণা এর ভিত্তি নয়। কালামুল্লাহ ও সুন্নতে রসূল (সা)-এর আলোকেই নির্ধারিত হবে 'আকীদা ও বিশ্বাস এবং দীনি হাকীকত ও সত্যসমূহের ভিত্তি। আল্লাহ্র যাত ও সিফাত, সৃষ্টি ও কর্ম, বিশ্বের আদি ও অন্ত, সৃষ্টি ও লয়, কর্মফল ও শাস্তি-পুরস্কারসহ যাবতীয় অতিপ্রাকৃতিক বিষয় সম্পর্কে রাসূল (সা) যা বলেছেন এবং যতটুকু বলেছেন সেগুলোই হচ্ছে 'আকীদা ও বিশ্বাস এবং হাকীকত ও চিরন্তন সত্য। বস্তুত ওহী ও নবুওয়ত ছাড়া এগুলো জানার এবং বিশ্বাস করার অন্য কোন মাধ্যম নেই। কেননা প্রাথমিক জ্ঞাত বিষয়ই হলো যাবতীয় তথ্য ও সত্য জানার মাধ্যম। অথচ দীনী ও গায়বী হাকীকত ও সত্যসমূহের প্রাথমিক সূত্রগুলোও কারো জানা নেই। কোন নতুন ও অজ্ঞাত বিষয় জানার একমাত্র মাধ্যম হলো জ্ঞাত বিষয় ও সূত্রগুলোকে এমনভাবে বিন্যস্ত করা যা মানুষকে কোন অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞান লাভের পর্যায়ে উপনীত করে। কিন্তু মুশকিল এই যে, প্রাকৃতিক ও জড়জাগতিক বিষয়সমূহের প্রারম্ভিক সূত্রগুলো আমাদের যেমন জানা আছে৷ দীনী ও গায়বী হাকীকত বা সত্যসমূহের প্রারম্ভিক সূত্র ও উপাত্তগুলো সেরূপ জানা নেই। আল্লাহ্র যাত ও সিফাত তথা গুণ ও সত্তা মানুষের 'আকল ও বুদ্ধি এবং স্থূল অনুভূতি ও ইন্দ্রীয় শক্তির ঊর্ধ্বের বিষয় এবং এ সম্পর্কে মানুষের কোন রকম

অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ নেই এবং বুদ্ধির ব্যবহার ও যুক্তি প্রয়োগেরও কোন বুনিয়াদ নেই। ليس كمثله شيئ তাঁর কোন তুলনা নেই। সুতরাং এ সম্পর্কিত জ্ঞান লাভের জন্য সেই মুবারক জামা'আতের ওপর নির্ভর করা ছাড়া কোন উপায় নেই যাঁদেরকে আল্লাহ্ নিজেই অনুগ্রহবশত স্বীয় গুণ ও সত্তার 'ইল্ম দান করেছেন এবং সত্য লাভের জন্য নূর ও হিদায়াত দান করেছেন। এই ঐশী মাধ্যমকে উপেক্ষা ও অস্বীকার করার কিংবা এ বিষয়ে আলোচনা ও যুক্তি প্রয়োগ করার কোন অধিকার আমাদের নেই। এই চিরন্তন সত্যকেই আল-কুরআন আল্লাহ্র এক নবীর মুখে এভাবে ভাষা দিয়েছে ঃ

قال اتحاجونى فى الله وقد هدان -

তিনি বললেন ঃ তোমরা কি আল্লাহ (-র যাত ও সিফাত) সম্পর্কে আমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হতে চাও, অথচ আল্লাহ্ আমাকে এ সম্পর্কিত জ্ঞান দান করেছেন?

দর্শনের অর্থহীন প্রয়াস

এ এমনই স্পষ্ট ও আলোকিত সত্য যার পর আল্লাহর যাত ও সিফাতের 'ইল্ম হাসিলের জন্য দর্শন কিংবা যুক্তিবিদ্যার আশ্রয় গ্রহণের কোন প্রয়োজনই ছিল না। কিন্তু মানুষের জ্ঞান সাধনার ইতিহাসে রীতিমত বিস্ময়কর ঘটনা এই যে, কয়েক হাজার বছর পর্যন্ত এ অর্থহীন কর্মকাণ্ডে দর্শন নিজেকে নিয়োজিত রেখেছে এবং এমন বিষয়ের অনুসন্ধান চেষ্টায় সে তার শ্রেষ্ঠ মেধা, প্রতিভা ও চিন্তাশক্তিকে ব্যয় করেছে যে বিষয়ের প্রারম্ভিক সূত্র ও উপাত্তগুলোও তার জানা নেই এবং নিশ্চিত জ্ঞান ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত লাভের কোন মাধ্যম তাঁর নাগালে নেই বলে সে নিজেই স্বীকার করেছে। তা সত্ত্বেও দর্শনসেবীরা স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে এই নাযুক বিষয়টির অবাধ চুলচেরা বিশ্লেষণ ও খুঁটিনাটি আলোচনায় নাক গলিয়েছেন যেমনটি করে থাকেন অভিধান শাস্ত্রবিদগণ শব্দমালা নিয়ে, ব্যাকরণবিদগণ বাক্যবিন্যাস নিয়ে, পদার্থবিদগণ বিভিন্ন পদার্থ নিয়ে এবং শল্যবিদগণ মানবদেহ নিয়ে। জটিল ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অতিপ্রাকৃত বিষয়সমূহে তাদের অবাধ আলোচনা দেখে মনে হয় যেন হাতে ধরা যায়, চোখে দেখা যায় এমন সাধারণ ও স্থূল কোন বিষয় নিয়ে তারা নাড়াচাড়া করছেন।

কালামশাস্ত্রবিদদের দর্শনপ্রীতি

আরো আশ্চর্যের বিষয় এই যে, চিন্তার জগতে গ্রীক দর্শনের আগ্রাসন রোধ করার গুরুদায়িত্ব নিয়ে যাদের বুদ্ধিবৃত্তিক যাত্রা সেই মুতাকাল্লিমগণও দর্শনের মূলনীতি ও পরিভাষাগুলো মেনে নিলেন এবং আল্লাহ্র যাত ও সিফাত সম্পর্কে

দার্শনিকদের মত তারাও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলোচনা ও চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণে এমন আত্মবিশ্বাসের সাথে মেতে উঠলেন মনে হলো তারাও যেন নিজেদের ধরা-ছোঁয়ার ভেতরের কোন সত্তাকে নিয়ে সাধারণ আলোচনায় রত হয়েছেন। দর্শন-দুর্গে ফাটল ধরাতে যারা মাঠে নামলেন দুর্ভাগ্যবশত নিজেরাই তারা হারিয়ে গেলেন দর্শনের কল্পনা ও পরিভাষার গোলক ধাঁধায়। সওয়াল-জওয়াব ও তর্ক-বিতর্কের উচ্ছ্বাসে দর্শনের এই বুনিয়াদী গলদটুকু ধরিয়ে দিতে তারা ভুলে গেলেন যে, যে নাযুক বিষয়ে হস্তক্ষেপের দুঃসাহস তাঁরা করেছেন তার প্রারম্ভিক সূত্র ও উপাত্তগুলো পর্যন্ত তাদের জানা নেই। দার্শনিকদের একথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া তাঁদের দায়িত্ব ছিল যে, গণিত শাস্ত্র, প্রকৃতি বিজ্ঞান হচ্ছে তোমাদের আলোচনা ও গবেষণার ক্ষেত্র। সুতরাং সে গণ্ডীতেই নিজেদেরকে সীমাবদ্ধ রাখা তোমাদের কর্তব্য। ইলাহিয়াত ও আল্লাহ-তত্ত্বের নাযুক সীমানায় অনুপ্রবেশ করা সীমালংঘন ছাড়া আর কিছু নয়। কালাম-শাস্ত্রবিদদের উচিত ছিল আল-কুরআনের ভাষায় দার্শনিকদের সম্বোধন করে বলা ঃ

هانتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وانتم لاتعلمون (ال عمران ٢٢)

যে বিষয়ে তোমাদের কিঞ্চিৎ জ্ঞান ছিল সে বিষয়ে তো বিতর্ক করে সেরেছ, কিন্তু যে বিষয়ে তোমাদের কোন জ্ঞানই নেই সে বিষয়েও কেন বিতর্ক করছ? আল্লাহ্ই শুধু জানেন; তোমরা কিছুই জানো না।

(আল-ই ইমরান ঃ আয়াত-২২)

পরবর্তী যুগে ইসলামী চিন্তাধারার অবক্ষয়

ইসলামী চিন্তাধারার অবক্ষয় পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, আল্লাহ্র অস্তিত্ব, জগতের নশ্বরতা, একত্ববাদ ও মৃত্যু পরবর্তী জীবনসহ যাবতীয় 'আকীদা ও বিশ্বাসের সত্যতা প্রমাণের জন্য মুতাকাল্লিমদের বিন্যাস প্রদত্ত দর্শনভিত্তিক যুক্তি-প্রমাণকেই মাপকাঠিরূপে গ্রহণ করা হয়েছিল। হাদীস ও ফিকহবিদদের ক্ষুদ্র দলটি বাদে আর সকলে কালাম ও যুক্তিশাস্ত্র-বিশারদদের আকল-বুদ্ধিকেই মাপকাঠি ধরে নিয়েছিলেন। কুরআন-সুন্নাহর পরিবর্তে মুতাকাল্লিমদের রচনাবলীকেই তারা আহকাম ও আকাইদের উৎসরূপে গ্রহণ করেছিলেন। হামলা থেকে আত্মরক্ষা করা এবং (দর্শনের স্বঘোষিত মূল নীতিমালা অক্ষুণ্ণ রেখে) শরীয়ত দর্শন-বিরোধী নয় প্রমাণ করার জন্য আয়াত ও হাদীসের ক্ষেত্রে তারা দর্শনোপযোগী ব্যাখ্যার আশ্রয় নিতেন। দর্শনের আলোচনায় অবতীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও মন ও মানস তাদের এতই প্রভাবিত হয়েছিল যে, দর্শনের স্বঘোষিত মূলনীতি খণ্ডন এবং কালাম শাস্ত্রের

প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও সংশোধনের পরিবর্তে আয়াত ও হাদীসকেই তাঁরা দর্শনোপযোগী করার প্রয়াস নিতেন। এই অদ্ভুত মানসিকতা সম্পর্কে ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) লিখেছেন ঃ

অবস্থা এই যে, নবীদের আসমানী শিক্ষা যাচাই করার জন্য প্রত্যেক দল স্বতন্ত্র নিয়ম বেঁধে রেখেছে। নিজেদের 'আকল-বুদ্ধির ওপর তাদের এত অগাধ আস্থা ও বিশ্বাস যে, আকল বুদ্ধি যা অনুমোদন করে সেটাকেই মূল ধরে নবীদের শিক্ষা ও বক্তব্যকে তারা তার অনুগত করে নেয় এবং নিজেদের নির্ধারিত নিয়ম ও স্বীকৃত নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ অংশটুকুই তারা গ্রহণ করে। পক্ষান্তরে উপরোক্ত নিয়ম ও নীতিমালার সাথে সংঘর্ষপূর্ণ অংশটুকু নির্দ্বিধায় প্রত্যাখ্যান করে।[১]

কালামশাস্ত্রের মূল নীতিমালাই হলো সত্যের মাপকাঠি, গভীর ও উচ্চাঙ্গ জ্ঞানের আধার এবং নিগূঢ় তত্ত্ব ও অভিজ্ঞানের ভাণ্ডার, একথা বিশ্বাস করার পর মানস জগতে এক বিরাট দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হত। অর্থাৎ কালাম শাস্ত্রে এগুলো 'প্রকৃত 'ইল্ম হলে রাসূল ও সাহাবা-কিরামের হাদীস ও বাণীতে এ গুলোর হদিস নেই কেন? এ সকল সূক্ষ্ম তত্ত্ব ও রহস্যের আলোচনা তাঁরা করেন নি কেন? দর্শন ও কালাম শাস্ত্রের ওপর যাদের পূর্ণ 'ঈমান' ছিল এবং দর্শনের যাদুতে এভাবে মন-মগজ যাদের আচ্ছন্ন ছিল তারা কখনো কখনো সরাসরি, কখনো-বা পরোক্ষ ভাষায় বলে দিত যে, তখন ছিল ইসলামের শৈশবকাল। এ সকল হাকীকত ও অভিজ্ঞান সম্পর্কে সে যুগের 'সাদা-সিধা' ও নিরীহ মানুষগুলোর কোন ধারণা ছিল না। পক্ষান্তরে দর্শন-প্রেমের পাশাপাশি সাহাবায়ে-কিরামের প্রতি শ্রদ্ধাও যাদের অন্তরে ছিল তারা এমন মানসিক দ্বন্দ্ব ও হতবুদ্ধিতায় ভুগছিলেন যে, এ প্রশ্নের সন্তোষজনক কোন মীমাংসায় পৌছানো তাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। সে যুগের দর্শন প্রভাবিত বিভিন্ন মতের বুদ্ধিজীবীদের মানসিক অবস্থা সম্পর্কে ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) লিখেছেন ঃ

যাদের বিশ্বাস এই যে, কালাম শাস্ত্রে দীনের মৌল বিষয়সমূহ, মৌলিক জ্ঞান, আল্লাহতত্ত্ব, আদি রহস্য ও মৌলিক দর্শন ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তাদের অনেকে বলে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম দীনের মৌল বিষয় সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। অনেকে অবশ্য কিছুটা সমীহ করে বলে যে, অবগত তিনি ছিলেন তবে প্রকাশ করেন নি। যাদের অন্তরে সাহাবা ও তাবি'ঈদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে৷ আবার দার্শনিক ও কালামশাস্ত্র বিদদের মতামতের প্রতিও প্রগাঢ় আস্থা রয়েছে তারা পড়েছে মহা বিপদে।

---

১. بيان موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول খ. ১. পৃ. ৩।

তাদের এ প্রশ্নের কোন জওয়াব নেই যে, সেই সম্মানিত ব্যক্তিগণ উপরিউক্ত 'শ্রেষ্ঠ 'ইলম' সম্পর্কে কিছু বলে যান নি কেন? যাদের অন্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি ঈমান ও শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে তাদের মনে এ খটকা লেগেই আছে যে, দীনের এ বুনিয়াদী ও মৌলিক বিষয়গুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যা তিনি কেন দিয়ে গেলেন না। অথচ অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় এর প্রয়োজন ছিল অনেক বেশী।[১]

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) বলেন, দর্শন কালামশাস্ত্র পূজারীদের মতে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বাণী অস্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত যা 'ইলম ও হিদায়াতের জন্য সহায়ক নয়। আশ্চর্য! নিজেদের দুর্বোধ্য ও দ্ব্যর্থবোধক বক্তব্যকে তারা দ্ব্যর্থহীন ও সুনির্দিষ্ট বলে রায় দিচ্ছে, অথচ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দ্ব্যর্থহীন ও সুনির্দিষ্ট কালামকেও দ্ব্যর্থবোধক ও অস্পষ্ট বলে উড়িয়ে দিতে চাইছে।[২]

'আকল ও বুদ্ধির পূজা

দার্শনিক ও মুতাকাল্লিম উভয় পক্ষই কয়েক শতক ধরে 'আকল ও বুদ্ধির এমন জয়গান গেয়েছেন এবং যাত ও সিফাত সংক্রান্ত আলোচনায় বুদ্ধির ভূমিকাকে এমন ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখানো হয়েছে যেন 'আকল ও বুদ্ধিই হচ্ছে এ ক্ষেত্রে চূড়ান্ত মাপকাঠি। স্থূল বিষয়সমূহের জন্য যেমন পঞ্চেন্দ্রিয়, প্রায়োগিক ক্ষেত্রসমূহের ক্ষেত্র তেমনি অভিজ্ঞতা ও অনুসন্ধান-লব্ধ জ্ঞান। এই সূরতহালের ফল এই দাঁড়াল যে, আহকাম ও 'আকাইদ উভয় ক্ষেত্রে 'আকলই হলো সকল সিদ্ধান্তের বুনিয়াদ ও মাপকাঠি। বিগত ছ' শতক ইসলামী ইতিহাসে কোন আলিম ও চিন্তানায়কই 'আকল ও বুদ্ধির এই একচ্ছত্র আধিপত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আওয়াজ তোলার হিম্মত করেন নি। আল্লাহ-তত্ত্ব সম্পর্কে দর্শন শাস্ত্রের অনধিকার চর্চার বিরুদ্ধে ইমাম গাযালী (র) তীর্যক লেখনী পরিচালনা করলেও 'আকল-বুদ্ধির একচ্ছত্র আধিপত্য এবং সর্বত্র নাক গলানোর প্রবণতার বিরুদ্ধে তিনি ততটা সোচ্চার হতে পারেন নি। আমাদের জানা মতে, ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-ই প্রথম ব্যক্তি যিনি 'বুদ্ধির' স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে গর্জে উঠেছিলেন এবং পূর্ণ সাহসিকতার সাথে এ সত্য তুলে ধরেছিলেন যে, ওহী ও নবুওয়তই হলো 'আকাইদের মূল উৎস। কোন 'আকীদার সত্যতা প্রমাণের জন্য 'আকল ও বুদ্ধি সহায়ক হতে পারে, উৎস হতে পারে না। ইমাম সাহেব পরিষ্কার ভাষায় লিখেছেন ঃ

ان العقل ليس اصلا لثبوت الشرع فى نفسه ولامعطيا له صفة لم تكن ولامفيدا له صفة كمال -

---

১. ঐ খ. ১. পৃ. ১২। ২. ঐ খ. ১. পৃ. ১৬৪।

প্রকৃতিগতভাবেই 'আকল শরীয়তের জন্য মূল ও বুনিয়াদের ভূমিকা পালন করে না এবং এমন কোন 'অবস্থান'ও তাকে দান করে না যা পূর্বে ছিল না এবং পূর্ণতার গুণও তাকে দান করে না।[১]

'আকল -বুদ্ধির প্রকৃত মর্যাদা ও অবস্থান

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র মতে, 'আকল শুধু সহায়কের ভূমিকা পালন করতে পারে। অর্থাৎ রাসূলের সত্যতা ও নিষ্পাপতার স্বীকৃতি পর্যন্ত মানুষকে পৌঁছিয়ে দেওয়াই হলো 'আকলের দায়িত্ব; অতঃপর তার ছুটি। 'আকল শুধু মৌলিকভাবে রসূলের সত্যতা প্রমাণ করবে এবং রাসূলের যাবতীয় সংবাদ ও নির্দেশ বিশ্বাস ও পালন করতে উদ্বুদ্ধ করবে। যেমন নতুন আগন্তুককে কেউ শহরের মুফতীর কাছে পৌঁছিয়ে দিয়ে বলল যে, ইনি আলিম ও মুফতী। পরে সেই সাধারণ পথ-প্রদর্শক ও মুফতী সাহেবের মাঝে কোন বিষয়ে মতানৈক্য দেখা দিলে মুফতী সাহেবকে অগ্রাধিকার প্রদান করাই হবে তার অবশ্য কর্তব্য। পথ-প্রদর্শনকারী সেই সাধারণ ব্যক্তির তখন একথা বলার অধিকার থাকবে না যে, আমি পথ না দেখালে মুফতী সাহেবের কাছে তুমি পৌছতে কিভাবে?[২]

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) আরো বলেন ঃ রিসালাত ও নবুওয়তের সত্যতা প্রমাণের পর 'আকলের কর্তব্য হলো রসূলের প্রতি আস্থা রেখে তাঁর নিরংকুশ আনুগত্য করে যাওয়া যেমন প্রত্যেক শাস্ত্রে শাস্ত্র-বিশেষজ্ঞের সিদ্ধান্তকেই শেষ কথা মেনে তার আনুগত্য করা হয় এবং নিঃশব্দে তাঁর যাবতীয় পরামর্শ অনুসরণ করা হয়। তদ্রূপ আহকাম ও গায়বী বিষয়ের ক্ষেত্রে রাসূলই হলেন অথরিটি এবং তাঁর কথাই হতে হবে শেষ কথা। ইমাম সাহেব লিখেছেন ঃ

> 'আকলের দিক-নির্দেশনায় কোন ব্যক্তি যখন জানতে পারে যে, অমুক ব্যক্তি আল্লাহ্র রসূল, অতঃপর কোন নিশ্চিত সূত্রে রাসূল -প্রদত্ত কোন সংবাদ সে অবগত হয় আর 'আকল তাতে সন্দেহ প্রকাশ করে তখন খোদ 'আকলেরই দাবী এই যে, বিরোধপূর্ণ বিষয়ের ভার এমন ব্যক্তির হাতে ছেড়ে দিতে হবে যিনি সে বিষয়ে 'আকলের চেয়ে অধিক জ্ঞানের অধিকারী। তাকে ভাবতে হবে যে, 'আকল এটা উপলব্ধি করতে অক্ষম এবং আল্লাহ্র যাত, সিফাত ও আখিরাতের 'ইলম 'আকলের তুলনায় রসূলেরই অধিক। রাসূল ও সাধারণের মাঝে যে পার্থক্য তা রোগী ও চিকিৎসকের পার্থক্যের চেয়ে অনেক অনেক গুণ বেশী। 'আকলের নির্দেশে মানুষ ইয়াহূদী চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয় এবং কষ্ট সত্ত্বেও তার ব্যবস্থাপত্র মেনে চলে শুধু এ জন্য যে,

---

১. ঐ খ. ১. পৃ. ৪৬।

১. ঐ খ. ১. পৃ. ৭০।

(ইয়াহূদী হলেও) চিকিৎসা শাস্ত্রে সে তার চেয়ে অভিজ্ঞ। সুতরাং আস্থার সাথে তার পরামর্শ ও ব্যবস্থাপত্র মেনে চললে আরোগ্য লাভ হবে। অথচ সে জানে যে, চিকিৎসকের ভুলও হতে পারে এবং ব্যবস্থাপত্র হুবহু মেনে চলার পরও অনেকের আরোগ্য লাভ হয় না। এমন কি ভুল চিকিৎসা অনেক সময় রোগীর মৃত্যুরও কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এত কিছু জেনেও মানুষ চিকিৎসকের পরামর্শ ও ব্যবস্থাপত্র মেনে চলে। এমন কি তার নিজস্ব ধারণা ও অভিজ্ঞতার বিপরীত হলেও চিকিৎসকের কথা সে অমান্য করে না। সুতরাং বোঝা উচিত, নবী-রসূলের মুকাবিলায় অন্য কোন সৃষ্টির (আকলের) কি মর্যাদা থাকতে পারে? সেই সাথে মনে রাখা উচিত যে, রাসূল চির সত্যবাদী এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সর্বদা সত্য বিষয়ই তাঁকে অবগত করানো হয়। সুতরাং রাসূলের কোন সংবাদ বাস্তবের বিপরীত হওয়া অসম্ভব। শুধু আকলের দোহাই দিয়ে রসূলের বাণী ও বক্তব্যের বিরোধিতাকারীদের মূর্খতা ও গোমরাহীর কোন সীমা-পরিসীমা নেই।[১]

রসূলের উপর নিঃশর্ত ঈমান আনা অপরিহার্য

দর্শন ও যুক্তিবাদের প্রভাব-বিকারগ্রস্তদের মানসিকতা এ পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছিল যে, শরীয়ত যুক্তি ও দর্শনের মূলনীতির অনুগত হলে সাগ্রহে তারা তা মেনে নিত, অন্যথায় তাদের মগজ তা গ্রহণ করতে কুণ্ঠা বোধ করত এবং তাদের মানস জগতে সীমাহীন দ্বন্দ্ব ও জটিলতা সৃষ্টি হত। এদের মধ্যে যাদের স্পর্ধা ও দুঃসাহস সীমা ছাড়িয়ে যেত তারা নির্দ্বিধায় বলে দিত যে, শরীয়তকে অবশ্যই বুদ্ধি ও যুক্তির অনুগত হতে হবে। অমুক বক্তব্য যেহেতু বুদ্ধি ও যুক্তির পরিপন্থী সেহেতু তা গ্রহণযোগ্য নয়। অতটা দুঃসাহস দেখানোর মুরোদ যাদের ছিল না শরীয়তকে তারা বুদ্ধি ও যুক্তির অনুগত করার জন্য অদ্ভুত ব্যাখ্যা প্রদান করত এবং দূরতম সম্ভাবনা খুঁড়ে বের করতেও তারা সংকোচ বোধ করত না। ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) বিভিন্ন প্রসঙ্গে অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা দেখিয়েছেন যে, রসূল (সা)-এর প্রতি নিঃশর্ত বিশ্বাস স্থাপন অপরিহার্য। এই নিঃশর্ত বিশ্বাসই হচ্ছে নবুওয়ত ও রিসালাতের দাবী। প্রকৃতপক্ষে এরই নাম হলো ঈমান। শর্তযুক্ত বিশ্বাসকে শরীয়তের পরিভাষায় ঈমান বলার কোন উপায় নেই। ইমাম সাহেবের ভাষায় ঃ

ففی الجملة لایکون الرجل مؤمنا حتی یؤمن بالرسول ایماناجازمالیس مشروطا بعدم معارض فمتی قال او من بخبره الاان یظهر له معارض بدفع خبره لم یکن مؤمنابه فهذاصل عظیم نجب معرفته -

---

১. بيان موافقة صريح المعقول খ. ১. পৃ. ৮৩।

মোটকথা, মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন নয় যতক্ষণ না সে বিপক্ষে যুক্তি থাকার শর্ত ছাড়াই নির্দ্বিধ ঈমান আনবে। কেউ যদি বলে যে, রসূল (সা) প্রদত্ত সংবাদসমূহে তখনই আমি ঈমান আনব যখন উক্ত সংবাদসমূহের বিপক্ষে কোন যুক্তি থাকবে না, তাহলে সে রসূল (সা)-এর প্রতি বিশ্বাসী নয়। এই শর্ত দীনের গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি যে সম্পর্কে অবহিত থাকা অত্যাবশ্যক।[১]

অন্যত্র তিনি লিখেছেন ঃ

ইসলাম দ্ব্যর্থহীনভাবে বলে দিয়েছে যে, রসূল (সা)-এর প্রতি মানুষকে অবশ্যই এমন নির্দ্বিধ ও ব্যাপক ঈমান আনতে হবে যাতে কোন শর্ত বা মাত্রা যোগ হবে না। সুতরাং রাসূল (সা)-এর প্রতিটি সংবাদেই বিশ্বাস করতে হবে এবং প্রতিটি নির্দেশই পালন করতে হবে। রসূল (সা)-এর বাণী ও বক্তব্য-বিরোধী সব কথাই বাতিল ও মিথ্যা বলে গণ্য করতে হবে। যে ব্যক্তি নিজের 'আকল ও বুদ্ধির সম্মতি সাপেক্ষে রসূল (সা)-এর কথা বিশ্বাস করে এবং 'আকল ও যুক্তির অনুমোদন না পেলে রসূল (সা)-এর কথা প্রত্যাখ্যান করে অর্থাৎ বুদ্ধি ও যুক্তিকেই রসূল প্রদত্ত 'সংবাদে'র মুকাবিলায় প্রাধান্য দেয়, আবার রসূল (সা)-এর প্রতি ঈমান পোষণের দাবীও করে তাহলে সেটা হবে চরম স্ববিরোধিতা, বুদ্ধিভ্রষ্টতা ও ধর্মহীনতা। তদ্রূপ যে ব্যক্তি বুদ্ধি ও যুক্তির মাধ্যমে আশ্বস্ত না হয়ে রসূল (সা)-এর কথা বিশ্বাস করবে না বলে তার কুফরীতে কোন দ্ব্যর্থতা নেই।

বুদ্ধি ও যুক্তির তাসের ঘর

মুক্তবুদ্ধির প্রবক্তাদের দাবী এই যে, 'যুক্তি ও (শরীয়তের) উক্তির মাঝে প্রায়শ বিরোধ ও বৈপরীত্য দেখা যায়। যে বিষয়গুলোকে 'আকীদা ও চিরন্তন সত্যরূপে নবী-রাসূলগণ পেশ করেছেন তার কোন কোনটি বুদ্ধি ও যুক্তি বিরোধী। এমনকি হাজার বছরের চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমে লব্ধ এবং দর্শনের ভিত্তিরূপে স্বীকৃত 'সত্য'সমূহের সাথেও সেগুলোর বিরোধ বাঁধে। কিন্তু ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, বুদ্ধিজাত যে সকল সিদ্ধান্তকে রাসূল প্রদত্ত সংবাদ তথা কুরআন-সুন্নাহর সাথে বিরোধপূর্ণ বলা হচ্ছে তলিয়ে দেখলে সেগুলোকে কল্পনার বিলাসীদের তৈরি বুদ্ধি তাসের ঘর ছাড়া আর কিছুই মনে হবে না। বুদ্ধিবৃত্তিক বিশ্লেষণ ও তদন্তের মাধ্যমে খুব নিকট থেকে দেখা হলে পরিষ্কার বোঝা যাবে যে, সেগুলো নিছক বাক্য বিস্তার মাত্র যার কোন বুদ্ধিবৃত্তিক বুনিয়াদ আদৌ নেই। ইমাম সাহেব লিখেছেন ঃ

---

১. ঐ খ. ১. পৃ. ১০১।

পরীক্ষা-নিরীক্ষা, যাচাই-বাছাই ও তদন্তের পর সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, যে সকল বুদ্ধিজাত সিদ্ধান্তকে যুক্তিবাদীরা বড়াই করে কুরআন-সুন্নাহ্‌র বিরোধী বলেন সেগুলোর পিছনে কোন সত্য নেই। এটা আসলে অবোধ শিশুকে কল্পিত দৈত্য-দানবের ভয় দেখানোর মতই হাস্যকর। বুদ্ধিজাত বিষয়গুলোর প্রতি গভীর ও পূর্ণ দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, সেগুলো বরং রাসূল প্রদত্ত সংবাদের সত্যতার দলীল-প্রমাণরূপে কাজ করছে এবং ঘোষণা করছে যে, রাসূল প্রদত্ত সংবাদের নির্গলিতার্থ সর্বাংশে সত্য। হাকীকত সম্পর্কে অজ্ঞতা কিংবা দর্শনের সর্বাত্মক প্রভাবের কারণেই শুধু কেউ কেউ এ সত্য অস্বীকার করে থাকে। যেমন উপাস্য দেবতারা কেউ ক্ষতি করতে পারে॥ এই ভয়ে কেউ কেউ প্রকম্পিত হয় কিংবা নিজের ঈমানী দুর্বলতার কারণে ইসলামের শত্রুদের হামলার ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে থাকে।[১]

অন্যত্র লিখেছেন ঃ

নিছক অজ্ঞতার কারণে দর্শনের জাঁকজমকপূর্ণ অথচ অন্তঃসারশূন্য পরিভাষা ও শব্দমালায় যারা প্রভাবিত হয়ে পড়ে তারা সেই দুর্বলচিত্ত যোদ্ধার মত যে কাপুরুষ শত্রুর জাঁকালো 'ইউনিফরম' দেখেই ভড়কে যায় এবং আসল অবস্থা তলিয়ে দেখার কথা ভুলে বসে। কিন্তু সাহসে বুক বেঁধে একটু ভেবে দেখলেই সে বুঝতে পারবে যে, শত্রুই বরং তার ভয়ে কাঁপছে। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

سنلقى فى قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا ـ

অতিশীঘ্র কাফিরদের অন্তরে আমরা ভীতি সঞ্চার করে দেব। কেননা এমন বস্তুকে তারা আল্লাহ্‌র শরীক ঠাওরিয়েছে যে সম্পর্কে আল্লাহ্ কোন ছাড়পত্র নাযিল করেন নি।[২] [আল-'ইমরান, ১৫১]

বুদ্ধিমানদের বোকামি

আল্লাহ্-তত্ত্ব সংক্রান্ত জটিল ও সূক্ষ্ম আলোচনাগুলো নিয়ে দার্শনিকদের বড় গর্ব। অথচ চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, পাগলের প্রলাপের সাথে সেগুলোর বিশেষ কোন তফাত নেই। সেগুলোকেই তাদের ভক্তরা রাসূলদের বাণী ও বক্তব্যের মুকাবিলায় গর্বের সাথে পেশ করে থাকে। ইমাম সাহেব লিখেছেন ঃ

প্রজ্ঞাবান মাত্রই দার্শনিকদের কথা চিন্তা করলে বুঝতে পারবেন অনুসন্ধিৎসা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের দাবীদার এবং বুদ্ধির ও যুক্তির দোহাই পেড়ে রসূলদের

১. ঐ, খ. ৪, পৃ. ১৫৩। ১. ঐ, খ. ৪, পৃ. ১৫৪।

বাণী ও বক্তব্য প্রত্যাখ্যানকারী এই সব লোকেরা দর্শনের পর্বত চূড়া এবং বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার শীর্ষ সোপান থেকে এমন সব কথা বলে যা পাগলের প্রলাপের মতই শোনায়। যে সত্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রমাণিত তাও তারা অস্বীকার করে এবং ভিত্তিহীন ও সুপ্রকাশিত ভ্রান্ত বিষয়কেও নিজেদের ছলনাপূর্ণ কথার মোড়কে গ্রহণযোগ্যরূপে পেশ করে থাকে।

সুস্থ বুদ্ধি ও ঐশী বাণীর মাঝে কোন বিরোধ নেই

'আকল ও বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে যথাযথ উপকার গ্রহণের প্রতি আল-কুরআন মানুষকে বরাবর উদ্বুদ্ধ করেছে। তাই মানুষের 'আকল ও বুদ্ধির প্রতি ইবনে তায়মিয়ারও পূর্ণ শ্রদ্ধা রয়েছে। তাঁর মতে, বিশুদ্ধ যুক্তি ও বিশুদ্ধ উক্তির মাঝে বিরোধ হতে পারে না। তিনি বলেন ঃ সুদীর্ঘ অধ্যয়ন ও গবেষণার জীবনে 'যুক্তি' ও 'উক্তির' মাঝে আমি কখনো বিরোধ ও বিপরীত কিছু দেখিনি। তবে শর্ত এই যে, যুক্তিটি হবে সুস্থ ও ব্যাধিমুক্ত এবং উক্তিটি হবে সুসংরক্ষিত ও সুপ্রমাণিত। এ প্রসঙ্গে بيان موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول নামে বিরাট কলেবরের আলাদা একটি বইও তিনি লিখেছেন এবং বিস্তারিত ও অকাট্য যুক্তি-প্রমাণের আলোকে দেখিয়েছেন যে, যুক্তি ও (শরীয়তের) উক্তির মাঝে পূর্ণ সংগতি বিদ্যমান। কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত সত্যকে সুস্থ বুদ্ধি অবশ্যই স্বীকার করে নেয়। শরীয়তের যাবতীয় উক্তিকে 'আকল সর্বদা অকুণ্ঠ স্বীকৃতি ও সমর্থনই দিয়ে এসেছে। প্রজ্ঞা ও সূক্ষ্ম দৃষ্টির সাথে পর্যালোচনা করলে 'আকল ও বুদ্ধির এই ইতিবাচক ভূমিকাই আমাদের চোখে পড়বে। ইমাম সাহেব লিখেছেন ঃ

> বিশুদ্ধ, সুস্পষ্ট ও সুপ্রমাণিত বুদ্ধিজাত প্রমাণসমূহ এবং যাবতীয় স্বভাবজাত জ্ঞান রাসূল প্রদত্ত সংবাদের অনুকূল, প্রতিকূল নয়। বিশুদ্ধ বুদ্ধিজাত প্রমাণসমূহ সবই (শরীয়তের) যুক্তি ও বর্ণনার অনুরূপ, বিন্দুমাত্র প্রতিরূপ নয়। আল্লাহ্র ফযলে বিভিন্ন ফেরকার মতবাদ ও চিন্তাধারা গভীর মনোযোগসহ আমি অধ্যয়ন করেছি এবং এ ধারণার সত্যতাই উপলব্ধি করেছি।[১]

অন্যত্র তিনি লিখেছেন ঃ

> স্পষ্ট যুক্তি কখনও শরঈ বিশুদ্ধ উক্তির বিরোধী হতে পারে না। বিরোধপূর্ণ বিষয়গুলোর ক্ষেত্রেও উপরিউক্ত সত্যতা আমি যাচাই করে দেখেছি। আমি নিশ্চিত যে, শরীয়তের বিশুদ্ধ ও সুস্পষ্ট উক্তির বিপক্ষে যা কিছু বলা হয় তা ভ্রান্ত ধারণার সমাহার ছাড়া কিছুই নয়। 'আকল ও বুদ্ধিই এগুলোর ভ্রান্তি

১. ঐ, প্রথম খণ্ড পৃ. ৮৪।

প্রমাণ করে; বরং বুদ্ধি ও যুক্তির সুষ্ঠু প্রয়োগ উপরিউক্ত ধারণাসমষ্টির বিপরীত এবং শরীয়তের সম্পূর্ণ অনুকূল বিষয়ই সুপ্রমাণ করে। আমি তাওহীদ ও সিফাত এবং তকদীর ও নবুওয়ত্‌সহ শরীয়তের বড় বড় মৌল বিশ্বাসকে আলোচ্য দৃষ্টিকোণ থেকে যাচাই করে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, যুক্তির আলোকে যা প্রমাণিত সত্য শরীয়তের কোন উক্তি বর্ণনাই তার বিরোধী হতে পারে না। তবে গভীর অনুসন্ধানের পর দেখা গেছে যে, সুস্পষ্ট যুক্তির পরিপন্থীরূপে চিহ্নিত উক্তি ও বর্ণনাগুলো হয় জাল হাদীস কিংবা দুর্বলসূত্রে বর্নিত 'যঈফ হাদীস।' সুতরাং প্রমাণরূপে সেগুলো গ্রহণযোগ্য নয়। আমরা নিশ্চিত জানি যে, 'আকল ও যুক্তির বিচারে 'অসম্ভব' কোন বিষয়ের সংবাদ রাসূল দিতে পারেন না। তবে এমন বিষয়ের সংবাদ দিতে পারেন যে সম্পর্কে দিশেহারা 'আকল কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণে অক্ষম। মোটকথা, রসূল এমন কোন সংবাদ দেন না যা 'আকল অস্বীকার করে, তবে এমন সংবাদ প্রদান করেন যার হাকীকত অনুধাবন করতে 'আকল সক্ষম নয়।[১]

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথে দাবী করেছেন এবং তাঁর দাবী যথেষ্ট গুরুত্ব লাভের যোগ্য যে, কোন হাদীস ও শরঈ উক্তিই 'আকল-বুদ্ধির বিরোধী হতে পারে না। এমন কিছু চোখে পড়লে দেখা যাবে শাস্ত্রকারগণ আগে থেকেই সেটাকে জাল কিংবা দুর্বলরূপে চিহ্নিত করে রেখেছেন।

সর্বোত্তম বুদ্ধিজাত প্রমাণ আল-কুরআন

কালামবিদ ও দার্শনিকদের এ দাবী ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) মানতে রাজী নন যে, নিছক বর্ণনা ও বিবরণই হলো আসমানী কিতাব আল-কুরআনের বুনিয়াদ। বিভিন্ন প্রসঙ্গে তিনি প্রমাণ করেছেন যে, কুরআনুল করীমে সর্বোত্তম বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি ও প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। সে সব এমনই অকাট্য ও সুস্পষ্ট যে, দর্শন ও কালামবিদদের 'মাকড়সার জাল'তুল্য যুক্তি-প্রমাণ তার ধারে কাছেও ঘেঁষতে পারে না। তিনি লিখেছেন ঃ

> কুরআনুল করীমে আল্লাহ্ পাক এমন অনুপম বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণ পেশ করেছেন যার গভীরে প্রবেশ করা দর্শন ও কালামবিদদের কর্ম নয়। এরা সেসব দলীল ও সিদ্ধান্ত নিয়ে নাড়া-চাড়া করে আল-কুরআন সর্বোত্তম পন্থায় যেগুলোর সার -নির্যাস পেশ করে দিয়েছে।[২]

অন্যত্র তিনি লিখেছেন ঃ

১. ঐ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৮৩। ২.

স্রষ্টার প্রমাণ এবং তাঁর গুণ ও কর্মের পরিচয় প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম পৃথিবীর মানুষের কাছে যা কিছু পেশ করেছেন তা স্পষ্ট ও যুক্তিসম্মত। বুদ্ধিজীবিদের 'আকল-বুদ্ধির এবং চিন্তা-কল্পনার সর্বোচ্চ সীমারও বহু উর্ধ্বে তার অবস্থান। যে সকল যুক্তি-প্রমাণ নিয়ে পূর্বাপর দার্শনিক ও কালামবিদগণ গর্ব করে থাকেন আল-কুরআনের বিভিন্ন স্থানে প্রাসঙ্গিকভাবে সেগুলো এসে গেছে। কিন্তু দর্শনসেবিগণ সত্য-মিথ্যার মিশ্রণ ঘটাতে অভ্যস্ত বিধায় সোজা ভাষায় সেগুলো পরিবেশন করেন না।

রসূল (সা)-এর শিক্ষায় কোন গোঁজামিল নেই

দর্শন ও কালামপন্থীদের অনেকের মতে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম যাত ও সিফাতের ক্ষেত্রে বিস্তারিত ব্যাখ্যা পরিহার করে সংক্ষিপ্ত ও অস্পষ্ট বর্ণনার আশ্রয় নিয়েছেন। তাই আল-কুরআনের বিরাট অংশই ব্যাখ্যা-সাপেক্ষ। আল্লাহ্‌র বিশেষ তাওফীকে পরবর্তী যুগের মুতাকাল্লিমগণ 'আকীদা ও মৌল বিশ্বাসগুলোকে বিস্তারিত, প্রামাণ্য ও পূর্ণাঙ্গরূপে উম্মাহর সামনে তুলে ধরেছেন। এ ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তির জওয়াবে ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতি নির্দেশ ছিল সুস্পষ্টরূপে (শরীয়ত) পৌছে দেওয়ার। সে অনুসারে শরীয়তের প্রতিটি ব্যাখ্যাসাপেক্ষ বিষয়েরই তিনি বিস্তারিত ও পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। 'আকাইদ ও মৌল বিশ্বাস এবং যাত ও সিফাত হলো দীনের বুনিয়াদ। এগুলো ছাড়া মানুষের পক্ষে আল্লাহ্‌র মা'রিফত এবং পরকালীন সৌভাগ্য ও মুক্তিলাভ সম্ভব নয়। সুতরাং রাসূলের পক্ষে এ উপলব্ধির সাথে যে কিতাবের পঠন-পাঠনের আহ্বান এসেছে বারবার তাতে এ ধরনের সংক্ষিপ্ততা ও দুর্বোধ্যতার অবকাশই বা কোথায়?

ইমাম সাহেব লিখেছেন ঃ

> দা'ওয়াত ও তাবলীগের দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে গিয়ে আল্লাহ্‌র রাসূল সুস্পষ্ট ও পূর্ণাঙ্গরূপেই আল্লাহ্‌র কালাম পৌছিয়েছেন এবং তার ভাব ও উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌র রসূল অন্য শব্দ দ্বারা অবশ্যই নির্ণয় করে দিয়েছেন। এটা অসম্ভব যে, বাহ্য অর্থ গ্রহণযোগ্য নয় এমন শব্দ প্রয়োগ করা সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র রসূল (সা) সে শব্দের উদ্দিষ্ট অর্থ বয়ান করে দেন নি। এ ধারণাও কোনক্রমেই যুক্তিগ্রাহ্য নয় যে, ব্যাখ্যা ও দিক-নির্দেশনা পেশ না করেই মানুষকে তিনি কালামের ভাব ও উদ্দেশ্য বোঝার নির্দেশ দেবেন শুধু এই যুক্তিতে যে, মানুষ নিজের বুদ্ধিতেই তা বুঝে নেবে। বস্তুত রসূল (সা)-এর বিরুদ্ধে এ এক গুরুতর অপবাদ যিনি আল্লাহ্‌র কালাম মানুষের কাছে হুবহু পৌছে দিতে সক্ষম হয়েছেন।[১]

১. ঐ. খ. ৩. পৃ. ১০।

অন্যত্র তিনি লিখেছেন ঃ

> আল্লাহ্ তাঁর রসূলকে সুস্পষ্ট তাবলীগের নির্দেশ দিয়েছেন। আর এটা সুনিশ্চিত যে, আল্লাহ্‌র সে নির্দেশ তিনি হুবহু পালন করেছেন। কেননা রসূল (সা)-এর চেয়ে আল্লাহ্‌র অধিক অনুগত আর কে হতে পারে? সুতরাং রসূল (স)-র প্রতি এই সুস্পষ্ট তাবলীগের পর তাঁর বাণী ও শিক্ষায় অস্পষ্টতা ও গোঁজামিল থাকার কোন অবকাশ নেই। তবে আয়াতগুলোকে আল-কুরআন متشابهات (রহস্যপূর্ণ) আখ্যা দিয়ে ঘোষণা দিয়েছে যে, এগুলোর تاويل আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জানে না সেখানে তা'বীলের অর্থ তাফসীর বা ব্যাখ্যা নয়; বরং সেগুলোর হাকীকত, বাস্তব রূপ ও পরিণাম।[১]

ইবনে তায়মিয়ার দাওয়াত ও তাঁর কৃতিত্বপূর্ণ অবদান

মোটকথা, ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র আপোষহীন নির্দ্বিধ ঘোষণা এই যে, ওহী ও নবূওয়ত তথা কুরআন ও সুন্নাহকেই 'আকাইদ ও মৌল বিশ্বাসের উৎসরূপে গ্রহণ করতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহই হবে একমাত্র মাপকাঠি। গোটা জীবনে মানুষকে তিনি এ দা'ওয়াতই দিয়েছেন। এ সম্পর্কিত আলোচনা ও যুক্তি-প্রমাণ ছড়িয়ে আছে তাঁর সমগ্র রচনাবলীতে। এভাবেই ইসলামী চিন্তাধারার মাঝে তিনি নতুন গতি সঞ্চার করেছেন, প্রাণ ও সজীবতা এনেছেন যা গ্রীক দর্শন, কালামশাস্ত্র এবং অনারবীয় ভাবধারার মন্দ প্রভাবে প্রায় নির্জীব হয়ে পড়েছিল।

---

১. ঐ, খ. ১, পৃ. ১৬৭। ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) তাঁর বিভিন্ন রচনায় প্রমাণ করেছেন যে, তিনটি অর্থে تاويل শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, কুরআনের পরিভাষায় এর অর্থ হলো হাকীকত ও পরিণাম। পূর্বসূরীদের পরিভাষায় এর অর্থ হলো তাফসীর। পক্ষান্তরে উত্তরসূরী কালামবিদদের পরিভাশায় তা'বীল মানে কোন কারণে কোন শব্দের সেই অর্থ গ্রহণ করা যা বাহ্যত সম্ভব নয়।

একাদশ অধ্যায়

তাকলীদ-পূর্ব যুগে কুরআন, সুন্নাহ্ ও ফিক্‌হ্শাস্ত্র

ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, হিজরী চতুর্থ শতকের পূর্বে এক ইমাম কিংবা এক মাযহাবের তাকলীদের প্রচলন ছিলনা। নির্দিষ্ট আলিম ও বিশেষ মাযহাবের তাকলীদ ছাড়াই মানুষ আমল করত এবং এটাকেই তারা শরীয়তের ওপর আমল এবং রসূল (স)-এর প্রত্যক্ষ অনুসরণ মনে করত। প্রয়োজনের মুহূর্তে অবশ্য যে কোন আলিম থেকে 'মাসআলা' জিজ্ঞাসা করে নিত। চতুর্থ শতকেও মাযহাবভিত্তিক তাকলীদ এবং মাযহাব ভিত্তিক ফিকহ্ চর্চা ও ফতওয়া প্রদানের সাধারণ রেওয়াজ ছিল না। শায়খুল ইসলাম হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবী (র) লিখেছেন ঃ

> চতুর্থ শতকেও উম্মাহর দুটি শ্রেণীর কর্মধারা ভিন্ন ছিল। মুসলমান এবং মুজতাহিদের মাঝে বিরোধ নেই॥ এমন সর্বসম্মত মাসআলাগুলোর ক্ষেত্রে সাধারণ শ্রেণীর মানুষ 'শরীয়ত প্রবর্তক' রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামেরই তাকলীদ করত। ওযু, গোসল, সালাত, যাকাত ইত্যাদি তারা পিতামাতা কিংবা শহরের শিক্ষক মুরুব্বীদের নিকট থেকে জেনে নিয়ে সে মুতাবিক কাজ করে যেত। কখনো কোন অস্বাভাবিক অবস্থা সৃষ্টি হলে নিকটস্থ মুফতীকেই সে সম্পর্কে ফতওয়া জিজ্ঞাসা করে নিত। এক্ষেত্রে মাযহাবের কোন বন্ধন ছিল না। বিশিষ্টদের মধ্যে যাঁরা হাদীস চর্চা করতেন তাঁদের জন্য তো বিশুদ্ধ হাদীস ও সাহাবায়ে কিরামের বাণী বিদ্যমান থাকা অবস্থায় অন্য কিছুর প্রয়োজনই ছিল না। যে মশহুর ও বিশুদ্ধ হাদীস যার ওপর কোন ফকীহ আমল করেছেন কিংবা আমল না করার যুক্তিসংগত কোন কারণ নেই অথবা সাহাবা ও তাবিঈদের বাণী ও বক্তব্য যা পরস্পরের জন্য সম্পূরক হত তাদের জন্য যথেষ্ট ছিল। তবে রিওয়ায়েতসমূহের বাহ্য

বৈপরীত্য কিংবা অগ্রাধিকার নির্ধারণের অক্ষমতা কিংবা অন্য কোন কারণে বিশেষ কোন মাসআলায় মন আশ্বস্ত না হলে তারা পূর্ববর্তী ফকীহদের সিদ্ধান্ত খুঁজে দেখতেন। সে বিষয়ে একাধিক মত থাকলে নির্ভরযোগ্যতম মতই গ্রহণ করতেন তা সেটি আহলে মদীনা বা আহলে কুফা যে কোন একটিই হোক। বিশিষ্টদের মধ্যে যাদের তাখরীজ তথা বিশ্লেষণ ও আহরণ যোগ্যতা ছিল তারা কোন মাসআলায় পূর্ববর্তী মুজতাহিদের সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত না পেলে তাখরীজ ও ইজতিহাদ ফি'ল-মাযহাবের মাযহাব স্বীকৃত মূলনীতির অনুগত থেকে ইজতিহাদ প্রয়োগের পন্থা গ্রহণ করতেন। এর ওপর ভিত্তি করে তাকে উক্ত মাযহাবের অনুসারী ধরে হানাফী বা শাফি'ঈ বলা হতো। এমন কি হাদীস সেবীদের মধ্যে যার যে মাযহাবের প্রতি ঝোঁক ছিল এবং অধিকাংশ মাসআলায় যিনি যে মাযহাবের সাথে ঐকমত্য পোষণ করতেন তার পরিচয় সে মাযহাবের সাথেই সম্পৃক্ত হতো। নাসাঈ ও বায়হাকীকে শাফি'ঈ বলা হয় এ কারণেই। তখন ফতওয়া ও বিচার বিভাগীয় পদে ইজতিহাদী যোগ্যতার অধিকারী ফকীহদেরই নিয়োগ করা হত।[১]

তাকলীদের সূচনা ও কার্যকারণ

চতুর্থ শতকের আলিমদের ক্রমবর্ধমান মতানৈক্য, বিতর্কপ্রিয়তা, ধর্মীয় ও নৈতিক অবক্ষয়, 'ইলম চর্চায় ভাটা এবং মনোবল ও অধ্যবসায়ের ঘাটতি ইত্যাদি বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো যে, দীন ও ঈমানের হিফাজতের জন্য পূর্ববর্তী ইমাম ও মুজতাহিদের বিন্যস্ত ও গ্রন্থবদ্ধ মাযহাবগুলোরই তাকলীদ করা উচিত এবং সমসাময়িক আলিমদের পরিবর্তে পূর্ববর্তী ইমামদের ফতওয়া অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয়। তবে তখনো পরবর্তীকালের মতো একক তাকলীদের বাধ্যবাধকতা আরোপিত হয়নি, প্রয়োজনের তাকীদে পরবর্তীতে তা আরোপিত হয়েছিল। অবশ্য এ বাধ্যবাধকতাও ছিলো প্রশাসনিক, সাংবিধানিক নয়। অরাজকতা, স্বেচ্ছাচারিতা ও প্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে উম্মাহকে বাঁচানোর জন্য মাযহাবের একক তাকলীদ প্রবর্তন করা ছাড়া কোন উপায় ছিল না তখন। বস্তুত এটা ছিল ঘটনাপ্রবাহের স্বাভাবিক ও অনিবার্য পরিণতি। বিশেষত তাতারী হামলার পর গোটা ইসলামী জাহানে জ্ঞান ও চিন্তার দৈন্য ও অবক্ষয়, মুজতাহিদ ব্যক্তিত্বের অভাব এবং বিভিন্ন ফিরকা ও ফেতনার অপতৎপরতা এমন প্রচণ্ড রূপ ধারণ করেছিল যে, কুরআন ও সুন্নাহ্ ভিত্তিক যে মাযহাবগুলো গবেষণা ও পর্যালোচনার সকল ধাপ এবং বিন্যাস ও গ্রন্থনার সকল পর্যায় অতিক্রম করে এসেছে সেগুলোর ওপর আমল করাই ইসলামী উম্মাহর বরেণ্য ও নেতৃস্থানীয়

১. হুজ্জাতুল্লাহি'ল বালিগা ১ম খণ্ড, পৃ. ১২২।

আলিমগণ নিরাপদ মনে করলেন। আর এ শর্ত ও বৈশিষ্ট্য চারটি মাযহাবেই শুধু পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান ছিল। তাই স্বাভাবিক কারণেই চার মাযহাবের গণ্ডিতে তাকলীদ সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।

তাকলীদের প্রকৃতি

তবে আলোচ্য তাকলীদের প্রকৃতি ছিল এই যে, কুরআন ও সুন্নাহর যথার্থ আমল এবং শরীয়ত প্রবর্তক রসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের একক আনুগত্যই হতো মুকাল্লিদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। তার ও রাসূলের মাঝে ইমাম (মুজতাহিদ) শিক্ষক ও উস্তাদের ন্যায় একটা প্রয়োজনীয় মাধ্যম মাত্র। মোটকথা, ইমাম ও মুজতাহিদের ভূমিকা শরীয়তের ব্যাখ্যাদানকারী মুখপাত্রের, আনুগত্যের অধিকারী বা আইন প্রবর্তকের নয়। শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলবী (র)-র ভাষায় ঃ

لايدين الايقول النبى صلى الله عليه وسلم ولايعتقد حلالاالاماحله الله ورسوله ولاحراما الاماحرمه الله ورسوله لكن لمالم يكن له علم بماقاله النبى صلى الله عليه وسلم ولابطريق الجمع بين المختلفات من كلامه ولابطريق الا ستنباط من كلامه اتبع عالما راشدا على انه مصيب فيما يقول ويفتى ظاهرا متبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فان خالف مايظنة اقلع من ساعته من غيرجدال ولااصرار-

মুকাল্লিদ শুধু সুন্নতে রাসূলেরই অনুসারী। আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সা) যা হালাল করেছেন তাকেই সে হালাল মনে করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সা) যা হারাম করেছেন তাকেই সে হারাম মনে করে। তবে যেহেতু রসূল (সা)-এর বাণী ও বক্তব্যের প্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং 'বাহ্য বিরোধপূণ'।

হাদীসগুলোর মাঝে সমন্বয় সাধন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্যতা তার নেই, তাই একজন প্রজ্ঞাবান আলিমের তাকলীদ সে গ্রহণ করে এই ভিত্তিতে যে দৃশ্যত সুন্নতে রসূলের ভিত্তিকে সঠিক রেখেই তিনি ফতওয়া দিচ্ছেন। সুতরাং কখনো এ ধারণা ভুল প্রমাণিত হওয়া মাত্র বিনাবাক্যে সে তার মাযহাব বর্জন করে হাদীস অনুযায়ী আমল শুরু করবে।[১]

---

১. হুজ্জাতুল্লাহি'ল-বালিগাহ, খ. ১, পৃ. ১২৪।

বলা বাহুল্য যে, এ ধরনের তাকলীদ (যা কুরআন-সুন্নাহর নির্ভুল আনুগত্যেরই বাস্তবরূপ) সম্পর্কে কারো কোন আপত্তি থাকতে পারে না। কেননা সাধারণ উম্মী শ্রেণীকে ইজতিহাদের মাধ্যমে স্ব-উদ্যোগে কুরআন-সুন্নাহ মুতাবিক আমল করতে বলার অর্থ অসাধ্য সাধনে তাকে বাধ্য করা এবং গায়ের জোরে সহজ সত্যকে অস্বীকার করা। এ ধরনের তাকলীদের (এক বা একাধিক ফকীহ-মুজতাহিদের শরণাপন্ন হওয়ার) রেওয়াজ মুসলিম জাহানে সব যুগেই বিদ্যমান ছিল এবং এটা খণ্ডিত আকারে হোক কিংবা সার্বক্ষণিক ভিত্তিতে কোনক্রমেই আপত্তিকর হতে পারে না। হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলবী (র) বলেন ঃ

> ফতওয়া প্রদান ও গ্রহণের এ প্রক্রিয়া রিসালতের পুণ্য যুগ থেকেই চলে আসছে। সুতরাং সর্বক্ষণ একই ব্যক্তির ফতওয়া গ্রহণ কিংবা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জন থেকে গ্রহণ করায় কিছুই যায় আসে না। তবে শর্ত এই যে, অন্তরে উপরিউক্ত বিশ্বাস দৃঢ়মূল থাকতে হবে (অর্থাৎ রসূলের আনুগত্যই হবে মুখ্য উদ্দেশ্য)। এতে আপত্তির কি আছে? ফকীহ ও মুজতাহিদ সম্পর্কে আমাদের ঈমান তো এ নয় যে, 'ইলম ও ফিক্‌হ-এর ওহী আল্লাহ্ তাকে দান করেছেন এবং তার কোন ভুল হতে পারে না। সুতরাং (রাসূলের মতই) তাঁর আনুগত্য আমাদের ওপর ফরয। কোন মুজতাহিদের তাকলীদ আমরা এ দৃষ্টিকোণ থেকেই করে থাকি যে, কুরআন-সুন্নাহর তিনি বিশেষজ্ঞ। তাঁর সিদ্ধান্ত হয় কুরআন-সুন্নাহর কোন প্রত্যক্ষ নির্দেশ থেকে গৃহীত কিংবা কুরআন-সুন্নাহ থেকে আহরিত কিংবা বিভিন্ন সূত্রে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, অমুক অবস্থায় অমুক হুকুম অমুক علت (শরীয়ত স্বীকৃত কারণ)-এর সাথে সম্পৃক্ত। অতঃপর পূর্ণ আত্মপ্রত্যয়ের সাথে غير منصوص (প্রত্যক্ষ নির্দেশবিহীন) বিষয়কে তিনি منصوص (প্রত্যক্ষ নির্দেশযুক্ত বিষয়)-এর উপর কিয়াস ও অনুমান করেছেন। অর্থাৎ মুজতাহিদ যেন বলছেন যে, আমার মনে হয় আল্লাহ্‌র রসূল (সা) প্রকারান্তরে বলেছেন, এই 'ইল্লত ও কারণ যে সকল ক্ষেত্রে পাওয়া যাবে সেই সকল ক্ষেত্রে এই হুকুম প্রযোজ্য হবে। সুতরাং আলোচ্যমালায় মুজতাহিদের কিয়াস উপরিউক্ত মূল ধারারই অন্তর্ভুক্ত এবং তার যাবতীয় সিদ্ধান্ত মূলত সুন্নতে রসূলের সাথেই সম্পৃক্ত। আসলে শরীয়তের কিছু আহকাম পরোক্ষ ও দ্ব্যর্থবোধক দলীল-নির্ভর হওয়ায় তাকলীদের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এমন না হয়ে সকল আহকাম যদি প্রত্যক্ষ দ্ব্যর্থহীন দলীল-নির্ভর হত তাহলে কোন ঈমানদার কখনো কোন মুজতাহিদের তাকলীদ করত না। কেননা মা'সূম ও নিষ্পাপ রসূল (স)-এর আনুগত্যই শুধু আল্লাহ্ আমাদের ওপর

ফরয করেছেন। এখন যদি মুজতাহিদের মাযহাব পরিপন্থী কোন বিশুদ্ধ হাদীস আমাদের সামনে এসে পড়ে আর আমরা তা পাশ কেটে কিয়াসের অনুগমন করি তাহলে আমাদের মত জালিম আর কে হবে এবং রোজ কিয়ামতে আল্লাহ্কে আমরা কি জওয়াব দেব।

পরবর্তী যুগের বিচ্যুতি ও সীমালংঘন

কিন্তু মুসলিম উম্মাহর সাধারণ স্তরে মূর্খতা ও অজ্ঞতা ধীরে ধীরে এমন শিকড় গেড়ে বসল যে, কোন কোন স্থানে ইমাম ও মুজতাহিদকে মাধ্যম ও যোগসূত্রের পরিবর্তে আইন প্রণেতা ও আনুগত্যের হকদার মনে করা হতে লাগল। মাযহাবী গোড়ামী এমন চরমে গেল যে, কোন কারণেই মাযহাবী সিদ্ধান্তে কমা, সেমিকোলন পর্যন্ত কেউ বাদ দিতে রাযী হলো না। সাধারণ শ্রেণীকে অবশ্য এজন্য দোষ দেওয়া চলে না। কেননা কুরআন ও সুন্নাহর 'অনুসরণ' মনে করেই তারা মাযহাব গ্রহণ করেছে। তদুপরি অগ্রাধিকারের কারণ নির্ণয়ের মাধ্যমে মাযহাব বর্জন কিংবা পরিবর্তন তাদের পক্ষে যেমন দুরূহ, তেমনি ঝুঁকিপূর্ণ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বহু আলিমের অবস্থাও এই ছিল যে, হাদীসের সাথে আপন ইমামের সিদ্ধান্তের অসঙ্গতি এবং অন্য ইমামের সিদ্ধান্তের সঙ্গতির কথা নিশ্চিতভাবে জানা সত্ত্বেও আপন মাযহাব নিয়েই তাঁরা গোঁ ধরে থাকতেন। এমনকি ইমামের সিদ্ধান্তের বিপক্ষে বিশুদ্ধ ও সুস্পষ্ট হাদীস পেশ করা হলেও হাদীসের প্রতি তাদের অন্তরে স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া জাগত না। এ ধরনের অর্বাচীনদের সম্পর্কে সপ্তম শতাব্দীর সুপ্রসিদ্ধ শাফি'ঈ আলিম শায়খুল ইসলাম 'ইযযুদ্দীন ইবন আবদুস সালাম লিখেছেন ঃ

ومن العجب العجيب ان الفقهاء المقلدين يقف احدهم على ضعف ماخذ امامه بحيث لا يجد لضعفه مدفعا وهومع ذلك يقلده فيه ويترك من شهد الكتاب والسنه والاقيسة الصحيحة لمذهبهم جمودا على تقليد امامه بل يتحيل لدفع ظاهر الكتاب والسنة يتأولها بالتا ويلات البغيدة الباطلة نضالاعن مقلده ...

বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, স্বীয় ইমামের দলীলগত দুর্বলতার যুক্তিসঙ্গত কোন কৈফিয়ত না থাকা সত্ত্বেও অনেক মুকাল্লিদ ফকীহ্ শুধু অন্ধ গোঁড়ামী বশে ইমামের তাকলীদে অবিচল থাকেন এবং অন্য মুজতাহিদের কুরআন-সুন্নাহ ও বিশুদ্ধ কিয়াসের সমর্থনপুষ্ট সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করে থাকেন। এমনকি ইমামের পক্ষ সমর্থনের জন্য কুরআন-সুন্নাহ্র স্বাভাবিক অর্থ এড়িয়ে উদ্ভট ব্যাখ্যার আশ্রয় নিতেও তাঁরা কুণ্ঠা বোধ করেন না।[১]

১. হুজ্জাতুল্লাহি'ল-বালিগাহ, পৃ. ১২৪:

তদ্রূপ সাধারণ শ্রেণীতেও একটা দল এমন ছিল যারা স্বয়ং ইমামকে ভুলের ঊর্ধ্বে মনে করত। তাদের অন্তরের বদ্ধমূল বিশ্বাস ছিল এই যে, কোন অবস্থাতেই ইমামের তাকলীদ ছাড়া যাবে না। এদের সম্পর্কেই শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ দেহলভী (র.) লিখেছেন ঃ

وفى من يكون عاميا ويقلد رجلامن الفقهاء بعينه يرى انه يمتنع من مثله الخطأ وان ما قاله هوالصواب البتة واضمرفى قلبه ان لا يترك تقليده وان ظهر الدليل على خلافه وذالك ماروواه الترمذى عن عدى بن حاتم انه قال سمعته يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقراء : اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله قال انهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا اذا احلوالهم شيئا استحلوه واذا حرموا عليهم شيئاحرموه ـ

(তাকলীদের অবৈধতা সম্পর্কে ইবনে হাযমের ফতওয়া) সেই সাধারণ ব্যক্তির ব্যাপারে, যে এই বিশ্বাস নিয়ে নির্দিষ্ট কোন মুজতাহিদের তাকলীদ করে যে, নিঃসন্দেহে তিনি ভুলের ঊর্ধ্বে এবং তাঁর মত অভ্রান্ত। সুতরাং দলীল-প্রমাণ তাঁর বিপক্ষে গেলেও তাকলীদ বর্জন করা চলবে না। এ ধরনের তাকলীদের নিন্দাই করা হয়েছে। তিরমিযী শরীফে 'আদী ইবন হাতিম হতে বর্ণিত ঃ তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন ঃ

اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله ـ

নিজেদের ধর্মনেতা ও পুরোহিতদেরকে তারা (য়াহূদী-নাসারারা) আল্লাহ্র পরিবর্তে রবের মর্যাদা দিয়েছিল।

অতঃপর তিনি ইরশাদ করলেন ঃ তারা তাদের পূজা করতনা, তবে ধর্মনেতারা যে বস্তুকে হালাল বা হারাম ঘোষণা করত সেটাকেই তারা হালাল বা হারাম মনে করত।[১]

ইমাম ইবনে তায়মিয়ার দৃষ্টিতে তাকলীদ ও ইজতিহাদ

সব যুগের প্রজ্ঞাবান ও শীর্ষস্থানীয় আলিমগণ এই ধরনের লাগামহীন তাকলীদের তীব্র সমালোচনা করেছেন। কেননা এটা রসূল (সা)-এর প্রাপ্য আনুগত্যের সমতুল্য। তাকলীদের বিরুদ্ধে ইবনে হায্ম ও অন্যান্য চরমপন্থী আলিমের ঢালাও ফতওয়া তাঁরা সমর্থন করেন না সত্য, তবে শর্তহীন তাকলীদের

১. হুজ্জাতুল্লাহি'ল-বালিগা, পৃ. ১২৫।

বৈধতাও স্বীকার করেন না যা রসূল (সা)-এর প্রাপ্য আনুগত্যের সমতুলনা দাবী করে। বস্তুত তাকলীদ সম্পর্কে এটাই হচ্ছে ভারসাম্যপূর্ণ ও যুক্তি-নির্ভর মত। পূর্বসূরীদের মধ্যে শায়খুল ইসলাম শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (র) হলেন এই মতের প্রবক্তা। ইমাম ইবনে তায়মিয়া অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে, সাধারণ শ্রেণী এবং অমুজতাহিদ আলিমদের জন্য মুজতাহিদের তাকলীদ ছাড়া কোন উপায় নেই। বস্তুত মাযহাব অনুসরণ তাদের জন্য একটি অনস্বীকার্য বাস্তব প্রয়োজন। তবে ইমাম ও মুজতাহিদের ভূমিকা হবে নিছক মাধ্যম ও শিক্ষকের। ইমাম সাহেব লিখেছেন ঃ

হালাল হারাম ও ফরয ওয়াজিবের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা)-এর নিরংকুশ আনুগত্য জ্বিন ও ইনসানের জন্য অপরিহার্য এবং প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সর্বাবস্থায় প্রত্যেকের ওপর তা ফরয। কিন্তু কিছু আহকাম এমন রয়েছে যা অনেকেই জানে না। সেগুলো জানার জন্য তারা বিদ্বানদের শরণাপন্ন হয় যাঁরা রসূল (সা)-এর শিক্ষা এবং তাঁর বাণী ও বক্তব্যের ভাব ও অন্তর্নিহিত মর্ম সম্পর্কে অধিক অবগত। সুতরাং যে সকল ইমাম ও মুজতাহিদের তাকলীদ করা হয় তাদের ভূমিকা নিছক মাধ্যম ও শিক্ষকের, পথ ও পথ-প্রদর্শকের। মানুষকে তাঁরা রসূল (সা) পর্যন্ত পৌছে দেন এবং নিজেদের ইজতিহাদ ও সামর্থ্য অনুযায়ী রসূল (সা)-এর বাণী ও বক্তব্যের মর্ম মানুষকে বুঝিয়ে দেন। একজন আলিমকে আল্লাহ্ এমন 'ইলম ও প্রজ্ঞা দান করেন যা হয়ত অন্য আলিমকে দান করেন না। আবার শেষোক্ত আলিমের কাছে হয়ত কোন মাসআলা সম্পর্কে এমন 'ইলম থাকে যা প্রথম জনের কাছে থাকে না। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

وداؤد وسليمن اذ يحكمان فى الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم - وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمن - وكلا اتينا حكما وعلما -(سورة الانبيا - ٨٩)

দাউদ ও সুলায়মানের কথা স্মরণ কর, উভয়ে লোকদের বকরীপাল কর্তৃক নষ্ট করা ফসল সম্পর্কে বিচার করছিলেন। তাদের বিচার-কর্ম আমি প্রত্যক্ষ করছিলাম; অনন্তর সুলায়মানকে আমি সঠিক ফয়সালা উত্তমরূপে বুঝিয়ে দিলাম। অবশ্য জ্ঞান ও বিচার-প্রজ্ঞা আমি উভয়কেই দান করেছিলাম।

{সূরা আম্বিয়া ঃ আয়াত-৮৯)

দেখুন, আল্লাহ্র বিশিষ্ট নবী দাউদ ও সুলায়মান (আ) একটি মোকদ্দমায় ভিন্ন রায় দিয়েছেন। আর আল্লাহ্ পাক উভয়ের জ্ঞান ও বিচার-প্রজ্ঞার প্রশংসা করার সাথে সাথে হযরত সুলায়মানকে বিশেষ প্রজ্ঞা দান করার

কথাও উল্লেখ করেছেন। সুতরাং নবীদের ওয়ারিছ ও উত্তরাধিকারী হিসাবে আহকাম সংক্রান্ত ইজতিহাদের ক্ষেত্রে আলিমদের মাঝেও অনুরূপ তারতম্য রয়েছে। যেমন (অন্ধকার বা অপরিচিত স্থানে) চারজন লোক আলামত ও সূত্র ধরে কা'বার দিক নির্ণয় করল এবং প্রত্যেকেই পিছনে একদল মুকতাদী নিয়ে চার দিকে মুখ করে নামায শুরু করল। এক্ষেত্রে চার ইমামের প্রত্যেকেরই এই বিশ্বাস যে, তার দিকটাই হচ্ছে সঠিক দিক। এমতাবস্থায় সকলের নামাযই শুদ্ধ হবে। অথচ এক ইমামই শুধু কা'বামুখী হয়ে নামায আদায় করছে এবং তার ইজতিহাদই ছিল সঠিক। এই মুজতাহিদ সম্পর্কেই দ্বিগুণ ছওয়াবের কথা হাদীসে ইরশাদ হয়েছে ঃ

اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران وان اجتهد فاخطأ فله اجر -

ফায়সালাকারী মুজতাহিদ সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হলে দ্বিগুণ বিনিময় লাভ করবে। পক্ষান্তরে ভুল ইজতিহাদের শিকার হলে একটি বিনিময় অবশ্যই লাভ করবে।[১]

ইমাম সাহেবের মতে, বিশেষ ফিকহী মাযহাবের পরিমণ্ডলে কারো মানস গড়ে উঠা এবং সে অনুসারে শরীয়তের আহকাম ও ইবাদতসমূহ পালন করা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। গোড়া থেকেই এ ধারা চলে এসেছে। তবে মুসলমানের যথার্থ কর্তব্য এই যে, নিজেকে সে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা)-এর অনুগত মনে করবে এবং কুরআন সুন্নাহ থেকে প্রমাণিত যে কোন সিদ্ধান্ত নির্দ্বিধায় মেনে নেওয়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখবে।

মানুষ সাধারণত মা, বাপ, মুরব্বী ও প্রতিবেশীদের 'আকীদা ও মাযহাবের পরিমণ্ডলেই বড় হয়, সন্তান যেমন দীনের ক্ষেত্রে মা, বাপ, মুরব্বী ও দেশবাসীর অনুগমন করে। কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্তির পর আল্লাহ্ ও রসূল (সা)-এর আনুগত্য তার জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তখন আর এ খোড়া অজুহাত চলবে না যে, بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا, আমরা বরং সে পথেই চলব যে পথে পূর্বপুরুষদের চলতে দেখেছি। অতএব, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা)-এর আনুগত্যের বিপরীতে পূর্বপুরুষ কিংবা দেশবাসীর 'আকীদা-বিশ্বাসে যারা অবিচল থাকবে, জাহিলি য়াতের গণ্ডীভুক্ত হয়ে তারা আযাবের উপযুক্ত হবে। তদ্রূপ শরীয়তের কোন বিষয়ে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা)-এর সঠিক নির্দেশ জানার পরও যারা তা কবূল করতে গড়িমসি করবে এবং পূর্ববর্তী মত আঁকড়ে থাকবে নিঃসন্দেহে তারা শাস্তিযোগ্য অপরাধী বিবেচিত হবে।[২]

১. ফাতাওয়া শায়খুল ইসলাম, ২য় খণ্ড, ২০১-২।

২. ফাতাওয়া শায়খুল ইসলাম, খ. ২, পৃ. ৩৮৪।

আলিমদের মধ্যে যাদের গবেষণা, যুক্তি-প্রয়োগ এবং বিভিন্ন মতের মাঝে অগ্রাধিকার নির্ধারণের যোগ্যতা রয়েছে তাদের সম্পর্কে ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) লিখেছেন ঃ

اما القادر على الاستدلال فقيل يحرم عليه التقليد مطلقا وقيل يجوز عند الحاجة كما اذا ضاق الوقت عن الاستدلال وهذا القول اعدل ـ

যুক্তিপ্রয়োগের যোগ্যতা আছে এমন ব্যক্তিদের জন্য সর্বাবস্থায় তাকলীদ হারাম ও বৈধ উভয় ধরনের মত রয়েছে। তবে তৃতীয় মত এই যে, প্রয়োজনের সময় তাদের জন্য তাকলীদের অবকাশ রয়েছে যখন গবেষণা ও যুক্তি বিশ্লেষণের পর্যাপ্ত সময় তার হাতে নেই। এটাই অধিকতর যুক্তি সঙ্গত মত।[১]

তবে পূর্ণাঙ্গ ইজতিহাদী যোগ্যতার অধিকারী ব্যক্তি সম্পর্কে ইমাম সাহেবের ফয়সালা এই যে, কোন সিদ্ধান্তের বিপক্ষে-তিনি যদি আয়াত বা হাদীস দেখতে পান আর যুক্তিগ্রাহ্য কোন সুরাহা তার হাতে না থাকে তাহলে আয়াত বা হাদীসের অনুসরণই তার জন্য জরুরী। ইমাম সাহেবের ভাষায়–

اما اذا قدر على الاجتهاد التام الذى يعتقد معه ان القول الاخر ليس معه ما يدفع به النص فهذايجب عليه اتباع النصوص وان لم يفعل كان متبعا للظن وما تهوى الانفس وكان من اكبر العصاة لله ورسوله ـ

অবশ্য ইজতিহাদী যোগ্যতাবলে কেউ যদি সাব্যস্ত করতে পারেন যে, অমুক সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে এমন কোন প্রমাণ নেই যা ইজতিহাদ সুরাহা করতে পারে তাহলে তার জন্য আয়াত বা হাদীস অনুসরণ করাই জরুরী। তা না করলে সে কল্পনা ও প্রবৃত্তির অনুগামী এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা)-এর অবাধ্য বলে গণ্য হবে।[২]

ফিকহ্ শাস্ত্রে ইমাম ইবনে তায়মিয়ার মর্যাদা

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) সাধারণত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের মাযহাব ও মূলনীতি মুতাবিক ফতওয়া প্রদান করেছেন। তাঁর অধিকাংশ ফতওয়া চার ইমাম কিংবা হিদায়াতপ্রাপ্ত কোন-না-কোন ইমামের ইজতিহাদের অনুকূল হতো। তবে ক্ষেত্র বিশেষে কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা'-কিয়াসের আলোকে নিজস্ব

১. ফাতাওয়া শায়খুল ইসলাম, খ. ২, পৃ. ৩৮৫।
২. ফাতাওয়া শায়খুল ইসলাম।

ইজতিহাদও তিনি প্রয়োগ করেছেন। এ সকল দিক বিবেচনা করে তাঁকে হাম্বলী মাযহাবের 'মুজতাহিদে মুনতাসিব' (অনুগামী মুজতাহিদ) বলাই যুক্তিযুক্ত হবে।[১]

ইমাম ইবনে তায়মিয়ার সংস্কার প্রচেষ্টার ফল

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) যেভাবে কুরআন-সুন্নাহ্‌কে আকাইদের উৎসরূপে গ্রহণ করার জোরালো আহবান জানিয়েছেন এবং সার্থকতার সাথে নিজেও তা প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন, তেমনি ফিকহ্ ও আহকামের ক্ষেত্রেও কুরআন ও সুন্নাহকে মানদণ্ডরূপে গ্রহণ করার জোর দাওয়াত দিয়েছেন এবং নিজেও তা আমল করে দেখিয়েছেন নিঃসন্দেহে এটা ইমাম ইবনে তায়মিয়ার অন্যতম সংস্কারমূলক অবদান। এ ক্ষেত্রে কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত ছিল তাঁর আদর্শ ঃ

فان تنازعتم فى شيئى فردوه الى الله ورسوله ـ

কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের শরণাপন্ন হও।

'ইলম ও ফিকহ্-এর অঙ্গনে সুদীর্ঘ ইজতিহাদ প্রক্রিয়ায় তাঁর এ দাওয়াত নতুন চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তিক আলোড়ন এবং সরাসরি কুরআন-সুন্নাহ্ ফিরে আসার অপূর্ব চেতনা ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করল। মোটকথা, 'কল্যাণ-যুগের' যে ইসলামী চিন্তা-চেতনা মুসলিম জীবনের বুনিয়াদ ছিল, ইমাম ইবনে তায়মিয়ার মহৎ প্রচেষ্টায় মুসলিম জাহানে তা পুনরুজ্জীবিত হলো। এ সকল বুদ্ধিবৃত্তিক ও প্রায়োগিক সংস্কার অবদানের কারণে ইসলামের ইতিহাসে তিনি সেই বরণীয় ব্যক্তিবর্গের অন্যতম হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছেন যাঁদের দ্বারা আল্লাহ্ পাক দীন ও শরীয়তের তাজদীদ ও পুনরুজ্জীবনের মহান খিদমত গ্রহণ করেছেন।

ذالك فضل الله يوتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ـ

এটা আল্লাহর দান; যাকে ইচ্ছা তাকেই তিনি তা দান করেন। আর আল্লাহ মহান দাতা।

---

১. মুজতাহিদে মুনতাসিব অর্থ শাখা ও মূলনীতিতে ইজতিহাদী যোগ্যতা সত্ত্বেও যুক্তি-প্রয়োগ ও সিদ্ধান্ত আহরণের ক্ষেত্রে কোন ইমামের অনুগমন করেন এবং সাধারণত তাঁর ইজতিহাদের গণ্ডী অতিক্রম করেন না। ফিকহ্ শাস্ত্রে ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র মর্যাদা ও ইজতিহাদী যোগ্যতা সম্পর্কে জানতে হলে পড়ুন মুহাম্মদ আবূ যুহরা রচিত ابن تيميه। পৃ. ৩৫০-৪৫১

দ্বাদশ অধ্যায়

ইবনে ইবনে তায়মিয়ার সুযোগ ছাত্র ও উত্তরসূরী

হাফিজ ইবনুল কায়্যিম

শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র কর্মব্যস্ত দাওয়াতী জীবন এবং আকর্ষণীয় মহান ব্যক্তিত্ব স্বাভাবিক নিয়মেই আপন যুগ ও সমাজের ওপর সুগভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। ফলে ছাত্র, শিষ্য ও ভক্তদের এক বিরাট জামাআত তার চারপাশে জড়ো হয়েছিল। তাঁর ছাত্র-শিষ্যদের সুদীর্ঘ তালিকায় প্রিয়তম ছাত্র হাফিজ ইবনু'ল-কায়্যিম যে বৈশিষ্ট্য, মর্যাদা ও নৈকট্য লাভ করেছিলেন তা অন্য কারো ভাগ্যে জোটেনি। বস্তুত তিনি ছিলেন ইমাম সাহেবের সুবিশাল জ্ঞান-ভাণ্ডারের ধারক, বাহক ও প্রচারক। জীবনের অনুকূল প্রতিকূল সকল অবস্থায় প্রিয়তম উস্তাদের বিশ্বস্ত সঙ্গী ছিলেন তিনি এবং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অটুট ছিল উস্তাদের প্রতি ছাত্রের এ দৃষ্টান্তপূর্ণ বিশ্বস্ততা। এমনকি ইমাম সাহেবের ইনতিকালের পরও প্রিয়তম উস্তাদের প্রেম ও ভালোবাসা এবং আদর্শ ও বিশ্বাসে তিনি অটল ও অবিচল ছিলেন। ইবনু'ল-কায়্যিমের সুগভীর 'ইলম ও প্রজ্ঞা, অতুলনীয় গুণ ও মর্যাদা এবং কর্ম ও অবদানের কথা বিবেচনা করলে স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনারই প্রয়োজন। তাঁর গবেষণা ও রচনাকর্মেরও পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন হওয়া উচিত ব্যাপক পর্যায়ে। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপারে এই যে, তাঁর জীবনের খুব কম তথ্যই আমাদের হাতে এসেছে। তাঁর সুযোগ্য ও সুবিখ্যাত ছাত্র হাফিজ ইবনে রজব 'তাবাকাতু'ল-হানাবিলা' গ্রন্থে 'ইবনু'ল-কায়্যিম' অধ্যায়ে যে কয়টি তথ্য দিয়েছেন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেগুলোকেই এখন পরিবেশন করা হয়। এর কারণ সম্ভবত এই যে, স্বীয় জীবন ও ব্যক্তিত্বকে প্রিয়তম উস্তাদের মাঝে এমনভাবে তিনি বিলিয়ে দিয়েছিলেন যে, সমসাময়িকদের চোখে তাঁর আলাদা ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠার সুযোগ পায়নি। হাফিজ সাহেবের জীবন-বৃত্তান্ত সম্পর্কে যতদূর জানা গেছে সেটাই এখানে আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

নাম ও বংশ

জন্ম ৬৯১ হিজরী, নাম-মুহাম্মদ, কুনিয়াত বা উপনাম-আবূ আবদুল্লাহ, উপাধি-শামসুদ্দীন, পিতার নাম-আবূ বকর ইবন আইয়ুব। জন্মস্থান দামেশ্কেই তিনি প্রতিপালিত হয়েছেন এবং সেখানেই সমাধিস্থ হয়েছেন। তাঁর পিতা আবূ বকর ছিলেন প্রখ্যাত জাওযিয়া বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ। এ সূত্রেই তাঁর নামের শেষে আল-জাওযী অভিধা যুক্ত হয়ে থাকে। শিহাব নাবলুসী আল-'আমির, কাযী তকীউদ্দীন, সুলায়মান, ফাতিমা বিনতে জাওহার, 'ঈসা ইবন মুত'ইম, আবূ বকর ইবন আবদুদ্দাইম প্রমুখ যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছদের দরসে তিনি হাদীস 'শ্রবণ' করেন। অতঃপর হাম্বলী মাযহাবে জ্ঞান অর্জন করে মুফতী পদে বরিত হন এবং ফতওয়া প্রদানের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। পরবর্তীতে তিনি ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) র এমন ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন যে, মৃত্যুই শুধু তাঁদের পৃথক করতে পেরেছিল। ৭১২ হিজরীতে মিসর থেকে ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র ফিরে আসার পরই হাফিজ ইবনু'ল-কায়্যিম তাঁর সংস্পর্শে আসেন।[১]

জ্ঞানগত মর্যাদা

হাফিজ ইবনে রজব লিখেছেন ঃ সকল ইসলামী শাস্ত্রেই তাঁর দখল ছিল। তবে তাফসীর জগতে তিনি ছিলেন অতুলনীয়। উসূল বিষয়ক শাস্ত্রসমূহেও তিনি শীর্ষস্থানের অধিকারী ছিলেন। হাদীস ও হাদীস-বিজ্ঞান এবং ইজতিহাদ ও সূক্ষ্ম যুক্তি-প্রয়োগে তাঁর কোন সমকক্ষ চোখে পড়ে না। ফিক্হ, ফিক্হ-বিজ্ঞান, আরবী ভাষা ও সাহিত্য এবং কালাম শাস্ত্রেও তাঁর যথেষ্ট দখল ছিল। সুফী দর্শন ও তাসাওউফ তত্ত্বেও তিনি গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। কুরআন-সুন্নাহ্র ভাব ও মর্ম, ঈমানের হাকীকত ও তত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর চেয়ে বড় আলিম কাউকে দেখিনি। নিষ্পাপ তিনি ছিলেন না নিশ্চয়, তবে উপরিউক্ত গুণ ও বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে তাঁর মত মানুষ আমি দেখিনি। আল্লামা যাহবী বলেন, হাদীসের মতন ও সনদের প্রতি তাঁর অখণ্ড মনযোগ ছিল। ফিক্হ অধ্যয়নেই তিনি সদা নিমগ্ন থাকতেন এবং শাস্ত্রীয় জটিল বিষয়গুলো বিশদভাবে লিখতেন। ব্যাকরণ অধ্যাপনায় বেশ নাম ছিল তাঁর এবং হাদীস-বিজ্ঞানে ও ফিক্হ -বিজ্ঞানে ভালো যোগ্যতা ছিল

যুহদ ও ইবাদত

হাফিজ ইবনে রজবের মতে, বিনিদ্র রজনী যাপনে অভ্যস্ত ইবনু'ল-কায়্যিম বড় ইবাদত প্রেমিক ছিলেন। খুব দীর্ঘ ও প্রশান্তিপূর্ণ হতো তাঁর সালাত। সদা যিকিরে সজীব ছিল তাঁর যবান। হৃদয়ে ছিল আল্লাহ-প্রেম ও আল্লাহতে সমর্পি-

১. আল-বিদায়া, খ. ১৪, পৃ. ২৩৪।

হওয়ার এক উদ্বেলিত ভাব। পবিত্র মুখাবয়বে ছিল আল্লাহ্‌র হুযুরে নিজের দৈন্য ও নিঃস্বতা এবং অসহায়ত্ব ও দীনতা প্রকাশের এক নূরানী দীপ্তি। এ দুর্লভ ভাবের অভিব্যক্তিতে আমার মনে হয়েছে তিনি সত্যিই অনন্য ও অতুলনীয়। কয়েকবার হজ্জ সমাপন ছাড়াও দীর্ঘদিন তিনি মক্কায় অবস্থান করেছেন। মক্কাবাসীরা তাঁর সার্বক্ষণিক ইবাদত ও তাওয়াফের বিস্ময়কর সব ঘটনা শুনিয়ে থাকে।

আল্লামা ইবনে কাছীর তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে লিখেছেন ঃ ইবনু'ল-কায়্যিম বড় ভালোবাসার মানুষ ছিলেন। হিংসা ও ঈর্ষা তাঁর স্বভাবেই ছিল না। কাউকে কষ্ট দেওয়া কিংবা হেয় করা তিনি জানতেন না। তাঁর একজন অতি প্রিয় সহচর হিসাবে সমসাময়িক দুনিয়ার তাঁর চেয়ে ইবাদত পাগল ও নফল প্রেমিক কেউ ছিল কিনা আমার জানা নেই। দীর্ঘ রুকূ' সিজদা সহ বড় প্রশান্তিপূর্ণ সালাত তিনি পড়তেন। সাথীদের মুখে এজন্য তাঁকে তিরস্কার ও শুনতে হতো, কিন্তু এ স্বাদের জিনিস পরিত্যাগ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। মোটকথা, গুণে ও কর্মের বিচারে তাঁর তুলনা পাওয়া দুষ্কর।[১]

অগ্নি পরীক্ষা

উস্তাদ ও শায়খের মত ইবনে কায়্যিমকেও বিভিন্ন পরীক্ষা ও মুজাহাদার মুখোমুখি হতে হয়েছে বারবার। শেষ বারের মত ইবনে তায়মিয়া (র)-কে দুর্গে বন্দী করা হলে তিনিও কারাজীবনে নিক্ষিপ্ত হন। তবে উভয়কে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রাখা হয়। ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র মৃত্যুর পর তিনি মুক্তি লাভ করেন। দীর্ঘ বন্দী জীবনের সবটুকু সময় তাঁর কেটেছে কুরআন তিলাওয়াত ও অধ্যয়ন নিমগ্নতায়। ইবনে রজবের ভাষায় ঃ

فقتح عليه من ذلك خير كثير ، وحصل له جانب عظيم من الاذواق والمواجيد الصحيحة وتسلط بسبب ذلك على الكلام فى علوم اهل المعارف والدخول فى غوامضهم وتصانيفه ممتلئة بذالك -

বন্দী জীবন তাঁর জন্য খুবই কল্যাণপ্রসু হয়েছিল। সে সময় এমন গভীর প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞান তিনি লাভ করেছিলেন যে, তত্ত্বাজ্ঞানীদের জটিল ও সূক্ষ্ম তত্ত্বজ্ঞানের গভীরে প্রবেশ করা তাঁর জন্য সহজ হয়ে গিয়েছিল। তাঁর রচনা-সমগ্র এ ধরনের বিষয়বস্তুতে পরিপূর্ণ।

---

১. আল-বিদায়া, খ. ১৪ পৃ. ২৩৪, ২৩৫।

ছাত্র ও সমমসাময়িকদের স্বীকৃতি

বহু সংখ্যক আলিম ইবনু'ল-কায়্যিমের জীবদ্দশায় এমনকি মৃত্যুর পরও তাঁর কাছ থেকে জ্ঞান লাভ করেছেন এবং উপকৃত হয়েছেন। সমমসাময়িক বিদগ্ধজনদের চোখে তিনি ছিলেন গভীর শ্রদ্ধা ও সমীহার পাত্র এবং তাঁর শিষ্যত্ব লাভ ছিল তাদের জন্য গৌরবের বিষয়। তাঁর ছাত্রদের তালিকায় ইবনে আবদুল হাদী এবং ইবনে রজবের মত মহাত্মাদের নামও রয়েছে। তাঁর সম্পর্কে কাযী বুরহানুদ্দীন যুর'আর মন্তব্য হল, 'আসমানের নিচে এখন তাঁর চেয়ে বিস্তৃত জ্ঞানের মানুষ চোখে পড়ে না।'

রচনা ও অধ্যাপনা

আল-জাওযিয়ায় দীর্ঘদিন ইমামতের দায়িত্ব পালন ছাড়াও সদরিয়া বিদ্যাঙ্গনে বহুদিন ধরে তিনি অধ্যাপনার কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন। এছাড়া বিভিন্ন বিষয়ে কিতাবও লিখেছেন প্রচুর। ইবনে রজবের মতে, পড়া-লেখা ও বই সংগ্রহে তাঁর ঝোঁক ছিল প্রচণ্ড। ফলে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে তিনি গড়ে তুলতে পেরেছিলেন বিরাট ও সমৃদ্ধ এক গ্রন্থাগার। তদুপরি সংগৃহীত কিতাবের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল তাঁর স্বহস্তে অনুলিপিকৃত।

রচনা-বৈশিষ্ট্য

সুবিন্যাস ও শৈলী বিচারে তাঁর রচনাবলী স্বীয় উস্তাদ ও শায়খ ইবনে তায়মিয়্যা (র)-থেকেও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছিল। কেননা তাসাওউফের মিষ্টতা এবং ভাষার লালিত্যের চমৎকার সমন্বয় ঘটেছিল তাঁর লেখায়। সম্ভবত তাঁর স্বভাব ও চরিত্রেরই ছায়াপাত ঘটেছিল তাতে। কেননা উষ্ণতার চেয়ে স্নিগ্ধতাই ছিল তাঁর স্বভাবের বৈশিষ্ট্য।

গুরুত্বপূর্ণ রচনাসমূহ

ইবনে কায়্যিম রচিত গ্রন্থের সুদীর্ঘ তালিকা থেকে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি গ্রন্থের নাম শুধু এখানে আমরা পেশ করছি।

১। تهذيب سنن ابى داؤد

২। مدارج السالكين بين منازل اياك نعبد واياك نستعين আল্লামা আবদুল্লাহ্ আনসারী হারাবী রচিত منازل السائرين - এর এই ব্যাখ্যা গ্রন্থটি তাসাওউফ তত্ত্বে এক অনবদ্য রচনা।

৩। زاد المعاد فى هدى خير العباد এ গ্রন্থের বিস্তারিত পর্যালোচনা আসছে।

৪। جلاء الا فهام فى الصلوة والسلام على خير الانام

৫। اعلام الموقعين عن رب العالمين ইবনে কায়্যিমের অন্যতম বিশিষ্ট এই রচনাকর্মে ফিকহ্ ও হাদীসসেবীদের জন্য মূল্যবান তথ্যের বিরাট সমাবেশ রয়েছে।

৬। الكا فية الشافية فى الا نتصار اللفرقة النا جية

৭। الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة

৮। حادى الارواح الى بلاد الا فراح (জান্নাতের বিবরণ সম্পর্কে এর টীকা);

৯। كتاب الداء والدوا

১০। مفتاح دار السعادة

১১। اجتماع الجيوش الاسلامية على غزو المعطلة الجهمية

১২। عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين

১৩। بدائع الفوائد

১৪। الكلم الطيب والعمل الصالح

১৫। تحفة الورود باحكام المولود

১৬। كتاب الروح

১৭। شفاء العليل فى مد سائل القضا ؤالقدر والحكمة والتعليل۔

১৮। نفحة الارواح وتحفة الافراح

১৯। الفوائد

২০। الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية

২১। الجواب الكافى لمن سأل عن الدواء الشافى

২২। روضة المحبين ونزهة المشتاقين

২৩। اغاثة الهفان فى مكائد الشيطان

২৪। طريق الهجرتين وباب السعادتين

মৃত্যু

৭৯১ হিজরীর ২৩ শে রজব রোজ বুধবার রাতে তিনি ইনতিকাল করেন এবং পরদিন বাদ জোহর জামে মসজিদে তাঁর জানাযা এবং বাবু'স-সাগীর কবরস্থানে দাফন অনুষ্ঠিত হয়। আল্লাহ্ তাঁকে রহম করুন এবং তাঁর দরজা বুলন্দ করুন।

যাদু'ল-মা'আদ গ্রন্থ পর্যালোচনা

বহু গ্রন্থ প্রণেতা আলিমদের অন্যতম হাফিয ইবনু'ল-কায়্যিম রচনার মান ও পরিমাণ উভয় দিক থেকেই উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তাঁর কয়েকটি রচনা এতই মূল্যবান যে, সেগুলোর বিস্তারিত পরিচিতি ও সার-সংক্ষেপে তুলে ধরা বেশ ফলদায়ক হতো। বিশেষ করে বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে اعلام الموقعين এবং সংস্কারধর্মিতার দিক থেকে مدارج السالكين ও اغاثة اللهفان এমনই কালোত্তীর্ণ রচনা যে, সময়ের প্রয়োজনেই ইবনে তায়মিয়ার الجواب الصحيح ـ الرد على المنطقيين গ্রন্থ দুটির মত এগুলোরও সুবিস্তৃত পরিচিতি ও সার-সংক্ষেপে তুলে ধরা উচিত। কিন্তু সেজন্য এক স্বতন্ত্র গ্রন্থের প্রয়োজন। তা ছাড়া ইবনু'ল -কায়্যিমের জীবনীগ্রন্থই হল এর উপযুক্ত ক্ষেত্র। তাই এখানে আমরা তাঁর সুবিখ্যাত زاد المعاد فى هدى خير العباد গ্রন্থটিই নির্বাচন করছি। কারণ এতে তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের বিচ্ছিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলোর চমৎকার সমাবেশ ঘটেছে। সেই সাথে সীরাত, হাদীস, ফিকহ, কালাম ও তাসাওউফ-তত্ত্বসহ ইসলামী শাস্ত্রের বহু শাখার আলোচনা এতে স্থান পেয়েছে। আমল ও সংশোধন এবং দাওয়াত ও সংস্কারের ক্ষেত্রে ইহ্‌য়াউ'ল-'উলূমের পরে এমন বিস্তারিত ও পূর্ণাঙ্গ রচনা সম্ভবত আর নেই। নিখুঁত তথ্য-বিশ্লেষণ, নির্ভরযোগ্যতা ও কুরআন-সুন্নাহর সাথে সঙ্গতির ক্ষেত্রে ইবনু'ল -কায়্যিমের যাদু'ল-মা'আদ বরং ইমাম গাযালীর ইহ্‌য়াউ'ল-'উলূমকেও ছাড়িয়ে গেছে। মনে হয় উম্মাহকে তিনি এমন কিছু উপহার দিতে চেয়েছিলেন যা দীনিয়াত গ্রন্থাগারের সার্থক প্রতিনিধিত্ব এবং শরীয়ত বিষয়ে সফল গাইড ও পথ-নির্দেশকের ভূমিকা পালন করতে পারে। যারা হাদীস প্রেমিক এবং সুন্নতে নববীর অনুসরণই যাদের সযত্ন প্রয়াস-এ কিতাবটির প্রতি তাদের সুগভীর অনুরাগ ছিল সব যুগে। এ কিতাব ছিল তাদের জীবনের বিশ্বস্ত বন্ধু, চলার পথের আলোক প্রদীপ এবং জীবন সফরের অমূল্য পাথেয়। ভারতে ১২৯৮ হিজরীতে এবং মিসরে ১৩২৪ হিজরীতে কিতাবটি সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। ভারতীয় সংস্করণের কলেবর হলো বড় সাইজের ৯৩৭ পৃষ্ঠা, পক্ষান্তরে মিসরীয় ক্ষুদ্র টাইপ সংস্করণের পৃষ্ঠা সংখ্যা হলো ৯২৬। কিতাবের ভূমিকায় গ্রন্থকার লিখেছেন ঃ

> আপন নবীর পরিচয় যিনি পেতে চান এবং তাঁর সীরাত ও আখলাক সম্পর্কে বিশদ জানতে চান, তার জন্য জরুরী কিছু বিষয়বস্তুর সমষ্টি হলো এ বইটি। এর জন্য এমন সময় কলম হাতে নিয়েছি যখন হৃদয় আমার সুদীর্ঘ সফরের অস্থির পরিবেশে বিষাদক্লান্ত এবং ইলমের পুঁজি অল্প। স্বাভাবিকভাবেই এ

সময় মন আমার বিক্ষিপ্ত ও নির্জীব এবং কোন কাজে একাগ্রতা ও নিমগ্নতা প্রায় অসম্ভব। তদুপরি প্রয়োজনীয় গ্রন্থাদি হাতের কাছে নেই, জরুরী ও মত বিনিময়ের জন্যও পাশে নেই কোন বিদগ্ধ আলিম।[১]

গ্রন্থকারের এ বক্তব্য প্রথম দিকে কয়েকটি অধ্যায় অনুচ্ছেদ সম্পর্কে হলে আশ্চর্যের তেমন কিছু নেই। কিন্তু গোটা বইটি সম্পর্কে হলে সত্যি তা এক বিস্ময়কর ব্যাপার । কেননা হাদীসের মতন, সনদ ও রিজাল (বর্ণনাকারী) সম্পর্কে যে বিস্তৃত ও সারগর্ভ আলোচনার অবতারণা তিনি করেছেন, সীরাত ও ইতিহাসের যে -বিপুল খুঁটিনাটি তথ্য ও প্রমাণপঞ্জী তুলে ধরেছেন, তাতে সাধারণের মনে এ ধারণাই হবে যে, এক বিরাট ও সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারে বসেই বুঝি বইটি লেখা হয়েছে। সত্য সত্যই আগাগোড়া বইটি সফরের অবস্থায় লেখা হয়ে থাকলে স্বীকার করতেই হবে যে, গ্রন্থকার সকল ইসলামী শাস্ত্রে, বিশেষত হাদীস ও ফিকহ্ শাস্ত্রে বিস্ময়কর ব্যুৎপত্তি ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের ক্ষেত্রে পূর্বসূরী মুহাদ্দিছদের তিনি ছিলেন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যুগের অনন্য উস্তাদ ইবনে তায়মিয়া (র)-র সার্থক উত্তরসূরী ছিলেন তিনি।

কিতাবের শুরুর দিকে ইবনু'ল-কায়্যিম নবুওয়ত ও ওহীর স্তর ও পর্যায় সম্পর্কে এমন বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, ওহীর প্রকার ও প্রকৃতি সম্পর্কে এমন পূর্ণাঙ্গ আলোকপাত করেছেন যা সাধারণ সীরাত গ্রন্থে পাওয়া যায় না।[২] অতঃপর নবী জীবনে ইসলামী দাওয়াত যে-সকল পর্ব ও পর্যায় অতিক্রম করেছে তার অনবদ্য বিবরণ তুলে ধরেছেন। নবীর নামসমূহের মর্ম ও তত্ত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত ও উপভোগ্য আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে স্বীয় উস্তাদের অনুকরণে ফিকহ ও ব্যাকরণের প্রচুর মাসআলা ও সূক্ষ্ম তত্ত্ব এবং কিছু কিছু নিজস্ব অনুভব ও উপলব্ধিজাত বিষয়ও তিনি তুলে ধরেছেন। সেই সাথে সীরাত সংক্রান্ত সাধারণ তথ্যমালা এবং রসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের সাথে সম্পৃক্ত ছোট-বড় সকল ঘটনা একত্রিত করে দিয়েছেন। তাতে তাঁর আখলাক-চরিত্র, স্বভাব-প্রকৃতি ও দৈহিক আকৃতি, আচার-অভ্যাস এবং দৈনন্দিন আমল সংক্রান্ত আলোচনারও একটা উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ তাতে এসে গেছে।[৩] এরপর শুরু হয়েছে সালাতসহ রসূল (র)-এর অন্যান্য ইবাদত সম্পর্কে বিস্তারিত ও সূক্ষ্ম আলোচনা। বলা চলে যে, এ প্রসঙ্গে তিতি তাঁর ব্যাপক ও বিস্তৃত হাদীস অধ্যয়নের সার-নির্যাস আমাদের উপহার দিয়েছেন এবং এখানেই তাঁর মুহাদ্দিছসুলভ প্রজ্ঞা এবং গবেষণাসুলভ জ্ঞান গভীরতার পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে। এ প্রসঙ্গে ফিকহ ও হাদীসের

১. যাদু'ল-মা'আদ (ভারতীয় সং), পৃ. ১৫।

২. যাদু'ল-মা'আদ (ভারতীয় সং), খ. ১, পৃ. ১৮।

৩. যাদু'ল-মা'আদ (ভারতীয় সং), ১ম খ., পৃ. ২৫-৪১

উসূল শাস্ত্রীয় কিছু সূক্ষ্ম আলোচনা[১] এবং রিজাল শাস্ত্রীয় কিছু মূল্যবান তথ্যও তাঁর কলম থেকে আমরা পেয়েছি।[২] চার ইবাদত (সালাত, সিয়াম, যাকাত, হজ্জ) বিষয়ক এ অধ্যায়গুলো আহকাম ও ফিকহ-সংক্রান্ত আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে ঈমান ও ভাব-উদ্দীপক কিছু প্রাসঙ্গিক বিষয়ও তিনি পরিবেশন করেছেন। যাকাত ও সাদাকা অধ্যায়ে তিনি লিখেছেন যে, গোটা সৃষ্টি জগতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামই ছিলেন সর্বাধিক উন্মুক্ত চিত্ত, প্রফুল্ল হৃদয় ও প্রশান্ত আত্মার অধিকারী মানব। কেননা শরহে সদর তথা চিত্তোন্মুক্ততা অর্জনে দান ও সদয়াচরণের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। নবুওয়তের গুণ ও বৈশিষ্ট্যের জন্য শৈশবে স্থূলভাবেই আল্লাহ তাঁর রসূল (সা)-কে 'শরহে সদর' দান করেছিলেন এবং সিনা মুবারক উন্মুক্ত করে শয়তানের অংশ ফেলে দিয়েছিলেন। দান, বদান্যতা ও আত্মত্যাগের মহৎ চরিত্রের কারণে এই চিত্তোন্মুক্ততা আরো উৎকর্ষ লাভ করেছিল। উপরিউক্ত দৃষ্টিকোণ থেকে ইবনু'ল-কায়্যিম সীরাতুন্নবীর ওপর বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন ও শরহে সদরের বিভিন্ন কারণ পর্যালোচনা করে লিখেছেন ঃ

> 'শরহে সদর' বা চিত্তোন্মুক্ততা লাভের বহু উপায় রয়েছে। আর সেগুলো রসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের মাঝে পূর্ণতম মাত্রায় বিদ্যমান ছিল। এর মধ্যে তাওহীদ হলো সবচে' গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী উপায়। তাওহীদের বিশ্বাস যত পূর্ণাঙ্গ ও শক্তিশালী হবে 'শরহে সদর' সেই অনুপাতে উৎকর্ষতা লাভ করবে। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ
>
> فمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه -
>
> ইসলামের জন্য যার হৃদয় আল্লাহ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন সে তো তার রবের পক্ষ থেকে আলোকপ্রাপ্ত ।[৩]
>
> আরো ইরশাদ হয়েছে ঃ

فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد فى السماء -

> আল্লাহ যাকে হিদায়াত দান করতে চান তার হৃদয়কে ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন। আর যাকে বিপথগামী করতে চান তার হৃদয়কে করে দেন সংকীর্ণ ও রুদ্ধ। ইসলাম গ্রহণ তার জন্য তখন দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে, যেন সে আকাশে আরোহণ করছে।

---

১. যাদু'ল-মা'আদ (ভারতীয় সং), ১ম., পৃ. ৬৯, ১০৫।

২. যাদু'ল-মা'আদ (ভারতীয় সং), ১ম খ., পৃ. ৭৩, ৯৯।

৩. সূরা যুমার-২২।

মোটকথা, হিদায়াত ও তাওহীদ হচ্ছে 'শরহে সদর' লাভের সর্বাধিক শক্তিশালী উপায়। পক্ষান্তরে শিরক ও গোমরাহী হচ্ছে হৃদয়ের সংকীর্ণতা ও রুদ্ধতার বড় কারণ।

'শরহে সদর' লাভের আরেকটি উপায় হলো বান্দার অন্তরে আল্লাহ্ প্রদত্ত সেই ঈমানী নূর ও আলোক যা সিনাকে উন্মুক্ত ও প্রশস্ত করে এবং কলবকে করে প্রফুল্ল ও আনন্দিত। এই নূর ও আলোক বান্দার অন্তর থেকে অপসৃত হলে তা সংকীর্ণ হয় এবং চুপসে যায়। বান্দা তখন এক অন্ধকার ও সংকীর্ণ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হওয়ার যন্ত্রণা অনুভব করে। তিরমিযী শরীফে রসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের ইরশাদ বর্ণিত হয়েছে ঃ

اذا دخل النور القلب انفسح وانشرح . قالوا وما علامة ذالك يارسول الله قال الانابة الى دار الخلود والتجا فى عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزوله ـ

বান্দার অন্তরে 'নূর' প্রবেশ করলে তা উন্মুক্ত ও প্রশস্ত হয়। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন ঃ হে আল্লাহর রসূল! তার আলামত কি ? ইরশাদ হলো, চিরস্থায়ী জীবনের প্রতি আগ্রহ ও আকর্ষণ, ক্ষণস্থায়ী জীবনের প্রতি অনাগ্রহ ও নির্লিপ্ততা এবং মৃত্যু আসার আগেই সেজন্য প্রস্তুতি গ্রহণ।

এই নূর ও আলোক মানুষ যে পরিমাণ লাভ করে 'শরহে সদর' নামের ঐশী সম্পদে সেই পরিমাণ সে ঐশ্বর্যশালী হয়। এমনকি তা স্থূল আলো ও অন্ধকার, চিত্তের প্রশস্ততা ও প্রফুল্লতা এবং সংকীর্ণতা ও অপ্রফুল্লতা সৃষ্টি করে থাকে।

'শরহে সদর' লাভের আরেকটি উল্লেখযোগ্য উপায় হলো, 'ইলম ও জ্ঞান, যা মানব চিত্তকে উন্মুক্ত ও প্রশস্ত করে। এমনকি তা গোটা বিশ্বের ব্যাপ্তি ও বিস্তৃতিকেও ছাড়িয়ে যেতে পারে। পক্ষান্তরে মূর্খতা আনে হৃদয়ের সংকীর্ণতা ও রুদ্ধতা। 'ইলমের ব্যাপ্তি ও বিস্তৃতি অনুপাতেই ঘটে হৃদয়ের ব্যাপ্তি ও বিস্তৃতি। তবে যে কোন আলিমের ভাগ্যে এ মহান সম্পদ জোটে না। এটা শুধু রসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া 'ইলমেরই বৈশিষ্ট্য। উপকারী ও কল্যাণপ্রসূ 'ইলম শুধু এটাই। এ মহাসম্পদ সৌভাগ্য যিনি লাভ করবেন তিনিই হবেন সবচেয়ে প্রশস্ত ও উন্মুক্ত চিত্ত। চরিত্র ও নৈতিকতায় তিনিই হবেন সর্বোত্তম এবং তাঁর জীবন ও সময়ই হবে সবচেয়ে সুখী ও প্রশান্তিপূর্ণ।

'শরহে সদর' লাভের আরেকটি বড় উপায় হলো ইনাবাত ইলাল্লাহ' তথা আল্লাহ-নিমগ্নতা। অর্থাৎ হৃদয়ের সবটুকু অনুভূতি দিয়ে তাঁকে প্রেম করা, সব দুয়ার থেকে মুখ ফিরিয়ে তাঁর দুয়ারেই শুধু পড়ে থাকা এবং তাঁর ইবাদতেই শুধু ডুবে থাকা। মোটকথা, 'শরহে সদর' লাভের জন্য এর চেয়ে কার্যকর ও ফলপ্রসু উপায় আর নেই। এ সম্পদ ও ঐশ্বর্য কখনো তুমি পেয়ে গেলে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই বলে উঠবে যে, জান্নাতে গিয়েও এ নিয়ামত আমি পেতে চাই।

'শরহে সদর' ও হৃদয়ের প্রশান্তি লাভে প্রেম ও ভালোবাসাও বিরাট ভূমিকা পালন করে। যার হৃদয়ের সবুজ অঙ্গনে প্রেমের ময়ূর পেখম মেলেছে এবং যার জীবনে ভালোবাসার স্বর্গসুখ নেমে এসেছে সেই শুধু তা অনুভব করতে পারবে। প্রেম যত গভীর হবে, বাধ ভাঙা জোয়ারের মত ভালবাসা যত উচ্ছসিত হবে, চিত্তোন্মুক্ততা ও চিত্তপ্রশান্তিও সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পেতে থাকবে। পক্ষান্তরে এ সম্পদ ঐশ্বর্য থেকে বঞ্চিত অপদার্থদের দিকে তাকালেও হৃদয় হয়ে যাবে সংকীর্ণ ও আবিলতাপূর্ণ। তাদের দর্শন হলো চোখের পীড়া এবং তাদের সঙ্গ হলো আত্মার ব্যাধি।

এবার বিপরীত দিক থেকে বলা যায় যে, হৃদয়ের সংকীর্ণতা ও আবিলতা সৃষ্টির একটি বড় কারণ হলো গায়রুল্লাহ্‌র মোহ জালে আটকা পড়ে আল্লাহ্ বিমুখ হওয়া এবং আল্লাহ্‌র যিকির ও ইবাদতে অনাগ্রহী ও উদাসীন হওয়া। যে গায়রুল্লাহর সাথে বান্দার প্রেম হবে সে গায়রুল্লাহ্ দ্বারাই তাকে আযাব ও কষ্ট দেওয়া হবে। সে গায়রুল্লাহ্‌র প্রেমের জাহান্নামী আগুনেই জ্বলে পুড়ে খাক হতে থাকবে। তার চেয়ে বদনসীব, অভিশপ্ত, অসুখী ও হতভাগা পৃথিবীতে আর কেউ হতে পারে না। বস্তুত প্রেম ও মুহব্বত দুই প্রকার ঃ এক প্রেম হৃদয় মনে সজীবতা আনে, আত্মাকে পুষ্টি ও খাদ্য যোগায়, চোখ জুড়ায়, প্রাণ শীতল করে। এককথায়, মাটির পৃথিবীকে জান্নাতে রূপান্তরিত করে। সেই প্রেম হলো আল্লাহ্-প্রেম, যা হৃদয় ও আত্মার সবটুকু ইচ্ছা ও অনুভূতিসহ আল্লাহর (যাত ও সিফাত তথা গুণ ও সত্তার) মাঝে নিজেকে বিলিয়ে দিতে উদ্বুদ্ধ করে। আরেকটি প্রেম আছে যা আত্মার যন্ত্রণা, বুকের জ্বালা, হৃদয়ের সংকীর্ণতা এবং চিন্তার আবিলতা সৃষ্টির মাধ্যমে জীবনকে জাহান্নামে পরিণত করে। সেটা হলো গায়রুল্লাহ্‌র প্রেম ও মোহ।

সর্বাবস্থায় ও সর্বক্ষেত্র যিকিরের সার্বক্ষণিকতা হলো 'শরহে সদর' লাভের আরেকটি উপায়। যিকিরই মানব হৃদয়ে আনে পরম তৃপ্তি ও শান্তি এবং নিবিড় তুষ্টি ও প্রশান্তি। পক্ষান্তরে গাফলত ও উদাসীনতা হলো হৃদয়ের সংকীর্ণতা, বদ্ধতা, যন্ত্রণা ও অস্থিরতার অন্যতম কারণ।

'শরহে সদর' লাভের ক্ষেত্রে সৃষ্ট জীবের প্রতি দয়া ও সদয় আচরণের ভূমিকাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। যার স্বভাবে রয়েছে সৃষ্ট জীবের কল্যাণ ও উপকারের সীমাহীন জযবা ও আবেগ, নিঃসন্দেহে তার হৃদয় হবে উন্মুক্ত, প্রশস্ত, প্রশান্ত ও তৃপ্ত। পক্ষান্তরে যে কৃপণের স্বভাবে ইহসান ও কল্যাণের জযবা নেই- সে হতভাগ্যের হৃদয় হবে সংকীর্ণ, বিষাদগ্রস্ত, বিপর্যস্ত ও আবিলতাপূর্ণ। সদকা ও দানে অভ্যস্ত ত্যাগী মানুষের উদাহরণ দিতে গিয়ে আল্লাহ্‌র রসূল ইরশাদ করেছেন ঃ মনে কর এক লোকের দেহে দু'টি লৌহবর্ম রয়েছে। যখন সে সদকা প্রদানের নিয়ত করে তখন বর্ম প্রশস্ত হতে থাকে। এমনকি তার কাপড়ের নীচের অংশ মাটিতে গড়াগড়ি খায়। ফলে তার পায়ের দাগগুলো মুছে যায়। পক্ষান্তরে কৃপণের অবস্থা এই যে, বর্মের প্রতিটি অংশ তার শরীরে চেপে বসে; তাতে আর কোন প্রশস্ততা ও স্বাচ্ছন্দ্য অবশিষ্ট থাকে না।

'শরহে সদর' লাভের আরেকটি উপায় হলো বীরত্ব ও সাহসিকতা। সাহসী মানুষের বক্ষ থাকে উন্মুক্ত, প্রশস্ত ও মনোবলসম্পন্ন। পক্ষান্তরে ভীরুর অন্তর হয় ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ। পশুরা যে পরিমাণ সুখ, আনন্দ, স্বাদ ও তৃপ্তি লাভ করে- তার ভাগ্যে ততটুকুই মাত্র জোটে। কৃপণ, আল্লাহ-বিমুখ, আল্লাহর যিকির থেকে গাফিল, তাঁর নাম ও সিফাত সম্পর্কে অজ্ঞ, তাঁর দীন সম্পর্কে বেখবর এবং গায়রুল্লাহ্‌র মোহজালে আটকা পড়া ব্যক্তির মত ভীরু ও বুযদিল ব্যক্তিত্ব আত্মার তৃপ্তি ও প্রশান্তি এবং হৃদয়ের অনাবিল আনন্দ ও সন্তুষ্টির সুমহান সম্পদ-ঐশ্বর্য থেকে হয় সম্পূর্ণ বঞ্চিত। এই আনন্দ ও প্রশান্তিই কবরে বসন্ত-সজীব সবুজ বাগিচার রূপ ধারণ করে। তদ্রূপ হৃদয়ের সংকীর্ণতা ও আবিলতাই যন্ত্রণাদায়ক জেলখানার রূপ ধরে হাযির হয়। পৃথিবীতে মানুষের সিনায় বিদ্যমান কলবের যে অবস্থা ছিল সে অবস্থাই তার হবে কবরের নিঃসঙ্গ জীবনে। এখানের আনন্দ সেখানেও আনন্দের রূপ ধারণ করবে এবং এখানের অশান্তি সেখানেও অশান্তির কারণ হবে। তবে (রোগ, ব্যাধি, দারিদ্র ও অন্যান্য কারণে) পৃথিবীতে ঈমানদারদের যে সাময়িক কষ্ট ও অশান্তি দেখা দেয় তদ্রূপ (সম্পদ ও ক্ষমতা এবং ভোগ ও পাশবিকতার মাধ্যমে) কাফির ও গাফিল ব্যক্তিরা যে ক্ষণিক সুখ লাভ করে তা মোটেই উল্লেখযোগ্য নয়। হৃদয়ে সর্বক্ষণ বিদ্যমান থাকা স্বভাবের অবস্থাই হলো বিবেচ্য।

'শরহে সদর' লাভের জন্য হৃদয়কে সেই সব ঘৃণ্য দোষ ও বৃত্তি থেকে অবশ্যই মুক্ত করতে হবে যা হৃদয়ে সংকীর্ণতা ও অস্বস্তি সৃষ্টি করে এবং কলবের আরোগ্য লাভে প্রতিবন্ধক হয়। 'শরহে সদর' লাভের উপায়গুলো

আয়ত্ত্ব করার সাথে সাথে উপরিউক্ত ঘৃণ্য দোষগুলো থেকে কলবকে পবিত্র না করলে 'শরহে সদরের' উল্লেখযোগ্য অংশ থেকেই মানুষ মাহরূম হবে। বড় জোর এই হবে যে, তার ভিতরে দু'টি বিপরীত উপাদানের দ্বন্দ্ব ও সংঘাত চলতে থাকবে। তদ্রূপ অপয়োজনীয় বিষয়সমূহ দেখা, শোনা, ও বলা এবং বিনা প্রয়োজনে মেলামেশা, পানাহার, নিদ্রা ইত্যাদি পরিহার করে চলাও জরুরী। কেননা এ অপয়োজনীয় বোঝাগুলো কলবের জন্য আযাব, কষ্ট ও বিপদের কারণ এবং হৃদয়ের সংকীর্ণতা ও রুদ্ধতার উৎস। এগুলোর কারণে মানব হৃদয় ভীষণ কষ্ট বোধ করে। দুনিয়া-আখিরাতের অধিকাংশ কষ্ট ও আযাব মূলত এগুলোরই ফল। হায় আল্লাহ্! এই বিপদসংকুল মরুভূমিতে দৌড়ঝাঁপ করেই যার জীবন কেটে যায় সে কতই না পেরেশানি, বিপর্যস্ততা ও সংকীর্ণচিত্ততার মাঝে দিন যাপন করে। পক্ষান্তরে সেই ভাগ্যবান ব্যক্তির সুখ-শান্তি ও হৃদয়ের প্রফুল্লতার কি কোন সীমা -পরিসীমা আছে যে তার জীবন ও চরিত্রের সবকটি উত্তম স্বভাব ও গুণ ধারণ করে রেখেছে? এর কর্মে ও আচরণে সেগুলোর প্রকাশ ঘটাচ্ছে? এদের সম্পর্কেই তো ইরশাদ হয়েছে ঃ ان الابرار لفى نعيم। নিঃসন্দেহে সৎ লোকেরা জান্নাতে আছে। অতঃপর প্রথমোক্তদের সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ ان الفجار لفى جحيم (নিঃসন্দেহে অসৎ লোকেরা জাহান্নামে আছে)। এ উভয় অবস্থারই অবশ্য বহু স্তর রয়েছে এবং স্তর থেকে স্তরের তফার্ত ও দূরত্বের সঠিক 'ইলম আল্লাহ্‌রই শুধু রয়েছে। মোট কথা, সজীবতা লাভের জন্য প্রয়োজনীয় 'শরহে সদর' তথা হৃদয়ের প্রশস্ততা ও আত্মার স্বভাব ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র রসূল (স.) ছিলেন সৃষ্টি জগতে সকলের চেয়ে পূর্ণ, সকলের চেয়ে অগ্রগামী। সেই সাথে স্থুল ও দৈহিক দিক থেকেও তাঁর 'শরহে সদর' এমন ছিলো যার সমকক্ষ পৃথিবীর অন্য কোন মানুষ হতে পারে না।[১] যে মানুষ রসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের পদাংক অনুসরণে যত অধিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হবে 'শরহে সদর' ও হৃদয়ে প্রশস্ততাজনিত সুখ ও শান্তির সম্পদ ঐশ্বর্য সে তত অধিক লাভ করবে। বলা বাহুল্য যে, কাজ প্রশস্তকরণ, ভার অপসারণ এবং স্বনামধন্য উচ্চ মর্যাদা ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রেই আল্লাহ্‌র রসূল (স) শীর্ষতম সোপানে[২] এবং চূড়ান্ত

১। উল্লেখ্য যে, এই শরহে সদর মুলত বক্ষ বিদীর্ণ করণেরই ফলশ্রুতি ছিল। এ ঘটনা সম্পর্কে আহলে সুন্নতের সকল প্রাজ্ঞ আলিম ও সীরাতকার একমত। যাদু-মা'আদে হাফিজ ইবনু'ল কায়্যিমও তা উল্লেখ করেছেন।

২। "আমি কি তোমার বক্ষ সম্প্রসারিত করি নাই? আর তোমার বোঝা কি নামিয়ে সেই দেই নাই যা তোমার পৃষ্ঠদেশ বাঁকা করে দিয়েছিল। আর তোমার স্মরণকে শীর্ষতম সোপানে উন্নীত করেছি।" [আল-কুরআন]

বিন্দুতে অবস্থান লাভ করেছিলেন। সুতরাং উম্মতও তাঁর পদাংক অনুসরণ অনুপাতে এ সম্পদ ও নিয়ামতের অংশ পেতে থাকবে।[১]

গ্রন্থকার প্রতিটি ইবাদতের আহকাম ও মাসায়েল বর্ণনার পূর্বে সেগুলোর অবতরণকাল, হিকমত ও তত্ত্ব এবং কল্যাণ ও তাৎপর্য সম্পর্কেও বিশদ আলোচনা করেছেন। বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে তা যেমন সবাঙ্গীন ও পূর্ণাঙ্গ তেমনি আঙ্গিকের দিক থেকেও তা আকর্ষণীয় ও হৃদয়গ্রাহী। এখানে আমরা একটি মাত্র নমুনা পেশ করছি ঃ

সিয়ামের উদ্দেশ্য হলো নফসের কুপ্রবৃত্তিগুলোকে দমন করা এবং মানুষের মধ্যে অভ্যস্ত ও প্রিয় জিনিসগুলো থেকে বিরত থাকার অভ্যাস ও শক্তি সৃষ্টি করা এবং তার রিপুশক্তিতে এতটা ভারসাম্য সৃষ্টি করা যাতে তার অন্তরে চিরন্তন সৌভাগ্য লাভের প্রেরণা সৃষ্টি হয়। সেই সাথে ক্ষুধা-পিপাসার মুকাবিলা করার পর্যাপ্ত শক্তি সৃষ্টি করাও সিয়ামের উদ্দেশ্য। সিয়াম আমাদেরকে মানুষের ক্ষুধার্ত কলিজার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আমরা বুঝতে পারি, পৃথিবীর লাখ লাখ আদম সন্তান অহরহ কিয়ামতের কি কঠিন আযাব ভোগ করছে, যারা জঠর জ্বালা নিবারণের জন্য পায় না এক মুঠো অন্ন এবং পিপাসাকাতর কলজে ঠাণ্ডা করার জন্য এক কাৎরা পানি। পানাহার ও কামরিপু নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সিয়াম শয়তানকে মানুষের জীবনে তার শয়তানী ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটাতে দেয় না, বরং বাধা দেয়। ফলে পরকালীন জীবনের চিন্তা বাদ দিয়ে প্রতি মুহূর্ত নফসের পায়রবী করার অভিশাপ থেকে সে মুক্তি পায়। সিয়াম মানুষের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে স্থিরতা ও প্রশান্তি আনে, তার পাশবিকতা ও উন্মত্ততা দমন করে এবং রিপুগুলোর মুখে মযবুত লাগাম এঁটে দেয়। সিয়াম হচ্ছে মুত্তাকীদের জন্য লাগাম, নফস ও আত্মার স্থায়ী যুদ্ধে আত্মার জন্য ঢাল এবং নৈকট্য প্রত্যাশী নেককারদের জন্য এক সফল মুজাহাদা ও সাধনা। মানুষের সমস্ত আমলের মধ্যে একমাত্র সিয়ামই হচ্ছে আল্লাহ্‌র জন্য বিশিষ্ট। একজন সিয়াম সাধক আসলে কি করেন? তার মা'বুদ ও মাহবুবের সন্তুষ্টি লাভের জন্য পাশবিকতা ও ভোগের চাহিদা দমন করেন। সুতরাং সিয়ামের অর্থ হচ্ছে আল্লাহর মুহব্বত ও ভালোবাসা এবং রেযা ও সন্তুষ্টির পথে পাশবিক সুখ ও ভোগ বর্জনের মাধ্যমে এক মহান ত্যাগ ও কুরবানী পেশ করা। সিয়াম হচ্ছে বান্দা ও আল্লাহ্‌র মাঝে এক গোপন রহস্য, যা অবগত হওয়া অন্য কারো পক্ষে সম্ভব নয়। অন্যদের এটা তো জানা সম্ভব যে, সিয়াম সাধক নিষিদ্ধ বিষয়গুলো বর্জন করেছে। কিন্তু সেটা সে মা'বূদের রেযা ও সন্তুষ্টি লাভের

১. যাদুল-মা'আদ, ১৫৮ থেকে ১৬০ পৃ. ১ম খণ্ড (নিজামী);

"উদ্দেশ্য"বর্জন করেছে, এ জানা সম্ভব নয়। এ হলো বান্দার কলব ও হৃদয়ের এমন এক সুগোপন ভাব ও অনুভূতির নাম যা অন্য কারো পক্ষে জানা অসম্ভব। এটাই হচ্ছে সিয়ামের হাকীকত। দৈহিক ও আত্মিক শক্তির হিফাজত, সংরক্ষণ ও অপচয় রোধেও সিয়ামের বিস্ময়কর অবদান রয়েছে। সিয়াম হচ্ছে সেই পাশবিক আবর্জনাগুলোর বিরুদ্ধে এক সার্থক রক্ষা-ব্যবস্থা যা মানুষের ওপর পূর্ণ প্রভাব ও আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হলে তার আত্মা ও চরিত্রে পচন ধরিয়ে ছাড়ে। সেই সাথে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর উপাদানগুলো থেকেও সিয়াম মানুষের শরীরকে মুক্ত করে। সুতরাং সিয়াম যুগপৎ দেহ ও আত্মার স্বাস্থ্য রক্ষা করে এবং পাশবিক স্বেচ্ছাচারিতায় বিধ্বস্ত স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রেও তা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। সিয়াম তাকওয়ার মহৎ গুণ অর্জনের অত্যন্ত সহায়ক ইবাদত। এজন্যই ইরশাদ হয়েছে ঃ

يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون -

হে ঈমানদারগণ ! তোমাদের ওপর সিয়ামের বিধান ফরয করা হলো যেমন করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর। আশা করি তোমরা মুত্তাকী হতে পারবে। (বাকারা-১৮৩) ; এ কারণেই আল্লাহ্‌র রসূল (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ الصوم جنة। (সিয়াম ঢালস্বরূপ)। এজন্যই বিবাহের সামর্থ নেই অথচ কামশক্তি প্রবল, এমন ব্যক্তিদের সিয়াম সাধনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মোটকথা, সিয়ামের কল্যাণ ও উপকারিতা এত স্পষ্ট ও অবধারিত যে, মানুষের সুস্থ বুদ্ধি সহজেই তা উপলব্ধি করতে পারে। জাগ্রত অনুভূতি অনায়াসেই তা অনুভব করতে পারে। তাই বান্দাদের জন্য রহমত ও অনুগ্রহরূপে এবং দেহ ও আত্মার জন্য ঢাল ও রক্ষাকবচ হিসেবে সিয়ামের বিধান আল্লাহ্ পাক ফরয করেছেন। এ ক্ষেত্রে রসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের কর্মপন্থাই ছিল সর্বোত্তম ও পূর্ণাঙ্গ। কেননা আমাদের দিক থেকে তা হলো সবচেয়ে সহজ ও স্বভাব অনুকূল, আবার উদ্দেশ্য হাসিলের দিক থেকে সবচেয়ে কার্যকর ও সফল। মানুষের পক্ষে তার অভ্যস্ত ও প্রিয় বিষয়গুলো বর্জন করা যেহেতু কষ্টসাধ্য ও সময়-সাপেক্ষ বিষয়, সেহেতু সিয়ামের বিধান ফরয করার ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করা হয়নি; বরং হিজরতের পরে ইসলামের মধ্যবয়সে তা ফরয করা হয়েছে। মুসলমানদের স্বভাব ও তবিয়ত ইতিমধ্যে তাওহীদ ও সালাতসহ বিভিন্ন আহকামে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। সিয়াম ফরয হয়েছিল দ্বিতীয় হিজরীতে। সুতরাং রসূল (স.) জীবনে একে একে নয়টি রমযানের সিয়াম পালন করেছেন। সিয়াম ফরয করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রজ্ঞাসম্পন্ন পর্যায়ক্রমের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

প্রথমে মুসলমানদের সিয়াম পালন কিংবা 'ফিদয়া'[১] আদায় করার এখতিয়ার ছিল। পরবর্তীতে এ ব্যবস্থা রহিত করে সিয়াম বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হয়। তবে সিয়াম পালনে অক্ষম বৃদ্ধদের ক্ষেত্রে ফিদয়া প্রদানের অবকাশ এখানো আছে। (বিস্তারিত বিবরণ ফিকহ্ বিষয়ক গ্রন্থসমূহে দেখুন) অসুস্থ ও মুসাফিরকে রমযানের পরিবর্তে পরে কাযা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। গর্ভবতী ও দুগ্ধবতী মহিলাদের ক্ষেত্রেও গর্ভস্থিত সন্তানের কিংবা দুগ্ধপোষ্য শিশুর প্রাণের আশংকা দেখা দিলে সিয়াম স্থগিত রাখার অনুমতি রয়েছে।

হজ্জ অধ্যায় হলো কিতাবের সর্বাধিক আলোড়ন সৃষ্টিকারী অংশ। এ অধ্যায়ে গ্রন্থকার সুগভীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা এবং বিস্ময়কর দূরদৃষ্টি ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের সুস্পষ্ট সাক্ষর রেখেছেন। হজ্জ মাসায়েল এবং রসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের বিদায় হজ্জ সম্পর্কে এমন সারগর্ভ, তথ্যবহুল, তাত্ত্বিক ও বিস্তৃত আলোচনা আর কোন কিতাবে এই অধমের চোখে পড়েনি। গোটা হজ্জ অধ্যায়টি মিসরী সংস্করণের ১৮০ পৃষ্ঠা থেকে ৩৪৯ মোট ১৬৯ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বিস্তৃত।

বিদায়ের হজ্জের বিবরণ দিতে গিয়ে মদীনার যাত্রা থেকে শুরু করে ফিরে আসা পর্যন্ত দীর্ঘ সফরের ধারাবাহিক ঘটনা এমন সুন্দরভাবে তিনি তুলে ধরেছেন যে, পাঠকের সামনে এই মুবারক সফরের একটা পূর্ণাঙ্গ ও জীবন্ত ছবি ফুটে ওঠে। সত্যি বলতে কি, আলোচ্য অধ্যায়টি হজ্জ সংক্রান্ত গোটা হাদীস ভাণ্ডারের সার-নির্যাস এবং বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয়ের এক সুন্দরতম সংগ্রহ হয়ে উঠেছে।[২] হজ্জের মত বিরোধপূর্ণ বহু মাসায়েল সম্পর্কেও তিনি পর্যাপ্ত আলোকপাত করেছেন এবং হাদীস ভিত্তিক স্বাধীন ইজতিহাদ প্রয়োগ করে নিজস্ব সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। এ ক্ষেত্রে তাঁকে বিশেষ কোন ফিকহী মাযহাবের অনুসারী মনে হয়নি। যেমন হাম্বলী মাযহাবের মুকাল্লিদ হওয়া সত্ত্বেও অকাট্য যুক্তি ও তথ্যের আলোকে তিনি প্রমাণ করেছেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হজ্জে 'কিরান' করেছেন, 'ইফরাদ বা তামাত্তু নয়।[৩] এমনকি রসূল (স.)-এর হজ্জে কিরান আদায়ের বিবরণ দিতে গিয়ে নেতৃস্থানীয় পূর্বসূরী ও উত্তরসূরী আলিমগণ যে সকল ভুল-ভ্রান্তির শিকার হয়েছেন, বস্তুনিষ্ঠ তথ্য-প্রমাণের আলোকে সেগুলো তিনি চিহ্নিত করেছেন। সাথে সাথে তাঁদের ভুলের উৎস ও কারণও উল্লেখ করেছেন।[৪]

---

১. অক্ষম ব্যক্তিদের প্রতিদিনের সিয়ামের পরিবর্তে একজন মিসকীনকে আহার করানো।

২. যাদু'ল-মা'আদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২৬-২৪৬।

৩. ঐ, পৃ. ১৮৫-১৯০

৩. ঐ, পৃ. ১৮৫-১৯০

এ প্রসঙ্গে তাবি'ঈগণের কাতারে হযরত তাউস, পরবর্তী পূর্বসূরীদের কাতারে আল্লামা তাবারী এবং উত্তরসূরী ইমামদের কাতারে কাযী 'ইয়ায ও আল্লামা ইবনে হাযমের মত পথিকৃত ও দিকপাল ব্যক্তিবর্গের ভুল-ভ্রান্তি তুলে ধরতেও তিনি পিছ-পা হন নি।[১] এখানে তাঁর জ্ঞানের পরিপক্কতা, মর্যাদা ও গুরুত্ব এবং গ্রন্থকারের ইমামত ও বৈদগ্ধ প্রমাণের জন্য হজ্জ অধ্যায়টিই যথেষ্ট।

স্বীয় উস্তাদ ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র রুচি ও স্বভাবের প্রভাবে এবং নিজস্ব বৈদগ্ধ ও দূরদৃষ্টির তাকীদে স্থানে স্থানে তিনি আকায়িদ ও কালাম শাস্ত্রীয় আলোচনার স্বচ্ছন্দ অবতারণা করেছেন এবং শরীয়তের রূহ ও প্রাণ তুলে ধরার সার্থক প্রয়াস চালিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তাওয়াক্কুলের হাকীকত ও আসবাব গ্রহণের বৈধতা সম্পর্কে যে গবেষণাধর্মী ও তথ্যবহুল আলোচনা তিনি পেশ করেছেন এক কথায় তা অনবদ্য ও উপভোগ্য।[২]

রসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সালামের গাযওয়া যুদ্ধসমূহের বিবরণ শুরু করার পূর্বে রীতিমাফিক জিহাদের হাকীকত ও তাৎপর্য এবং এর স্তর ও পর্যায় সম্পর্কে তথ্য ও তত্ত্বপূর্ণ বক্তব্যের অবতারণা করেছেন।[৩] অতঃপর ইসলামী দাওয়াতের সূচনা, মক্কার ঘটনাপ্রবাহ, মদীনায় হিজরত, জিহাদের ফরয বিধান অবতরণ, মালে গনীমত বন্টন, সন্ধি ও নিরাপত্তা, জিযয়া কর এবং আহলে কিতাব ও মুনাফিকদের সাথে আচরণ ইত্যাদির আহকাম ও বিধান বিস্তারিতভাবে লিখেছেন।[৪] জিহাদ ফরয হওয়ার হিকমত ও তাৎপর্য বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি জান্নাতের হাকীকত এবং জান্নাতের অফুরন্ত নিয়ামতের তুলনায় মানুষের জান ও মাল যে কত তুচ্ছ ও নগণ্য- তাও তুলে ধরেছেন বেশ ঈমান উদ্দীপক ভাষায়। এখানে এসে তাঁর ঈমানী তেজ ও লেখনী শক্তি উভয়ের সার্থক সমন্বয় ঘটেছে বলে মনে হয়। তিনি লিখেছেন ঃ

> মানুষ তার জান-মালকে জানমালের মালিকের রাস্তায় ব্যয় করবে, এটাই হলো প্রেম ও মুহব্বত এবং জান্নাত ও তার অফুরন্ত নিয়ামতের দাবী। কেননা মু'মিনের জান-মাল তিনি খরিদ করে নিয়েছেন। কোন ভীরু অপদার্থের ও শূণ্যহস্ত ফকীরের সাধ্য কি এমন পণ্যের দাম হাঁকে। আল্লাহর কসম! এ কোন অচল পণ্য নয় যে, ভীরু, দুর্বল ও ফকীর-মিসকীন এর দরাদরি করতে পারে এবং এ পণ্যের বাজার এত মন্দা নয় যে, অভাবী নাখাস্তা লোকও তা করযরূপে চাওয়ার সাহস করতে পারে। এ পণ্য তো

১. যাদু'ল-মা'আদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪৯-২৫১।
২. ঐ পৃ. ২৬৪-২৬৬।
৩. ঐ পৃ. ২৯১-২৯৪।
৪. ঐ, পৃ. ২৯৫-৩৩২।

জহুরী ও সমঝদারদের বাজারে বিক্রির জন্য ছাড়া হয়েছে। জান্নাতের মালিক তো জানের চেয়ে কম মূল্যে তার পণ্য বেচতে রাযী নন। ভীরু অপদার্থের দল তো মূল্য শুনেই পিছিয়ে এসেছে। আর প্রেমিক মজনূর দল হুড়োহুড়ি করে এগিয়ে গেছে জানের বাজি লাগাতে যে, মালিক দয়া করে তার জানটা যদি জান্নাতের মূল্যরূপে কবুল করেন। শেষ পর্যন্ত এ মহাপণ্য সেই পূণ্যাত্মাদের হাতে চলে গেল যারা মু'মিন ভাইদের প্রতি ছিলেন সদয় ও বিনম্র, কিন্তু কাফিরদের বেলায় ছিলেন বজ্র কঠোর। 'ইশক ও প্রেমের দাবীদারদের সংখ্যা যখন বেড়ে গেল তখন তাদের কাছে দাবীর সত্যতার প্রমাণ তলব করা হলো। কেননা বিনা প্রমাণে সবার দাবী স্বীকার করে নিলে আশিক মজনূ আর ভণ্ড মজনূর মাঝে পার্থক্য করার কোন উপায় থাকবে না। দাবীদাররা হর কিসিমের প্রমাণ পেশ করল কিন্তু তাদের বলা হলো বাছাই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া ছাড়া তোমাদের দাবী গৃহীত হবে না।

قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله -

আপনি বলে দিন, আল্লাহ্‌কে সত্যই যদি তোমরা ভালোবাস তাহলে আমার অনুসরণ কর। আল্লাহ্ তোমাদের ভালোবাসবেন।

এ কঠিন পরীক্ষার কথা শুনে সবাই পিছিয়ে গেল। কাজে-কর্মে, আচরণে, অভ্যাসে ও চরিত্রে তথা জীবনের সর্বক্ষেত্রে যারা রসূল (সা)-এর সত্যিকার অনুসারী ছিলেন তারাই শুধু নিজেদের দাবীতে অটল থাকলেন। অতঃপর চূড়ান্ত পরীক্ষার মানদণ্ড ঘোষণা করে ইরশাদ হলো ঃ

يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لائم -

"আল্লাহ্‌র পথে তারা জিহাদ করে এবং নিন্দুকের নিন্দা বা সমালোচনার মোটেই পরওয়া করে না।" এবার কিন্তু প্রেম ও মুহব্বতের অধিকাংশ দাবীদার কেটে পড়ল। মুজাহিদরাই শুধু টিকে রইল। তখন তাদের লক্ষ্য করে বলা হল, এখন থেকে আশিক ও প্রেমিকদের জান-মালে তাদের মালিকানা নেই। সুতরাং যে পণ্যের সওদা হয়ে গেছে তা প্রকৃত মালিককে বুঝিয়ে দাও।

ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة -

নিঃসন্দেহে আল্লাহ, মু'মিনদের নিকট থেকে তাদের জান-মাল খরিদ করে নিয়েছেন এই শর্তে যে, তাদেরকে জান্নাত দেওয়া হবে।

বিক্রয় চুক্তি হয়ে যাওয়ার পর বিক্রেতা ও ক্রেতার কর্তব্য হল পণ্য বুঝিয়ে দেওয়া এবং মূল্য পরিশোধ করা। ব্যবসায়ীরা যখন ক্রেতার মর্যাদা, দয়া, মহিমা, ক্ষমতার সর্বব্যাপকতা প্রত্যক্ষ করল এবং মূল্যরূপে প্রাপ্তব্য চিরস্থায়ী

জান্নাতের অফুরন্ত নিয়ামত সম্পর্কে অবগত হলো তখন তাদের বুঝতে বাকি রইল না যে, জানমালের এ সওদাবাজিতে তারা দারুণ জেতা জিতেছে। এখন ক্ষণস্থায়ী জীবনের মোহে পড়ে এ বিক্রয় চুক্তি প্রত্যাহার করা হবে সীমাহীন বোকামী ও নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। তাই তারা খরিদদারের প্রতিনিধির হাতে সানন্দে ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেদের সমস্ত ইচ্ছা ও এখতিয়ার বিলুপ্ত করে বায়আতে রিযওয়ানে শরীক হলো। নবীর হাতে হাত রেখে তারা শপথ করল—এ মূল্য কখনো আমরা ফেরত নেব না এবং বিক্রয় চুক্তি প্রত্যাহারেরও আবেদন জানাব না। মোটকথা, ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি পূর্ণাঙ্গ হয়ে গেছে এবং তারা তাদের সব কিছু সোপর্দ করে দিয়েছে তখন তাদের বলা হল—তোমাদের জীবন ও সম্পদ এখন থেকে আমার হয়ে গেছে এবং এখন তা কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে আমি তোমাদের ফিরিয়ে দিচ্ছি।

ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله امواتا بل احياء عندربهم يرزقون -

"আল্লাহর রাস্তায় যারা নিহত হয়েছে তাদের মৃত মনে কর না। আপন প্রতিপালকের কাছে তারা জীবিত, তাদের রিযিক প্রদান করা হয়।" লাভের লোভে আমি তোমাদের জান-মাল দাবী করিনি। আমি শুধু আমার দান ও দয়ার প্রকাশ ঘটাতে চেয়েছি। দেখছ না, কেমন তুচ্ছ ও নগণ্য জিনিস নিয়ে কী বিরাট ও অফুরন্ত মূল্য তোমাদের হাতে তুলে দিলাম! তদুপরি তোমাদের জান-মাল তোমাদের জন্যই আমি সঞ্চিত করে রেখেছি। এখানে হযরত জাবির (রা)-এর ঘটনা স্মরণ করুন। রসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁর কাছ থেকে একটি উট খরিদ করলেন। তদুপরি বিক্রিত উট ফেরতও দিলেন। তাঁর পিতা ওহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। আল্লাহ্ পাক তাঁর পিতার সাথেও অনুরূপ মু'আমালা করলেন। আল্লাহ্ তাকে জীবিত করে আবরণ সরিয়ে সরাসরি কালাম করলেন, হে আমার বান্দা! কী চাওয়ার আছে তোমার, বলো। মানুষ তার ক্ষুদ্র অনুভূতি ও উপলব্ধি দ্বারা আল্লাহ্র দয়া ও করুণা এবং দান ও ইহসানের কতটুকুই বা অনুভব করতে পারে? এ জান-মাল আল্লাহ্ই তো দিয়েছেন। বিক্রয় চুক্তি সম্পাদনের তাওফীকও তিনিই দিয়েছেন। যাবতীয় দোষ ও খুঁত সত্ত্বেও দয়া করে সে মাল কবূল করেছেন এবং বান্দার হাতে কল্পনাতীত মূল্য তুলে দিয়েছেন। নিজের দেওয়া মাল দিয়েই নিজের বান্দাকে খরিদ করেছেন। তদুপরি বান্দার তিনি প্রশংসা করেছেন, অথচ তাঁর দেয়া তাওফীক ছাড়া বান্দার পক্ষে এ বিরাট সওদা করা সম্ভব ছিল না। আল্লাহ্র পথে আহবানকারী রসূল (স) সাহসী ও আত্মসম্মানবোধসম্পন্নদের আল্লাহ্র ও জান্নাতের দিকে ডাকলেন। ঈমানের

নকীব বিবেকসম্পন্নদের আহ্বান শোনালেন । ফলে জান্নাতের আশায় আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুসন্ধানকারী যাত্রী দলের মাঝে মহাযাত্রার এক অভূতপূর্ব কোলাহল জেগে উঠল এবং আশা-প্রত্যাশার স্বর্ণতোরণ পেরিয়ে মনযিলে মকসূদে পৌছার পূর্ব পর্যন্ত কারো মনেই যেন স্বস্তি নেই। আছে শুধু ব্যাকুল প্রতীক্ষার আনন্দ-বেদনা।[1]

অতঃপর হাফিজ ইবনু'ল-কায়্যিম রসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লামের গাযওয়া, প্রতিনিধি প্রেরণ ও অন্যান্য ঘটনার ধারাবাহিক ও বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেছেন। হাদীছ ও সীরাত উভয় শাস্ত্রেই তাঁর সুগভীর ও সুতীক্ষ্ণ নজরে ছিল। ঐতিহাসিক ও সমালোচক হওয়ার পাশাপাশি তিনি ছিলেন একজন যুগ-অনন্য মুহাদ্দিছ। তাই আলোচ্য গ্রন্থের এ অংশটি অন্যান্য সীরাত গ্রন্থের তুলনায় অধিকতর মূল্যবান, সারগর্ভ ও তথ্যনির্ভর হয়েছে। মতানৈক্যপূর্ণ বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্তই হবে চূড়ান্ত। গাযওয়া ও ঘটনাবলীর ধারা বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে তিনি তাঁর স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে বিভিন্ন আয়াতের তাফসীর ও সূক্ষ্ম তত্ত্বসমূহও পেশ করেছেন উদারতার সাথে।[2] গাযওয়াসমূহের আলোচনায় তাঁর অনুসৃত রীতি এই যে. প্রতিটি গাযওয়ার পর তিনি ফিকহসংক্রান্ত একটি পরিচ্ছেদ লিখেছেন এবং সংশ্লিষ্ট ঘটনা থেকে সম্ভাব্য যাবতীয় ফিকহী মাসায়েল আহরণপূর্বক সবিস্তারে তা বর্ণনা করেছেন। যেমন খয়বর, মক্কা, হুনায়ন ও আওতাস বিজয়ের ঘটনা বর্ণনার পর যথাক্রমে ঃ

فيماكان فى غزوة خيبر من الاحكام الفقهية ـ فصل فى اشارة الى مافى هذه الغزوة من الفقه واللطائف فصل الى اشارة ماتضمنت هذه الغزوة من المسائل الفقهية والنكت الحكمية ـ

শিরোনামে সংশ্লিষ্ট ঘটনা থেকে আহরিত ফিকহী মাসায়েলগুলো গ্রন্থবদ্ধ করেছেন। প্রতিটি পরিচ্ছেদেই ফিকহশাস্ত্রের অত্যন্ত মূল্যবান তথ্য ও মসলা-মাসায়েল পরিবেশিত হয়েছে।

গাযওয়া বর্ণনায় পূর্ববর্তী সীরাত বিশারদদের তথ্য ও গবেষণা দ্বারা তিনি উপকৃত হয়েছেন সত্য, তবে তা অনুকরণসর্বস্ব নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি পূর্ববর্তীদের সর্বস্বীকৃত মতামত সম্পর্কেও প্রশ্ন তুলে নিজস্ব অধ্যয়ন ও প্রজ্ঞার ফসল পেশ করেছেন। বর্ণনা মুতাবিক সাধারণভাবে এটাই ধারণা করা হয় যে, মদীনার আনসারী কিশোরীদের নিম্নোক্ত স্বাগত সঙ্গীতটি,

طلع البدر علينا　　　من ثنيات الوداع

১. যাদু'ল-মা'আদ. পৃ. ৩১১-৩১২।

২. যাদু'ল-মা'আদ. পৃ. ৩৫২।

وجب الشكر علينا ما دعا لله داع

ايها المبعوث فينا جئت بالامر المطاع

হিজরত কালে রসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের মদীনায় শুভাগমন উপলক্ষে গীত হয়েছিল। কিন্তু হাফেজ ইবনু'ল-কায়্যিম এ ধারণার সাথে ভিন্নমত পোষণ করে বলেন যে, সঙ্গীতটি আসলে (মদীনা শরীফ থেকে সিরিয়ার দিকে অবস্থিত) তাবূক থেকে ফেরার সময় রসূলুল্লাহ (স)-কে স্বাগত জানিয়ে গীত হয়েছিল। তিনি লিখেছেন ঃ

وبعض الرواة بهم فى هذا ويقول انما كان ذالك عند مقدمه المدينة من مكة وهو وهم ظاهر فان ثنياة الوداع انما هى من ناحية الشام لا يراها القادم من مكة الى المدينة ولايمر بها الا اذا توجه الى الشام -

ভূল ধারণার শিকার হয়ে কতিপয় বর্ণনাকারী বলেন যে, আলোচ্য গীতটি মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতকালে গাওয়া হয়েছিল। এটা পরিষ্কার ভুল। কেননা الوداع। হচ্ছে সিরিয়ার দিকে অবস্থিত। মক্কা থেকে আগত কাফেলার সামনে তা পড়তে পারে না। সিরিয়া অভিমুখী না হলে তা সামনে পড়ার কথা নয়।[১]

গাযওয়া তাবূক বর্ণনার পরও তিনি যথারীতি বিস্তারিতভাবে সংশ্লিষ্ট ফিকহী মাসায়েল গ্রন্থবদ্ধ করেছেন। তাতে বেশ কিছু সূক্ষ্ম ইজতিহাদ এবং গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও নাগরিক বিষয়ও স্থান পেয়েছে। গাযওয়ার আলোচনা শেষে দরবারে রিসালাতে বিভিন্ন আরব প্রতিনিধি দলের আগমন[২] এবং দরবারে রিসালাত থেকে বিভিন্ন সম্রাট ও শাসকদের নামে চিঠি ও প্রতিনিধি দল প্রেরণের বিস্তারিত বিবরণও ইবনু'ল-ক্যায়িম তুলে ধরেছেন।[৩]

দ্বিতীয় খণ্ডের বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে নববী চিকিৎসা প্রসংগ অর্থাৎ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জনকে রসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম যে চিকিৎসা ও ব্যবস্থা-পত্র দিয়েছেন সেগুলোর বিস্তারিত আলোচনা। এ প্রসঙ্গে তিনি চিকিৎসাশাস্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে নববী চিকিৎসার রহস্য, তাৎপর্য ও উপযোগিতা তুলে ধরেছেন। অবশ্য ফাঁকে ফাঁকে ফিকহ ও হাদীস সংক্রান্ত আলোচনাও রয়েছে

১. যাদু'ল-মা'আদ. পৃ. ৪৬৬ ;
২. ঐ, পৃ. ৪৬৯-৪৮২;
৩. ঐ, পৃ. ৪৮৩-৫১৮;

যথারীতি।[১] কঠোর পরিশ্রম ও সাধনার মাধ্যমে ইবনু'ল-কায়্যিম যে মূল্যবান কাজটি করেছেন তা এই যে, বর্ণানুক্রমানুসারে ঐ সকল ঔষধ ও উপকরণের নাম তিনি সংগ্রহ করেছেন যা বিশুদ্ধ, দুর্বল কিংবা অন্তত কোন জাল হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর চিকিৎসাশাস্ত্রের আলোকে গবেষণাধর্মী বিশ্লেষণের ম্যাধমে সেগুলোর চিকিৎসা গুণাগুণও তুলে ধরেছেন একজন সর্বদর্শী চিকিৎসা বিজ্ঞানীর মত।[২] নববী চিকিৎসা অধ্যায়ে দেহজ রোগ ও চিকিৎসার পাশাপাশি কলব ও আত্মার ব্যাধি ও চিকিৎসা প্রসঙ্গ তিনি টেনেছেন এবং 'ইশ্‌ক ও প্রেমজাত ব্যাধি, 'ইশ্‌ক ও মুহব্বতের হাকীকত ও প্রকৃতি, কারণ ও প্রকার এবং প্রেমজাত ব্যাধি ও চিকিৎসা সম্পর্কে এমন সারগর্ভ, তত্ত্বপূর্ণ ও বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা পেশ করেছেন যা মানব স্বভাব ও মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর সুগভীর জ্ঞান ও বিস্তৃত পড়াশোনার কথা যেমন প্রমাণ করে, তেমন জীবন ও জীবন-সমস্যা এবং হৃদয়ঘটিত ব্যাধি সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানের উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করে।[৩]

নববী চিকিৎসার প্রকৃতি অবশ্য সেটাই যা শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাহ্ (র) লিখেছেন। অর্থাৎ এ চিকিৎসা ওয়াহী ও শরীয়ত নির্ভর নয় ; বরং নিজস্ব চিকিৎসা জ্ঞান এবং আরবদের অভ্যাস ও অভিজ্ঞতা-নির্ভর।[৪] তবু রসূল (স) এর প্রতিটি বাণী ও নির্দেশের ওপর যারা ভক্তি, ভালোবাসা, বিশ্বাস ও র্নিভরতার সাথে আমল করতে অভ্যস্ত-তাদের জন্য হাফিজ ইবনু'ল কায়্যিমের 'যাদু'ল-মা'আদ' সত্যি এক মহা মূল্যবান তথ্য-ভাণ্ডার।

আলোচনা অধ্যায় শেষ করে হাফিজ সাহেব দরবারে রিসালতের বিচার ও ফয়সালা-সংক্রান্ত আলোচনা শুরু করেছেন এবং অভ্যাস মাফিক এ অধ্যায়েও ফিকহ ও মু'আমালা সংক্রান্ত তত্ত্ব, তথ্য ও মাসায়েলের এক বিশাল ও মূল্যবান ভাণ্ডার গড়ে তুলেছেন।[৫] এভাবে উম্মাহকে এমন এক বহুমুখী গ্রন্থ তিনি উপহার দিয়েছেন যাতে ফিকহ, হাদীস, তাফসীর থেকে শুরু করে সীরাত, ইতিহাস ও কালামশাস্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় আলোচনাগুলো আমাদের জন্য সহজলভ্য হয়ে উঠেছে।

আলোচ্য গ্রন্থের একমাত্র সমালোচনার দিক এই যে, তাতে প্রায় সকল ইসলামী শাস্ত্র মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। ফলে প্রয়োজনীয় বিষয়টি খুঁজে পাওয়া হয়ে পড়েছে মহা দুষ্কর। সম্ভবত আলোচ্য গ্রন্থ রচনার সময় আপন শায়খের প্রভাব তাঁর ওপর পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান ছিল।

---

১. যাদু'ল মা'আদ ২য় খণ্ড, পৃ. ২-১৪১ ;
২. যাদু'ল-মা'আদ. খ. ২,পৃ. ৮-৬২-১৪১ ;
৩. ঐ খ. ২, পৃ. ৯২-৯৭ ;
৪. হুজ্জাতুল্লাহি'ল-বালিগা, খ., পৃ. ১০২ (প্রকাশ মিসর)।
৫. যাদু'ল আ'আদ, ২য় খণ্ড, ১৪২ থেকে শেষ পর্যন্ত।

তাই মূল আলোচনার ফাঁকে দুর্বলতম সূত্র ধরেও প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে তিনি এমন স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে ঘুরে বেড়িয়েছেন। প্রতিটি শাস্ত্র সংশ্লিষ্ট আলোচনাকে পৃথক পৃথক অধ্যায়ে বিন্যস্ত ও গ্রন্থবদ্ধ করে দিলে তা থেকে উপকৃত হওয়া সহজ হতো এবং গ্রন্থটির আকর্ষণও বহুগুণ বেড়ে যেত।[১] তবে উল্লিখিত দুর্বলতা সত্ত্বেও এটি ইসলামী জাহানের সেই মহামূল্যবান গ্রন্থগুলোর অন্যতম যা একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারের সার্থক বিকল্প হতে পারে। 'যাদু'ল-মা'আদ' গ্রন্থ সাথে থাকার অর্থ হলো জীবন-মৃত্যুর শংকামুক্ত সর্বজ্ঞানবিশারদ একজন 'আলিম বন্ধু আপনার সাথে রয়েছেন। আল্লাহ্‌র পথের হাজারো পথিক দীন ও সুন্নতের পথে চলতে গিয়ে যাদু'ল-মা'আদ' থেকে আখিরাতের পাথেয় সংগ্রহ করেছেন, আত্মার খোরাক হাসিল করেছেন এবং ঈমানের স্বাদ ও লযযত পেয়েছেন।

ইবনে আবদুল হাদী

হাদীস শাস্ত্রে বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী এবং দীনের প্রচার ও সংস্কার কাজে ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র জীবন উৎসর্গকারী ছাত্রদের মাঝে ইবনু'ল-কায়্যিমের পর ইবনে আবদুল হাদী, ইবনে কাছীর ও ইবনে রজবের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে মৃত্যু বরণকারী 'আল্লামা ইবনুল আবদুল হাদীর জীবনীকারদের মতে, তাঁর জীবনে আরো কিছুটা অভিনিবেশের পরিচয় দিলে নিঃসন্দেহে তিনি শীর্ষস্থানীয় আলিমদের একজন হতে পারতেন। এমনকি বড় বড়দের ছাড়িয়ে যাওয়াও তাঁর পক্ষে কষ্টকর হতো না। আল্লামা সাফাদীর মন্তব্য হলো, لو عاش لكان اية বেঁচে থাকলে তার ব্যক্তিত্ব হতো যুগ-অনন্য।' গ্রন্থে আল্লামা যাহবী মন্তব্য করেছেন ঃ

هوالفقيه البارع المقرى، المجود المحدث الحافظ النحوى الحاذق ذو الفنون كتب عنى واستفدت منه ـ

তিনি বিজ্ঞ ফিকহবিদ, যোগ্য কারী, মুহাদ্দিছ, হাফেজ, ব্যাকরণবিদ এবং বিভিন্ন শাস্ত্রবিশারদ ছিলেন। আমার কাছ থেকে তিনি হাদীস শুনেছেন এবং লিখেছেন। আমিও তাঁর কাছ থেকে উপকৃত হয়েছি।[২]

১. ৪৭ সনে মদীনা শরীফে অবস্থানকালে خير الزاد নামে এ দুরূহ কাজটি আমি শুরু করেছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় তা অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে।

২. আদ্দুরারু' ল-কামিনাহ, খ. ৩, পৃ ৩২২

যুগশ্রেষ্ঠ আল্লামা আবুল হাজ্জাজ আল-মিয্যী তাঁর বিরল প্রতিভার স্বীকৃতি দিয়েছেন এভাবে ঃ

ما التقيت به الا واستفدت منه ـ

যখনই তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে তখনই কোন -না-কোন বিষয়ে উপকৃত হয়েছি।[১]

আল্লামা সাফাদী বলেন ঃ

كنت اذا لقيته سألته عن مسائل ادبية وفوائد عربية فينحدر كالسيل ـ

তাঁর সাথে আমার দেখা হলে আরবী ভাষা ও সাহিত্য প্রসঙ্গে বিভিন্ন বিষয় জিজ্ঞাসা করতাম তখন তাঁর মুখ থেকে যেন ঢল নামত।[২]

ইতিহাস ও তাফসীরবিশারদ আল্লামা ইবনে কাছীর তাঁর কথা লিখেছেন এভাবে ঃ

حصل من العلوم مالا يبلغه الشيوخ الكبار وتفنن فى الحديث والنحو والتصريف والفقه والتفسير والاصلين والتاريخ والقراة وله مجاميع والتاليف مفيدة كثيرة وكان حافظا جيدا لاسماء الرجال وطرق الحديث عارفا بالجرح والتعديل مبصرا بعلل الحديث حسن الفهم ، له جيد المذاكرة صحيح الذهن مستقيما على طريقة السلف واتباع الكتاب والسنة مثابرا على فعل الخيرات ـ

জ্ঞান ও 'ইলমের জগতে যে উচ্চ মর্যাদা তিনি লাভ করেছিলেন তা বয়োবৃদ্ধ ও বড় বড় আলিমদের পক্ষেও সাধারণত সম্ভব হয় না। হাদীস, ব্যাকরণ, ফিকহ, তাফসীর, ফিকহ ও হাদীসের উসুল শাস্ত্র, ইতিহাস, কিরাত শাস্ত্রসহ সকল শাস্ত্রেই অসাধারণ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। বেশ কিছু মূল্যবান রচনা ও সঞ্চয়ন তিনি রেখে গেছেন। রিজাল শাস্ত্র ও হাদীসের সনদ তাঁর মুখস্থ ছিল। এ বিষয়ে তিনি ছিলেন এক অসাধারণ হাফিজ। হাদীস ও সনদের বিচার-বিশ্লেষণ শাস্ত্রেও তাঁর ভালো দখল ছিল। সনদ ও রেওয়ায়েতের দোষ ও খুঁত নির্ণয়ে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। আলিমগণের

১. আদ্দুরারুল কামিবাহ, খ. ৩, পৃ. ৩৩২।

২. ঐ।

সাথে আলোচনার মজলিসে অত্যন্ত সপ্রতিভ ছিলেন। তাঁর চিন্তা ছিল স্বচ্ছ। সালাফ তথা পূর্বসূরীদের পথে ও মতে অবিচল ছিলেন। কুরআন-সুন্নাহর কঠোর অনুসারী ছিলেন। ভালো কর্মে ও নেক কাজে নিষ্ঠাবান ছিলেন।[১]

সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত

নাম শামসুদ্দীন মুহাম্মদ, উপাধি আল-'ইমাদ, উপনাম আবূ আবদুল্লাহ ও আবুল আব্বাস। তবে ইবনে আবদুল হাদী নামেই তিনি প্রসিদ্ধ। বংশসূত্র এরূপঃ মুহাম্মদ ইবন আহমদ ইবন আবদুল হাদী ইবন আবদুল হামীদ ইবন আবদুল হাদী ইবন ইউসুফ ইবন মুহাম্মদ বিন কুদামা। পরিবারটি তাদের মূল আবাসভূমি বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে দামিশকে চলে আসে এবং সালেহিয়্যা মহল্লায় বসবাস শুরু করে। সেখানে ৭০৪ হিজরীতে ইবনে আবদুল হাদী জন্মগ্রহণ করেন। বিভিন্ন রিওয়ায়েতে ইলমু'ল -কিরাত শিক্ষা করেছেন। হাদীসসহ পাঠ্য পুস্তকসমূহের শ্রেষ্ঠাংশ পড়েছেন কাযী আবুল ফযল, সুলায়মান ইবনে হামযা, আবু বকর ইবন আবদুদ্দাইম, ঈসা ইবন মুত'ইম হাজ্জার, যয়নব বিনতু'ল-কামাল প্রমুখের কাছে। হাদীস শাস্ত্রের বিভিন্ন শাখার অধ্যয়ন ছিল তাঁর প্রিয় বিষয়। রিজাল-শাস্ত্র ও সনদ বিশ্লেষণ-শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা ও ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। ফিকহের মাযহাব সম্পর্কে তাঁর পরিপক্ক জ্ঞান ছিল। হাদীস ও ফিকহ-এর উসূল শাস্ত্রে এবং আরবী ভাষা ও সাহিত্যে যথেষ্ট দখল ছিল। আল্লামা ইবনে রজব লিখেছেন,

ولازم الشيخ تقى الدين ابن تيمية مدة وقرأ عليه قطعة من الاربعين فى اصول الدين للرازى -

শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়ার সংস্পর্শে তিনি বেশ কিছুদিন ছিলেন এবং তাঁর কাছে ইমাম রাযীর الار بعين فى اصول الدين এর অংশ-বিশেষ পড়েছিলেন।

ফিকহ শাস্ত্রে তাঁর বিশেষ উস্তাদ ছিলেন শায়খ নজমুদ্দীন হাররানী। সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও যুগশ্রেষ্ঠ আলিম হাফিয আবুল হাজ্জাজ আল-মিয্‌যী-এর খিদমতে দশ বছর ছিলেন। আল্লামা যাহবীর কাছেও পড়েছেন এবং তিনি রিজাল ও সনদ-বিশ্লেষণ শাস্ত্রসহ বিভিন্ন শাস্ত্রে ছাত্রের বিরল প্রতিভার স্বীকৃতি দিয়েছেন অকুণ্ঠচিত্তে। আল্লামা হুসায়নীর বর্ণনা মতে দীর্ঘদিন যাবত তিনি সদরিয়া ও যিয়াইয়া বিদ্যাঙ্গনে প্রধান অধ্যাপকরূপে অধ্যাপনার দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছেন।[২]

---

১. আল-বিদায়া, খ. ১৪, পৃ. ২১০।

২. আদ্দুরারু' ল-কামিনাহ, খ. ৩, পৃ ৩২২;

সমসাময়িক আলিম 'আল্লামা ইবনে কাছীর তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে লিখেছেন ঃ তিন মাসের মত তিনি ফোড়া ও জ্বরে ভুগেছেন। শেষ দিকে রোগ বেড়ে গিয়েছিল এবং প্রচণ্ড দাস্ত শুরু হয়েছিল। অবশেষে ৭৪৪ হিজরী, জুমাদা'ল উলার দশ তারিখ রোজ বুধবার আসরের আযানের পূর্বে তিনি ইনতিকাল করেন। ইবনে কাছীর বলেন, তাঁর পিতা আমাকে বলেছেন, ইবনে আবদুল হাদীর যবানে শেষ কথা ছিল ঃ اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله اللهم اجعلنى من التوابين واجعلنى من المتطهرين পরের দিন মুজাফ্‌ফরী জামে মসজিদে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। তাতে শহরের কাযী, বিশিষ্ট আলিম, সরকারী কর্মকর্তা ও ব্যবসায়ীসহ সর্বস্তরের মানুষ জানাযায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ গ্রহণ করেছেন। ইবনে কাছীর আরো লিখেছেন ঃ

وكانت جنازته حافلة مليحة عليها ضؤ ونور -

তাঁর জানাযায় প্রচণ্ড ভিড় হয়েছিল এবং এক বিশেষ নূর ও দীপ্তি বিরাজ করছিল সেখানে।

তিনি রওযাতে আস-সায়ফ ইবনু'ল-মাজদ-এর পাশে সমাধিস্থ হয়েছেন।[১]

রচনাবলী

আল্লামা ইবনুল হাদী তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনে বেশ কিছু অমর রচনা-কীর্তি রেখে গেছেন[২] যা কলেবর ও পৃষ্ঠা সংখ্যার দিক থেকে যেমন তেমনই তথ্য, উপাদান ও রচনা শৈলীর দিক থেকেও তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে কয়েকটি গ্রন্থ আবার একাধিক খণ্ড বিশিষ্ট। ذيل طبقات الجنابلة গ্রন্থে হাফেজ ইবনে রজব তাঁর রচনাবলীর যে দীর্ঘ তালিকা দিয়েছেন তা থেকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থগুলোর নাম এখানে পেশ করা হচ্ছে।

১। الاحكام الكبرى (সাত খণ্ড) ; ২। المحرر فى الاحكام ;
৩। كتاب العمدة فى الحفاظ (দুই খণ্ড) ; ৪। تعليقة للثقات (দুই খণ্ড);
৫। احاديث الصلوة على النبى صلى الله عليه وسلم ; ৬।
৭। الاعلام فى ذكر مشائخ الائمة الاعلام، اصحاب الكتب الستة ; ৭।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জন্ম সম্পর্কে বিরাট কলেবরের একটি গ্রন্থ ; ৮। تعليقة على سنن البيهقى (দুই খণ্ড) ; ترجمة الشيخ
تقى الدين ابن تيمية ; ৯। منتقى من تهذيب الكمال للمزى (৫ম

১. আল-বিদায়া, খ. পৃ. ২১০।

২. এক্ষেত্রে ভারতবর্ষের সুপ্রসিদ্ধ সর্বজনপ্রিয় আলিম গ্রন্থকার মাওলানা আবদুল হাই লখনভীর নাম করা যেতে পারে যিনি মাত্র উনচল্লিশ বছর বয়সে এক বিরাট ও মূল্যবান রচনা ভাণ্ডার রেখে গেছেন।

খণ্ড) ; ১০। منتخب من مسند الامام احمد (দুই খণ্ড) ; ১১। منتخب من سنن البيهقى ; ১২। منتخب من سنن ابى داؤد ; ১৩। شرخ الفية لابن مالك ; ১৪। ইমাম যাহবীর রচনাবলীর সমালোচনা ; ১৫। الرد على ابى حيان النحوى এছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন হাদীস সম্পর্কে স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা-পুস্তিকা এবং বিভিন্ন গ্রন্থের টীকা যেগুলোর তালিকা বেশ দীর্ঘ। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের যিয়ারত প্রসঙ্গে আল্লামা তাকীউদ্দীন ইবনে সুবকী আল্লামা ইবনে তায়মিয়ার মতামত খণ্ডন করে شفاء السقام فى زيارة خير الانام গ্রন্থ লিখেছিলেন তার জওয়াবে আল্লামা ইবনে আবদুল হাদী লিখেছেন الصارم المنكى فى الرد على السبكى নামে সুন্দর ও সারগর্ভ সমালোচনা গ্রন্থ যা আল্লামা ইবনে আবদুল হাদীর সুগভীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা এবং হাদীস ও রিজাল শাস্ত্রের ওপর তাঁর ব্যাপক অধ্যয়ন ও পড়াশোনার সাক্ষ্যই বহন করে।

ইবনে কাছীর

নাম ইমাদুদ্দীন ইসমাঈল ইবনে ওমর, উপনাম আবুল ফিদা; তবে ইবনে কাছীর নামেই তিনি পরিচিতি লাভ করেছেন। তিনি কয়েস গোত্রের সন্তান, সিরিয়ার বুখারা শহরের পার্শ্ববর্তী মাজদাল গ্রামে যেখানে তাঁর আব্বা খতীবের দায়িত্ব পালন করছিলেন -৭০১ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। ৭০৬ হিজরীতে পিতার সাথে দামিশকে চলে আসেন। শায়খ বুরহানুদ্দীন আল-ফাযারী প্রমুখের কাছে ফিকহ্ অধ্যয়ন করেন। ইবনে সুওয়ায়দী আবুল কাসিম ইবন আসাকির প্রমুখ হাদীস শাস্ত্রবিশারদদের কাছে হাদীস শ্রবণ করেন। তবে আল্লামা আল-মিয্যীর তিনি বিশেষ ছাত্র ছিলেন। পরে তিনি তাঁর প্রিয় কন্যার পাণিও গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর কাছ থেকে প্রচুর হাদীস রিওয়ায়েত করেছেন। ফতওয়া, অধ্যাপনা, বিতর্ক আলোচনা ছিল তাঁর প্রিয় বিষয়। ফিকহ, তাফসীর ও আরবী ব্যাকরণ শাস্ত্রে বিশেষ দখল ছিল। রিজাল শাস্ত্র এবং সনদ বিশ্লেষণ-শাস্ত্রে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। উম্মুস সালিহ বিদ্যাঙ্গনে অধ্যাপক ছিলেন। আল্লামা যাহবীর ইনতিকালের পরে তানকাযিয়া বিদ্যাঙ্গনেও অধ্যাপনা করেছেন। তাঁর সম্পর্কে আল্লামা যাহবীর মন্তব্য হলো ঃ

هو فقيه متقن ومحدث محقق ومفسر نقاد وله تصانيف صفيدة -

তিনি পরিপক্ক ফকীহ, গবেষক, মুহাদ্দিছ, সমালোচক ও তাফসীর বিশারদ। তাঁর বেশ কিছু উপকারী রচনা রয়েছে।

হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী বলেন ঃ

كان كثير الا ستحضار وسار تصانيفه فى البلاد فى حياته وانتفع به الناس بعد وفاته ـ

অত্যন্ত প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের অধিকারী ছিলেন। জীবদ্দশায়ই তাঁর রচনাবলী বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। এমন কি মৃত্যুর পরও মানুষ সেগুলো থেকে উপকার লাভ করেছে।

শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। তিনি তাঁর জ্ঞান, মর্যাদা ও বৈদগ্ধের সশ্রদ্ধ প্রশংসা করতেন। তাঁর সাথে তাঁর ছাত্র সম্পর্কও ছিল। ইবনে হাজার বলেনঃ

اخذ عن ابن تيمية ففتن بحبه وامتحن بسببه ـ

"ইবনে তায়মিয়া থেকে জ্ঞান অর্জন করেছেন এবং তাঁকে গভীরভাবে ভালবেসেছিলেন।"

এ ভালবাসার মাশুলও তাঁকে দিতে হয়েছিল। আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া গ্রন্থে ইমাম সাহেবের জীবন-বৃত্তান্ত যত্ন ও আন্তরিকতার সাথে সবিস্তারে লিখেছেন এবং সর্বশক্তি দিয়ে তাঁর পক্ষ সমর্থন করেছেন। ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র জীবন-বৃত্তান্তের অধিকাংশ বিষয় আল-বিদায়া থেকেই আমরা নিয়েছি। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ রচনাবলী হলো ঃ

(১) التكميل فى معرفة الثقات الضعفاء والمجاهيل (পাঁচ খণ্ড); (২) تخريج ادلة (৩) ;الهدى والسنن فى احاديث المسانيد والسنن (৪) ;التنبيه طبقات (৬) ;علوم الحديث ـ (৫) ;مسند الشيخين الشافعية;

আহ্কাম সম্পর্কে বিস্তৃত কলেবরের একটি গ্রন্থ রচনায় তিনি হাত দিয়েছিলেন, কিন্তু তা সম্পূর্ণ হয় নি। মুসনাদে ইমাম আহমদকে বর্ণনানুক্রমে বিন্যস্ত করে তাতে তাবারানী ও আবু য়া'লার সংযোজনও অন্তর্ভূক্ত করেছেন। তবে তাঁর মূল রচনাকীর্তি হলো দু'টি গ্রন্থ যা ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে এবং আজ পর্যন্ত গবেষক ও বিদগ্ধজনদের মহলে উপকারী গ্রন্থের মর্যাদা পেয়ে আসছে। একটি হলো তাফসীরে ইবনে কাছীর। হাদীস ও বর্ণনা ভিত্তিক তাফসীর গ্রন্থসমূহের মধ্যে আল্লামা ইবনে কাছীরের তাফসীরকেই মনে করা হয় সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য। আল্লামা সুয়ূতী লিখেছেন ঃ

له التقسير الذى لم يؤلف مثله -

এমন এক তাফসীর গ্রন্থ তিনি লিখেছেন যার অনুরূপ পূর্বে রচিত হয়নি।

ইবনে কাছীরের পূর্বে বর্ণনাভিত্তিক তাফসীরগুলোতে মুহাদ্দিছসুলভ সতর্কতা এবং হাদীসের বিশুদ্ধতা যাচাইয়ে প্রজ্ঞার দারুণ অভাব ছিল। ফলে সেখানে দুর্বল হাদীস ও ইসরাঈলী বর্ণনাসমূহের বহুল অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। হাফিজ ইবনে কাছীর তাঁর তাফসীরে হাদীস শাস্ত্রের স্বীকৃত নীতিমালা অনুসরণ করেছেন এবং মুহাদ্দিছসুলভ সতর্কতার মাধ্যমে পূর্ববর্তী তাফসীরকারদের বুহ দুর্বলতা সযত্নে পরিহার করেছেন। অবশ্য একথা সত্য যে, তাঁর মত বরেণ্য মুহাদ্দিছের কাছে আমাদের যতটা প্রত্যাশা ছিল হাদীস বিচারের ক্ষেত্রে ততটা উচ্চ মান তিনি বজায় রাখতে পারেন নি। কিছুটা উদারতা প্রদর্শন করে ইসরাঈলী বর্ণনাসমূহের একাংশ তিনিও গ্রহণ করেছেন। তবুও একথা স্বীকার করতেই হবে যে, প্রাচীন তাফসীর গ্রন্থগুলোর মাঝে হাদীসশাস্ত্রীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ইবনে কাছীরের তাফসীরই হলো সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য ও উপকারী। সম্প্রতি মিসরের স্বনামধন্য গবেষক পণ্ডিত আল-উস্তায আহমদ শাকের عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير নামে তাফসীর ইবনে কাছীরের সংক্ষেপ করেছেন। এতে মূল গ্রন্থের যাবতীয় সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রেখে দুর্বল হাদীস, অনির্ভরযোগ্য ইসরাঈলী বর্ণনা, পুনরুক্ত বর্ণনা ও সনদ এবং বিভিন্ন অপ্রয়োজনীয় ও দীর্ঘ আলোচনা ছাঁটাই করা হয়েছে। ফলে কিতাবটির উপযোগিতা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

ইবনে কাছীরের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ রচনা হলো আল-বিদায়া ওয়া'ন-নিহায়া। ১৩৫১ হিজরীতে মিসর থেকে চৌদ্দ খণ্ডে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। আরব ঐতিহাসিকদের রীতি অনুযায়ী সৃষ্টির আদি থেকে শুরু করে ৭৬৭ হিজরী পর্যন্ত সময়কালের ইতিহাস এতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আল্লামা ইবনু'ল আছীরের সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'আল-কামিলি' শেষ হয়েছে ৬২৮ হিজরী পর্যন্ত এসে। এতে 'আল বিদায়া'তে ১৩৯ বছরের ইতিহাস সংযোজিত হয়েছে। তাতারী হামলা এবং আট শতকের ঐতিহাসিক গুরুত্বের কারণে উপরিউক্ত সময় কাল ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও ঘটনাবহুল। এ কারণে এবং নির্ভরযোগ্যতা ও বিশুদ্ধতার কারণেও 'আল-বিদায়া' সকল ঐতিহাসিকের প্রিয় উৎস গ্রন্থরূপে বিবেচিত হয়ে এসেছে। ৭৭৪ হিজরীতে হাফিজ ইবনে কাছীর ইনতিকাল করেন এবং দামিশ্‌কের প্রসিদ্ধ সুফিয়া কবরস্থানে সমাধিস্থ হন।[১]

---

১. যায়ল তাযকিরাতি'ল-হুফফাজ (শামসুদ্দীন আবুল মাহাসিন আল-হুসায়নী কৃত)।

হাফিয ইবনে রজব[১]

সংক্ষিপ্ত জীবন-বৃত্তান্ত

নাম আবদুর রহমান, পিতার নাম আহমদ ইবনে রজব। তাঁর বংশ-সূত্র এরূপ ঃ আবদুর রহমান ইবন আহমদ ইবন রজব ইবন আবদুর রহমান ইবনু'ল হাসান ইবন মুহাম্মদ ইবন আবুল বারাকাত মাস'উদ। পারিবারিক আবাসভূমি ছিল বাগদাদ। সেখানেই তিনি ৭৩৫ হিজরীতে রবী'উ'ল-আওয়াল মাসে জন্মগ্রহণ করেন। ৭৪৪ হিজরীতে অল্প বয়সেই পিতার সাতে দামিশকে আসেন। মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল ইবন ইবরাহীম ইবনু'ল খাববায এবং ইবরাহীম ইবনু'ল-আত্তার প্রমুখ থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। মিসরে আবুল ফাতাহ-আল-মায়দুমী এবং আবুল হারাম আল-কালানিসী প্রমুখ থেকে হাদীস গ্রহণ করেন। হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী বলেন ঃ ইবনে রজব বিপুল সংখ্যায় হাদীস শ্রবণ করেছেন এবং হাদীছ-চর্চায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। ফলে হাদীস শাস্ত্রে অল্পকালের মধ্যেই তিনি ব্যুৎপত্তি অর্জন করে ফেলেন। হাফিজ আবুল ফযল তাকীয়ুদ্দীন ইবনে ফাহদ মক্কী (মৃ. ৮৭১ হি.) তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

الامام الحافظ الحجة والفقيه العمدة احد العلماء الزهاد والائمة العباد مفيد المحدثين واعظ المسلمين ـ

তিনি হাদীসের হাফিজ ও ইমাম, শ্রেষ্ঠ ফকীহ্, দুনিয়ার প্রতি নির্মোহ আলিমদের একজন, ইবাদত গুযার ইমামদের অন্যতম, মুহাদ্দিছগণের শিক্ষক এবং মুসলমানদের খতীব।

তিনি আরো লিখেছেন ঃ তিনি ধার্মিক ও মুত্তাকী নেতা ছিলেন। মানুষের অন্তরে তাঁর প্রতি মুহব্বত পয়দা করে দিয়েছিলেন আল্লাহ্ পাক। দল-মত নির্বিশেষে সকলে তাঁর সততা ও শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়ে একমত ছিলেন। তাঁর ওয়াজের মজলিস অত্যন্ত উপকারী ও প্রভাব সৃষ্টিকারী ছিল।

আশ-শিহাব ইবন হাজ্জী তাঁর 'ইলম ও প্রজ্ঞাগত মর্যাদা সম্পর্কে বলেন ঃ

১। হাফিজ ইবনে রজব আল্লামা ইবনে তায়মিয়ার প্রত্যক্ষ ছাত্র নন। ইমাম সাহেবের মৃত্যুর আট বছর পর তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তবে হাফিজ ইবনে কায়্যিমের তিনি প্রিয়তম ছাত্র এবং ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র) ও ইবনে কায়্যিম দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত। দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় সকল ক্ষেত্রেই তিনি ইবনে তায়মিয়া (র)-র অবদান ধন্য এবং ইবনে তায়মিয়ার আদর্শে অনুপ্রাণিতদের অন্তর্ভুক্ত।

হাদীস শাস্ত্রের তিনি অসাধারণ সমালোচক ও গবেষক ছিলেন। সমসাময়িকদের মাঝে হাদীসের সনদ এবং সনদের বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সর্বাধিক পারদর্শী ছিলেন। আমাদের সমসাময়িক অধিকাংশ হাম্বলী আলিম তাঁর ছাত্র ছিলেন।

৭৯৫ হিজরীতে রজব মাসে তাঁর ইনতিকাল হয় এবং দামিশকের আল-বাবু'স -সগীরে সমাধিস্থ হন। ইনতিকালের কয়েকদিন পূর্বে কবরস্থানে এসে জনৈক কবর খননকারীকে বলেন ঃ আমার জন্য একটা কবর খনন করবেন। আদেশ পালিত হলে তিনি সেই কবরে নেমে অনেকক্ষণ শুয়ে কাটালেন। অতঃপর উঠে এসে বললেন, ভালই। এর কয়েক দিন পরই তাঁর ইনতিকাল হয় এবং সেই কবরেই তাঁকে দাফন করা হয়।

রচনাবলী

তিরমিযী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ লিখেছেন। ফাতহু'ল-বারী নামে বুখারী শরীফের একটি ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনার কাজে হাত দিয়ে বেশ কিছু দূর এগুলেও তা শেষ করে যেতে পারেননি। ইবনে আবূ য়া'লা কৃত 'তাবাকাতু'ল -হানাবিলা' গ্রন্থের তিনি পরিশিষ্ট যোগ করেছেন। ওয়াজ ও উপদেশমূলক একটা গ্রন্থ হলো اللطائف فى وظائف الايام। এতে ফিকহ্ -সংক্রান্ত বেশ কিছু উপকারী কথা ও মূলনীতির আলোচনা রয়েছে। ইমাম নববীর اربعين। এর ব্যাখ্যাও লিখেছেন তিনি। নববীর 'আরবাঈনে' মোট বিয়াল্লিশটি হাদীস ছিল। তিনি আরো আটটি হাদীস যোগ করেন। বইটি ১৩৪৬ হিজরীতে মুস্তফা আল- বাবী আল-হালাবী–এর প্রেস থেকে ছেপে বের করা হয় ; ما ذئبان جائعان ارسلا فى غنم الخ। হাদীসটির স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা করেছেন। শেষোক্ত বই তিনটি প্রকাশিত হয়ে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। তাঁর রচনাবলীতে হাফিজ ইবনে কায়্যিমের দাওয়াতী জযবা ও সংস্কারবাদী মনের আকুতি লক্ষ্য করা যায়। সেই সাথে ইবনে কায়্যিমের ভাষার মিষ্টতা ও প্রাঞ্জলতা এতে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান রয়েছে।

উপরে উল্লিখিত কয়েকজন ছাত্র ও ছাত্রের ছাত্র ছাড়াও অষ্টম ও নবম শতাব্দীর কতিপয় বিশিষ্ট আলিম, লেখক ও সংস্কারক এমন রয়েছেন যাদের সম্পর্কে জানা সম্ভব হয়নি যে, তাঁরা শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়ার কিংবা তাঁর কোন ছাত্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন কিনা। তবে তাদের রচনাবলীতে শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র 'ইলম ও প্রজ্ঞা, আবেগ ও চিন্তাধারা এবং দাওয়াতী জযবা ও ব্যাকুলচিত্ততার পূর্ণ ছাপ বিদ্যমান রয়েছে। শায়খুল

ইসলামের ছাত্রদের কাছ থেকে কিংবা তাঁর রচনাবলী থেকে উপকৃত হয়ে থাকুন কিংবা সে সুযোগ তাদের জীবনে নাই এসে থাকুক-চিন্তার ঐক্য এবং রুচি ও কর্মের অভিন্নতার ভিত্তিতে তাঁদেরকে ইবনে তায়মিয়া (র)-র চিন্তাধারার অনুগামী একই পরিবারভুক্ত বলে নির্দ্বিধায় ধরে নেওয়া যেতে পারে। এ পর্যায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মাঝে الموافقات। গ্রন্থের স্বনামধন্য রচয়িতা আল্লামা আবূ ইসহাক শাতিবী (মৃ. ৭৯) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ الاعتصام। মূলত সেই সংস্কার আন্দোলনেরই একটি অনবদ্য সংযোজন, যে আন্দোলনের শুভ সূচনা হয়েছিল শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-র যুগে, তাঁরই মুবারক হাতে। الاعتصام। গ্রন্থটি সুন্নত ও বিদআত সম্পর্কে সবচেয়ে তথ্যবহুল, সারগর্ভ, মৌলিক ও সর্বাঙ্গীন রচনাকর্ম।

সমাপ্ত–

---

১. পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬১৯, প্রকাশ মিসর।

গ্রন্থকার ঃ

মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (র) সেই যে ত্রিশের দশকে তাঁর পূর্বপুরুষ বালাকোটের শহীদ আমীরু'ল-মু'মিনীন হযরত সাইয়েদ আহমদ বেরলভী (র)-এর অনুপম চরিত গ্রন্থ "সীরাত সাইয়েদ আহমদ শহীদ" লিখে তারুণ্যদীপ্ত বয়সেই উর্দূ সাহিত্যের আসরে নিজের একটি উল্লেখযোগ্য আসন করে নিলেন তারপর বিগত প্রায় পৌণে এক শতাব্দী ধরে তাঁর কলম অবিশ্রান্তভাবে লিখে গেছে মুসলিম ইতিহাসের গৌরবদীপ্ত অধ্যায়গুলোর ইতিবৃত্ত। পাঁচ খণ্ডে রচিত 'তারিখে দাওয়াত ও আযীমত'-এর ভাবানুবাদ **'সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস'** তাঁর এমনি একটি অমূল্য গ্রন্থ। সীরাত থেকে ইতিহাস, ইতিহাস থেকে দর্শন ও সাহিত্য পর্যন্ত সর্বত্রই তাঁর অবাধ গতি। তাঁর "মা-যা খাসিরা'ল-আলামু বিনহিতাতি'ল-মুসলিমীন" **Islam and the World**-এর বঙ্গানুবাদ 'মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো?' একখানি চিন্তাসমৃদ্ধ অনবদ্য আরবী গ্রন্থ যার অনুবাদ পৃথিবীর অনেক ভাষায় হয়েছে। 'নবীয়ে রহমত' ছাড়াও তাঁর রচিত "আল-মুরতাযা" শীর্ষক হযরত আলী (রা)-এর জীবনী গ্রন্থখানা আরবী, উর্দূ ও ইংরেজী ভাষায় প্রভূত সুনাম অর্জন করেছে। সমসাময়িক বিশ্বে তাঁর চাইতে অধিকতর খ্যাতিমান ও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী অন্য কোনও আলেম জন্মেছেন কি না এবং থাকলেও তাঁর মত এত অধিক স্বীকৃতি লাভ করেছেন কিনা সন্দেহ রয়েছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের প্রায় সকল জনপদে যেমন তিনি আমন্ত্রিত হয়ে সে সব দেশ সফর করেছেন, তেমনি নোবেল পুরস্কার তুল্য মুসলিম বিশ্বের সব চাইতে মূল্যবান 'বাদশা ফয়সাল' পুরস্কারে তিনি পুরস্কৃত হয়েছেন। তিনি একাধারে রাবেতায়ে আলমে ইসলামী-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, লখনৌর বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দারুল উলুম নদওয়াতুল-উলামা-এর রেকটর, ভারতীয় মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ প্লাটফরম মুসলিম পার্সোন্যাল ল' বোর্ডের সভাপতি ছিলেন। তাঁর অস্তিত্ব কেবল ভারতীয় মুসলমানদের জন্যই নয়, গোটা বিশ্বের মুসলমানদের জন্যই এক বিরাট নেয়ামত ছিলেন। তাঁর বেশ কটি বই ইতিমধ্যেই বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। একাধিকবার তিনি বাংলাদেশ সফরও করেছেন। তাঁর আত্মজীবিনীমূলক গ্রন্থ এ পর্যন্ত ৭ খণ্ডে প্রকাশিত 'কারওয়ানে যিন্দেগী' শুধু তাঁর আত্মজীবনীমূলক নয়, এটা সমসাময়িক বিশ্বের অনেক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ও ব্যক্তির এক অপূর্ব আলেখ্যও বটে। তাঁর রচনায় আল্লামা শিবলীর অনবদ্যতা, আল্লামা সাইয়েদ সুলায়মান নদভীর সূক্ষ্মদর্শিতা, মাওলানা মানাযির আহসান গিলানীর সতর্কতা, মাওলানা আশরাফ আলীর থানবীর তাকওয়া, সর্বোপরি তাঁর পূর্বপুরুষ সাইয়েদ আহমদ বেরলভী (র)-এর দরদ প্রতিফলিত হয়েছে। শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া (র), মাওলানা মনযূর নোমানী (র), ও রঈসুত-তাবলীগ মাওলানা ইউসুফ (র)-এর অনেক মূল্যবান গ্রন্থে তাঁর লিখিত সারগর্ভ ভূমিকাগুলো পড়বার মতো। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে তিনি মাওলানা আহমদ আলী লাহোরী (র) এবং মাওলানা আবদুল কাদির রায়পুরী (র)-এর খলীফা। বিগত হিজরী ১৪২১ সনের ২২ রমযান জুম'আর পূর্বে সূরা ইয়াসীন তেলাওয়াতরত অবস্থায় ইনতিকাল করেন। রায়বেরেলীর পারিবারিক কবরস্থানে রওযায়ে শাহ্ আলামুল্লাহ্য় তাঁকে দাফন করা হয়।

মুহাম্মদ ব্রাদার্স-ঢাকা